নীললোহিত — সমগ্র

নীললোহিত-সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং

নীললোহিত-সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
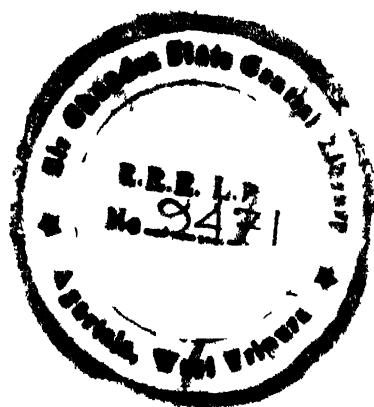
দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NILLOHIT-SAMAGRAH (Volume III)
Collected prose writings of SUNIL GANGOPADHYAY
Published by SUDHANGSHU SEKHAR DEY
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

Rs. 130.00

প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ১৯৪৯

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবাশিস রায়

একশো তিরিশ টাকা

ISBN-81-7612-343-9

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

শব্দগ্রন্থক : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

উৎসর্গ

বুইয়া আর পুপলু-কে

সূচি

দৃষ্টিকোণ

বীথি ও আশুতোষ ঘোষকে

দাড়ি কামাবার জন্য ব্লেড কিনতে হলেও ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে পয়সা চাইতে হয়, আমার তখন এমন অবস্থা। কোনো রকমে এক পিঠের ভাড়া জোগাড় করে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে, ফেরার সময় ফেরৎ গাড়িভাড়া কারুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে বাধ্য হই। আমার বাড়ি থেকে বড়ো রাস্তায় বেরুবার জন্য দুটিমাত্র গলি পথ। দুটি গলির মুখেই দুটি সিগারেটের দোকানে প্রচুর ধার জমে যাওয়ায় এমন মুস্কিল হয় যে, যে-কোনো দিক দিয়ে বেরুতে গেলেই বিপদ। বাড়ির সামনে দিয়ে বেলুনওলা রং-বেরংয়ের অসংখ্য বেলুন নিয়ে যাচ্ছে, আমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলেটি আচমকা আবদার ধরে বসল কাকা, আমায় বেলুন কিনে দাও না। আমি শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিমর্ষ ভাব চেপে রেখে ওকে বললুম দূর পাগল। বেলুন কিনে কি হবে, ওতো যখন তখন ফেটে যায়, আমি তোকে পরে এরোপ্লেন কিনে দেব। এ রাস্তা দিয়ে এরোপ্লেন ফেরিওলা গেলে আমায় ডাকিস।

একটা ছোট ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করতুম, একদিন মালিকের কথায় হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেছিলুম একটা থাপ্পড়ে দাঁত ক'খানা খুলে দেব। ভদ্রভাবে যদি বলতে না পারেন, কথা বলতে আসবেন না আমার সঙ্গে। মালিক একটুও বিচলিত না হয়ে বলেছিল বেশ বেশ, এই রকম তেজি ছেলেই তো এখন দেশের পক্ষে দরকার। ভালো, ভালো। কিন্তু বাপু নিজের কর্মচারীর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে তো আমার পক্ষে কাজ চালানো মুস্কিল। এই ছোট জায়গায় আটকে থাকা ঠিক নয়, তুমি এর চেয়ে কোনো বড়ো জায়গায়, ভদ্র জায়গায় যে কাজে তোমার যোগ্যতার দাম পাবে—সে রকম জায়গা খুঁজে নাও। তোমায় আটকে রাখলে আমার পাপ হবে।

সেই দিন থেকেই আমার চাকরি যায়। তিন মাস পর্যন্ত আমার রাগ ও তেজ বেশ বজায় ছিল। তখনো চাকরি না পেয়ে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কানটা মুলে দিয়ে বলেছিলাম গোমুখ্যু ছাড়া কেউ কখনো মালিকের ওপর রাগ করে! চাকরি হচ্ছে ভগবান, হাজার দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা পেলেও ভগবানকে কখনো ত্যাগ করা যায় নাকি? সে কতটা সহ্য করতে পারে, ভগবান যেমন যাচাই করে দেখেন, চাকরিও তাই। মালিক না হয় আমাকে বলেছিল, একটা কথা ক'বার বলতে

হবে? গরু-ছাগলেও এর চেয়ে তাড়াতাড়ি বোঝে। কী এমন দোষ করেছিল, একথা বলে? এমনকি মালিকের বাড়িতে মেথর না এলে উনি যদি আমাকে পায়খানা সাফ করতেও বলতেন, তাও আমার হাসি মুখে করা উচিত ছিল। সবই তো পরীক্ষা।

যাই হোক, তখন আমি কোনো মেয়ের দিকে তাকাই না। ভালো করে কথা পর্যন্ত বলি না। পাছে প্রেম-টেম হয়ে যায়। প্রেম হলেই তো আবার পয়সার প্রশ্ন। বিকেলবেলা যদি হঠাৎ গরম কমে গিয়ে হঠাৎ হু হু করে মোলায়েম বাতাস দেয়, তখুনি আমি বাড়ির বন্ধ ঘরে ফিরে আসি। যদি আবার মন খারাপ হয়ে যায়। আগে বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করে সিনেমা দেখতে যেতুম, কে কেমন টিকিট কাটল খেয়ালই করিনি। কিন্তু এখন সিনেমার প্রসঙ্গ উঠলে আমি বলি, সিনেমা দেখলেই আমার মাথা ধরে, তোরা যা।

এমন অবস্থায় এক বন্ধু দয়াপরবশ হয়ে আমাকে একটি টিউশনি যোগাড় করে দিয়েছিল। একটি স্কুল ফাইনালের মেয়েকে গ্যারাণ্টি দিয়ে অঙ্কে পাশ করাতেই হবে, মাসিক পঞ্চাশ টাকা। সেই সময় আমার আরো দুরবস্থা হলো। পঞ্চাশ টাকার মূল্য আমার কাছে লক্ষ টাকার সমান, কিন্তু প্রথম মাসটা যে অসম্ভব দীর্ঘ। এক-একটা দিন যায় মরুভূমির এক মাইল পথের মতন। তা ছাড়া যেতে হয় নিউ আলিপুর, আমার বাড়ি থেকে বহু দূর। প্রত্যেক দিনের ভাড়া জোগাড় করার জন্য বহু আয়ুক্ষয় করতে হয়। তবু আমি দাঁতে দাঁত চেপে আগামী মাসের এক তারিখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মেয়েটি নির্বোধ কিন্তু সুন্দরী। নতুন তৈরি করা বাড়ির ব্যালকনিতে বসে বহুদূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়, রক্তিম ছায়াময় সন্ধেবেলা সেই সুরম্য হর্মের সদ্য যুবতী যখন আমার দিকে তাকিয়ে অকারণে হাসে আমি তখন অ্যালজ্যাব্রার ফর্মুলা ভাবি। অশ্বিনী দত্ত কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিযোগের চেয়ে অ্যালজ্যাব্রার শক্তিও কম নয়। বাড়িটাতে লোকজন খুব কম, মেয়ের বাবা মা প্রায়ই পার্টিতে যান, মেয়েটিকে যখন আমি পড়াই, ধারে কাছে একটিও লোক থাকে না। শাড়ির বদলে যেদিন মেয়েটি শালওয়ার পাঞ্জাবি পরে, সেদিন আমি ওর দিকে প্রায় চোখ তুলে তাকাই না। দু'বাহু তুলে ঐ স্বাস্থ্যবতী নির্বোধ কুমারী যখন আলস্য ভাঙার ভঙ্গি করে, তখন তার হাত ও বুকের ডোলে যে ভঙ্গিমা হয়, তার কাছে অ্যালজ্যাব্রা জ্যামিতি পদে পদে তুচ্ছ হয়ে থাকার সম্ভাবনা।

উনিশ দিনের দিন, নিরালা মেঘলা সন্ধেবেলায় মেয়েটি আমার হাতের উপর হাত রেখে আদুরে গলায় বলল, খালি পড়া আর পড়া। আজ পড়া না, আসুন আজ গল্প করি।

গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, এসব মেয়ের প্রতি বাপ মা বেশি মনোযোগ দেয়নি। এসব মেয়েদের বেশ অল্প বয়সেই বাড়ির চাকরের সঙ্গে ভাব হয়। উষ্ণ হাতের পাঞ্জায় মেয়েটি আমার হাতে চাপ দিল। আমি কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। মনে মনে বললুম, আহা রে খুকি, আমি কি তোমার মনের ইচ্ছা জানি না। আমারও কি সাধ আহ্লাদ জাগে না? আমারও কি ইচ্ছে হয় না, জ্যামিতির বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোমার ঐ কচি ঠোঁট দুটি নিয়ে খেলা করি? কিন্তু কোথা থেকে তোমার বাড়ির লোকজন কেউ যদি এক ঝলক দেখে ফেলে তারপর মার খাব কি খাব না সেটা পরের কথা—কিন্তু চাকরিটি তো যাবে। মেয়ের বদলে অন্য মেয়ে পাওয়া যায়, এমনকি প্রেম গেলেও অন্য প্রেম আসে, কিন্তু চাকরি? ওরে সর্বনাশ। পঞ্চাশ টাকার চাকরিটা হারাবার রিস্ক নিয়ে তোমার সঙ্গে ছেলেখেলা করার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বললুম, না, লিলি, এখন মন দিয়ে পড়াশুনো করো, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর অনেক গল্প করব। পরীক্ষার পরও আমাকে তোমাদের বাড়ি আসতে দেবে?

সাতাশ দিন কেটেছে আর তিনদিন, আর তিনদিন পরেই সেই সোনার দিন। এরা আবার এক তারিখেই দেয় তো। প্রথম টাকা পেয়েই ডজনখানেক বেলুন কিনব। তিনটে দেব পিসতুতো ভাইয়ের ছেলেকে, তিনটে ফাটিয়ে ফেলব নিজে, আর ছটা উড়িয়ে দেব আকাশে, এমনিই।

সাতাশ দিনের দিন, অঙ্ক কষাতে কষাতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে গেল। যখন বেরিয়ে এসেছি খুবই ক্লান্ত। নিজের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়, আরেকটু হলেই অঙ্কে ফেল করতুম, এখন মেয়েটিকে শেখাবার জন্য বাড়িতে রোজ জ্যামিতির এক্সট্রা কষি। এখন অনেক বড়ো পরীক্ষা। সেদিন খুবই ক্লান্ত লাগছিল। অন্যদিন নিউ আলিপুর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে এসে ট্রামে উঠি। আজ আর ভালো লাগল না, পকেটে একটা সিকি আছে বলে খানিকটা বিলাসিতার লোভে সেখান থেকেই বাসে চেপে বসলুম। আর তো মোটে তিনদিন।

জানলার ধারে বসার জায়গা পেয়ে আস্তে আস্তে মন ভালো হচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে কণ্ডাক্টর এল টিকিট চাইতে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে সিকিটা বার করে দিলাম।

—অচল, পাল্টে দিন।

অচল? অসম্ভব? মায়ের লক্ষ্মীর সিংহাসন থেকে গোপনে সরিয়ে এনেছি, সেই সিকি কখনো অচল হতে পারে? ঠাকুর দেবতাকে কেউ অচল পয়সা দেয় নাকি। আমি বললুম, মোটেই অচল নয়, ভালো করে দেখুন।

কণ্ডাক্টর বলল আপনিই দেখুন না। হাতে ঘষলুম, হাতে একেবারে রঙে রঙ হয়ে গেছে, পাল্টে দিন।

সিকিটা আমি হাতে নিয়ে দেখলুম। সত্যি, সেটায় কোনো পদার্থ নেই। ঠুকলে টক টক-এর বদলে ঢ্যাব ঢ্যাব শব্দ। আমি অসহায় ভাবে বললুম, আমার কাছে তো আর খুচরো নেই।

—নোট দিন ভাঙিয়ে দিচ্ছি। ক'টাকার নোট, পাঁচ টাকার?

আমি বললুম, না, একশো টাকার—

কণ্ডাকটার সমেত বাসের বহুলোক হেসে উঠল। আমি চটে উঠে বললাম, হাসির কি আছে এতে? দেখবেন? আমি পকেটে হাত দিলাম।

কণ্ডাক্টর বলল, না, না, দরকার নেই, ভয় পেয়ে যাব। জীবনে কখনো একশো টাকার নোট দেখিইনি, হঠাৎ কেন এখন দেখিয়ে চমকে দেবেন? আপনি বরং টিকিট না কেটে এমনিই যান।

—কেন, এমনি যাব কেন? বেঁধে দিন, আমি নেমে যাচ্ছি। মাঝপথে নেমে এসে বিশ্ব সংসারের ওপর অসম্ভব ক্রোধ হয়। হঠাৎ মনে হয়, ওষুধের কোম্পানির চাকরিটা যখন ছেড়েই এসেছি তখন আসবার আগে সত্যি সত্যি মালিকের দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে আসিনি কেন। একটা কিছু করা সত্যিই দরকার। যত রাজ্যের চোর জোচ্চোররাই নির্বিঘ্নে সুখে থাকবে এ দুনিয়ায়।

এতক্ষণ বক্‌বক করে পড়িয়ে এসে ক্লান্ত, ক্ষিদে পেয়েছে, এখন এতটা পথ হেঁটে যাবার কথা ভাবতেই কি রকম যেন অভিমান বোধ হলো। পথের দিকে তাকিয়ে বললুম, আমাকে এত কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি? না, আমি হেঁটে যাব না। যে-কাজ আগে কখনো করিনি, ঠিক করলুম, সেইভাবেই ফিরতে হবে। অন্য বাসে উঠে আবার এই সিকি দেখাব। যদি না নেয় নেমে পড়ব, কিছুটা দূর তো যাওয়া যাবে। এইভাবে কয়েকটা বাস বদলাতে পারলেই হলো।

দোতলা বাস থামিয়ে উঠে পড়লাম। ওঠা নামাতে যাতে কিছুটা সময় যায় এই জন্য ভাবলুম দোতলায় যাব। খুব বেশি ভিড় ছিল না, কণ্ডাক্টর দু'জনেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেই দেখলাম একটা মোটাসোটা মানি ব্যাগ। আমার পায়ের কাছে। নীচু হয়ে তুলে নিলাম। ব্যাগটা খোলামাত্র আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। থরে থরে একশো টাকার নোট সাজানো। অন্তত বারো তেরোখানি নিশ্চিত, এ ছাড়া কিছু আজেবাজে পাঁচ-দশ টাকার খুচরো নোট, কয়েকখানা ছাপানো কার্ড। আমার বুকের ভিতরকার শব্দ বাইরের সব শব্দ ঢেকে দিল। আমার হাত কাঁপছে, চোখের চারপাশে জ্বালা করছে।

তবু আমি গলার শব্দ পরিষ্কার করে বললুম, মানি ব্যাগটা কার? এই মানি ব্যাগটা কার?

কয়েকজন যাত্রী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কেউ কোনো কথা বলল না। আমি হাত উঁচু করে বললাম, এটা কার? কেউ কোনো সাড়া দিল না। আমি তখন অনেকটা আপন মনেই বললাম, কেউ বোধহয় নামার সময় ফেলে গেছে। কণ্ডাক্টরকে জমা দিয়ে আসি।

তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে, যদি বাস থেকে নেমে পড়তে পারি, তাহলে এসব টাকাই আমার। ময়দানের পাশ দিয়ে চৌরঙ্গির ফাঁকা রাস্তায় বাস দুর্দান্ত স্পীডে যাচ্ছে, আমি এসে পা-দানিতে দাঁড়ালাম। আর কয়েক মুহূর্ত, বাস থেকে নেমে গেলেই আমি পথের জনতার সঙ্গে মিশে যাব। এত স্পীডে যাচ্ছে যে আমার পক্ষে লাফিয়ে নামা অসম্ভব। আমি অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। এক হাজার টাকা? অবিশ্বাস্য? ব্যাগটা আমার হাতের মুঠোয়। কি চমৎকার তার স্পর্শ। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, অসাবধান হলেই টাকা হারায়, যে লোকটার টাকা হারিয়েছে—অসাবধানতার জন্য তাকে তো ফল ভোগ করতে হবেই। আমার কি দোষ? আর সিগারেটের দোকানের সাতান্ন টাকা ধার কালই শোধ করে দেব, দিদিমার জন্যে একটা গরদের কাপড় কিনে নিতে হবে, বাবার ছবিটার কাঁচ ভেঙে পড়ে আছে কতদিন। এমনকি একথাও আমার এই মুহূর্তে মনে হলো, সব টাকাটা খরচ করব না, ব্যাগের মধ্যে লোকটার ঠিকানা তো আছেই, পরে কখনো ওকে টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

এ পাশে অন্ধকার ময়দান, পার্ক স্ট্রীটের আলো দেখে বাসটা থামবেই, আমি সমস্ত শরীর সজাগ করে রেখেছি একটু স্পীড কমলেই লাফিয়ে নেমে পড়ার জন্য। কিন্তু তার আগেই সিঁড়ি দিয়ে দুম-দুম করে নেমে আসতে আসতে একজন ভারী চেহারার অন্যপ্রদেশী বলল, মেরা পার্স কৌন লিয়া? মেরা পার্স?

একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। চোর পকেটমার ধরা পড়লে কী রকম মারধোর করা হয়, তা তো জানি। সর্বস্বান্তের মতন উদাসীনভাবে আমি ব্যাগটা বাড়িয়ে দিলাম কোনো কথা না বলে। লোকটা লোভীর মতন হাত থেকে সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। একতলা থেকে আর একটি লোকও এগিয়ে আসছিল, সে বলল, কি, চুরি করেছিলেন?

আমি প্রায় ফিসফিস করে উত্তর দিলাম, না, কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—কুড়িয়ে পেয়েছেন তো কারুকে জিজ্ঞেস করেননি কেন?

—জিজ্ঞেস করেছিলুম সত্যিই।

—চোপ। আমি নিজের চোখে দেখলুম, তুমি পালাবার জন্য হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুঁকে ছিলে। কী মশাই, আপনার পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছিল নাকি? পার্ক স্ট্রীটের সবুজ আলো পেয়ে বাসটা থেমেই ছুটেছে। অন্য প্রদেশী সেই লোকটি ব্যাগটা হাতে পেয়ে আর কোনো কথা বলেনি, আমার খুব কাছে নেমে এসে চোখে কি রকম একটা ভঙ্গি করে হঠাৎ ঝুপ করে সেই চলন্ত বাস থেকেই লাফিয়ে পড়ল। পড়ার ঝোঁকে মাটিতে উল্টে গেল, তারপর তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়েই হনহন করে হাঁটতে লাগল।

কণ্ডাক্টরদের মধ্যে একজন বলল, কী, ব্যাগটা দিয়ে দিলেন। ওটা সত্যিই ওর কিনা জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো। ভেতরে কি ছিল?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিছুই বলার নেই আমার। কণ্ডাক্টরটি আবার বলল, ঐ লোকটার ব্যাগ বলে তো মনে হয় না, এমনভাবে পালাল কেন? আর আগেই দিয়ে দিলেন। ভেতরটা খুলে কাগজপত্র কি আছে মিলিয়ে দেখবেন তো।

অপর লোকটি বলল, দেখবে কি করে, সে সাহস কি আছে? ও নিজেই তো একজন চোর।

আমি লোকটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। পাথরের মতন মুখ নাক চোখ সব যেন খোদাই করা। মুখের ছবিতে মমতা কিংবা নিষ্ঠুরতা—কোনো ভাবই নেই। গলার আওয়াজ গম্ভীর। লোকটি আমার কলার মুঠো করে চেপে ধরেছে।

আমি দীনের চেয়েও দীন গলায় বললুম, বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি, আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—তা হলে পালাবার চেষ্টা করছিলে কেন? লোকটার হাতে যখন তুমি ব্যাগটা তুলে দিলে তখন তোমার মুখ অবিকল চোরের মতন দেখাচ্ছিল, জান?

কণ্ডাক্টরটি বলল, মশাই, আপনার জন্যই তো ঐ পাঞ্জাবিটা ব্যাগটা নিয়ে পালাল। আপনি তো আমাদের কাছে দিলে পারতেন, আমরা মিলিয়ে দেখতাম, ও লোকটাই আসল মালিক কিনা—

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। ঐ ঘটনার পরের মাসেই দৈবাৎ অন্য একটি ওষুধের কোম্পানিতে আবার চাকরি পাওয়ায় আমার সব অসুখ সেরে যায়। তারপর আবার বিকেলের এলমেলো হাওয়ায় মন খারাপ হওয়ার জন্য আমি মনকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করি। বন্ধুদের সামনে উদারভাবে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বিলি করতে পারি। কাছাকাছি মেয়েদের দেখলেই উসখুস করে উঠি, আলাপ বা একা সিনেমায় নিয়ে যাবার জন্য ছল-ছুতো খুঁজতে থাকি। অর্থাৎ আবার আমি স্বাভাবিক হয়ে গেছি, যেহেতু চাকরি পেয়েছি। এমনকি মাঝে মাঝে ভিখারিকে

পয়সা দিতেও আমার আটকায় না। টিউশনি করা পরের মাস থেকেই ছেড়ে দিয়েছিলুম।

পিসতুতো বোনের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, পকেটের রুমালে সেণ্ট মাখিয়ে। সমস্ত রকম আইন ভেঙে বিরাট নেমন্তন্ন, প্রচুর আলো ও হৈ-চৈ, কারণ পাত্রটি একটি রত্ন ও খুব শাসালো। বরের সঙ্গে বরযাত্রীরা দঙ্গলে মিলে ইয়ার্কি চালিয়েছে। তাদের মধ্যে আমি বাসের সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম যে আমার কলার চেপে ধরে আমাকে চোর বলেছিল। সেই রকম নিরেট পাথরের মতন মুখ। চার বছর বাদেও আমি লোকটিকে দেখা মাত্র চিনতে পারলুম। লোকটিও আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর দুজনেই মৃদু হাসির জন্য ঠোঁট ফাঁক করলুম।

লোকটির নাম গগন মৈত্র। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গেল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে আমরা গল্প করতে লাগলুম। কথায় কথায় আমি হাসতে হাসতে বলে ফেললুম, আপনি কিন্তু সেদিন বাসের মধ্যে চোর চোর বলে বড্ড অপমান করেছিলেন।

গগনবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, বাঃ, আপনি তো সত্যিই চুরি করেছিলেন।

আমি বললুম, মোটেই না। আপনি খালি ভুল করছেন। প্রথমত আমি ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, দ্বিতীয়ত, অন্য একজন লোক সেটা চাওয়া মাত্র তার হাতে দিয়ে দিয়েছি। একে চুরি বলে?

—আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় কথাটার মাঝখানের ব্যাপারটুকুই আসল। কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ঠিকই, ফিরিয়ে দিয়েছিলেনও ঠিক, কিন্তু মাঝখানের সময়টুকুতে আপনি ব্যাগটা নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। ঐটাই চুরি। আপনি সার্থক হতে পারেন নি বটে, কিন্তু চেষ্টা তো করেছিলেন চুরি করার।

—আমার তখন কি অবস্থা ছিল আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। চুরি কেন, খুন ডাকাতি করাও তখন আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু আপনি আমাকে মার খাওয়াবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? টাকাগুলো তো আমি নিইনি, তবু বাসের সব লোককে দিয়ে আপনি আমাকে মার খাওয়াতে চাইছিলেন।

—চোরের মার খাওয়া দেখতে বড়ো ভালো লাগে। আপনার লাগে না? আপনি নিজে কখনো কোনো চোরকে মারেননি?

—হ্যাঁ, একবার মামাবাড়ির একটা চাকর ঘড়ি চুরি করেছিল, তাকে খুব মেরেছিলাম।

গগনবাবু হো-হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, তা হলে গোড়া থেকে ব্যাপারটা শুনুন। আজকের যে বর, সে হচ্ছে আমার মাসতুতো ভাই। ওদের

কিসের ব্যবসা জানেন? পেন পেন্সিলের ব্যবসা, আমি ওদের পার্টনার। কিন্তু ব্যবসার আসল অংশ হচ্ছে, একটা বিখ্যাত বিদেশী পেনের জাল করে দিশি পেন সেই নামে বিক্রি করা। আমি কমার্সের ছাত্র ছিলুম বলে খাতাপত্র হিসেব টিসেব আমিই রাখি, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কায়দা-কৌশল আমারই। সুতরাং আমি নিজেও একটা চোর ছাড়া কি? যে বাড়িতে ভাড়া থাকি, সে বাড়ির মালিকেরও বেবি ফুডের ব্ল্যাক মার্কেটিং ব্যবসা আছে, অর্থাৎ থাকি চোরের বাড়িতে। আমার ছোট ছেলে চাকরি করে যা মাইনে পায় তার দুগুণ উপরি। সুতরাং আমাদের পরিবারটিই চোরের পরিবার বলতে পারেন। আমার ছেলে লেখাপড়াতে ভালোই ছিল, হঠাৎ এ বছর ফেল করেছে। ইংরেজির মাস্টারমশাই বলে যে তাঁর কোচিং-এ ভর্তি না হলে, আমার ছেলের পাশ করার আশা নেই। অর্থাৎ মাস্টারটি চোর। আর চোরের কাছে যদি লেখাপড়া শেখে ছেলেটিও একটি চোর ছাড়া আর কি হবে? তা হলে ভেবে দেখুন, চার পাশে চোর একেবারে থিকথিক করছে কিনা। খবরের কাগজ খুলে দেখুন নামকরা চোরদের ছবি আর কথাবার্তা। কারুকে কিছু বলার উপায় নেই—সুতরাং হয়তো হাতের কাছে কোনো ছিঁচকে চোর ধরা পড়ল তাকে মারধোর করে নিজেকে সাধু সাজাবার ইচ্ছে হয় কিনা বলুন। চোরকে যখন মারা হয়, তখন এটা অন্তত প্রমাণ হয়, যারা মারছে, তাঁরা অন্তত চোর নয়। ঐটুকু সময় সাধু সাজার লোভ কে ছাড়তে চায়! এখন বলুন, আপনার চেনাশুনো জগতে এরকম চোর আছে কিনা।

আমি বললুম, অঢেল অঢেল! এখন যে ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করছি, তাদের এক ধরনের ওষুধে স্রেফ জল মেশানো বলে ধরা পড়েছিল। অন্য অনেকগুলিতেও ভেজাল আছে বলে আমরা জানি। এসব জেনেশুনেও চাকরি ছাড়তে পারি না কারণ চাকরি ছাড়লে সত্যি সত্যি নিজের হাতে চুরি করতে হবে, আর চাকরি রাখলে নিজের হাতে না করে, চুরির টাকাটাই মাইনে হিসেবে বখরা পাব। এর মধ্যে দ্বিতীয়টাই সুবিধে কারণ দ্বিতীয়টায় মার খেতে হয় না। তাছাড়া, এই রকম সিল্কের জামা গায় দিয়ে এমন সুন্দরভাবে থাকা যায় লোকে ঘুণাক্ষরেও চোর বলে সন্দেহ করতে পারবে না। কি বলেন!

গগনবাবু আর আমি দুজনেই হাসতে লাগলুম।

২

দুপুরের দিকে সদর দরজায় ঠুক-ঠুক আওয়াজ। ভেতর থেকে প্রশ্ন : কে? বাইরে

থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম উত্তর এল, মা-নি-অ-র্ডা-র।—একটু টেনে টেনে উচ্চারণ, কিন্তু এমন সুমিষ্ট স্বর আর হয় না। দরজায় কেউ কড়া নাড়ার পর, দরজা খুলে যাকে দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়া যায়, সে হলো এই ব্যক্তিটি। মানি অর্ডার পিওন। অবশ্য, এ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ আমার জীবনে খুবই কম ঘটে।

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, একই পিওন মানি-অর্ডার এবং রেজেস্ট্রি চিঠি বা পার্শেল ইত্যাদি আনে। কিন্তু যেদিন মানি অর্ডার আনে—সেদিন তার গলার স্বরটা সত্যিই মিষ্টি হয়ে যায়, উচ্চারণ করে টেনে টেনে। আর অন্যদিন, খানিকটা কর্কশভাবে, দ্রুতভাবে বলে, রেজেস্ট্রি।—একই লোকের দু' কাজে দু' রকম গলা।

আর, যে টেলিগ্রাম আনে, তার ভঙ্গি অন্যরকম। সে ডাকে না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলে ক্রিং ক্রিং করে। লাল রঙের সাইকেলে, খাকি পোশাকের মানুষ, তার হাতের কাগজটায় কি রঙের খবর থাকে সে জানে। টেলিগ্রাম আসার কথা শুনলেই বুক দুরুদুরু, চোখের কাঁপন, কপালে ঘাম, হাতেব পাতা চুলকোন। এ ব্যাপারে আমিও খানিকটা পুরোনোপন্থী, টেলিগ্রামের কথা শুনলে ভয় হয়। কারণ, আমাদের দেশে শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ, ধন্যবাদ ইত্যাদি টেলিগ্রামে পাঠানোর এখনো তো রেওয়াজ হয়নি। হয় কোনো দুর্ঘটনা, অথবা এমন কোনো আকস্মিক সুখবর —যার ধাক্কা সামলানোও কম কথা নয়। বলা বাহুল্য, আমি টেলিগ্রামে এ পর্যন্ত কোনো সুখবর পাইনি। বরং একবার একটা টেলিগ্রামে দু'-দুটো দুসংবাদ পেয়েছিলাম। সেটা বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। তখন পর্যন্ত আমি এমন বোকা ছিলুম যে, লটারির টিকিট কিনতুম। অবশ্য, পাঁচ বছর আগে সেই শেষবার।

যাই হোক, লটারির টিকিট কিনে কেই-বা তেমন মাথা ঘামায়। অনেক সময়ই কিনতে হয় উপরোধে, অফিসের বেয়াবাবা গছায়, অথবা পাড়ার মুদি অথবা কোনো বেকার প্রৌঢ়। টিকিটটা কিনে সকলেই বাড়িতে ফেলে রাখে—বিশেষ মাথা ঘামায় না কেউ—লটারি কোম্পানিগুলির প্রতি সবারই অগাধ বিশ্বাস, যে, নাম উঠলে টাকা ঠিক বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এ ছাড়াও, এ বিষয়ে কুসংস্কার এই যে, লটারির টাকা নিয়ে একদম ভাবা উচিত নয়, ও কথা ভুলে যেতে হয়, চেষ্টা করেও ভুলে যেতে হয়—তা হলেই টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকে। ও টাকা সকলেই হঠাৎ পায়, যারা পেয়েছে—তারা সকলেই নাকি টিকিট কেনার কথা ভুলে গিয়েছিল। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম, চেষ্টা না করেও। তারপর, শীতের শেষে যখন গরম জামাকাপড় কাচতে দিতে হবে, প্যান্ট-কোটের পকেট পরিষ্কার করছি, কোটের বুক পকেট থেকে লটারির টিকিটটা বেরুল। কাগজটা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগে, অলস নয়নে সেটার দিকে একবাব চোখ বুলিয়ে দেখি, গতকালই ছিল সেটার ড্রয়িং-এর তারিখ। আমি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আয়নার

দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বললাম, কাল যদি আমার নাম উঠে থাকে, তাহলে, আজই টেলিগ্রাম এসে যাবে। মন্দ হয় না টাকাটা পেলে—এত ধার হয়ে গেছে বাজারে।

ঠিক সেই সময় সদর দরজার কাছে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং এবং সরু গলায়, টেলিগ্রাম। এরকম আশ্চর্য যোগাযোগেও বুক ধক্ করে উঠবে না, এমন কঠিন মানুষ আমি নই। কাল লটারির ড্রয়িং ডেট ছিল, আজই টেলিগ্রাম আসার কথা, আজই এই সময় হঠাৎ আমার হাতে লটারির টিকিট এবং বাইরে টেলিগ্রাম পিওন। আমি বললুম, মন শান্ত হও। শুনেছি, এই রকম অবস্থায় অনেকের হার্টফেল করে। অনেকে এমন লাফ দেয় যে, কড়িকাঠে মাথা ঠুকে যায়। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে টেলিগ্রাম পিওনকে বললুম, দাঁড়ান, যাচ্ছি। তারপর, আস্তে-সুস্থে জামা গায়ে দিয়ে, কলম খুঁজে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম। সিঁড়ির প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছি, আর আমি মনে মনে হিসেব করছি—এক লক্ষ টাকা দিয়ে কি করব। প্রত্যেক সিঁড়িতে আমার প্ল্যান বদলে যাচ্ছে। শেষ সিঁড়িতে হঠাৎ আমার পা মচকে গেল।

পাঠকদের আমি আর উৎকণ্ঠায় রাখতে চাই না। আমার এ লেখার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমি লটারির এক লক্ষ টাকা পাইনি। এক লক্ষ টাকা যারা পায়—তাদের লেখা কত সুন্দর হয়—ঘন নিটোল লেখা যা শুধু লেখা হয় চেকবইতে। আমি অনেক পত্র-পত্রিকায় বা বইতে লেখার সুযোগ পেয়েছি, চেকবইতে আজ পর্যন্ত পেলাম না। সে যাই হোক, সে টেলিগ্রাম ছিল আমার বড়দির স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ। বড়দির স্বামীর, অর্থাৎ আমার বড়ো জামাইবাবুর যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, অনেকদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন, তাঁর মৃত্যু খুব আকস্মিক নয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদে আমি শোকে এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে, চার পাঁচ দিন পর্যন্ত মুহ্যমান, বাড়ির সকলে নিজেদের শোক ভুলে আমাকে সান্ত্বনা দিতেই ব্যস্ত।

টেলিগ্রামের প্রসঙ্গে আরেকটি লোকের কথা মনে পড়ে। কুনওয়ার সিং। একবার একটা চাকরির ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম। বেহালার দিকে সেই কোম্পানির ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সেইখানে ট্রেনিং—খুব সাহেবী কায়দায়, সব সময় সুট-টাই পরে থাকতে হয়, ইংরেজি ছাড়া বাক্য নেই—দু' সপ্তাহের বেশি আমি সেখানে টিঁকতে পারিনি অবশ্য। সেই হোস্টেলে আমার রুমমেট ছিল কুনওয়ার সিং। জাতে সে রাজপুত, দু-তিন পুরুষ ধরে বাংলাদেশে আছে এবং তার মুখের বাংলা বাগবাজারের মতো দন্ত্যের-স বহুল। বিয়েও করেছে বাঙালি মেয়েকে। একদিনেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল, ভারী ভালো লেগেছিল ছেলেটিকে—সবল, বিশাল চেহারা, অথচ লাজুক মৃদু স্বভাব। একদিন এক সঙ্গে বসে আছি, ওর নামে একটা টেলিগ্রাম

এল। কুনওয়ার সিং সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা আর না নিভিয়ে, সেই শিখার ওপরে ধরল টেলিগ্রামটা। তখনো খাম খোলেওনি। আস্তে আস্তে সেটাকে পুড়িয়ে ফেলল। আমি স্তম্ভিত। কোনো কথা জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, দয়া করে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

তারপর একদিন অন্তর একদিন, কুনওয়ারের কাছে টেলিগ্রাম আসতে লাগল। প্রত্যেকবারেই না-পড়ে সেটা পুড়িয়ে বা ছিঁড়ে ফেলত। আমি আজ পর্যন্ত কুনওয়ারের টেলিগ্রামের রহস্য জানতে পারিনি। অন্য সব বিষয়ে সে বহু কথা বলত, টেলিগ্রাম বিষয়ে কিছু বলত না। টেলিগ্রাম পাবার পর খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থাকত। টেলিগ্রাম পিওনও বোধহয় তার সারা জীবনে, একই লোককে দশ দিনে পাঁচ বার টেলিগ্রাম দেয়নি। একদিন সে হঠাৎ কুনওয়ারের কাছে বখশিস্ চেয়ে বসল। কুনওয়ার মৃদু হেসে ওকে একটা টাকা দিয়ে, সেদিন ওর সামনেই টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে ফেলেছিল অন্যবারের মতো না পড়েই।

পিওনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে রহস্য যারা চিঠি বিলিয়ে যায়, তারা আসে এবং যায় নিঃশব্দে। দরজার ফাঁক দিয়ে কিংবা লেটার বক্সে কোন এক সময় ওই সব আঠা-মোড়া রহস্য ফেলে রেখে যায়। চিঠির বাক্সে কোনো খাম দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে আমার। মনে হয়, একদিন এমন একটা চিঠি আসবে, যাতে আমার জীবনটা বদলে যাবে। কী সেই চিঠি, আমি নিজেও জানি না। তবু প্রতীক্ষা করি। খামের ওপর ঠিকানার হাতের লেখা বেশি হলে ভালো লাগে না। নীল খাম দেখলেই মনে হয় সম্পূর্ণ অজানা কোনো তরুণীর কাছ থেকে এসেছে হয়তো।

এরকম ক্বচিৎ দু-একটা আসেও কিন্তু তারা আর কেউ দ্বিতীয়বার লেখে না।

৩

সারা মেদিনীপুর জেলাটার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হাট বসে বীনপুরে, সোমবার। মঙ্গলবার আবার বিজয়া দশমীর দিন, শিলদায় মেলা। সেও খুব ভারী মেলা, দূর-দূরান্তের লোক আসে। সুতরাং এই একটা দিন এ অঞ্চলে বহুলোকের আনাগোনা।

বীনপুরের থানার পাশেই দুর্গাপুজো হচ্ছে, সুন্দর মণ্ডপে পুরোহিত তখনো মন্ত্র পড়ছেন। মণ্ডপের কাছেই চেয়ার টেবিল পেতে থানার বড়োবাবু সেদিনের কাজ করছেন—এমন সময় চারজন যুবককে নিয়ে আসা হলো—এরা 'ছত্রীবাহিনী' বলে ধরা পড়েছে।

দারোগা সাহেব এবং আশেপাশে আর যাঁরা বসেছিলেন—সকলেই প্রথমটা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন—জমাদারের মুখে ছত্রীবাহিনীর খবর শুনে। বিজয়া দশমীর দিন সকালবেলা—কি সর্বনাশের কথা।

একে একে চারজন ছত্রী ঢুকল—মাইল দশেক দূরে, বেলপাহাড়ীতে এরা ধরা পড়েছে, সেখানকার তৎপর হোমগার্ডের সর্দার বিরাট চিঠি লিখে একটিমাত্র চৌকিদার সঙ্গে দিয়ে বাসে করে এদের পাঠিয়েছে থানায়। ওরা বেশ শান্তভাবেই সুড়সুড় করে থানায় ঢুকল।

সার্ট-প্যান্ট পরা চারজন যুবক, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি—মুখেচোখে কোনো বিশেষত্ব নেই—আরো হাজার হাজার যুবকদেরই মতো দেখতে। তবু, ওদের পোশাক বা মুখের রেখায়—এমন একটা কিছু আছে যা দেখলেই বোঝা যায়—ওরা কলকাতার লোক। কলকাতার ছেলেদের একটা দাগ থাকে তাদের মুখে—যেটা কলকাতার বাইরে গেলে বুঝতে পারা যায়। দারোগা সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরা 'ছত্রী'দের দেখে মৃদু হাস্য করলেন, ছত্রীদের মুখে হাসি।

দারোগা সাহেব বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো।

ছত্রীদের একজন বললেন, আমরা ছত্রী হই, সেও ভালো, কিন্তু আমরা মুরগি চোর নই।

—সেকি ব্যাপার। বসুন, বসুন। এই চেয়ার দাও এঁদের চারজনকে।

ছত্রী চারজন বসল। কলকাতার নানা অফিসে মোটামুটি সম্মানজনক কাজ করে ওরা। দারোগা সাহেব প্রথমে জিজ্ঞেসবাদ করে ওদের সম্পূর্ণ পরিচয় নিলেন। সকল সন্দেহের উর্ধ্বে ওদের পরিচয়—দু-একজনের কাছে অফিসের কার্ডও ছিল। এ ছাড়া মেদিনীপুরে চেনাশুনো জন দশেক উল্লেখযোগ্য লোকের নাম করল। তাছাড়া মুখের চেহারা ও কথাবার্তাই ওদের পরিচয়।

নিঃশ্বাস ফেলে দারোগা সাহেব বললেন, শেষকালে বেলপাহাড়ীতে আপনাদের ছত্রী বলে ধরল? এত জায়গা থাকতে বেলপাহাড়ীতেই বা আপনারা গেলেন কেন?

চারজনের একজন উত্তর দিল, দেখুন, বেলপাহাড়ীতেও এ কথা আমাদের বার বার জিজ্ঞেস করেছে। আমরা অবাক হয়ে গেছি। বেলপাহাড়ীতে যাব না কেন। যেখানেই যাই—অন্য জায়গা ছেড়ে সেখানে গেলাম কেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে, ছোট্ট জায়গা বেলপাহাড়ীতে যাবার ইচ্ছে আমাদের কেন হয়েছিল—তা বলতে পারি। বছর খানেক আগে আমাদের এক বন্ধু ঝাড়গ্রাম থেকে গিধনি যাচ্ছিল বাসে চেপে। মাঝ পথে ছোট্ট জায়গায় বাস থামে সন্ধেবেলা—শালের জঙ্গল পেরিয়ে এসে ছোট একটা ছবির মতো ঝকঝকে সুন্দর গ্রাম, ছবির মতই

নির্জন—সে হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়ে দু'দিন থেকে যায়। পরে, সে আমাদের ঐ গল্প বলে—ঐ জায়গাটাকে নাকি তার পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন জায়গা বলে মনে হয়েছিল—যেখানে একটাও কলকারখানা নেই, কোনো দেখার জিনিস নেই—পিচের রাস্তা দিয়ে দিনে মাত্র কয়েকখানা বাস আর ট্রাক যায়—সভ্য সমাজের সঙ্গে এইটুকুই মাত্র যোগাযোগ। অথচ টাটকা তরকারি পাওয়া যায়, মুরগির মাংস সুলভ, ভাত খাবার সময় একটাও কাঁকর দাঁতে লাগে না। বাংলা দেশেই এ রকম জায়গা আছে—এই নির্জনতার সুখ পাবার জন্য পাহাড়ে যেতে হয় না, এইসব বলেছিল।

বেলপাহাড়ের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। এবারে চার বন্ধু পুজোর চারটি দিনের জন্য এসেছিলাম ঝাড়গ্রামে। ছুটি কাটাতে বাংলা দেশের বাইরে যাওয়া আমাদের পছন্দ নয়—তা ছাড়া ট্রেনের ভাড়াও কম। কলকাতার মাইকের চিৎকার থেকে শুধু সরে আসা। ঝাড়গ্রামেও কিন্তু দেখলুম সেই মাইকের উৎপাত আর কলকাতার ভিড়—ভালো লাগছিল না, হঠাৎ একদিন সকালে দেখলুম একটা বাসের গায়ে লেখা আছে 'বেলপাহাড়ী'। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, হোটেল থেকে জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে সেই দুপুরেই বেলপাহাড়ীর বাসে চেপে বসলুম!

দারোগা সাহেব নম্র স্বরে বললেন, ঐ যে মুরগি চুরির কথা বললেন, সেই ব্যাপারটা কি?

যুবক চারজন এবার হাসল সশব্দে। একজন বলল, সেইটাই মজার। সেইজন্যই অনেকটা আমরা নিজে থেকে থানায় এলাম। বেলপাহাড়ীর কিছু লোক যখন আমাদের ছত্রী হিসেবে আজ সকালে গ্রেপ্তার করে—আমরা একটুও বিচলিত হইনি—ভেবেছিলুম, ওদের অগ্রাহ্য করেই আমরা বাসে চেপে চলে আসব। এসব বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করলে, আমরা দুপুরের ট্রেন ফেল করব—কালকের আগে কলকাতায় ফিরতে পারব না। বুঝতেই পারছেন, ঐ একটা রোগা-পটকা চৌকিদার আমাদের মতো চারটে যুবককে আগলে থানায় নিয়ে আসতে পারে—এটা হাস্যকর। কিন্তু ভেবেচিন্তে আমরা নিজেরাই এলাম। একটা মজার ব্যাপার বলার আছে। তাছাড়া, গুজবের তো শেষ নেই। যদি আমরা সোজা চলে যেতাম—তা হলে নিশ্চয়ই এ গুজব ছড়িয়ে পড়ত আগুনের মতো যে, চারজন সত্যিকারের ছত্রী সৈন্য ধরা পড়েও পালিয়ে গেছে। আমাদের চেহারার বর্ণনাও তখন বীভৎস বিকট হয়ে উঠত। আপনারাও নিশ্চয়ই তখন ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতেন। আচ্ছা, ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলি।

দুপুরের দিকে বেলপাহাড়ী পৌঁছে দেখলুম, গ্রামটা সত্যিই সুন্দর—আমাদের বন্ধু যেমন বলেছিল। একদিকে কিছু সাঁওতালদের বাড়ি, রাস্তার একপাশে একটা

বিরাট মাঠ, অন্য পাশে ছোট ছোট শালের জঙ্গল। আমরা ঠিক করলুম, রাত্তিরটা এখানেই কাটাব। আমাদের সেই বন্ধু একজন সাঁওতাল ছেলের নাম বলেছিল —সেই ছেলেটিকে খুঁজে বার করলুম—সেই আমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমে ভেবেছিলুম রাত্তিরটা মাঠেই শুয়ে কাটিয়ে দেব। গরমের রাত— তারপর, রাস্তার পাশেই ঐ সাঁওতাল ছেলেটির একটি দোকান ঘরের বারান্দায় চৌকি পেতে থাকব ঠিক করলুম। আমাদের জিনিসপত্র ওখানে রাখা হলো। চমৎকার ঠাণ্ডা ভাবে সন্ধেটা নামল, কোথাও কোনো শব্দ নেই—মাঠ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় মাঠে গিয়ে বসেছি। একজন গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে—এইসব সময় বেসুরো গানও ভালো লাগে। মাঝে মাঝে সাইকেলে করে কিছু লোক—আমাদের চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় দেখি—জনা দশেক লোক দূর থেকে ভয়ার্ত স্বরে আমাদের জিজ্ঞেস করছে, আপনারা কে ওখানে? কে? শিগগিরই বলুন।

লোকগুলো এমন ভয় পেয়েছে যে আমাদের কাছে আসছে না। দূর থেকেই জিজ্ঞেস করছে। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের কাছে ডাকলুম। তখনো আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। লোকগুলি গুটিগুটি ভয়ে ভয়ে কাছে এল। এসেই কর্কশ ভাবে বলল, আপনারা সন্দেহজনক ভাবে এখানে বসেছেন কেন? দুপুর থেকে আপনাদের লক্ষ্য করছি। খুব সাবধান! আমাদের কাছে চালাকি চলবে না! আপনাদের পরিচয় বলুন। কোথা থেকে আসছেন?

প্রথমে ইচ্ছে হয়েছিল, দু' একটা রসিকতা করি। কিন্তু গ্রামের লোকেরা একটু সীরিয়াস ধরনের হয়, খুব একটা রসিকতা বোঝে—এ ধারণা আমাদের নেই। তা ছাড়া, লোকগুলির কর্কশ গলা শুনেই বুঝেছিলাম—ওরা আসলে ভয় পেয়েছে খুব। ভীতু লোকেরা কখনো স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারে না। তাছাড়া ইদানিং মানুষের মধ্যে গোয়েন্দাগিরির প্রবণতা এমন বেড়ে গেছে যে, স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রায়। যে-কোনো কথার উত্তরেই এমন একটা হুঁ আওয়াজ করে —যার মানে, হুঁ-হুঁ বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! যেমন আমার নাম বললে এমন একটা হুঁ শোনা যায়—যার মানে কেন আমার বাবা-মা ঐ নামটা রাখতে গেলেন! অথবা, এই বললুম আমরা কলকাতার লোক—ঝাড়গ্রাম থেকে আসছি আজ— এ কথার মানে কি!

যাই হোক, আমাদের কথাবার্তায় সেই মুহূর্তে চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাদের ছত্রী বলে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো না। কিন্তু, আমরা যেন মাঠ ছেড়ে সেই মুহূর্তে উঠে যাই। মাঠে বসা চলবে না! ওসব জ্যোৎস্না-ফোৎস্না বাজে কথা। কোনোরকম চালাকি করতে গেলেই আমাদের বিপদ—কারণ, আমাদের ওপর সব সময় নজর রাখা হবে।

আস্তানায় ফিরে এলাম। সন্ধেবেলাটা হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম —গ্রামের ঐ ছেলেদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করব—হলো না—বারান্দায় এসে শুয়ে রইলাম। মাঝে মাঝেই বুঝতে পারছি—সাইকেলে করে লোকেরা আমাদের লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কেউ সব সময় আমাদের লক্ষ্য করছে—এটা ভাবলে একদম ভালো লাগে না—নিজেদের মধ্যে গল্প করতেও ইচ্ছে হয় না। অবশ্য একটা কথা ভেবে ভালো লাগল—বেলপাহাড়ীর মতো এমন নগণ্য জায়গা—সেখানেও যুবকেরা দেশরক্ষার দায়িত্ব বুঝেছে। সবসময় সজাগ—এটা অন্তত ভালো চিহ্ন। রাত্রে ভালো খাবার পাওয়া গেল না, রুটি আর বেগুনের ঘ্যাঁট।

সকালেই আসল মজা। সকালবেলা বাসের জন্য বসে আছি। কিছু কিছু গ্রামের লোক আমাদের সঙ্গে দু' একটা কথা বলে যাচ্ছে। হঠাৎ আগের রাত্তিরের দুটি ছোকরা এসে বলল, আপনারা চকে চলুন। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেতে হবে আপনাদের।

হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। কোনো পঞ্চায়েত নয়—একটা চায়ের দোকানে কয়েকটি ছোকরা। তার মধ্যে সেই দুজন বিশেষ উৎসাহী—রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বলুন, আপনারা কে? কাল যা বলেছেন সব মিথ্যে। মাঠে কেন বসেছিলেন—চাঁদের আলোয় বসে বসে গান করা—চালাকি পেয়েছেন। বেলপাহাড়ীতে কেন এসেছেন?

সকালবেলাতে এসব কথাবার্তা শুনতে মোটেই ভালো লাগে না। তবু যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিলুম। নিজেদের পরিচয় দিলুম। প্রমাণ দেখালুম। কিন্তু ছোঁড়া দুটি ক্ষেপে উঠেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল—সব মিথ্যা কথা। ছত্রী সৈন্য। ঠিক ধরেছি। শুধু শুধু বেলপাহাড়ীতে আসা! কেউ আসে! পুলিশে ধরাব।

ছত্রী সৈন্যর নাম শুনে গ্রামের বহু লোক ভিড় করেছে। দূর-দূরান্তে খবর চলে গেল। কিন্তু অনেকেই নিরাশ হলো। এ কি রকম ছত্রী সৈন্যের চেহারা। একি কথাবার্তা। যাঃ। শুনেছি—ছত্রী সৈন্য নাম শুনেই অনেক জায়গায় মার লাগাতে শুরু করে—কিন্তু আমাদের গায়ে একটা লোকও হাত তুলল না কেন কে জানে। চাঁদের আলোয় এরা গান গেয়েছে, ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও একটা বাড়ির বারান্দায় শুয়েছে এগুলো কেমন কেমন ঠিকই, কিন্তু ছত্রী সৈন্য না রে। যান বাবুরা বাসে উঠুন।

সেই ছেলে দুটি তখন ক্ষেপে গেছে। যে-কোনো উপায়ে আমাদের গ্রেপ্তার করা চাই-ই! অথচ জনতার সমর্থন পাচ্ছে না। তখন ওরা দু'জন কোথা থেকে একটা মুরগির পা আর কিছু পালক এনে বলল, আমরা কাল রাত্রে মুরগি চুরি করে খেয়েছি। যে ছোকরাটি ক্যাপ্টেন, সে বিকট গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগল

—ছত্রী সৈন্য না হলে কেউ মুরগি চুরি করে খায়। দু'-দুটো মুরগি যার দাম তিরিশ টাকা।

জনতা এবার হাসাহাসি শুরু করেছে। আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ছোকরা দুটির বদমাইসি। এ পর্যন্ত ভাবছিলুম, ওরা অত্যধিক তৎপর, আমাদের ভোগাচ্ছে। যদিও কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য খারাপ না, উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি অচেনা লোককে ভালো করে যাচাই করে দেখা। কিন্তু এখন দেখছি বদমাইসি। ক্যাপ্টেন জনতাকে বলল আমার যে-কোনো লোককে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আছে! আপনারা যদি আমার কাজে বাধা দেন তবে সে দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের! সঙ্গে সঙ্গে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে বলল, কি জানি বাবা! আমাদের কি দরকার। আমরা শুধু দেখতে এসেছি। তুমি ওদের গ্রেপ্তার করবে কি ছেড়ে দেবে—তার আমরা কি জানি!

ক্যাপ্টেন তখন আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে চোখ মটকে বলল, এবার কি করবেন? হয় আমাদের তিরিশ টাকা দিন নয় আপনাদের ছত্রী সৈন্য বলে থানায় পাঠাব। সেখানে আমার চিঠি পেলে, অন্তত তিনদিন তো হাজতে থাকবেনই!

আমরা বললুম, যে-মুরগি আমরা খাইনি, তার জন্য তিরিশ টাকা তো দূরের কথা এক পয়সাও দেব না। তার বদলে আমরা ছত্রী সৈন্য হিসেবে ধরাই পড়তে চাই!

কিছুটা লজ্জিত মুখে দারোগা সাহেব বললেন, চলুন পুজো শেষ হয়ে এসেছে। শান্তিজল নেবেন। আর একটু প্রসাদ খাবেন। পরের বাস তো দুপুরের আগে আর নেই। এখানেই দুপুরে চারটি ডাল-ভাত খাবেন। মায়ের প্রসাদ আপনাদের এখানে পাওনা ছিল—তাই এখানে আসতে হলো!

পরে তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, দুর্ভোগ হলো, বেড়াতে এসে এই হয়রানি—সেজন্য সত্যি আমরা লজ্জিত। তবে কি ভেবে হাসি পাচ্ছে জানেন? আগে পাগল বা ভিখিরিকে ছত্রী বলে ধরে আনত। তখন আমরা বলে দিলাম —ছত্রী সেনা ওরকম নয়—ছত্রীদের ভদ্রলোকদের মতো দেখতে হবে। তাই এবার ভদ্রলোক ধরে পাঠিয়েছে।

ওরা চারজনও হাসল। অন্যান্য বহু কথাবার্তা। একজন বললেন, বুঝলেন, গ্রামের ছেলেরা যে এরকমভাবে উৎসাহী হয়ে নিজের গ্রাম পাহারা দিচ্ছে, কলকাতায় বসে আমরা তা জানতুম না। দেখে প্রথমে বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু কিছু কিছু আবার এর সুযোগও নিচ্ছে। আমাদের কাছে যে তিরিশ টাকা দাবি করল শেষে, নইলে ছত্রী বলে ধরিয়ে দেবে—এসব বন্ধ হওয়া দরকার। আপনি এইটা শুধু দেখবেন।

দারোগা সাহেব অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির। আর চারজন ভদ্রসন্তানকে তাঁর এলাকাতেই এরকমভাবে বিব্রত ও অপদস্থ করায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করছিলেন। বললেন, ছি, ছি, লোকেরা নিজের দেশের মধ্যে বেড়াতেও পারবে না! আপনাদের পুজোর ছুটি কাটাবার আনন্দটাই মাটি করে দিল। থানা ও পুজামণ্ডপসুদ্দু সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ওদের খাইয়ে দাইয়ে, বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে বিকেলের দিকে বাসে তুলে দিলেন। সেই চারজনের মনে তখন আর কোনো গ্লানি নেই।

আমি এ গল্প শুনলাম ওই 'ছত্রী বাহিনী'র মুখ থেকেই সদ্য। গল্পটা এমন কিছু নয়। দেশের যুবসমাজ সজাগ হয়েছে, তৎপর হয়েছে এই কথায় বোঝা যায়! এর মধ্যে দু'একজন বাড়াবাড়ি করবেই—দু'একজন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে এই ফাঁকে। এত বড়ো দেশের তুলনায় এরকম ঘটনা নগণ্য। নেহাৎ আমার চেনা লোকদেরই এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে—তাই শুনে বিশ্বাস করলুম, অন্য লোকের হলে পুরোটা বিশ্বাস করতুম না হয়ত, কিন্তু আর একটা জিনিস আমার আশ্চর্য লাগল। একটা না, দুটো। আশ্চর্যের এবং দুঃখের। এক, বেলপাহাড়ী যে সুন্দর এ কথা বেলপাহাড়ীর একজন লোকও জানে না। বদ মতলব ছাড়া শুধু বেড়াবার জন্যই যে কেউ ওখানে যেতে পারে তা কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি। অথচ জায়গাটা যে সুন্দর—বন্ধুদের মুখে শুনে বুঝতে পারলুম। ঐ চারজনের মধ্যে তিনজন পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে এসেছে, তাদেরও ভালো লাগল জায়গাটা, আর বেলপাহাড়ীর একটা লোকও নিজেদের জায়গার সৌন্দর্য চেনে না! দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, চাঁদের আলোয় মাঠে বসে গান গাওয়া কেন সকলের কাছেই অস্বাভাবিক মনে হল? গ্রামে কি একটা মানুষও থাকে না আজকাল—যার মনে হতে পারে, জ্যোৎস্নার রাত্তিরে মাঠে বসে গান করাই সবচেয়ে স্বাভাবিক? রোমাণ্টিসিজমও কি তা হলে বই পড়ে শিখতে হয়? আমার ধারণা ছিল, গ্রামের লোকেরা জন্ম-রোমাণ্টিক, অন্তত প্রত্যেক গ্রামেরই দু'চারজন।

৪

ছেলেবেলায় খুব ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটাকেই মনে হতো বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। তার এক মাস আগে থেকে হামানদিস্তেয় কাঁচ গুঁড়ানো, বাজারের পয়সা চুরি করে হাজার গজ কাঠিম কেনার উদ্যোগ এবং রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ লাল। দিগন্ত থেকে একটা কাটা ঘুড়ি উড়তে উড়তে

এসে যদি আমারই ছাদে পড়ত—তবে তার চেয়ে বড়ো উল্লাস আর কিছুতে বোধ করিনি। আকাশের একটা বদ অভ্যেস আছে, ঠিক বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেই একবার অন্তত বৃষ্টি ঝরানো, এ জন্য আকাশের দেবতাকে কত অভিশাপ দিয়েছি।

একবার শীতকালে কাশীতে বেড়াতে গিয়ে দেখলুম, সেখানে শীতকালেও ঘুড়ি ওড়ে। তখন আমি ভেবেছিলুম, সব মানুষেরই উচিত—প্রতি বছর গ্রীষ্মকালটা কলকাতায় কাটিয়ে শীতকালে কাশীতে এসে থাকা।

খুবই নীচের ক্লাসে তখন পড়ি, একটা রচনা এসেছিল, 'তোমাকে যদি এক হাজার টাকা দেওয়া হয়, তুমি কি করবে? অন্য ছেলেরা খুব বুদ্ধিমান, তারা কেউ লিখল ভিখারিদের খাওয়াবে, কেউ লিখল নাইট ইস্কুল স্থাপন করবে, এমন কি একজন লিখেছিল যে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে আসবে। আমি লিখেছিলুম, 'আমি ঘুড়ির দোকান করিব এবং কম দামে ঘুড়ি বিক্রয় করিব।' পরোপকার এর চেয়ে বড়ো উপায় আমার জানা ছিল না। নাজির হোসেনের ঘুড়ির দোকানের সামনে কতদিন আমি করুণ চোখে তাকিয়ে থেকেছি, কালো রঙা কড়ি টানা চাঁদিয়ালের জন্য কি অসম্ভব লোভ ছিল, কিন্তু সেটার দাম দু'আনা, আমার দু' পয়সার বেশি নেই! মাস্টারমশাই আমার রচনা পড়ে কান মুলে দিয়ে বলেছিলেন, হুঁ! ঘুড়ির দোকান! তোর দ্বারা ওর চেয়ে বেশি কিছু আর হবেও না জীবনে!

কানমলা খাবার জন্যই নয় শুধু, ঘুড়ি ওড়াবার নেশা আস্তে আস্তে এমনিতেই কমে যায়। তখন বিষম ডিটেকটিভ বই পড়ার নেশা। রোমাঞ্চ সিরিজ পড়তে পড়তে মনে হতো, বড়ো হয়ে আমিও প্রতুল লাহিড়ীর মতন ডিটেকটিভ হবো। কাগজ পাকিয়ে পাইপের মতন তৈরি করে মুখে দিয়ে শার্লক হোমসের কায়দায় প্রায়ই গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়তুম। বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক এলে কুটিল চোখে তার জুতোর ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেখে নিয়ে মনে মনে গূঢ়ভাবে হেসে বলতুম হুঁ হুঁ! জানি, জানি!—তখনো আমার মুখমণ্ডল নতুন বেলুনের মতন নির্লোম ও মসৃণ, কিন্তু বড়ো হয়ে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হবার পর আমার কি রকম গোঁফ থাকবে—তাও ঠিক করা হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের লালকেল্লায় বিচার হবার সময় সুভাষ বোসের কীর্তিকাহিনী সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, কি অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করেছিলুম তখন। নেতাজীর নাম শুনলেই শরীর কাঁপে। ডিটেকটিভ বই ছেড়ে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পড়তে শুরু করে দিয়েছি তখন। পড়ার টেবিলের সামনে মিলিটারি পোশাকে নেতাজীর ছবি, সেই দিকে তাকিয়ে গভীর নিশ্বাস পড়ে আমার। আর কি—ঠিকই [illegible] হয়ে [illegible]। বড়ো হয়ে দেশের জন্যই আমি জীবন উৎসর্গ করব। বাবা মায়ের শাসন একটু শিথিল হলেই আমিও বন্দুক পিস্তল ছোঁড়া শিখব
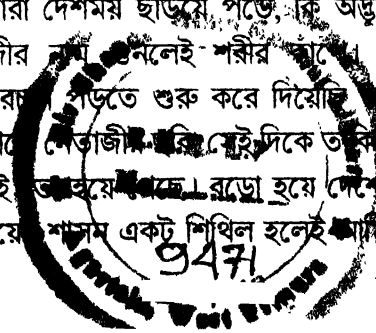
গোপনে, পুলিশের তাড়া খেয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাব। (ছেলেবেলায় নেতারা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকে শুনে আমি ভাবতুম, সত্যিই বুঝি কলকাতায় নানা জায়গায় মাটির তলায় গোপন সুড়ঙ্গ আছে লুকোবার।) 'ভুলি নাই', বইখানা কতবার যে পড়েছিলাম তার আর ঠিক নেই, সাহেব দেখলেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতুম, আর একটু বড়ো হয়ে উঠি তারপর দেখাচ্ছি মজা! যে-সব সহপাঠীরা তখনো ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা ক্যারাম খেলে সময় কাটায়—তাদের জন্য করুণা হতো। কথা নেই বার্তা নেই একদিন একটা গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, কি, ন্যাড়া হয়েছিস নাকি? তারপর টুপি খুলে ধরে টেনে, মাথায় চাঁটি মেরে একাক্কার কাণ্ড বাঁধাল।

কলেজে ঢুকেই হঠাৎ খুব বড়ো হয়ে গেছি মনে হতে থাকে। সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের 'একেবারে বাচ্চা' বলে মুখ বেঁকায়। ট্রামে-বাসে কেউ যদি আপনি না বলে তুমি বলে, তবে বিলক্ষণ চটে যাই। মাসতুতো বোনেদের নাইট শোতে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব, মাসীমা বললেন, এইটুকু ছেলের সঙ্গে কি এত রাত্তিরে ছেড়ে দেওয়া যায়? শুনে রাগে আমার শিরা-টিরা দপদপ করে।

কলেজে পড়ার সময় তো মনে হয়, এখন বড়ো হয়ে গেছি, সুতরাং বড়ো হয়ে কি হবো। ইতিমধ্যে কত রকম পরিকল্পনা যে বদলেছিলুম কিন্তু কলেজে এসে শুধু কলেজের ছেলেরা আর বড়ো হয়ে কি হবো—এই স্বপ্ন দেখে না, তারা ভাবে ভবিষ্যতের কথা, যার ডাকনাম কেরিয়ার! কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অধ্যাপক, কেউ রাষ্ট্রদূত। ছেলেবেলায় যেমন অনেক ছেলেকে দেখতুম ক্যারাম বা ডাংগুলি খেলে সময় কাটায়, এখানে এসে দেখলুম, সবাই ঐ রকম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার ছেলেখেলাতেই সময় কাটায়, কেউ আর বড়ো হতে চায় না। এই রকম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আমার ওসব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও হলো না, অন্য স্বপ্নও ভুলে গেলুম।

তারপর সত্যি সত্যিই তো কলেজ টলেজ ছেড়ে এসে বয়েসে বড়ো হয়েছি, কিন্তু আর কিছুই হইনি। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দুর্বোধ্য বা অনর্থক মনে হয়। যারা বার বার স্বপ্ন বদলায়, তারাই ভুল করে বোধ হয়।

ছেলেবেলায় যাকে দেখেছি, তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছে, বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে, সে ডাক্তারই হয়েছে, আর কিছু হতেও চায়নি, হয়ওনি, কোনো দুঃখ নেই! বাবলু ডাক্তার হতে চেয়েছিল, সত্যিই ডাক্তার হয়ে বাবলু বেশ সুখী। মুরারির ইচ্ছে ছিল লেখক হবে, ক্লাশ সেভেন থেকেই আমাকে বলত, আমি রাইটার হবো, বুঝলি! ক্লাশ টেনে ওঠার আগেই মুরারি দুটো নাটক লিখে

ফেলেছিল, সগর্বে ঘোষণা করেছিল, দেখিস, একদিন আমি বড়ো রাইটার হবো। আমি ভক্তের মতো মুরারির দিকে তাকিয়ে থাকতুম। মুরারি এখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ বড়ো অফিসার হয়েছে, যথেষ্ট ডিএ বাড়ছে না, এ ছাড়া মুরারির আর কোনো দুঃখ নেই। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, ইতিহাসের ক্লাশে সুবিমল বলেছিল, আমি আর কিছু হতে চাই না, বড়ো হয়ে আমি নানান দেশ ঘুরে বেড়াব। সুবিমলের সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখা হয়, একটা ওষুধের কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ হয়েছে, প্রায়ই দূরে নানান জায়গায় যেতে হয়। দেখা হলেই বলে কিরে, কেমন আছিস! চলি, বড়ো ব্যস্ত আছি, সন্ধেবেলা দিল্লি এক্সপ্রেস ধরতে হবে।

কখনো কখনো খুব অদ্ভুত লাগে! জানলার সামনে ঠক করে একটা কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি এসে পড়ল। আগে এই রকম ঘুড়ি দেখলে বুকের মধ্যে দুপ দুপ করত, একতলা থেকে তিনতলায় উঠে যেতুম বিদ্যুৎগতিতে, কতবার পড়ে গিয়েছি, থুতনিতে এখনো কাটা দাগ আছে। কালো চাঁদিয়াল তো ছিল দুর্লভ রত্ন, কিনতে না পেরে কতদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। আজ আমি উঠে একটু হাত বাড়ালেই ওঠাকে ধরতে পারি, কিন্তু কোনো ইচ্ছেই হলো না। দূর থেকে কতগুলো ছেলে ওটাকে নেবার জন্যে ছুটে আসছে, আমি হাসিমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছি। যে-ছেলেটা সবচেয়ে আগে আগে ছুটে আসছে, ওর মুখটা অনেকটা আমারই ছেলেবেলার মুখের মতন দেখতে না!

ছেলেবেলার এসব স্বপ্নগুলো কোথায় যায়? ছেলেবেলায় ভাবতুম, বড়ো হয়ে শুধু অফিসে চাকরি করা বা বিয়ে করে সংসার পেতে বাড়ি বানানো শুধু এই কি জীবন নাকি? এ তো নুন-কম তরকারির মতন, কোনো রকমে গিলে ফেলতে পারলে পেট ভরবে ঠিকই, কিন্তু বিস্বাদ থেকে যাবে। আসল জীবন অন্যরকম, কি রকম ঠিক জানি না, কিন্তু অন্য রকম। কিন্তু এখন দেখছি এইগুলোই তো সকলের একমাত্র সাধনার ধন। বড়ো হওয়া টড়ো হওয়া সব বাজে কথা, কোনোরকমে জীবনটা টিকিয়ে রাখাই বড়ো কথা।

৫

বুলুমাসিরা সবাই পুরী যাচ্ছেন, আমি ট্রেনে তুলে দিতে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, মানুষের দুঃখ আসলে দু'রকম।

বুলুমাসি বেশ পুষ্টাঙ্গিনী নারী—জাঁদরেল, দুনিয়ায় কাউকে ভয় করেন না,

মুখ-চোখের ভঙ্গি একরকম। আগে থেকে রিজার্ভ করা সিটে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। মাসতুতো ভাইবোন তিনজনই এখনো বাচ্চা, মেশোমশাইকেও একটি বাচ্চা হিসেবে ধরা যায়, কারণ পুরীতে এখন ঠাণ্ডা পড়তে পারে এই ভেবে তিনি হাওড়া স্টেশনেই সোয়েটার ও মাফলার পরে বসে আছেন। ট্রেন ছাড়তে এখনো মিনিট পঁচিশেক বাকি কিন্তু আমার এমন সাহস নেই যে, এখনি বুলুমাসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পারি! ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে আর এক প্রস্থ পায়ের ধুলো নিতে হবে, বুলুমাসি আমার থুতনি ধরে আদর করার ছলে চোখ পাকিয়ে বলবেন সাবধানে থাকবি, বেশি রাত করে বাড়ি ফিরবি না, ঘুমোবার আগে ভালো করে দেখে নিবি দরজা-টরজা সব বন্ধ আছে কি না...ইত্যাদি, তবে তো নিষ্কৃতি!

সুতরাং আমি অলসভাবে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলুম! ছবির বইয়ের পাতা উল্টে যাবার মতন ট্রেনের এক-একটি কামরা দেখতে খুব ভালো লাগে। বিশেষত এই পুজোর সময়ে, কেননা এখন প্রত্যেক নারী ও শিশুর অঙ্গে নতুন ঝলমলে পোশাক। সারা ট্রেন জুড়ে কলকল্ খলখল্ করছে রামধনুর সাতটা রং। তবে গোলাপী রংটাই বেশি, এবারের পুজোর ফ্যাসান গোলাপী রং।

জানলাগুলোর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টুকরো কথাবার্তায় নানা ধরনের কাহিনী জানতে পারি। দুটি ছোট ঘটনার কথা বললেই বোঝা যাবে মানুষের দুঃখ আসলে দু'রকম।

--বাব-বাঃ, বাঁচা গেল। তা হলে সত্যি ট্রেনে উঠলুম—

—ধুৎ ভালো লাগছে না! এত ভেবে রেখেছিলুম—

—ললিতা, তুমি এখনো ঐ কথা ভেবে মন খারাপ করছ?

—করব না! কতদিন ধরে ভেবে রেখেছিলুম, বিয়ের পর কালিম্পং যাব -তা না, এখন চললুম ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে।

—মোটেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে নয়, পুরী খারাপ জায়গা?

—এই নিয়ে তিনবার যাওয়া হলো পুরীতে। পচে গেছে একেবারে।

—আহা, কালিম্পংই বা কি এমন ভালো জায়গা?

—খুব ভালো জায়গা। আমি কতদিন ধরে ভেবে রেখেছি। পুরী আর কালিম্পং বুঝি এক কথা হলো? ভেবে রেখেছিলুম, বিয়ের পরই তোমার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাব। পাহাড়ে আমার এত ভালো লাগে।

—কি করব, দার্জিলিং-এর ট্রেনের যে রিজার্ভেসান পেলাম না কিছুতেই। দেখো, দু'জনে এক সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতেও ভালো লাগবে।

—সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। রং কালো হয়ে যায়।

—ইস রঙের কি গর্ব।

এরপর যুবকটির উচ্চ ও যুবতীর স্মিত হাস্য। যদিও যুবতীর মুখে তখনো অখুশির ছায়া।

পরের দৃশ্য ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে। আবহাওয়া পারিবারিক। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে, দাদা-বৌদি, দিদি-জামাইবাবু, দাদার বন্ধু, বোনের বান্ধবী ইত্যাদি নিয়ে আটজনের একটি দল। জানালার পাশের রূপসী তরুণীটির মুখ মলিন, এক পলক দেখলেই বোঝা যায়, সে-ই এ দৃশ্যের নায়িকা। নায়িকা ছাড়া অন্যান্যদের সংলাপ আমি বিনা পরিচয়ে (ওদের পরিচয় তো আমি জানিও না। এলোমেলোভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি)।

—কি ব্যাপার, সুপর্ণার মুখ এমন গম্ভীর কেন?

—আহা বুঝতে পারছেন না? মন খারাপ!

নায়িকা : মোটেই আমার মন খারাপ নয়!

—কারুর সঙ্গে একটাও কথা নেই, চোখ ছল ছল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, একে মন খারাপ বলে না?

নায়িকা : মোটেই আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছি না। বয়ে গেছে আমার!

—কেন রে, সুপর্ণার মন খারাপ কেন রে?

—কল্যাণবাবু আসতে পারলেন না বলে আমাদের দিকেও একটু তাকাতে নেই।

—কল্যাণবাবু এলেন না কেন?

—সব তো ঠিকঠাক ছিল, লাস্ট মোমেন্টে টেলিগ্রাম পেলেন ওঁর হেড অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কলকাতায় আসছেন, ওকে থাকতেই হবে।

—ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগুলোর কোনো আক্কেল নেই? পুজোর ছুটির সময়েও অফিসের কাজ! খালি কাজ আর কাজ!

—বোম্বেতে পুজোর ছুটি থাকে না। ওরা জানবে কি করে? তা ছাড়া কাজ না করলে কি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়া যায়?

—সত্যি অন্যায়, কল্যাণদার উচিত ছিল উল্টো টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেওয়া যে, উনি থাকতে পারবেন না! সুপর্ণাদি, তুমি জোর করে বললেই পারতে।

নায়িকা : আমার বয়ে গেছে। নিজেরই গরজ নেই। কাজটাই তো বড়ো।

—ইস, সুপর্ণার মুখখানা একেবারে টকটকে লাল হয়ে গেছে এক্ষুনি চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

নায়িকা : ঠাট্টা করবে না বলছি! ভালো হবে না।

—এই, কেন ওকে রাগাচ্ছিস! বিরহিনীকে একটু একা থাকতে দেওয়া উচিত!

—যা যাঃ! কল্যাণবাবুর অভাব তুই মেটাবি। দুধের স্বাদ কখনো ঘোলে মেটে?

—আমি মোটেই ঘোল নই, আমি কণ্ডেস্‌ড মিল্ক!

নায়িকা : ওরকম করলে আমি এখনি নেমে যাব বলছি!

—মনে তাইতো ইচ্ছে!

—এই, কেন তুমি সুপর্ণাকে রাগাচ্ছ?

—তোমার বুঝি অমনি হিংসে হলো। কল্যাণবাবু আসেননি, এই সুযোগে আমি একটু চান্স নিচ্ছি।

নায়িকা : এরকম করলে সত্যি নেমে যাব বলছি!

—নামো না দেখি, আমি দরজার কাছে বুক পেতে দেব না!

—আমার কি মনে হয় জানো ছোড়দি, কল্যাণদা হয়তো কাল পরশু পুরীতে হাজির হয়ে একটা সারপ্রাইজ দিতে পারে—

নায়িকা : এই রিন্টু, তোরা একটু অন্য কথা বল না! খালি এই এক কথা! গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিতেই আমি আবার বুলুমাসির কামরার দিকে ছুটে এলাম। আস্তে আস্তে গাড়িটা প্লাটফর্ম ছেড়ে যাবার পর আমি সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এই এক গাড়ি ভর্তি যারা যাচ্ছে, তারা অনেকেই যাচ্ছে সুখের সন্ধানে। সুখের চেহারা একরকম। দুঃখ দু-রকম। ঠিক জায়গায় যাওয়া হয় না. সব সময়েই দুটোর মধ্যে অন্তত একটা দুঃখ থেকেই যায়।

৬

ইংরেজিতে যদিও বলে কিং আর কুইন, কিন্তু মুখে আমরা এখনো বলি সাহেব-বিবি। কিন্তু, তাসের সাহেব-বিবির মতো সত্যিকারের ঐরকম সাহেব-বিবি আমি কখনো দেখিনি। ঐরকম গালপাট্টা গোঁপ, পাটকরা সিঁথি, কাশীর বেগুনের মতন মুখখানি, তাসের সাহেবের মতো ওরকম চেহারার সাহেব হয় কিনা জানি না। বাংলা দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা টুয়েনটি নাইন, মাসিপিসিরা যারা ইংরেজি বিশেষ জানেন না—তাঁরাও দুপুরের দিকে গোল হয়ে খেলতে বসে পান চিবুতে চিবুতে কয়েকটা ইংরেজি কথা বলেন, যেমন খেলার নাম 'টুয়েনটি নাইন'—তা ছাড়া 'পেয়ার', 'ডবল', 'সেট'—ইত্যাদি, কিন্তু কিং কুইন নয়, সাহেব-বিবি থাকে সাহেব বিবিই। এমনকি, 'বিবির পেয়ার' দেখালে চার নম্বর কমে যায়, কিন্তু 'কুইনের পেয়ার', কখনো শুনিনি। রাজা-রানী আর নেই কিন্তু বাংলা দেশের তাসে সাহেব-বিবি রয়ে গেলেন। ঐ রকম অদ্ভুত চেহারায়!

ছেলেবেলায় আমি এই নিয়ে প্রায়ই ভাবিত হয়ে পড়তাম। তাসের সাহেবের

ঐরকম অ-সাহেবী চেহারা দেখে। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, সাহেবরা সত্যিকারের বহুরূপী, মানুষ থেকে অমানুষ সব রকম চেহারাই ওরা ধরতে পারে —গায়ের রংটা সব সময় ফর্সা থাকে, এই যা। প্রায়ই বহু সাহেব আমার চোখে পড়ে, অনেকেরই সংস্পর্শে আসতে হয় এই কলকাতা শহরেই।

আমার জীবনে প্রথম সাহেব দর্শন এবং স্পর্শন ঘটে ছেলেবেলায়। গাঁয়ের ছেলে, শহরে এসেছি পড়তে। ১৯৪৬ সাল। কী এক উপলক্ষে স্কুলে স্ট্রাইক, অন্য ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে আমিও শোভাযাত্রায়। ইউনিভার্সিটির সামনে মিটিং, খুব গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে, এমন সময় পুলিশ এসে গেল। কোথায়, কোনদিকে ছুটে পালাতে হয় আমি তখনো জানি না, একই জায়গায় ঢ্যালার মতন দাঁড়িয়ে আছি, একটি সারজেন্ট এসে (সে পুরো সাহেব বা আধা কিংবা পৌনে ছিল জানি না, কিন্তু তার লাল টকটকে চেহারা ছিল ভয়াল সাহেবেরই প্রতিমূর্তি!) 'হট যাও' বলে আলতোভাবে ছুঁয়ে দিল, আমি ছিটকে পড়লুম, আমার চোখের কোণে সেই কাটা দাগ আজও আছে। তখন ভেবেছিলুম বড়ো হয়ে সাহেবদের ওপর খুব একটা প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু, তার এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা এসে গেল, আর সাহেবগুলো এমন বদলে গেল! স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে এ পর্যন্ত একজন শ্বেতাঙ্গকেও তাঁর গায়ের রং বা জাতি পরিচয়ের জন্য অপদস্থ করা হয়েছে এরকম উদাহরণ নেই। এই সহনশীলতা আমাদের দেশের বিশেষত্ব নিশ্চিত। ফরাসিরা এখনো সহ্য করতে পারে না জার্মানদের। কোরিয়ার লোক এখনো জাপানিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি নয়, কিন্তু ইংরেজদের ওপর আমাদের পুরোনো রাগ একটুও নেই।

এই শীতকালে, যখন মানস সরোবর কিংবা আরো দূরের শীতের দেশ থেকে উড়ে আসে হাজারে হাজারে যাযাবর হাঁস, আশ্রয় নেয় চিড়িয়াখানায়—তেমনি কলকাতা শহরেও আসতে থাকবে ঝাঁকে ঝাঁকে সাহেব। চৌরঙ্গি এলাকায় পথঘাট ভরে যাবে সাহেব-মেমে। কিন্তু যাদের কথা সকলেই জানেন, যাঁরা এসে ওঠেন এক নম্বর হোটেলগুলোতে, ফুল ফুল ছাপ জামা এবং কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দৈত্যের মতো চেহারার যে সব সাহেব, পাশে রঙিন খাঁচার মতো পোশাক পরা ছোট ফুরফুরে মেমসাহেবকে নিয়ে ছবি তুলে বেড়াবেন, বিরাট গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবেন কোনারক দেখতে—যাঁরা আমাদের দেশের পক্ষে বড়ো আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাঁদের সরকারি নাম 'ট্যুরিস্ট', যাঁরা এসে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ বৃদ্ধি করেন, তাঁরা ছাড়াও আরো অনেক চেহারার সাহেব-সুবো আসেন এদেশে। তাঁদের সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আঠারো থেকে তেইশ বছর বয়সের মধ্যে ইওরোপে আমেরিকার বহু ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী ভ্রমণে। অনেকরকম স্কলারশীপের ব্যবস্থা আছে, যারা

সেই স্কলারশীপ পেয়ে যায়, তারা সৌভাগ্যবান, যারা পায় না, তারাও দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের বাংলা কাগজে মাঝে মাঝে ছবি বেরুত শ্রীযুক্ত অমুক পায়ে হেঁটে পৃথিবী ভ্রমণ করে এলেন বা করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এই রকম দুঃসাহসিক কাজ খবরের কাগজে ছবি বেরুবার মতো। অথচ, ইউরোপ আমেরিকা থেকে প্রতি বছর হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে পায়ে হেঁটে পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বছর দু-তিন আগে, শোনা যায়, কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গ ইউরোপ থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন কলকাতায়। এরকম আরো অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

বছর চারেক আগে, মৌলালির কাছে একজন ইংরেজ যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, রিপন স্ট্রিট কোথায় বলতে পার?

বললুম, আমি অনেকটা এ দিকেই যাচ্ছি, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি।

যেতে যেতে আলাপ হলো। ছেলেটা এসেছে ইংলণ্ডের সাসেক্স অঞ্চল থেকে, কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ মন খারাপ হওয়ায় পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে। কার মুখে যেন শুনেছে রিপন স্ট্রিটে সস্তায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়, তাই খুঁজতে যাচ্ছে। নাম স্ট্যানলি, বছর কুড়ি বয়েস, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, কোমল মুখ নীল চোখ। খানিকদূর এগিয়ে আমি বিদায় নিলাম। দিন সাতেক পরে সেই ছেলেটাকেই আবার দেখলুম চৌরঙ্গি অঞ্চলে। জামাকাপড় ময়লা, চুল উস্কোখুস্কো, পিঠে একটা ব্যাগ। নিজে থেকেই ডেকে বললুম, কী খবর, স্ট্যানলি? একটু ফ্যাকাসে ধরনের হেসে বলল, তোমার চেনা কোনো জায়গা আছে, যেখানে বিনা পয়সায় থাকা যায়?

আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি নিজের বাড়িতে একা থাকতেন। তিনি বললেন, তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পার!—

স্ট্যানলি সানন্দে বন্ধুটির সঙ্গে চলে গেল। মাসখানেক পরে সেই বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি, স্ট্যানলি তোয়ালে পরে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, বন্ধুটি তখন বাড়িতে নেই। অপেক্ষা করতে করতে শুনলাম স্ট্যানলির তখন খাবার পয়সা নেই, বন্ধুটির সঙ্গেই খায়—এবং প্রতিদিনে নিজে থেকেই ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, জামাকাপড় কাচে। বন্ধুটিকে পরে বললুম, কি রে, ব্রিটিশ চাকর রেখেছিস যে বাড়িতে? বন্ধু লাজুকভাবে বললেন, ছেলেটা সত্যি ভালো, টাকাপয়সা নেই, বিপদে পড়েছে, থাক না...তবে, রাত্তিরে যখন ঘুমের ঘোরে ওর গায়ে পা তুলে দিই মাঝে মাঝে—তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে পায়ের তলায় একজন খাঁটি

ইংরেজ শুয়ে আছে, ভাবলে হাসিই পায়।

স্ট্যানলি আরো অনেকদিন রয়ে গেল আমাদের আড্ডায়, ওকে নিয়মিত সদস্যরূপে পেলাম। সরল, বুদ্ধিমান ছেলে, অনিন্দ্যকান্তি, কথায় কথায় ঝরঝর করে হাসে। দুনিয়ার কোনো বিষয় সম্পর্কে কুসংস্কার নেই, এমনকি নিজের দেশ সম্পর্কেও। তারপর একদিন ও হঠাৎই আবার চলে গেল।

মাস কয়েক পর, একদিন বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি আমার বিছানায় তিনটে সাহেব শুয়ে আছে। শুনলাম সন্ধে থেকে ওরা আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। একজন বেশ সপ্রতিভাবে বলল, তোমার নাম ওমুক তো? তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

আমি একটু ঢোঁক গিলে মনে মনে ভাবলুম, এতই বিখ্যাত হয়ে গেছি নাকি যে, ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সাহেবরা আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসছে? সন্ধে থেকে বসে থাকছে মাঝরাত পর্যন্ত। ওরা বলল, এলাহাবাদে স্ট্যানলি বলে একটি ব্রিটিশ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। সে তোমাদের কয়েকজনের ঠিকানা দিয়ে বলেছে তোমরা কলকাতায় থাকার জায়গা জোগাড় করে দিতে পার।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। তিনজনের মধ্যে দুজন আমেরিকান, একজন ইংরেজ। পথে পথেই ওদের বন্ধুত্ব। ভরাট স্বাস্থ্য, সবল কণ্ঠস্বর, লাল চুল, নীল চোখ, কিন্তু সাহেব-ভিখিরি। ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি জামা-প্যাণ্ট, কারুর পায়ে রবারের চটি কারুর খালি পা। শিক্ষা-দীক্ষা-বুদ্ধিতে কেউ খুব সাধারণ নয়। আমার চেয়ে আমার যে বন্ধু একা থাকেন তাঁর বাড়িতেই এরকম ভিখিরি সাহেব অতিথি আসতে লাগল ঘন ঘন।

একজোড়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো, আমেরিকান। দু'জনেরই বয়স কুড়ির নীচে—ঐরকম কবে কোথায় থাকবে ঠিক নেই, ঘুগনি-আলুকাবলি কিংবা বেশি করে তরকারি ফাউ নিয়ে দু'আনার কচুরি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ছেলেটার চোখের কাছে একটা কালসিটের দাগ। জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কিসের জন্য? ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল, ও কিছু নয়। কাশীতে এক সন্ধেবেলা চারটে মজার লোক—কি যেন তোমরা বলো, গুণ্ডা? গুণ্ডা?—গলির মধ্যে আক্রমণ করেছিল —ওদের ইচ্ছে ছিল আমার বান্ধবীকে কেড়ে নেয়। তাই ওদের সঙ্গে একটু খেলা করলুম আর কি!

আমরা শিউরে উঠে বললুম, কী সর্বনাশ! কাশীর গুণ্ডা? বাঁচলে কি করে?

ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল, আমি যুযুৎসু জানি কিনা! চারটে লোককে সামলানো আমার কাছে কিছুই না। একজনের যেই একটা চোখ কানা করে দিলুম, অমনি আর সবাই ভয়ে পালাল।

এস্‌থার বলে আর একটি মেয়েকে দেখেছিলুম, সে এসেছিল একা। আঠেরো উনিশ বছরের মেয়ে, লম্বা চুল, নরম স্বভাব, বিয়ে পাশ করে একা বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে। ও ঠিক পায়ে হেঁটে ঘোরে না, হিচ হাইকিং—অর্থাৎ রাস্তার চলতি গাড়ি থামিয়ে বিনে পয়সার লিফ্‌ট চায়! কলকাতা থেকে ঐভাবে মাদ্রাজে যাবে। আমি ভয় পেয়ে বললুম, তুমি একা মেয়ে, যে কোনো অচেনা লোকের গাড়িতে উঠবে—তুমি তার বিপদের কথা জানো না? ট্রাক ড্রাইভাররা বোধহয় সব দেশেই সমান হয়—অন্তত এ দেশের লরির ড্রাইভারদের কথা জানি—তাদের নিষ্ঠুরতার সীমা নেই।

নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সরল হেসে এস্‌থার বলল, জানো—আমার কখনো বিপদ হয় না। আমার সঙ্গে যখন কেউ খারাপ ব্যবহার করতে আসে, আমি তার পা জড়িয়ে ধরে দয়া ভিক্ষা চাই। এমন কাঁদতে আরম্ভ করি—যে শেষ পর্যন্ত তারা দয়া না করে পারে না।

বহুদিন পরে এসথারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম যে, সে নিরাপদেই দেশে ফিরতে পেরেছে।

কিন্তু সবচেয়ে মজার সেই জার্মান ছেলেটি, যে এখনো কলকাতায় আছে। ধরা যাক তার নাম গটফ্রিড। জার্মানিতে ওর বাবা একজন ডাক্তার, সুতরাং ধরা যায়, উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। কিন্তু গটফ্রিড একেবারে ভিখিরি—পাশপোর্ট ছাড়া আর কোনো মূল্যবান বস্তু ওর সঙ্গে নেই। আমার নানা বন্ধুর বাড়িতে ও কিছুদিন করে রইল। কিন্তু ভিখিরি হলেও খানিকটা সৌখিন ও অভিমানী বলে বেশিদিন থাকতে পারে না। এক বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন ছিল, কিন্তু তার ঘরে মাঝে মাঝে ইঁদুর ঢোকে বলে বেশিদিন থাকতে পারেনি। আরেকজনের বাড়িতে আবার বেড়াল আছে, তাও ওর পছন্দ নয়। শুনেছি জার্মান জাত বিষম কর্মঠ হয়। কিন্তু একজনের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার জায়গা পেয়ে সে শুধু দিনরাত শুয়ে থাকে কিংবা ছবি আঁকার নামে হিজিবিজি কাটে। সেখান থেকে ও চলে গেল একদিন। মাঝখানে শুনলুম গটফ্রিড রাস্তায় নাচ দেখিয়ে ভিক্ষে করছে। সাহেবের নাচ দেখলে কলকাতার লোক এখনো ভিক্ষে দেয় বোধহয়।

আমার সেই যে বন্ধু একা থাকেন, একদিন তাঁর কাছে রাত দশটায় গটফ্রিড এসে হাজির। খুব ব্যস্তভাবে বলল, এই, তোমার কাছে একটা কম্বল আছে?

—কেন, কম্বল কি করবে? কোথায় থাক তুমি এখন?

—সময় নেই, তাড়াতাড়ি। কম্বল আছে কিনা বলো।

—আছে, দিচ্ছি। কোথায় থাক?

—চমৎকার জায়গায়। চৌরঙ্গিতে ময়দানে। পাশেই পুকুর, তার পাশে ছোট

একটা গুমটি ঘর আছে। কি আলো হাওয়া ঘরটায়। আর চৌরঙ্গির মতো জায়গায় বেড়াল নেই, ইঁদুর নেই, ফার্স্ট ক্লাশ। কিন্তু ক-দিন ধরে একটু শীত-শীত করছে। একটা কম্বল দরকার! তাড়াতাড়ি দাও নইলে ভিখিরিরা এসে জায়গাটা আবার দখল করে নেবে।

৭

এতকাল কলকাতা শহরে আছি, কোনোদিন জ্যোৎস্না দেখিনি। আকাশের দিকে তো চোখ তুলে তাকাবার স্বভাব নেই, ছেলেবেলায় সেই যখন ঘুড়ি ওড়াতুম —তারপর আর কখনো আকাশের দিকে পুরো চেয়ে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। জ্যোৎস্নাও দেখিনি, জ্যোৎস্নার আলো নিয়মিত নিশ্চিত এসেছে কলকাতায়, কিন্তু নিয়ন আলোয় মিশে গেছে, মিশে গিয়ে অন্যরকম রং, বড়োই ফ্যাকাশে বা অদৃশ্য। যাই হোক, আমি জ্যোৎস্না নিয়ে বহুদিন ভেবেও দেখিনি।

গত শুক্রবার পূর্ণিমা ছিল। তার চারদিন আগে থেকে কলকাতা শহরে ব্ল্যাক আউট। ক'দিন থেকেই দেখেছি রাস্তায় একটিও আলো নেই, তবু কোথাও পুরো অন্ধকার নয়। কি রকম যেন একটা অন্য রকমের আলো এসে পড়েছে এখানে সেখানে—। তবুও আকাশে মুখ তুলিনি। হঠাৎ পথে পথে শুনতে পেলাম শুক্রুরবার দিন পূর্ণিমা। কে আবার কবে পূর্ণিমার খোঁজ রেখেছে? কত পূর্ণিমা আসে, কত পূর্ণিমা যায়—যাদের বাতের অসুখ আছে, তারা ছাড়া আর কেউ পূর্ণিমার খবরও রাখে না। এমনকি, কবিরাও নয়, আজকাল। অথবা শুধু সেই সব কবি যাঁরা বাতের রোগী।

তবে কেন কলকাতার পথে পথে হঠাৎ পূর্ণিমার আলোচনা?

কান পেতে শুনলাম, পূর্ণিমার দিনই নাকি বোমা পড়ার সম্ভাবনা। সেদিন ব্ল্যাক আউট তুচ্ছ হয়ে যায়, সেদিন আর কিছুই গোপন রাখবার উপায় নেই, কারণ, চাঁদে ঠুলি পরানো যায় না। সেই জন্যই শুধু লোকে পূর্ণিমার আলোচনা করছে? অথচ লোকের মুখে তো ভয় নেই। কেউ তো বোমা পড়ার ভয়ে মুখ শুকনো করেনি।

শুক্রুরবার দিন সন্ধের পর আমি বিশেষ কাজে দ্রুত হেঁটে আসছিলুম। যতক্ষণ নিজের চিন্তা নিয়ে বিব্রত ছিলুম, ততক্ষণ কিছুই চোখে পড়েনি। হঠাৎ এক সময় দেখলুম, রাস্তাটা নীল রঙে ছেয়ে গেছে। নীল রঙের জ্যোৎস্না—নীল রং, যে জ্যোৎস্নায় অভিসারে বেরুবার সময় রাধা আত্মগোপন করার চেষ্টায় নীল রঙের শাড়ি পরে নিজেকে মিশিয়ে দিত জ্যোৎস্নায়। আমি অকস্মাৎ কিছু না ভেবে

তাকালুম আকাশের দিকে। দেখি চৌরঙ্গির শিয়রে বিশাল চাঁদ উঠেছে ঠিক ইয়ের মতো। কিসের মতো? কিসের মতো? না থাক, চাঁদ নিয়ে বহু উপমা দেওয়া হয়েছে, অসংখ্য, আমি না হয় আর একটা উপমা নাই-বা যোগ করলুম। বরং বলা যাক, চাঁদ উঠে আছে ঠিক চাঁদের মতো। বহুদিন চাঁদ দেখিনি, সুতরাং চাঁদই আমার কাছে চাঁদের উপমা।

আর একটা কথাও মনে হলো, এ চাঁদ শুধু কলকাতাতেই উঠেছে।

চৌরঙ্গির শিয়রের কাছে এই যে ফুটে আছে বিশাল চাঁদ, ওর পক্ষে ঠিক এখনই আর কোথাও আলো দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই যে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ শশাঙ্ক, একে নিয়ে এখন আমি কি করি? মহা মুস্কিলে পড়লুম, এতদিন পর এমন ভাবে দেখলুম চাঁদকে, কিছু যেন একটা আমার করা দরকার সেই উপলক্ষে। অথচ কী? একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলুম। শুক্কুরবার সন্ধেবেলা আমার জরুরি কাজ থাকে, অনেকদিন নানা কারণে আটকে গেছি, কিন্তু কোনো দিন এমন নৈসর্গিক বাধা আসেনি। শেষ পর্যন্ত, পূর্ণ চাঁদের মায়া আমার ভাবনার পথ ভোলাতে পারল না, আমি মুখ নিচু করে জরুরি কাজ সারতে চলে গেলুম।

ঘণ্টা দুয়েক পর, দশটা বাজে, আমরা চার বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছি আবার চৌরঙ্গির মোড়ে। আমরা ভাবছি, এখন আমরা কোনদিকে যাব। মাথার উপরে চাঁদ। আমরা চারজন রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতিপুত্র, কোটালপুত্র নই যে চৌরাস্তার চারদিকে চলে যাব। আমরা সবাই এক রাস্তায় যাব, যে-যার বাড়িতে যাব—কিন্তু তার আগে এই চাঁদকে কি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাব? চাঁদের ফ্লাড লাইট কলকাতার ব্ল্যাকআউট নষ্ট করে দিয়েছে। চারদিক আলোময়। এতদিন চন্দ্রবিহীন ছিল বলেই আজ এ শহরে চাঁদ তার সমস্ত আলো উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে নাকি? অথবা প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই এমন চাঁদের আলো থাকে, আমরা দেখতে পাই না? তাহলে, আমাদের মনে হলো, যুদ্ধ একদিন না একদিন থামবেই আমাদের অনুকূলে, তখন, যুদ্ধ থেমে যাবার পর, এই কলকাতা শহরে প্রত্যেক পূর্ণিমার দিন তো পথের সব আলো এমনিতেই নিভিয়ে দিলে হয়! কোনো দরকার নেই বালবের আলোর, নিয়ন রঙের আলোর, মাসে অন্তত একদিন অন্যরকম আলো থাক না—এই শহরে। নগরের সব মানুষ সেদিন বেরিয়ে আসবে পথে, মাসের একটি দিন এ শহরে অঘোষিত উৎসব হবে। ফলে, বিদ্যুৎ বাঁচবে, বাঁচবে মানুষের সুকুমার বৃত্তি। যদি কেউ কেউ এর ফলে চন্দ্রাহত হয়ে যায়, তবু ক্ষতি নেই। দিনের আলোয় পাগল হওয়ার চেয়ে রাত্তিরে পাগল হওয়া ভালো।

আমরা চার বন্ধু ঠিক করলুম, আজ রাত্রে আমরা এক শতাব্দী পিছনে ফিরে যাব। চোখে পূর্বপুরুষদের রোমাণ্টিকতা মাখিয়ে আজ আমরা পথের ওপরেই

দাঁড়িয়ে কিছুটা চন্দ্রাসুধা পান করব। কেউ আমাদের অনাধুনিক বলতে পারবে না, চিনতেই বা পারবে কে? চাঁদের আলোয় আমাদের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। আমরা চারজনে ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদের দিকে তাকালুম।

পথে লোক নেই। যে দু' চারজন ইতস্তত ঘুরছে দেখলুম, মনে হলো, ওরাও যেন লুকিয়ে চাঁদের সুষমা ভোগ করতে এসেছে। কোথাও বিন্দুমাত্র সন্ত্রস্ততা নেই। দূরে অক্টরলোনী মনুমেণ্টটাকে প্রত্যেকদিন আমার অসহ্য কুৎসিত লাগে দেখতে, স্থাপত্য শিল্পের চরম কদর্যতার এই নিদর্শনটি কলকাতার বুকে এখনো আছে দেখে প্রত্যেকদিন আমার রাগ হয়, কিন্তু আজ দেখলুম, চাঁদের আলোয় ও একেবারে বদলে গেছে। শান্ত, গম্ভীরভাবে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হলো, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মনুমেণ্টটাও ওর দুটো হাত বার করে এক একবার মাথা চুলকে নিচ্ছে—যেন ঘুম না পায়। মন্থর পায়ে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করেছি। চাঁদের আলোয় পায়ের শব্দ হয় না। কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ছায়া পড়ছে।

সারা শরীর ভিজে গেছে চাঁদের আলোয়। চুলের মধ্যে জ্যোৎস্না, হাতে মুখে, জামার পকেটে ঢুকে গেছে জ্যোৎস্না। এত তীব্র নীল আলোয় যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লুম। হেঁটে চলেছি, হেঁটেই চলেছি বহুদূর, নিঃশব্দে। দুটো বিড়ালের বাচ্চা খেলা করছিল পথের ওপর। সেখানে একটা গাছের ছায়া পড়েছে একটু একটু, আলো আর ছায়ার মধ্যে খেলা করছে দুটো বিড়ালের বাচ্চা, দুজনে দুটোকে জড়িয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওদের দেখে আমরা একটু থমকে দাঁড়ালুম, জ্যোৎস্নায় মিশে গেছে দুটো ফুটফুটে বিড়াল, গাছের ছায়ায় যখন আসছে তখনই ওদের চোখ দেখা যায়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো, এই জ্যোৎস্না ও শিরীষ গাছের পাতার ছায়া, দুটো বিড়াল শাবকের সামনে আমরা চারজন...এই চমৎকার পরিবেশে একটা সিগারেট না ধরালে মানায় না। দেশলাইতে একটাই কাঠি ছিল। কাঠিটা জ্বলে ওঠবার পরেই বুঝতে পারলুম, জ্যোৎস্না কত সুন্দর।

তখন ইচ্ছে হলো গুনগুন করি। চাঁদ সম্পর্কে কার কি গান মনে পড়ে? প্রথমেই মনে এল, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে'। এই গানে যেন মুহূর্তে আমাদের কৈশোর ফিরে এল, কারণ কৈশোরের পর আর এ গানটা শুনিনি। গানটা গুনগুন করতে করতে মাঝখানে আমরা চারজনেই এক সঙ্গে হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠলুম। কে কি ভেবেছিলাম কি জানি! তারপর, মনে পড়ল, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' কিন্তু দু' তিন লাইনের পরই চুপ করে গেলাম। এ গানটা মানায় না, সবাই গেছে বনে—এখানে সবাই বলতে চারজন পুরুষ নয় নিশ্চয়ই। আমাদের এ গানটা মানায় না। আর কি গান? 'ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার'

—এ গান এক লাইনও গাওয়া যায় না। 'চোখের জল' আমাদের কোনো ব্যাপার তো নয়, বিশেষত 'দুঃখের পারাবারে' বড়োই কাঁচা রচনা।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বহুদূর চলে এসেছি। পৌঁছোলাম আর এক চৌরাস্তায়। এবার আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একজন বলল, চলো এবার ডানদিকে যাই। আরেকজন বলল, না, বাঁ দিকে, ওদিকটা বেশ ফাঁকা। আরেকজন না, চলো সামনের দিকেই যাই, তাহলে বাড়ির দিকেই পৌঁছে যাব। চতুর্থজন—না, চলো পিছনে ফিরে যাই, আবার ফিরে যাই চৌরঙ্গিতে। ওখানটাই সবচেয়ে সুন্দর। আমাদের মতের মিল হলো না। তখন ঠিক করলুম একটা পয়সা নিয়ে টস্ করা হোক দু'জন দু'জন করে। একটা চক্‌চকে আধুলি বার করলুম পকেট থেকে। আধুলিটাতে একটা টুসকি মেরে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলুম, সেটা ঠং করে মাটিতে পড়ল। আমি আমার পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম, বল হেড না টেল?

একজন কৌতূহলী পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বোধহয় সে আমাদের কথা শুনেছিল। হঠাৎ লোকটি আমাদের কাছে এসে বলল, বাড়িই চলে যান! এত রাত হলো! আমরা এমন চমকে উঠেছিলাম যে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

—না বলছিলাম কি, আপনাদের কথা শুনলাম তো, কোন দিকে যাবেন? এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো।

মধ্যবয়স্ক ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকটি, কালো হাতির মতো মুখ, কিন্তু চোখ দুটি দেখলে নিরীহ ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। বোধহয় রাত্তিরের ভাত হজম করার জন্য পায়চারি করতে বেরিয়েছেন। তবু, এ সময় যে-কোনো অপরিচিত লোকের গায়ে পড়ে কথা বলাই সন্দেহজনক। জিজ্ঞেস করলুম, আপনি?

—না, না, আমি এমনিই বললুম এত রাত্রে আর কোথায় ঘুরবেন, এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো, তাই,—

—আপনি কোথায় থাকেন?

—ঐ যে কোণের বাড়িটা। 'শান্তা লজ'—ঐ বাড়িটা আমার।

ভদ্রলোক হাতের ছড়িটা উঁচু করে দেখালেন। ভদ্রলোকের মুখে সন্দেহজনক কিছুই নেই তবু জিজ্ঞেস করলুম, আপনার নাম?

—শশধর রায়চৌধুরী।

—কি রায়চৌধুরী? শশধর?

আমি হাসি সামলাতে পারলুম না। একটু দূরে গিয়ে হে-হো করে হেসে উঠলুম। এক বন্ধু এসে বলল, কি রে হাসছিস কেন? আমি বললুম, কিছু না! —বল না!—আমি হাসি গিলে ফেলে বললুম, এতক্ষণ চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। এখন স্বয়ং শশধর এসে পথনির্দেশ করে দিলেন। চল বাড়ি যাই।

বৃদ্ধ খেয়ার মাঝি তার নৌকোখানার ওপর একলা চুপ করে বসে আছে। লোকজনকে ডাকাডাকি করার ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই। বয়সের দরুণ চোখে ছানি পড়েছে, ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে সে জলের মধ্যে কি দেখছে কে জানে।

পাশেই চালু হয়েছে স্টিমার ফেরি! শস্তা ও দ্রুত, সব লোক আজকাল তাতেই যায়। খেয়া নৌকোর দিন শেষ হয়ে গেছে। তবু বৃদ্ধ কাশেম আলি তার ছোট নৌকোখানা নিয়ে বসে থাকে অভ্যেসবশত। কখনো কখনো স্টিমার ফেরি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য বন্ধ থাকে—কখনো দু-তিন ঘণ্টা লেট হয়—তখন কাশেম আলির খেয়ার নৌকোয় কেউ কেউ আসে।

—কি কাশেম ভাই, আমাকে চিনতে পার?

খেয়ার মাঝি নড়েচড়ে বসে। মুখে একটা হাসির আভাস দেখা দেয়। বলে, যাবেন ওপারে? আসেন। এক আনা। এক আনা।

—চিনতে পার আমাকে?

—হ হ ক্যান চিনুম না।

সে আমার দিকে ভালো করে তাকায়। একটু লজ্জা গোপন করার চেষ্টা করে। সে আমায় চিনতে পারেনি। চিনতে পারার কথাও নয়।

আমিও কাশেমকে চিনতে পারিনি। পঁচিশ বছর পরে একজন মানুষকে চিনতে পারা কি সহজ?

পঁচিশ বছর আগে আমি নিতান্তই বালক। কয়েকবার তখন এই নদীর ওপর দিয়ে খেয়া পারাপার করেছি। হয়তো তখন কাশেম আলি ছিল না—ছিল অন্য কেউ। কিন্তু খেয়ার মাঝি তো একটা প্রতীক। মনে হয় যেন আবহমান কাল ধরে একজন মাঝিই খেয়া পারাপার করে যায়।

তবু বাল্যের দু-একটা স্মৃতি অদ্ভুতভাবে মনের মধ্যে গেঁথে থাকে। অনেক প্রিয় মুখ ভুলে গেছি, তবু মনে থেকে গেছে একটা দৃশ্য—খেয়া নৌকোর একজন মাঝি, শুধু লুঙ্গি পরা খালি গা—লম্বা-চওড়া জোয়ান, মুখে ঝকঝকে হাসি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি চালাবার সময় তার বাহুর সবল পেশিগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তাকে মনে হয়েছিল সে এই নদীর অধিপতি—এত স্বচ্ছন্দ তার খেয়া পারাপার। সম্ভবত ভাটিয়ালি গানের দু-এক পদও শোনা গিয়েছিল তার কণ্ঠে।

পঁচিশ বছর বাদে সেই নদীর ধারে এসে অকস্মাৎ মনের মধ্যে ঝিলিক দেয় দৃশ্য। এখন স্টিমার ফেরি হয়েছে, খেয়া নৌকোর আর কদর নেই। তবু স্টিমারে পার হওয়ার বদলে আমি খেয়া নৌকোর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মাঝির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই কি সেই? হতেও পারে, নাও হতে পারে। কোথায় সেই দুর্ধর্ষ জোয়ান, যাকে মনে হয়েছিল নদীর অধিপতি। পঁচিশ বছর পর তার বৃদ্ধ

হয়ে যাবারই কথা। এবং এখন আর সে নদীর অধিপতি নয়—এখন যন্ত্র এসে গেছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। পাড় থেকে কেউ একজন মাঝিকে একবার কাশেম আলি বলে ডাকল—সেই থেকে জেনে নিলাম নাম। পঁচিশ বছর আগে যে ছিল তার নামও কাশেম আলি কিনা আমার মনে নেই। তবে, খেয়ার মাঝি যেন একটা প্রতীক—যেন একই মানুষ চিরকাল খেয়া পারাপার করে। সেই জন্যই প্রশ্ন করি, কি কাশেম ভাই, চিনতে পার?

বারবার তো এই নদী, এই প্রকৃতি, এইসব মানুষকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, চিনতে পার? চিনতে পার? এটা সেই পঁচিশ বছর আগেকার বালকের প্রশ্ন। কেন না, এখনকার আমি-কে চিনতে পারা সম্ভব নয়, আমি অনেক বদলে গেছি।

এই নদীর কিনারায় আমি এখন একই সঙ্গে একজন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আমার মনের একটা অংশ ফিরে গেছে শৈশবে, একটা অংশ বর্তমান বাস্তবে। একটা অংশ সব কিছু অবাক চোখে দেখে, একটা অংশ বিচার-বিবেচনা করে।

আমি কাশেম আলির নৌকোয় উঠলাম। আমি ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। স্টিমার ফেরি চালু আছে, কে এই পলকা খেয়ায় উঠবে। শুধু আমাকে নিয়ে মাত্র এক আনা পয়সার জন্য কাশেম আলি নদী পার হবে—এটা ভারি আশ্চর্য লাগে। কিন্তু কাশেম আলির কোনো অভিযোগ নেই, বরং তাকে খুশিই মনে হয়। শুধু শুধু বসে থাকার বদলে বৈঠা চালানোতেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

একটু আগে কাশেম আলিকে বিড়ি খেতে দেখেছিলাম। তাই নিজে সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাকেও একটা দিই। এটা এক হিসেবে অসৌজন্য, কারণ পঁচিশ বছর আগে আমি যদি একেই দেখে থাকি, তাহলে কাশেম আলি আমার গুরুজন তুল্য, তাঁর সামনে ধূমপান করাই আমার উচিত নয়। কিন্তু আমার ভেতরের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষটি এদিকটা পাত্তা দেয় না।

কাশেম আলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিগারেটটি দেখে। তারপর, জিজ্ঞেস করে, কর্তা কি বাংলাদেশী, না ইণ্ডিয়া থিকা আইতাছেন?

উত্তর দেবার আগে আমি মনে মনে একটু হাসলুম। দু পাচ বছর বাদে হয়তো এসব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো আমার মধ্যে একটু আলোড়ন জাগে। যে মাটিতে জন্মেছি, যেখানে শৈশবে গায়ে ধুলো মেখেছি, যে নদীতে খেয়া পারাপার করেছি—সেই মাটি ও সেই নদীর ওপর বসে নিজেকে বিদেশী বলে পরিচয় দিতে গেলে একটু হাসি পাবে না?

পঁচিশ বছর আগে যখন দেশ স্বাধীনও হয়নি, ভাগও হয়নি—তখন গ্রামের

সাধারণ চাষী বা খেয়ার মাঝির মুখে ভারত বা ইণ্ডিয়া কথাটাই শোনা যেত না। তখন ওরা জানত শুধু এই জেলা আর ঐ জেলা, এই নদী আর ঐ নদী। বড়ো জোর ঢাকা আর কলকাতার গল্প শুনেছে। অবাঙালি মাত্রই ছিল তখন 'পশ্চিমা'। এখন সবাই দেশ বোঝে। এটা ভালো কথা।

বললাম হ্যাঁ, আমি ইণ্ডিয়ার লোক। তবে, এখানেও ছিলাম ছোটবেলায়। কাশেম আলি চুপ করে বৈঠা টানতে লাগল। বুড়ো হয়েছে, হাতে আর সে রকম জোর নেই। নদীর জল বেশ টলটলে, নীল আকাশের ছায়া পড়েছে। মনে হয়, এই জল খুব চেনা—পঁচিশ বছর আগে ঠিক এরকমই দেখেছি। কি-রি-কি-রি-কি-রি শব্দ করে যে মাছরাঙা পাখিটা ঝুপ করে জলে এসে পড়ল, ওকেও চিনি।

কাশেম আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কবে থেকে খেয়া পারাপারের কাজ করছে। সে একটা হাত তুলে দেখাল, যখন থেকে সে এইটুকু বাচ্চা ছেলে তখন থেকে। অর্থাৎ আমার জন্মের আগে থেকে। তবে এই কি সেই, যাকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছিলাম? হতেও পারে, নাও হতে পারে। তখন স্টিমার ফেরি ছিল না—সুতরাং অনেকগুলো খেয়া নৌকো ছিল নিশ্চয়ই। তার মধ্যে একজন মাত্র সবল চেহারা মাঝির কথা আমার মনে আছে। সে আর একজন।

—কাশেম ভাই, তুমি কখনো ইণ্ডিয়ায় গেছ?

—না কত্তা। কোথাও যাই নাই। গরিব মানুষ, কোথায় আর যামু?

—গত বছর যখন খুব যুদ্ধ ছিল?

না, তখনো কাশেম আলি কোথাও যায়নি, সে শুধু খেয়া পারাপার করেছে। বস্তুত সেই সময় তার রোজগার ভালোই ছিল, কেননা—কিছুদিন স্টিমার ফেরি অচল হয়ে থাকে। সে খানসেনাদেরও পারাপার করেছে, রাতের অন্ধকারে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদেরও এপার ওপার নিয়ে গেছে—উদ্বাস্তু দলকেও নদী পার করে দিয়েছে। কেউ বেশি পয়সা দিয়েছে, কেউ পয়সা দিতে পারেনি। এসব কথা সে আমাকে অকপটে জানায়।

সে খেয়ার মাঝি, সে তো প্রতীকের মতন, আবহমান কাল ধরে পারাপার করাই তার কাজ। এর মধ্যে পাপপুণ্য নেই। কোন দিকে পাপ, কোন দিকে পুণ্য সে জানে না—সে শুধু জানে নদীর এপার আর ওপার। ওপার থেকে এপারে, এপার থেকে ওপারে মানুষ যেতে চায়। মাঝখানে নদী থাকে উদাসীন, সেও ঐ নদীর অংশ। আমি বুঝতে পারি।

কোনো বীভৎস দৃশ্য, কোনো অত্যাচার কি কাশেম আলি দেখেনি? না দেখে উপায় কি। উনিশশো একাত্তরে সে দেখেছে নদীর জলে ভেসে আসা টাটকা যুবতীর লাশ। দেখেছে দিবা দ্বিপ্রহরে মানুষ খুন।

নির্লিপ্তভাবে সে বলে যাচ্ছিল—দু একটা ঘটনা শুনেই আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। ঐ সব বীভৎস ঘটনা আমি আর বারবার শুনতে চাই না—কী আর হবে কবর খুঁড়ে ঐসব স্মৃতি জাগিয়ে। যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে।

আমি কাশেম আলিকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, এ নদীতে মাছ কী রকম বলো? সে আমাকে মাছের কথা বলল। শীতকালে এ নদীতে কতটা জল থাকে? সে আমাকে জলের কথা বলল। এখন আর সে নির্লিপ্ত নয়। এই নদীর কথাই যেন তার ব্যক্তিগত কথা। বর্ষার সময় দুকূল প্লাবী ঢলের কথা বলতে গিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি বললাম—কাশেম ভাই, অনেকদিন আগে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান এইসব হওয়ার আগে আমি এই নদীতে অনেকবার খেয়া পার করেছি। আমি তোমাকে সেই তখন থেকে চিনি।

কাশেম তার ছানি-পড়া ঝাপসা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, হ, আপনেরেও আমার ভাই চেনা চেনা লাগে।

আমরা দুজনে কেউই পুরোপুরি মিথ্যে কথা বলিনি।

৮

নাগরদোলা ঘুরছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, জোরে, আরো জোরে ঘোরাও। আরো। দুধ-সাবু খেয়ে চালাচ্ছ নাকি? আরো জোরে।

বিপরীত দিকের দোলনাটা থেকে সেই মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল, এই, এই, আর না, আর না— আমার মাথা ঘুরছে! থামাও! থামাও!

সুন্দরী মেয়েকে ভয় দেখাতে কার না ইচ্ছে হয়। হোক না অচেনা! আমি লঘু গলায় ফের দোলনাওয়ালাদের উত্তেজিত করতে লাগলুম, না, না, থামাবে না! আরো জোরে!

মেয়েটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, না, খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি! দোলনা ছিঁড়ে পড়বে। আমি বললুম, অত ভয় পেলে নাগরদোলায় উঠতে গেছেন কেন?

এই থেকে আলাপ। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার ঘুরন্ত বাতাসের মধ্যে দেখা। এক দোলনায় আমরা চারজন, অন্য দোলনায় ওরা। আমাদের দোলনায় বন্ধু, তার স্ত্রী ও শ্যালকের সঙ্গে আমি। ও দোলনায় ওরা চারজন মেয়ে। সেই

মেয়েটির গায়ের রং কুচকুচে কালো। কিন্তু অমন রূপসী মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। সবার চোখ ঘুরে ঘুরে ঐ মেয়েটির দিকেই আসবে। কালো ঝক্‌ঝকে শরীর, তার পরনে সাদা শাড়ি, ব্লাউজ সাদা, চটি সাদা, হাতে ঘড়ির ব্যাণ্ডটাও সাদা, আর কোন অলঙ্কার নেই, গলায় শুধু একটা শ্বেত মুক্তামালা। কোনারকের সুরসুন্দরী মূর্তি যে দেখেছে, সেই শুধু মেয়েটির রূপ খানিকটা অনুমান করতে পারবে।

নাগরদোলা থামল, ওরা নেমে পড়তেই আমি বললুম, একি, হয়ে গেল? আর একবার ঘুরবেন না?

অচেনা মেয়েরা সব অনুরোধ বোঝে না। অনুরোধকে মনে করে 'আওয়াজ দেওয়া'। সেই মেয়েটি কিছু বলবার আগেই তার অন্য একটি সঙ্গিনী বার্লি খাওয়া চেহারার মেয়ে বলল, কি অসভ্য ছেলেগুলো। চল কৃষ্ণা—

নাম জানলুম কৃষ্ণা। আমার এক পিসিরও গায়ের রঙ ছিল খুব কালো—নাম ছিল পূর্ণিমা। অচেনা লোকজনের মধ্যে কেউ তাকে পূর্ণিমা বলে ডাকলে তিনি হেসে আকুল হতেন। বলতেন, অত চেঁচিয়ে ডাকিস না—লোকে পূর্ণিমা শুনে তাকিয়ে দেখবে—এল একখানা অমাবস্যা! পূর্ণিমা পিসিকে আমি ভালোবাসতুম; সেই থেকে আমি কালো রঙ অমাবস্যা ভালোবাসি!

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের রোগ নির্ণয়ের মতন শান্তিনিকেতন মেলায় সবাই কোনো-না-কোনো সূত্রে চেনা। বিকেলবেলা আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম তার অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে। সেই অধ্যাপকের আবার এক অন্য বন্ধুর ছোট বোনের চারজন বান্ধবী বেড়াতে এসেছে। ওরকম সম্পর্ক ধরলে পৃথিবীর সবাই যে সবাইকার বন্ধু-বান্ধবী, মানুষ সেটা ভুলে যায়। সুতরাং আমার বন্ধুর বন্ধুর ছোট বোনের চারজন বান্ধবীকে আমি মোটেই পর ভাবলুম না। আপন ভেবে বিনা দ্বিধায় আলাপ পরিচয় শুরু করে দিলুম। নাগরদোলার সেই চারজন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণা।

অনেক মেয়ের কালো রঙের জন্য লজ্জা থাকে।

কৃষ্ণার নেই. কৃষ্ণা অহংকারী। সে জানে, সব পুরুষই তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য। চায়ের কাপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, আপনি ভারী পাজী! নাগরদোলা অত জোরে চালাতে বলেছিলেন কেন?

আমি বললুম, চলুন, আমার সঙ্গে আবার চড়বেন আসুন। আমি ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি!

কৃষ্ণার সঙ্গিনী সেই বার্লি-খাওয়া মেয়েটি কড়া চোখে তাকাল। তাকে দেখলেই মনে হয়—ভবিষ্যতে সে কোনো মেয়ে-হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হবে। তা হোক, তাতে আমার কোনো ভয় নেই। আমার পেড়াপিড়ি ও

আগ্রহাতিশয্যে ফের দলবল মিলে সবাই এলুম নাগরদোলায় চাপতে। এখন তো আলাপ হয়ে গেছে, এখন আর দ্বিধা কি। নাগরদোলার প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে আমি কৃষ্ণার বাহু চেপে ভয় দেখিয়ে বললুম, এবার ফেলে দিই? দিই ফেলে? বাচ্চা বালিকার মতন কৃষ্ণা হাসতে হাসতে ভয় পেতে লাগল। আমি এমনিতে একটু বোকাসোকা লাজুক ধরনের ছেলে, কিন্তু কৃষ্ণার পাশে বসে হঠাৎ যে কি করে সেদিন অত চালু হয়ে গেলুম, কে জানে।

কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চেনা অনেকে বেরিয়ে পড়ল—যদিও কৃষ্ণা থাকে বালিগঞ্জে—আমি থাকি চরম উত্তর কলকাতায়। আমাকে 'নর্থ ক্যালকাটার ছেলে' বলে একবার ঠাট্টাও করলে ওরা। তবু ওর চেনা কয়েকজনকে আমি চিনি—আমার চেনা কয়েকজনকেও চেনে কৃষ্ণা। ঐ যে আগেই বলেছি—বন্ধুর বন্ধুতেই পৃথিবীটা ভর্তি।

শান্তিনিকেতনে আমি একদিন বেশি থেকে গেলুম, আগের দিন চলে গেল কৃষ্ণারা। যাবার আগে কৃষ্ণা ওর বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে গেল, আমিও দিলুম আমারটা। স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার আগে বেশ আন্তরিকভাবেই বলল, বাড়িতে আসবেন কিন্তু একদিন। ঠিক আসবেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলুম মাসাঞ্জোর, সেখান থেকে দুর্গাপুর ঘুরে কলকাতায় ফিরলুম সাতদিন বাদে। রাত্তির বেলা জি টি রোড ধরে বন্ধুর জিপে করে আসছিলুম, সেদিন চাঁদের আলো পৃথিবীটা ধুয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল কৃষ্ণার কথা।

কিন্তু কৃষ্ণাকে আমি কোনোদিন ফোন করিনি, চিঠি লিখিনি, দেখা করতেও যায়নি। কেন? ঠিক কারণটা আমি নিজেও জানি না। এই জন্যই তো গল্প লিখতে পারি না। গল্পে যা-যা মানায় তার কিছুই ঠিকমতো আমার মাথায় আসে না। শান্তিনিকেতনে অমন চমৎকার ভাবে যে রূপসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হলো, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়ে যে কলকাতায় আবার দেখা করতে বলল—তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয় আরো ঘনিষ্ট করাই তো স্বাভাবিক, গল্পেও সেই রকম হয়। কৃষ্ণার সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা এখনো আমার কাছে আছে অথচ একদিনও আর দেখা হয়নি।

আমি কেন দেখা করিনি? একজন মানুষের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। একই মানুষ কিন্তু মায়ের সামনে, অফিসের বড়োবাবুর সামনে, বন্ধুর সামনে, স্ত্রীর সামনে এবং প্রেমিকার সামনে, ছোট ভাইয়ের সামনে—সে বিভিন্ন, বলা যায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব। সেইরকম, যে মানুষ শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায় বেড়াচ্ছে আর যে কলকাতার ভিড়ের বাসে ঝুলছে—এরা দুজনেও

আলাদা। শান্তিনিকেতনে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোনো দ্বিধা ছিল না, বিনা ভূমিকায় অনায়াসেই লঘু চাপল্য এবং ইয়ারকি শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতায় অন্যরকম। শান্তিনিকেতনের সেই একখানা বিরাট আকাশ, লাল ধুলোর রাস্তা, মেলার হট্টগোল আর সোনাঝুরি গাছে হাওয়ার ঢেউ—এই পটভূমিকার বদলে ট্রামলাইন পেরিয়ে গলিতে ঢুকে বাড়ির নম্বর খুঁজে দরজার কলিংবেল বাজিয়ে বা কড়া নেড়ে—বৈঠকখানায় বসে কৃষ্ণার বাবা বা দাদার সঙ্গে অনেক পরিচয় করে তারপর কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু অন্যরকম হতে বাধ্য। টেলিফোন করেই বা কি বলব? বলব কোথাও দেখা করতে। নিয়ে যাব কোনো রেস্টুরেন্টে? যাকে নাগরদোলায় চাপার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলুম, তাকে কি ঠিক সেই একই ভাবে রেস্টুরেন্টে আসার আমন্ত্রণ জানান যায়? আমি ভেবে পাইনি। আমি আর দেখা করিনি কৃষ্ণার সঙ্গে।

দেখা করিনি, কিন্তু ক্ষীণ আশা করেছিলুম—কৃষ্ণা নিজে হয়তো আমাকে চিঠি লিখবে বা দেখা করবে। আমি জানতুম, তা অসম্ভব। কোনো মেয়ে যেচে কোনো ছেলেকে চিঠি লেখে নাকি আগে? ছেলেটিকে তার ঠিকানা দেওয়া সত্ত্বেও! আর, কৃষ্ণা ওরকম ঝলমলে রূপসী—তার নিশ্চয়ই অনেক অনুরাগী—তার বয়েই গেছে আমার মতন হেঁজিপেঁজিকে চিঠি লিখতে।

পৌষ মেলা হয় শীতকালে, তখন প্যান্ট-কোট পরার সময়। কৃষ্ণার ঠিকানা লেখা কাগজটা রয়ে গেল আমার কোটের পকেটে। শীত ফুরোলে কোটটা কাচতে না দিয়েই আলমারিতে তুলে রাখলুম। পরের বছর শীত যখন পড়ি পড়ি করছে, গরম জামাগুলো সব নামতে শুরু করছে—কোটের পকেট থেকে অন্য অনেক কাগজপত্রের সঙ্গে বেরুল সেই ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজটা। মনে পড়ল আবার কৃষ্ণার কথা, সেই কষ্টিপাথরের মতন উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, সেই শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ, মনে পড়ল সেই শ্বেতবসনা সুন্দরীকে। বুকের মধ্যে একটু টনটন করে উঠল। কৃষ্ণা খুব আন্তরিক ভাবে বলেছিল ওর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে। কেন দেখা করিনি। এখন কি করব। ধুৎ, কি পাগলামি। একবছর আগে দেখা হয়েছিল, এখন গিয়ে বলা যায়—আমি এসেছি, এতদিনে আমার সময় হলো।

কাগজটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। প্রত্যেক বছর প্রথম প্রথম শীতে কোটের পকেট থেকে সব কিছু বার করি—অনেক পুরোনো কাগজপত্র বাতিল হয়ে যায়, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা ফেলতে ইচ্ছে করে না। চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দিয়ে ভাবি, থাক না। পড়ে পড়ে কৃষ্ণার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার আমার মুখস্ত হয়ে গেছে—তবু ওর নিজের হাতের লেখাটা ফেলি না। এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার—এই একটা বাড়ির ঠিকানা আমার মুখস্ত—সে

বাড়িতে আমি কখনো যাইনি, সাত বছর কেটে গেছে, আর কখনো যাবও না। কৃষ্ণার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। অথচ ঐ নম্বর কোনোদিন আমি ডায়াল করিনি। ভুলে গিয়ে কত অসুবিধা হয়—কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কৃষ্ণার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আমার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী। এরকম অযৌক্তিক কাণ্ড করলে কি আর গল্প হয়?

বরং আর একটি অযৌক্তিক ব্যাপার আজকাল আমার মাথায় আসে। মাঝে মাঝে মনে হলো, কৃষ্ণা তো একবার ভাবলেও পারত—ওর ঠিকানা লেখা কাগজটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—ওর ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বরটা আমার মনে নেই—সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। কিন্তু ওকি আমায় একটা চিঠিও লিখতে পারত না? কিংবা টেলিফোন? এই ভেবে কৃষ্ণার ওপর প্রবল অভিমান হয় আমার।

৯

বাচ্চা সাধুজী চেঁচিয়ে উঠলেন, অলখ নিরঞ্জন। আমার বেশ মজা লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, সাধুজী, আপনার দেশ কোথায় ছিল? আপনি কি জাত?

সাধুজী ক্রুদ্ধ চোখ পাকিয়ে আমার দিকে অগ্নি হেনে বললেন, সারে দুনিয়া হামারা দেশ, ভগবানকা সন্তান...। গলার স্বরে এমন আন্তরিকতা ও তেজ যে আমার খুব তারিফ করতে ইচ্ছে করল।

আমি বললুম, বাঃ, বেশ, বেশ। চমৎকার। খুব ভালো বলেছেন।

সাধুটির বয়েস বারো কিংবা তেরো বছর। ইয়ার্কি করে বায়ো কি ত্যায়ো—বলছি না, সত্যিই ওর বেশি বয়েস নয়। মুখে দাড়িগোঁফের রেখাও ওঠেনি। সদ্য-কৈশোরের মসৃণ চামড়া, ঝকঝকে চোখ—এই বয়সের প্রতিটি ছেলে ও মেয়েকে যে রকম সুন্দর দেখায়,—সাধুটিও সেইরকম সুন্দর, শুধু মাথার চুলে ধুলো মেখে জট পাকিয়েছে, সারা গায়ে ছাই মাখা, পরনে একটি নেংটি—এইটুকুই সাধুত্বের চিহ্ন। গঙ্গার পাড়ে, নিমতলা শ্মশানঘাটের পাশে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে। আট-দশজন ভক্তও জুটেছে চারধারে। ভক্তদের কাছে ওর নাম বাচ্চা মহারাজ।

আমরা কয়েক বন্ধু প্রায়ই শ্মশানে বেড়াতে যাই। মড়া পোড়ানো দেখতে আমাদের বেশ ভালো লাগে। তাছাড়া জায়গাটা ভালোভাবে চিনে রাখাও হচ্ছে। এখন পায়ে হেঁটে আসছি, যেদিন চারজন মানুষের কাঁধে চেপে আসব—সেদিন

যেন তাদের বলে দিতে পারি, ওহে, ডানদিকের ঐ চিতাটা নিও না, ওটাতে এমন হু-হু করে হাওয়া লাগে যে, খুব ট্রাবল দেয়, প্রায়ই নিভে যেতে চায়। তার পরের চিতাটার পাশ দিয়েও খুব লোকজনের আনাগোনা। তার চেয়ে বাঁ দিকের কোণের এই চিতাটা নাও—এটা বেশ নিরিবিলি, গোলমাল কম, এটায় বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আরামে পুড়তে পারব। এদিকটায় আঁচ এত বেশি যে সব চোখের জল নিমেষে বাষ্প হয়ে যায়।

শ্মশানের পাশে, গঙ্গার ধারে কয়েকজন সাধুর ধুনি জ্বলে। গাঁজা টানার লোভে সেদিকে গিয়েও আমরা মাঝে মাঝে বসি। যাদের বুকের মধ্যে সর্দি কিংবা শ্লেষ্মা নেই, তাদের পক্ষে গাঁজা বেশ উপকারী। এই সব সাধুদেরও আমার খুব ভালো লাগে—বস্তুত সমস্ত গৃহত্যাগী মানুষ সম্পর্কেই আমার দুর্বলতা আছে।

'অলখ নিরঞ্জন'—রব শুনেই আমি বাচ্চা মহারাজের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ছেলেবেলায় 'বন্দী-বীর' কবিতায় পড়েছি, 'অলখ নিরঞ্জন, মহারব উঠে, বন্ধন টুটে, ভয় করে ভঞ্জন...'। আমার ধারণা হলো, ঐ বাচ্চা সাধুটিও 'বন্দী-বীর' কবিতা পড়েই 'অলখ নিরঞ্জন' কথাটা শিখেছে। ওকে কোনক্রমেই পাঞ্জাবি মনে হয় না, আর শিখের বাচ্চা গঙ্গার ধারে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গাঁজা খাবে কেন? ওঁদের ধর্মচর্চা তো এ রকম নয়।

বাচ্চাটার তেজ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলুম। ওকে ঘিরে যে আট-দশজন ভক্ত বসে আছে—তারা সবাই মধ্যবয়স্ক এবং প্রৌঢ়। তাদের সকলেরই গাঁজা টানাই অন্যতম মতলব হলেও, তারা কেউ নাস্তিক নয়, তারা ঐটুকু বাচ্চা সাধুকেও 'আপনি' সম্বোধন করছিল, তার হুকুম মতন ধুনি সজীব রাখছে, জল আনছে গঙ্গা থেকে, কাঠ জোগাড় করেছে। বাচ্চা মহারাজ অবলীলাক্রমে হুকুম করছে ওদের, ধমকাচ্ছেও মাঝে মাঝে। আমি ধর্মদ্রোহী নই, অধিকাংশ শহুরে মানুষের মতন আমি ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন এবং ধর্মপ্রবণ মানুষদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার কখনো জাগে না। বাচ্চা সাধুটিকে নিয়ে মজা করার লোভও আমার হয়নি। বরং আমি বিস্মিতভাবে ওকে লক্ষ্য করছিলুম। অলৌকিক বা দৈব কোনো শক্তি থাকুক না থাকুক—ঐ বাচ্চাটি যে অনেক বিষয়ে অসাধারণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বয়সে এমন ব্যক্তিত্ব সে অর্জন করল কোথা থেকে? প্রতিটি কথার অমন চমকপ্রদ উত্তর দেওয়া সে শিখল কি করে?

আমার এক ভাগ্নে আছে, তারও বয়েস ঐরকম, তেরো-চোদ্দ হবে। ইংরাজি ইস্কুলে পড়ে, ফরফর করে ইংরেজি বলে—কথায় কথায় আমার উচ্চারণে ভুল ধরে দেয়। ইতিহাস ভূগোলে তার প্রখর জ্ঞান, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কোথায়—এক

নিমেষে সে ম্যাপে দেখিয়ে দিতে পারে—কিন্তু তাকে যদি চৌরঙ্গিতে একা ছেড়ে দেওয়া হয়, সে কিছুতেই রাস্তা চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। একা ঘরে শুতে দিলে তার ভূতের ভয় করে। আর এই বাচ্চা মহারাজ, রাতের পর রাত খোলা আকাশের নীচে কাটাচ্ছে—দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে আন্তরিক বিশ্বাসে বলে সারা দুনিয়া আমার দেশ। গায়ে ছাই মেখে, মাথায় জটা রাখলেই কি এসব শেখা যায়?

আমি বাচ্চা সাধুর একেবারে গা ঘেঁসে বসলুম। বাঙালি ছেলে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই—যদিও খুব হিন্দী বলার চেষ্টা করছে—বোধ হয় ওর ধারণা হয়েছে, সাধু হলেই হিন্দী বলতে হয়। মাঝে মাঝে বাংলা বলে ফেলছে, তাতে স্পষ্ট বীরভূম জেলার টান। 'অলখ নিরঞ্জন' কথাটা খুব ভালো লেগেছে বলেই হয়তো মাঝে মাঝে ওইটা বলে চেঁচিয়ে উঠছে, দু-একবার 'বোম মহাদেব' জুড়ে দিচ্ছে।

লাল ন্যাকড়া কলকেতে জড়িয়ে বাচ্চা মহারাজ বেশ জুৎ করে ধরল। চোখ বুজে বিড়বিড় করে কি যেন বলে আগুনে কিছুটা গঙ্গা জলের ছিটে দিল। তারপর পুনরায় অলখ নিরঞ্জন, বোম বোম মহাদেব উচ্চারণ করে গাঁজার কলকে ঠোঁটে ছোঁয়ালো—বাপস, সে কি টান। আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। টানের চোটে গাল তুবড়ে গেল, কলকের মাথায় দপ দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। টান শেষ হলে আমার দিকে কলকেটা এগিয়ে ধরা গলায় বলল, লে বাচ্চা। ভক্তিভরে কলকেটা নিয়ে আমিও যথাসাধ্য টান দিয়ে আমার পাশের গুরুভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে বললুম, লে ভাইয়া।

গাঁজার টানে আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বাচ্চা মহারাজকে বললুম, সাধুজী, আপনাকে আমি বীরভূম জেলায় দেখেছি!

চমকে উঠে ও আমার দিকে তাকালে। তারপর ফের উদাসীন গলায় বলল, হো সক্তা। গিয়া উধার!

—আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন?

—কাশী।

—তার আগে কোথায় ছিলেন?

—কেদার-বদ্রি।

—কেদার-বদ্রি? সত্যি? কতদিন ছিলেন?

বাংলা সাহিত্যে কেদার-বদ্রি ভ্রমণকাহিনীর অভাব নেই। সেইসব ভ্রমণকাহিনী পড়া বিদ্যে থেকে আমি সাধুটির বিবরণ শুনে বুঝতে পারলুম, সে সত্যি কথাই বলছে। ফের জিজ্ঞেস করলুম কবে থেকে সাধু হলেন? বীরভূমে আপনার বাড়ি ছিল নিশ্চয়ই—বুঝতে পারছি। আমি বীরভূমে প্রায়ই যাই, ছ'সাত বছর আগে

বাচ্চা অবস্থায় আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

—নেহি!

—কাঁহে দোঁখা দেতা হায় মহারাজ? ইস্কুলে পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে ভেগেছিলেন?

—নেহি! ঝুটাবাত।

—তবে, মা বুঝি খুব মেরেছিল একদিন? কিংবা কোনো কিছু চুরি করেছিলেন? ধরা পড়ে গিয়ে, ভয়ে পালিয়ে ছিলেন?

—বিলকুল ঝুট, মিথ্যে কথা।

তেজস্বী বাচ্চা মহারাজের মুখ এক মুহূর্তের জন্য একটু মলিন হয়ে গেল! চোখের দৃষ্টি দূরে চলে গেল। অভিমানী গলায় বলল, আমার মায়ের তো পান বসন্ত হলে—আস্তে আস্তে পুরো গল্পটা শুনলাম। স্মল পকসে ওর বাবা, মা, দুই বোন—এক মাসের মধ্যে মারা যায়। ওর আর আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। ন'বছর বয়সে ওর গ্রামের এক সম্পন্ন ব্যক্তি ওকে বাড়ির চাকর রেখেছিল। দু'এক মাস কাজ করেছেও সেখানে—বিষম খাটাত তারা, খেতে দিত না পেট ভরে। গ্রামের শ্মশানে এক সাধুর আস্তানা ছিল—সেই সাধুই ওকে পছন্দ করে চেলা বানিয়ে নিলেন তখন। তারপর চারবছর ধরে সাধুটির সঙ্গে বহু জায়গায় ঘুরেছে, এখন সেই সাধুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে নিজেই স্বাধীন সাধু হয়েছে! এখান থেকে যাবে গঙ্গাসাগরের মেলায়।

ছেলেটিকে আমার বেশ ভালো লাগল। বাপ-মা অনাথ, হয়তো সারাজীবন কারুর বাড়ির চাকর হয়েই থাকতে হতো। কিংবা চোর-জোচ্চোর হওয়াও অসম্ভব ছিল না। তার বদলে এই তো বেশ স্বাধীন জীবন পেয়েছে। কোনোদিন ঈশ্বরকে পাক বা না পাক—স্বাধীনতা তো পেয়েছে। বাড়ির সমস্যা নেই, পোশাকের সমস্যা নেই, শুধু দুটি খাওয়া—তা ভারতবর্ষে সাধুদের এখনো খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়নি। আরো কয়েকটা কথা বলে বুঝতে পারলুম, ছেলেটার মধ্যে ঘরে ফেরার ইচ্ছে একেবারেই মরে গেছে, সুতরাং বিশেষ কোনো লোভ নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এই খোলা আকাশ আর ভ্রমণের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। ক্ষতি তো কিছু হয়নি, এই রকম অবস্থায় থেকেও কি চমৎকার ঝকঝকে স্বাস্থ্য।

গাঁজা খাওয়ার পর বেশি করে দুধ খেতে হয় নাকি। ছেলেটির প্রতি মায়াবশত আমি বললুম, বাচ্চা মহারাজ, আপনি একটু দুধ খাবেন? সে অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বলল, নেহি। আমি বললুম, আপনাকে আমার কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে, মাখন রুটি খাবেন?

যেন খুব খারাপ জিনিসের নাম করছি—এইভাবে আবার বলল, নেহি। উসব

নেহি খাতা হায়! আমি ফের বললুম তবে কিছু ছাতু খাবেন? তাতেও তার আপত্তি। কচুরি? না। এবার আমার একটু রাগ হলো। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, এই খোকা বেশি চালাকি হচ্ছে, না? একটা কিছু খাওয়াবো বলছি, গ্রাহ্যই হচ্ছে না? ঢং? এক গাঁট্টা মেরে সাধুগিরি ঘুচিয়ে দেব।

আমার ধমকে কিন্তু বাচ্চা সাধু রেগে উঠল না। একদৃষ্টে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে লাজুক গলায় বলল জিলিপি খিলায় গা? আভি গরম ভাজতা হায়। একঠো টাকা দেও। একঠো টাকা—

আমি হাসতে হাসতে ওকে একটা টাকা দিতেই ও সাধুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিরিং করে লাফিয়ে আগুন ডিঙিয়ে কোথায় ছুটে গেল। ফিরে এল একটু বাদেই—হাতে এক ঠোঙা জিলিপি নিয়ে। আমাদের সবাইকে একটু একটু টুকরো ভেঙে দিল। তারপর ঠোঙা হাতে পিছন ফিরে বসে জিলিপি খেতে লাগল। আগে রসটা টেনে নিয়ে তারপর একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। কি খুশি।

১০

মা জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁরে, কাল শান্তাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

আমি বই হাতে অন্যমনস্ক, তবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই বুঝলাম মা আসছেন আমার ঘরে এবং এসে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করবেন। মা তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বলল শান্তা?

বইয়ের যে একেবারে শেষ লাইনে এসে চোখ থমকে আছে, সুতরাং সেই লাইনটা না পড়ে উত্তর দেওয়া যায় না। শেষ করে, বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে উত্তর দিলাম, শান্তামাসির সঙ্গে দেখাই হলো না। বড়ো মেসো শান্তামাসি টালিগঞ্জ গেছেন শুনলুম, বাড়িতে আর কেউ নেই, ছোটকু বাথরুমে ছিল, আর নবনীতাকে দেখলুম তার প্রাইভেট টিউটর পড়াচ্ছে—তখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না। তাই আমি বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে চলে এলাম। আমার একটা কাজ ছিল।

—শান্তার শাশুড়ি ছিল না?

—দেখলাম না তো!

—আজ তাহলে একবার যাস।

ততক্ষণ আমি আবার বইটা খুলেছি, পরের পাতার প্রথম লাইনে চোখ নিবদ্ধ, উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, দেখি যদি পারি তো একবার যাব আজ আবার—

—শান্তার টেলিফোনটা খারাপ, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, তুই

একটু জিজ্ঞেস করে আসিস আজ, ওর কি মত, সেই বুঝে—

—যাব যাব, বলছি তো সময় পেলে আজ যাব—

আজ যে যাব তা বহুক্ষণ আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি সিঁড়িতে মার পায়ের শব্দ পেয়েই—যত কাজই থাক আজ যাব। কেননা কাল আমি সত্যিই যাইনি। ওটা মিথ্যা কথা। শান্তামাসির মেয়ে নবনীতার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ির দেবনাথের বিয়ের সম্বন্ধ মা প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। দেবনাথের বাবার চিনির কল আছে; দেবনাথ নিজেও জার্মানি থেকে ও ব্যাপারে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা তার। খুবই সুপাত্র যাকে বলে। এ বিয়ে হলে শান্তামাসিও আনন্দে আটখানা হবে, আমারও কারণ আছে, স্যাকারিন দিয়ে চা খেয়ে খেয়ে জিভ তেতো হয়ে গেল, এ বিয়ে হলে নবনীতার শ্বশুরবাড়ি গেলে নিশ্চয়ই চিনি দেওয়া চা খাওয়া যাবে সব সময়। ও বাড়িতে নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন চায়েতেই চিনি থাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা সব কাজ ফেলে শান্তামাসির বাড়িতে গেলুম। শান্তামাসি বাড়ি ছিলেন, শান্তামাসি এই সম্বন্ধের কথা শুনে খুব খুশি—নবনীতাকে আমি বিয়ের কথা বলে রাগালুম। আমার আগের দিন না আসায় কোনো ক্ষতি হয়নি, মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথা বলাটা ধরা পড়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। মা মাসিতে এমন কথা হবে যে আগের দিন আমি গিয়েছিলুম কি যাইনি—সে প্রসঙ্গই উঠবে না। কিন্তু আমার মিথ্যে কথায় একটু খুঁত রয়ে গেল।

শান্তামাসির বাড়িতে এর আগে গিয়েছিলুম মাস দুয়েক আগে, সেদিন ঘরভর্তি সবাই বসে গল্প করছিল। এমন সময় ঝি এসে নবনীতাকে বলল, দিদিমণি—তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন। আড্ডার মাঝপথে নবনীতাকে উঠে যেতে হলো, শুনলাম পরীক্ষার আগের চারমাস ওকে ওদের কলেজের একজন অধ্যাপক বাড়িতে পড়াচ্ছেন—নবনীতা বরাবরই ইংরেজিতে একটু কাঁচা। সেদিন উঁকি মেরে দেখেছিলাম, আমারই বয়েসী অ্যাংরি ইয়ংম্যান টাইপের এক ছোকরা ওর সেই অধ্যাপক।

সুতরাং, মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলবার সময় পরিবেশ ফোটাতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয়নি। শান্তামাসির ভাসুরের ক্যান্সার হয়েছে, তাঁকে দেখতে প্রায়ই ওরা টালিগঞ্জে যান। সুতরাং শান্তামাসির টালিগঞ্জে যাওয়ার কথা শুনলে মা অবিশ্বাস করবেন না। ছোটকুর স্বভাব অফিস থেকে ফিরেই ঘণ্টাখানেক বাথরুমে কাটানো—দিনে তিন-চারবার চান করা ওর বাতিক। আর সন্ধ্যাবেলা নবনীতার অধ্যাপক তো পড়াতে রোজই আসে। শান্তামাসির শাশুড়িও প্রায় রোজ বিকেলেই মহানির্বাণ মঠে কথকতা শুনতে যান। সুতরাং বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার

অছিলায় আমি চট করে মিথ্যে কথাটা বানিয়েছিলাম। তবু একটা খুঁত রয়ে গেল। পরের দিন শান্তামাসির বাড়িতে গিয়ে কথায় কথায় জানতে পারা গেল, দিন পনের আগে নবনীতার সেই অধ্যাপককে নাকি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীন অধ্যাপকটি উগ্র আধুনিক এবং উদ্ধত, বাড়ির সবার সামনে সিগারেট খায়, এমনকি দেশলাই চেয়েছে—এই অপবাধে তার চাকরি গেছে। শান্তামাসি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বুড়োসুড়ো ধীর-স্থিব আর কোনো অধ্যাপককে জোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথাটায় খুঁত থেকে গেল—নবনীতা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পডছে। তা যাকগে, আসল কাজটা তো ঠিকঠাকই হচ্ছে—সামান্য একটা মিথ্যে কথায় কি আসে যায়।

কিন্তু মায়েব কাছে ঐ মিথ্যে কথাটা আমি কেন বললুম? যদি বলতুম, না মা, কাল শান্তামাসিদের বাড়িতে যেতে পাবিনি, আজ যাব—তাহলে কি এমন ক্ষতি হতো? মা দু'তিন দিন ধরেই যেতে বলেছিলেন, আমি রোজই যাব যাব করে পাশ কাটাচ্ছিলুম, সুতরাং তিনদিনের দিন ঐ মিথ্যে কথা এবং চতুর্থ দিনের দিন সত্যিই যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় দিনেও ঐ মিথ্যেটা না বলাই তো আমার উচিত ছিল। তবে কেন?

—তারপর ইন্দ্রনাথ স্টেশনেব প্লাটফর্মে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—তাই নাকি? তাবপব?

—প্লাটফর্মেব বিশেস লোকজন নেই, কয়েকটা ছোকরা একদিকে জটলা করছিল— তাদের চেহাবাও বিশেষ সুবিধের নয়—ইন্দ্রনাথেব ঐ অতবড জোয়ান শবীর আমাব পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। মাথায় জল ছেটানো দরকার —অথচ ওকে ফেলে রেখে যেতে পারছি না।

—কেন, তাতে কি হবে?

—ইন্দ্রনাথের পকেটে চাব হাজার টাকা ছিল, ও আমাকে আগেই বলেছিল —সুতরাং ওকে একা ফেলে যাওয়া, আব সেই ছোকবাগুলোব রকমসকম.

—তখন কি করলি?

—ইন্দ্রনাথেব ওপর চোখ বেখে একটু দরে ঘোবাঘুরি কবে অতিকষ্টে একটা কুলিকে দেখতে পেলুম, ছোট স্টেশন তো .. কুলিটাকে দিয়ে জল আনালুম এক বালতি... তারপর পৌনে দু'ঘন্টা বসে থাকার পব পবের ট্রেন যখন এল।

ইন্দ্রনাথ এবং আমার—দু'জনের বন্ধু এমন একজনকে ঘটনাটা শোনাচ্ছিলাম। ঘটনাটি সবই সত্যি। ইন্দ্রনাথেব একদিন সত্যিই খুব শরীর খারাপ হয়েছিল এবং অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল রাত্রিবেলায় প্লাটফর্মে। কিন্তু বলবার সময় কেন যে একটু বদলে গেল—কিছুই বুঝি না। ইন্দ্রনাথ বলেছিল ওর পকেটে দেড় হাজার টাকা

আছে। দেড় হাজার টাকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবু সেটাকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা বলার ইচ্ছে আমার কেন হলো; আমি নিজেই জানি না। পরের ট্রেন এসেছিল আধঘণ্টা বাদে—আমি সেটাকে বাড়িয়ে করলুম পৌনে দু'ঘণ্টা। কেন? এমনকি আধঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টাও নয়, পৌনে দু'ঘণ্টা। ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেবার জন্য এই মিথ্যের অবতারণা? পকেটে দেড় হাজার টাকা নিয়ে নির্জন প্লাটফর্মে এক বন্ধুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই তো স্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—তাকে আরো বাড়িয়ে লাভ কি? তাহলে কি সব সময় যা ঘটে—তারই পুনরুক্তি করতে একঘেয়ে লাগে বলেই এইসব নির্দোষ মিথ্যে বলতে সাধ হয়?

—রতনটা একেবারে বাজে ছেলে। কোনো কথা দিয়ে কথা রাখে না—বড়ো বৌদি বললেন।

—অফিসেও কেউ ওকে গ্রাহ্য করে না শুনেছি। মুখেই শুধু লম্বাচওড়া কথা, কাজের বেলা কিছু না—এবার ছোট বৌদি।

পারিবারিক মহলে আমার মামাতো ভাই রতনের খুব নিন্দে হচ্ছিল। আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। রতনকে আমার খুব ভালো লাগে, চমৎকার দিলখোলা মানুষ, সরলভাবে হা-হা করে হাসে, কি চমৎকার গান গায়। রতনের দায়িত্বজ্ঞান একটু কম, সময়ের ঠিক রাখে না, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না—কিন্তু একই মানুষ ভালো গান গাইবে, আবার সময়েরও ঠিক রাখার আদর্শ দায়িত্ব পালন হবে—এতটা আশা করা যায় না। রতনের আমি ভক্ত। সুতরাং আমি প্রাণপণে বৌদিদের নিন্দের প্রতিবাদ করতে লাগলুম। কিন্তু বৌদিরা ওসব গান-টানের দিকেই যাচ্ছেন না। শুধু ঐ দায়িত্বজ্ঞানটার ওপরই সব জোর। তখন আমি বললাম, রতনের দায়িত্বজ্ঞান নেই কে বলল? গত বছর সেই যে আমরা পুরী গেলুম—রতনই তো আমাদের বাড়ি ঠিক করে দিল।

বড়ো বৌদি বললেন, রতন বাড়ি ঠিক করে দিয়েছে? আমি বিশ্বাস করি না। আমি বললুম, সত্যিই! রতনের কথাতেই তো আমরা দীঘা না গিয়ে পুরী গেলুম। রতন বাড়ি ঠিক করে দেবে বলেছিল—আমিও প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করিনি—কিন্তু রতন ওর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে রেখেছিল—স্বর্গদ্বারে চমৎকার বাড়ি—ভাড়া লাগাল না—এমনকি পৌঁছে দেখলাম আমাদের জন্য খাবারদাবার রেডি। রতনদের অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি—

—সত্যি বলছ?

রতনের নিন্দে থামাবার জন্য রতনের দায়িত্বজ্ঞানের এই কাহিনীটা বলার প্রেরণা আমার ভেতর থেকেই কে যেন আমায় দিয়ে দিল। ঘটনার কাঠামোটা তো সত্যিই। আমরা ঠিকই পুরী গিয়েছিলাম, রতন ছিল আমাদের সঙ্গে—ঠিক

করেছিলাম কোনো হোটেলে থাকব। কিন্তু স্টেশনেই রতনের অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো—তিনি কলকাতায় ফিরছেন সপরিবারে। তিনিই উৎসাহিত হয়ে বললেন, স্বর্গদ্বারে একটা বাড়ি তিনি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দু'মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে একমাসের পরই তিনি ফিরে যাচ্ছেন—সুতরাং সেই বাড়িতে আমরা অনায়াসে একমাস থাকতে পারি। বাকি অংশটা রং চড়ানো হলেও রতনের জন্যই তো আমরা বাড়িটা পেয়েছিলাম।

ছোট বৌদি বললেন, সত্যি, রতন পুরীতে বাড়ি যোগাড় করে দিতে পারে নাকি—আমার দাদা-বৌদি পুরী যাবেন বলেছিলেন—তা হলে রতনকে বলতে হবে তো!

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ, এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি। আজ বিকেলেই রতনের কাছে ছুটতে হবে। রতনের প্রশংসা করতে গিয়ে আমিই তার বিপদের কারণ ঘটালাম।

এইসব অকারণ মিথ্যে অকারণেই অনেক সময় ধরা পড়ে যায়।

প্রথম ঘটনায় আবার ফিরে আসি। শান্তামাসির বাড়ির টেলিফোন আবার ঠিক হয়ে গেল, আমার আর দায়িত্ব রইল না কিছুই। নবনীতার বিয়ে আমার মায়ের উদ্যোগেই প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় একদিন মা ট্যাক্সিতে আসতে আসতে দেখলেন কলেজের রাস্তায় নবনীতা আরো দুটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলের সঙ্গে খুব হাসি-গল্প করছে। এতে মনে করার কিছু নেই—আজকালকার কলেজের মেয়েরা বাইরে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে, গল্প করবে—এ তো স্বাভাবিক। মা বাড়ি ফিরেই হাসতে হাসতে বললেন, নবীনকে রাস্তায় দেখলাম, খুব বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে আমি আর ডাকিনি! তারপর মা শান্তিমাসিকে ফোন করলেন—এ কথা সে কথা সাত কাহনের পর মা জিজ্ঞেস করলেন নবনীতা বাড়ি ফিরেছে কিনা। ফিরেছে শুনে মা টেলিফোনেই ফিসফিসিয়ে বললেন, দেখ শান্তা নবীনকে যখন মাস্টার এসে পড়ায়—তখন তোরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাস্ না! আজকালকার ছেলেমেয়ে—যতই ভালো হোক...নবীন অবশ্য সোনার টুকরো মেয়ে—কিন্তু বলা তো যায় না—কখন কি বিপদ হয়ে যায়—খবরের কাগজে যা এক একখানা খবর মাঝে মাঝে বেরোয়।

শান্তামাসি অবাক হয়ে বললেন, নবীনকে তো এখন আর কেউ পড়ায় না।

—কেন, এই যে নীলু দেখে এল গত সোমবার?

—গত সোমবার? অসম্ভব!

—হ্যাঁ, নীলু নিজের চোখে দেখে এসেছে—সেই মাস্টার নবীনকে পড়াচ্ছে, তোরা তখন টালিগঞ্জে গিয়েছিলি—

তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আবার সেই দৃশ্য, আমি আমার ঘর, হাতে বই, আমার সামনে রাশিয়া আমেরিকার মতন দুই বিশাল শক্তি, মা আর মাসিমা। শান্তামাসি : নীল তুই নিজের চোখে দেখেছিলি? মা : তুই না দেখে থাকলে শুধু শুধু কেন মিথ্যে কথা বললি? আমি আর কি উত্তর দেব? কোনো যুক্তি নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই—আমি যে এমনিই বলেছিলাম—সে কথা তো ওদের বলা যায় না! সুতরাং বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে হাসতে হাসতে বললুম, কি যে হয়েছ তোমরা, একটু ইয়ার্কিও বোঝ না?

১১

কিরে তুই এত বড়ো হয়ে গেছিস?

স্থলপদ্মের পাপড়ির মতন মুখের রং করে স্বপ্না বলল, বাঃ বড়ো হবো না? সময় বুঝি থেমে থাকবে?

শুধু চেহারাতেই বড়ো হয়নি স্বপ্না, শুধু যে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখছি তাই নয়, মনের দিক থেকেও অনেক পরিণত হয়েছে। নইলে, 'সময় বুঝি থেমে থাকবে'—এ রকম কথাও ওর মুখে অপ্রত্যাশিত। শেষবার যখন ওকে দেখেছিলাম চাইবাসায়, বছর আষ্টেক আগে, তখন ওর মাথায় ঝোলানো লম্বা বেণী, বাঘের গায়ের মতন হলদে-কালো ডোরা কাটা ফ্রক, সব সময় চঞ্চল ছটফটে, কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবার আগে একটুও চিন্তা করতে চাইত না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, কি জানি, জানি না! তখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করত স্বপ্না তুই এত ছুটোছুটি করিস কেন রে? একটু আস্তে আস্তে হাঁটতে পারিস না? সে কথাতেও স্বপ্নার উত্তর—কি জানি, জানি না।

সেই স্বপ্না এম. এ. পড়তে এসেছে কলকাতায়, এই বয়সের মেয়েরা কত উপন্যাসের নায়িকা হয়—স্বপ্নাও নায়িকা হবার যোগ্য হয়ে উঠেছে, যুবতীসুলভ মধুর-মন্থর হাঁটার ভঙ্গি, ঠাট্টা করলে মুখের রং গোলাপি হয়ে আসে, কথা বলতে বলতে চোখ দুটি বেশি উজ্জ্বল আর নিষ্পলক করে রাখে।

সময় বুঝি থেমে থাকবে?

ঠিকই বলেছে স্বপ্না, সময় থেমে থাকে না—এই আট বছরে আমিও তো কত বদলেছি—আগে ট্রামে বাসে টাকা ভাঙিয়ে খুচরো গুণতুম না, আজকাল একপলকে দেখে নিই অচল বা কম দিয়েছে কিনা, আগে কোথাও নেমন্তন্ন থাকলে সেদিন ইচ্ছে করে দাড়ি না কামিয়ে যেতুম—আজকাল প্রত্যেক দিন সকালে দাড়ি

কামাই বিনা কারণে, এখন কারুকে জিভ-ভেংচি কাটার কথা ভাবতেই পারি না। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো বন্ধুকে দেখলেও নেমে পড়ি না—অফিসে লেট হয়ে যাচ্ছে ভেবে। সত্যি, সময় থেমে থাকে না, সবাই বদলায়, আমিও বদলেছি, স্বপ্নাও তো বদলাবেই। কিন্তু আটবছর আগে দেখা আর পরের দেখায় খুব সহজে মেলানো যায় না। এই যুবতীকে আমার খুবই অচেনা লাগল, আমার চোখে সেই তেরো বছর বয়সের ছটফটে মেয়েটিই ভাসছে। মেয়েদের বোধহয় এরকম অসুবিধ হয় না। ওরা সহজে মানিয়ে নিতে পারে। আট বছরে আমার চেহারাও নিশ্চয়ই অনেক বদলেছে—স্বপ্না সেসব উল্লেখও করল না। কলেজ স্ট্রিটে ইউনিভার্সিটির সামনে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এক দঙ্গল মেয়ের ভিড় থেকে একজন আমার সামনে এগিয়ে এসে বলেছিল, এই নীলুদা—এখানে কি করছ?

প্রথমটায় তো আমি চিনতেই পারিনি। চাইবাসার সাদামাঠা কিশোরী কলকাতার সব স্টাইল কি করে এত তাড়াতাড়ি শিখে নিল? শাড়ি-ব্লাউজ-জুতো সবই নিখুঁত ম্যাচ করা, ঠোঁটের হাসিটুকু পর্যন্ত।

জিজ্ঞেস করলুম, কবে এলি? কোথায় থাকিস? মেজমামা এখন কোথায় পোস্টেড? চাইবাসা ছাড়ল কবে?

স্বপ্না এখানে মেয়েদের হোস্টেলে থাকে, ওর বাবা বদলি হয়ে গেছেন বিন্ধ্যাচলে। চাইবাসার মেয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই হোস্টেলের রাস্তা চিনিস্ তো? ঠিক যেতে পারবি, না আমি পৌঁছে দেব?

স্বপ্না হেসে বলল, কি যে বলো! এক মাস হলো এসেছি, রাস্তা চিনতে পারব না?

আমারই ভুল, যে মেয়ে কলকাতার পোশাক ও হাসির ফ্যাশান এত সহজে জেনে নিয়েছে, সে আর ট্রাম-বাসেব রাস্তা চিনতে পারবে না? অবাস্তব। কিন্তু আমার মনে পড়েছিল বোধহয়, সম্বলপুরে বেড়াতে গিয়ে পাহাড় থেকে ফিরছি আমরা বিকেলবেলা, পথে সন্ধে হয়ে এসেছিল, আমরা ছিলুম চার-পাঁচজন —সর্টকার্ট করার জন্য আমরা একটা জঙ্গলের রাস্তা ধরেছিলুম। সেই অন্ধকার জঙ্গল—অমন ছটফটে মেয়ে স্বপ্না সেও আমার হাত চেপে ধরে ভীতু-ভীতু গলায় বলেছিল, নীলুদা, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো? পৌঁছতে পারব তো?

আমি সেই কথা ভাবছিলুম। কিন্তু, একথা মনে পড়েনি, একটা বয়েস আসে —যখন মেয়েরা ইচ্ছে করেই একা অন্ধকার অরণ্যে প্রবেশ করতে চায়। ঠিক জায়গায় পৌঁছুবার বদলে পথ হারানোতেই তখন বেশি আনন্দ।

যেদিকে ওর হোস্টেল, তার উল্টোদিকে যাবার জন্য স্বপ্না তার সঙ্গিনীদের

উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। আমি বললুম, কলকাতায় তো আগে কখনো একলা থাকিস নি, সাবধানে থাকিস কিন্তু।

এটাও আমারই ভুল—সেই আট বছর আগে, নদীর ধারে গেলে যেমন কিশোরী স্বপ্নাকে বলতাম, এই তুই সাঁতার জানিস না—দেখিস, বেশি জলের ধারে যাসনি একা। স্বপ্না সাঁতার জানত না—তাই তাকে আমি জলের ধারে যেতে বারণ করেছিলুম। কিন্তু তা বলে কোনো যুবতীকে কি আর 'ডোন্ট গো নীয়ার দা ওয়াটার' বলা যায়! যুবতীরা তো জলের ধারে যাবেই—না গেলে তাদের মানায় না। আর এই কলকাতার সমুদ্রে সাঁতার না জেনেই ঝাঁপ দেওয়া যায়।

আমার কথা শুনে স্বপ্না ফিরে তাকাল। আমি যে ওর সাক্ষাৎ মাসতুতো দাদা —স্বপ্না তা গ্রাহ্যই করল না, অপর যুবকদের দিকে মেয়েরা যেরকম ভাব নিয়ে তাকায়, আমার দিকেও সেইরকম ভাবে তাকিয়ে বলল, ইস, খুব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে!

মাঝে মাঝে ছোটমাসির বাড়িতে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়। সব সময় ব্যস্ত, বেশিক্ষণ সেখানেও থাকতে চায় না। ছোট মাসি ওকে বলেছিলেন, হোস্টেল ছেড়ে তাঁর বাড়িতে এসে থাকতে। স্বপ্না কিছুতেই রাজি নয়। হস্টেলে কত আনন্দ, কত বন্ধু—সেসব ছেড়ে এই ধাবধাড়াগোবিন্দপুর টালিগঞ্জে এসে থাকতে ওর বয়ে গেছে! আমি যখন চাইবাসায় স্বপ্নাদের বাড়িতে গিয়ে মাস দুয়েক ছিলাম—স্বপ্না সব সময় আমার সঙ্গে থাকত, কত গল্প। আমার প্রতিটি জিনিস আর কথাবার্তায় ওর ছিল পরম শ্রদ্ধা আর মনোযোগ। এখন কত দূরত্ব, এখন ওর কত রহস্য, আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না!

ছোট মাসির বাড়িতে স্বপ্না একদিন বলল, নীলুদা তুমি বড্ড কিপ্টে হয়ে গেছ আজকাল। একদিনও খাওয়ালে না, সিনেমা দেখালে না। এই তো 'ডক্টর জিভাগো' বইটা দেখাও না আমাকে।

আমি বললুম, তোরই তো পাত্তা পাওয়া যায় না। তোর কত নতুন নতুন বন্ধু এখন। আচ্ছা চল, এই শনিবার দুপুরের শো-তে, আমি টিকিট কেটে রাখব।

শনিবার বেলা দেড়টা আন্দাজ স্বপ্না আমার অফিসে টেলিফোন করে বলল, নীলুদা—তুমি টিকিট কেটে ফেলেছ? কিন্তু আমি যে আজ যেতে পারছি না! আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন রে? যাবি না কেন?

—ভীষণ মাথা ধরেছে, চোখ টনটন্ করছে। আজ আর সিনেমা দেখতে ভালো লাগবে না। আমি বললুম, ঠিক আছে, তুই আয় তো। মাথায় দুটো গাট্টা মারলেই মাথা ধরা সেরে যাবে। ঐটুকু মেয়ের আবার মাথা ধরা কি রে?

—না, সত্যি, আজ আর যাওয়া হবে না!

আমি তখন আর কি করি, একা তো সিনেমা দেখা যায় না, টিকিট দুটো অফিসের একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে উপহার দিয়ে দিলুম।

সেদিনই সন্ধেবেলা পার্ক স্ট্রিটে দেখি স্বপ্না, পাশে একটি স্টাইলিস্ট ছোকরা—যথারীতি তার সরু প্যান্ট ও ক্রিম মাখা ঝকঝকে চুল। আমাকে দেখে স্বপ্না একটুও অপ্রতিভ হলো না, মাথা ধরার কথা তুলল না, ছোকরাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল এই যে, ইনি—আমার বন্ধু করবী, তার দাদা।

ইচ্ছে হলো স্বপ্নাকে এক ধমক দিই। কেন মাথা ধরার মিথ্যে কথা বলেছিল আমাকে? মনে আছে, আট বছর আগে, কি একটা মিথ্যে কথা বলেছিল বলে স্বপ্নাকে আমি খুব ধমকেছিলুম। স্বপ্না কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, আর কখনো আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না। সেই কথা মনে পড়ায় আজ ওকে ধমকাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলিয়ে নিলুম। মনে পড়ল, সময় তো আর থেমে থাকেনি। এখন স্বপ্নার পক্ষে নিজের দাদার চেয়েও বন্ধুর দাদার প্রতি টান থাকাই তো স্বাভাবিক। আর, এসব ব্যাপারে একটু-আধটু মিথ্যে না বললে চলবে কেন?

১২

রত্নাদি বললেন, না ভাই, তার কোনো মানে হয় না। তোমার ছেলেরা সব একদিকে বসে আড্ডা দেবে, আর আমরা মেয়েরা শুধু খেটে মরব? তাহলে আর পিকনিকের মজা কি!

প্রশান্তদা কাচুমাচু মুখে উত্তর দিলেন, রত্না, আমি একটা আরজি পেশ করব? আজ একটু মেয়েদের হাতের রান্না খেতে চাই। আজকাল তো ঠাকুরের রান্না খেয়েই দিন কাটে, বছরের অন্তত একটা দিন মেয়েদের হাতের রান্না খেতে পাব—পিকনিকে সেটাই তো আনন্দ। তোমরা তো ছেলেদের সঙ্গে রোজই আড্ডা দিচ্ছ—

রত্নাদির পাশেই পড়েছিল কুটনো কোটার বঁটি—সেটা তুলে প্রশান্তদার দিকে ধেয়ে যেতে যেতে বললেন, কি মিথ্যুক! রোজ ঠাকুরের রান্না খেতে হয়, আমি একদিনও রাঁধি না?

দীপঙ্কর ছুটে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, ও কি, ও কি! স্বামীহত্যা। তার চেয়ে এই অধমকে বুক পেতে দিচ্ছি...

উনুনে মাংস চেপেছে এই মাত্র। বারাসতের বাগানবাড়িতে আজ চমৎকার মেঘের ছায়া। উত্তাপহীন কোমল বাতাস। ঝকঝকে বাড়িটার চার পাশে কেয়ারি করা ফুল বাগান, দক্ষিণ কোণে টলটলে জলের একটা ছোট পুকুর, তার পাড়ে

লাল সিমেন্টের বাঁধানো ঘাট। প্রশান্তদা'র মামাশ্বশুরের বিশ্রাম নিবাস। সেখানে আজ পিকনিক আমাদের।

মাংস ততক্ষণ সেদ্ধ হোক, পুকুর পাড়ে আমরা সবাই মিলে এসে বসলুম, পাঁচজন পুরুষ, চারটি মহিলা। আমরা পুরুষরা তাশ খেলায় সবে জমে উঠেছিলুম, মেয়েদের তাড়নায় উঠে আসতে হলো। রত্নাদি বললেন, এসো, আমরা সবাই মিলে একটা খেলা খেলি। পার্থবাবু আপনি ঐ দিকটায় বসুন, তপন আলোর ডান দিকে, শুভ্রা, তুই যা তারপর...

আমার মনটা প্রথম থেকেই খারাপ লাগছিল। পিকনিকে আসতে কার না ভালো লাগে, প্রশান্তদার আহ্বান পেয়ে আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলুম। তাছাড়া প্রশান্তদা লোভ দেখিয়েছিলেন, খাবারদাবার ছাড়াও সঙ্গে থাকবে চিলড বীয়ার, জিন আর লাইম। অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে ভোর ছটায় দাঁড়িয়েছিলুম হাজরার মোড়ে—প্রশান্তদার কথা মতো। অঙ্গে আমার পিকনিকের উপযোগী রঙচঙে জামা, পকেটে মাউথ অর্গান নিয়েছিলুম, হঠাৎ ট্যাঙ্গো নাচের সঙ্গে বাজিয়ে সবাইকে ফুর্তি দেব। তখনো জানতুম না, পিকনিকে কে কে আসবে। প্রশান্তদা গাড়ি নিয়ে এলেন আমাকে হাজরার মোড় থেকে তুলতে, গাড়িতে আরো তিনজন রয়েছে, তার মধ্যে শুভ্রাকে দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। বিয়ের পর শুভ্রা আরো রূপসী হয়েছে, লাল রঙের শাড়ি আর কাচের কল্কা বসানো লাল ব্লাউজে ওকে দেখাচ্ছে জ্বলন্ত শিখার মতন। ওর স্বামী পার্থবাবু খুব মাঞ্জা দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন, মুখে পরিতৃপ্ত মানুষের হাসি। সঙ্গে শুভ্রার ষোলো বছরের ননদ চন্দনা।

রত্নাদি বলেছিলেন, আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে পার্থ আর শুভ্রা, আর এ হচ্ছে—। শুভ্রা আমাকে স্পষ্ট না-চেনার ভান করল। আমি কিছু বলতে যাবার আগেই ও একটা শুকনো নমস্কার করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সেই যে আমার মন খারাপ হয়ে গেল, আর ভালো লাগল না কিছুই। মাউথ অর্গানটা আর বার করিনি, তাশ খেলাতেই আমার ভালো লাগছিল—কারণ তাশ খেলার সময় মুখ গুঁজে থাকা যায়। নইলে, শুভ্রার দিকে তাকালেই আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠেছিল।

রত্নাদি বললেন, শোনো, খেলাটার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। খেলাটার নাম অন্তাক্ষরী। প্রথমে একজন যে-কোনো একটা গান গাইবে—এক লাইন দু-লাইন গাইলেই হবে। তবে গানটা যেখানে শেষ হবে—সেই শেষের অক্ষরটা দিয়ে আরম্ভ করে পাশের লোককে আর একটা গান গাইতে হবে। বুঝিয়ে দিচ্ছি—মনে করো আমি গাইলুম, ইয়ে, কি বলে, যে কোনো গান, হ্যাঁ, ধরো, আমি গাইলুম, 'ওগো

কিশোর, আমি তোমার দ্বারে পরাণ মন জাগে';—এটা শেষ হলো 'গ' দিয়ে, পরের জনকে 'গ' দিয়ে আরম্ভ করতে হবে একটা গান—সবাই বুঝতে পারছ তো? আরম্ভ করা যাক—

আমি বললুম, রত্নাদি আমি তো গান জানি না। আপনারা বরং খেলুন, আমি বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখি।

রত্নাদি ধমকে উঠলেন, তোমাকে আর বেশি কবি-কবি ভাব দেখাতে হবে না। বসো চুপটি করে। গান আবার আজকাল কে না জানে। একটু সুর ভুল হলেও কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু সবাই শোনো—এক মিনিটের বেশি আমার সময় দেওযা হবে না কিন্তু। আরম্ভ করো, তপন তোমার থেকেই...

তপন বলল, আমি গ দিয়েই শুরু করছি, 'গগনে গগনে আপনার মনে কি খোলা--আ, তবু গগনে গগনে'।

—'ন' দিয়ে। এর পর কে? পার্থবাবু, আপনার।

পার্থবাবু চোখ বুজে একটু ভেবে বেশ ভাব দিয়ে গাইলেন, 'নীল অঞ্জনে ঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর, হে গম্ভীর। হে গম্ভীর। বনলক্ষ্মীর কম্পিত কার চঞ্চল অন্তর—' পঙ্কজ মল্লিকের স্টাইলে খুব গম্ভীরভাবে গলা কাঁপাতে লাগলেন তিনি।

'ব' দিয়ে। মল্লিকা, এবার তুমি।

'ব' দিয়ে? 'র' দিয়ে?—মল্লিকা নামের মেয়েটি জলে পড়া মানুষের মতন ছটফট করতে লাগল—যেন, যত গান ওর মনে ছিল—সব এইমাত্র ভুলে গেছে। এটা সেটা গুনগুন করার চেষ্টা করে হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'রাত ভরি বহনা, সবেরে চলি যানা, ও ঝুমকো মেরি মেরি'—

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, না, না, হিন্দী গান চলবে না। মল্লিকা বেচারী গাইতেই পারল না। র দিয়ে তার কোনো বাংলা গান মনে পড়ছে না। তার পাশ থেকে প্রশান্তদা গেয়ে উঠলেন শ্যামার গান, 'রাজার প্রহরী ওরা, অন্যায় অপবাদে, নিরীহের প্রাণ বধিবে বলে কারাগারে বাঁধে।'

দু' তিনজন পর আমার পালা এল 'আ' দিয়ে গাইবার। আমার সুর ওঠে না গলায়—কিন্তু গীতবিতানেব সমস্ত গানের প্রথম লাইন প্রায় আমার মুখস্ত। আমি আস্তে আস্তে ধরলাম, 'আজ কিছুতেই যায় না, যায় না, যায় না মনের ভার...মনে ছিল আসবে বুঝি...না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার।'

শুভ্রা চকিতে আমার দিকে একবার তাকাল, আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। একজনের পর শুভ্রার পালা আসতে সে গাইল অতুলপ্রসাদের গান—'ও কেন দেখা দিল রে! না দেখা ছিল যে ভালো। ও কেন দেখা দিল রে।' শুভ্রা আমার দিকে আর তাকায়নি, কিন্তু তার ঠোঁটের টেপা হাসি দেখে আমি বুঝতে পারলুম,

ও আমাকেই আঘাত দিতে চাইছে।

আমিও তৈরি হয়ে রইলুম, পরেরবার আমার পালা আসতেই গাইলুম, 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম, তুমি রবে নীরবে—'

শুভ্রার পালা আসতে শুভ্রা গাইল মায়ার খেলা থেকে 'ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে। জেগেছি, জেগেছি,—আর ভুল নয়, ভুল নয়।'

এর পর অনেকক্ষণ আর আমার পালা আসে না। আমি উসখুস করতে লাগলুম। পার্থবাবু আর রত্নাদি লম্বা লম্বা গান গাইতে লাগলেন। আবার আমার পালা আসতেই আমি শুভ্রার দিকে তীব্র চোখে তাকালুম। শুভ্রার ফরসা মুখে একটা লালচে আভা এসেছে, এক পলক আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। একটু যেন চোখের পাতা কাঁপল তার। আমি গাইলুম, 'বড়ো বেদনার মত বেজেছ তুমি হে, আমার প্রাণে। মন যে কেমন করে মনে মনে, তাহা মনই জানে।'

মল্লিকা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ন' দিয়ে একটা গান আমার মনে পড়েছে। আমি এবার গাইব। অনেকেই হেসে উঠল। নিজের যখন পালা আসে, তখন মল্লিকার কিছুতেই গান মনে পড়ে না। রত্নাদি বললেন, আচ্ছা, গাও। ঠিক আছে, মল্লিকা ধরল 'নীরবে থাকিস সখী ও তুই নীরবে থাকিস। তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা, তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস, নীরবে থাকিস সখী—।' শুভ্রা আর আমি দুজনেই মল্লিকার দিকে তাকালুম। মল্লিকা কি কিছু উদ্দেশ্য করে ও গানটা গাইছে ? মল্লিকা শুভ্রাকে আগে থেকেই চেনে—কিন্তু আমাকে তো চেনে না। মল্লিকার সরল অতি-উৎসাহী মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তপন বলল, ইস, 'য' দিয়ে আরম্ভ হলো না। তাহলে এবার আমি গাইতুম, 'যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকাবনে।' আর এক লহর হাসি। শুধু শুভ্রা সে হাসিতে যোগ দিল না। ওর পালা আসতে শুভ্রা এবার একটু ভাবতে লাগল মাটির দিকে চোখ রেখে। রত্নাদি তাড়া দিলেন, এক মিনিট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। শুভ্রা হঠাৎ শুরু করল, 'বঁধু মিছে রাগ করো না, কোরো না। মম মন বুঝে দেখো মনে মনে, মনে রেখো, কোরো করুণা।...মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে যাই—সে আমার নহে ছলনা।'

আমার পালা আবার ফিরে আসবার আগেই রত্নাদি বললেন, মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে, ভুর ভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে, পোড়া না লেগে যায়। খেলা এখন বন্ধ থাক।

আমি নিরাশ হয়ে বললুম, কেন, আর একটু চলুক না।

প্রশান্তদা বললেন, না, না, মাংসে পোড়া লাগলে সব মাটি হবে। আমি হাল্কাভাবে হাসতে হাসতে বললুম, কিন্তু আমি যে আর একখান গান গাইব বলে ঠিক করে রেখেছিলুম।

পার্থবাবু বললেন, কি মশাই। আপনি প্রথমে এ খেলাটা খেলতে চাচ্ছিলেন

না। এখন যেচে গান শোনাতে চাইছেন।

আমি আমার হাসি আরো তরল করে বললুম, কি করব, খুব জমে গেল যে খেলাটা। এখন বেশ ভালো লাগছে।

রত্নাদি বললেন, ঠিক আছে তোমার গানটা শোনাও, তারপরই খেলা শেষ হবে। আমি শুভ্রার দিকে আর তাকালুম না, রত্নাদির দিকেই তাকিয়ে গাইলুম, 'এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—এ-যে হৃদয় দহন জ্বালা সখী। এ-যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা—এ তো খেলা নয়...'

১৩

আমি ছেলেটাকে বললুম, যাও, যাও, কিছু হবে না। ছেলেটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি ফের ধমকে উঠলুম, বলছি তো কিছু হবে না। কেন বিরক্ত করছ ? অন্য জায়গায় যাও।

ছেলেটি বকুনি খেয়েও নড়ে না, ঠ্যাটা বেড়ালের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। আমি খুবই বিরক্ত হয়ে তাকে আরো প্রচণ্ড ধমক লাগাতে যাচ্ছিলুম, সে তখন আদুরে আদুরে গলায় বলল, আমাকে দিদিমনি দেবেন, দিদিমনি আমাকে রোজ দ্যান।

সুপর্ণা যে তখন ব্যাগ খুলে খুচরো পয়সা খুঁজছে লক্ষ্য করিনি। আমাকে চুপ করে যেতে হলো। সুপর্ণার হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতর থেকে বেরুল আর একটা ছোট ব্যাগ, তার এক খোপ থেকে একটা পাঁচ পয়সা দুই লীলায়িত আঙুলে তুলে ভিখারি ছেলেটিকে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, এবার যাও।

আমি বক্র হেসে ছেলেটিকে বললাম যাও এবার আর একজনকে পাঠিয়ে দাও।

সুপর্ণা বলল আর কেউ এলে দেব না। এই ছেলেটা রোজ আমার কাছ থেকে পাঁচ পয়সা নেবেই কিছুতেই ছাড়বে না।

আমি বললাম, তুমি শুধু ওকেই ভিক্ষে দাও, আর-কারুকে দাও না। তোমার এই পক্ষপাতিত্ব কেন ?

—যখন বেশি খুচরো থাকে, তখন অন্যদেরও দিই। দেওয়াই তো উচিত সবার। সব সময় অবশ্য পারা যায় না।

বহুক্ষণ সুপর্ণার সঙ্গে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা ফাঁকা। মনে হচ্ছে যেন ট্রাম-বাসেরা এ রাস্তার কথা ভুলেই গেছে। কিংবা হঠাৎ বাস-ট্রামে ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

সুপর্ণা জিজ্ঞেস করল, আপনি ও ছেলেটিকে ওরকম ধমকাচ্ছিলেন কেন ?

ও তো কোন দোষ করেনি। শুধু ভিক্ষে চাইছিল।

—আমি কমপিটিশন সহ্য করতে পারি না।

—কি ? তার মানে ?

—কিছু না। একথা এখন থাক্।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মেজাজ ঠিক থাকছে না। ভিখারি বালক নিয়ে আলোচনা করার উৎসাহ নেই। সুপর্ণা কিন্তু মুখে বেশ মিষ্টি হাসিটা ফুটিয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ওকে ওর নিজের চেহারার চেয়েও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।

সুপর্ণা বলল, গরীব দুঃখীদের সঙ্গে যদি কেউ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তাহলে আমার খুব খারাপ লাগে। এমনিতেই তো সব সময় নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়। আমি খেতে পাচ্ছি, থাকার জায়গা পেয়েছি, ইচ্ছে মতন শাড়ি-টাড়ি কিনতে পারি —আর কত হাজার হাজার মানুষ এখনো দু'বেলা খেতে পায় না—

আমি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বললুম, এই জন্যই তোমাকে আমার এত বেশি ভালো লাগে। তোমার মনটা একেবারে হীরের টুকরো—

—বাঃ। এ তো খুব সাধারণ কথা। কিন্তু আপনি যে আজ ছেলেটার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলেন, তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি।

—কেন ?

—নিষ্ঠুরতা আপনাকে মানায় না।

—আমাকে কোন ভূমিকায় মানায় ?

—আপনিই একদিন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে একটা বুড়ো ভিখিরিকে এক সঙ্গে অনেকগুলো খুচরো পয়সা দিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বাঃ। কবে ? মোটেই না।

—হ্যাঁ দিয়েছিলেন।

—হতেই পারে না।

—আমার ঠিক মনে আছে। মাস দেড়েক আগে। সেদিনও আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

একটু একটু যেন আমার মনে পড়ল। বললাম, তা হতেও পারে। বুড়োটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল হাত পেতে। কারুর কাছ থেকে কিছু চায়নি। শুধু হাতখানা বাড়ানো ছিল—তার মুখখানা আঁকিবুকিতে ভরা—পুরোনো দলিলের মতন, হয়তো দেখে আমার মায়া হয়েছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—সেদিন মায়া হয়েছিল, আর আজ...

—সুপর্ণা, আমাকে কি প্রত্যেকদিন এক ভূমিকায় মানায় ? আমি তো সাধারণ

মানুষ। মহৎ মানুষেরাই অনবরত দয়ালু হয়। আমি তো নই, আমার শরীরে খানিকটা দয়া-মায়া আছে বটে, আবার রাগ, ঈর্ষা, বিরক্তি—এসবও আছে। আমি কখনো সামান্য দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ি, কখনো কঠোর নির্মম হতেই ভালো লাগে। একই মানুষ বিভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন রকম।

—আপনি বড্ড বড়ো বড়ো কথা বলেছেন। আমি যা বললুম, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ? দীন-দুঃখীদের সাধ্যমত দু-চারটি পয়সা দিতে সবারই ভালো লাগে—

—চলো বাস এসে গেছে।

—এ বাসে বড্ড ভিড়। এটাতে উঠব না।

—তা হলে হেঁটে যাওয়া যাক্।। কিংবা ট্যাক্সিতে উঠবে ?

—ট্যাক্সি ? একটু আগে আপনি একটা ভিখিরিকে দুটো পয়সা দেননি—এখন ট্যাক্সিতে যেতে চাইছেন।

—আরেঃ যাঃ। তুমি খালি ঐ ভিখিরি ছেলেটার কথা তুলছ কেন ?

—ভিখিরিদের কেউ মুখঝামটা দিলে আমার বড়ো কষ্ট হয়। ঐ ছেলেটাকে দেখে আপনার মায়া হলো না ?

— না।

—না ! কি রকম করুণ আর মিষ্টি মুখটা—ওকে দেখে আপনার মায়া হলো না ?

—না। কারণ পাশাপাশি দুজন ভিখিরি থাকলে একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারে না। ওর সঙ্গে আমার বিরাট প্রতিযোগিতা—আমি তো চেষ্টা করবই ওকে হটিয়ে দিতে।

—ও আবার কি কথা ?

—ও চাইছিল দু-চারটে পয়সা, আর আমি তোমার করুণাব ভিখারি। তোমার একটু কৃপা পাবার জন্য আমি কতক্ষণ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমার দিকে চেয়ে যদি একটু হেসে—

সুপর্ণা কুলকুল করে হাসল। তবে এ হাসি অন্য রকম। আমি ঠিক এর কথা বলিনি, এর মধ্যে খানিকটা ঠাট্টা মিশে আছে। বলল, যাঃ, আপনি যে কি পাগলের মতো উল্টোপাল্টা বলেন ?

আমি বললাম, আজ ঐ ভিখারি ছেলেটাই জিতে গেছে। ও শুধু তোমার কাছ থেকে পয়সাই পায়নি—ও তোমার মনোযোগও পেয়েছে। তুমি সর্বক্ষণ ওর কথাই বলছ।

—আপনার জন্যই তো ! আপনি যদি ওকে দু-চারটে পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন ও আর দাঁড়াত না। এ নিয়ে কোনো কথাই বলত না।

আমি বললাম, আমার কি রকম লজ্জা করে।

—লজ্জা করে মানে?

—লজ্জা করে তো কি করব? অধিকাংশ লোকই ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয় —তার প্রতি মায়াবশত নয়। তাকে বিদায় করবার জন্য। ভিখিরিরা পাশে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘ্যান করে—তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য দু-চারটে পয়সা দিতে হয়। সে রকম দিতে আমার লজ্জা করে। একটা মানুষের আত্মাকে অবহেলা করতে কিংবা অপমান করতে আমার লজ্জা হয়। কিংবা ধরো, কখনো কোনো ভিখিরিকে দেখে মনটা উদার হয়ে গেল, পকেট থেকে খুচরো পয়সা তুলে তাকে দিয়ে দিলাম —সে আমাকে আশীর্বাদ করল। সেই আশীর্বাদটা পেয়ে আমার লজ্জা হয়। মনে হয় ওটা আমার প্রাপ্য নয়। আমি তো সত্যিই দাতা নই।

—বাবারে বাবা। ভিখিরিকে দুটো পয়সা দেবেন, তার জন্য আবার এত কথা। এর জন্য এত ভাবতে হবে কেন?

—সেই তো, তার থেকে না দিলেই চুকে যায়।

—আসলে আপনি কিপ্টে, সেই কথা বলুন।

—কে বলেছে কিপ্টে। চলো, তুমি কোন রেস্টুরেন্টে খাবে—তোমাকে সেখানে ট্যাক্সিতে...।

দর্পিত ভ্রুভঙ্গি করে সুপর্ণা বলল, মোটেই আমি যাব না কোথাও। শুধু শুধু ঐ ভাবে পয়সা নষ্ট করা—আর কত মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কত মানুষ ফুটপাথে...

সুপর্ণা যে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরায় খেতে ভালোবাসে না, তা নয়। ট্যাক্সি চড়তেও পছন্দ করে। অন্য মেয়েদের মতোই। কিন্তু আজ কথা প্রসঙ্গে সে মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় বড়ো কাতর হয়ে পড়েছে, এই কাতরতার ছায়ায় তার মুখখানি উদ্ভাসিত। এখন তার সৌন্দর্য অন্যরকম। এটা দেখার জন্যই আমি ওকে খোঁচাচ্ছিলুম। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কেউই সঠিক পথে ভাবছেন না মনে হয়—প্রায় সকলকেই শৌখিন মনে হয়। তবু কখনো কখনো মুখে এই কাতরতার ছায়া দেখতে ভালো লাগে। আমি বললুম, এসো, তাহলে আজ সন্ধেটা অন্যভাবে কাটান যাক। আমার কাছে টাকা দশেক আছে, আর তোমার কাছে যা আছে, সব মিলিয়ে খুচরো করে রাস্তাব সব ভিখিরিদের বেলানো যাক।

সুপর্ণার মুখে তখনো হাসি ফিরে আসেনি। সন্দেহের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বুঝি এটাকে এখনো ঠাট্টা মনে করছেন?

আমি বললুম, না, ঠাট্টা নয়। আমি জানি এতে একজনেরও খিদে মেটানো যাবে না। কিন্তু এক সন্ধের জন্য আমরাও ভিখিরি হয়ে যাই। আমি তো জন্মভিখারি, আমার কাছে এর নূতনত্ব খুব নেই, কিন্তু তোমাকে ভিখারিনী হিসেবে কেমন মানায়—সেটা দেখতে ইচ্ছে করছে।

১৪

সন্ধেবেলা রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছিলাম। কোথাও যাবার নেই, উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো পথ চলা। উদ্দেশ্যহীন হলেই খুব নিঃসঙ্গ লাগে। মনে হয়, এখন সবাই কলকাতায় খুব ব্যস্ত, সবাই কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। একমাত্র আমারই কোনো কাজ নেই। আর সবাই আমাকে ভুলে গেছে, আমি পরিত্যক্ত বন্ধুহীন।

এক-একদিন সন্ধেবেলা এরকম হয়, এরকম মন খারাপ লাগে, শরীরটা হাল্কা হয়ে যায়, বাতাসে ভাসা তুলোর বীজের মতন অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যাওয়ার অভ্যেস আমার কিছুতেই হলো না। মধ্য-কলকাতা থেকে সন্ধের সময় বাড়ি ফেরা মোটেই সহজ কাজ নয় অবশ্য। ট্রামে-বাসে অসহ্য ভিড়, ঐ ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বাড়ি ফেরা একটা অসম্ভব ব্যাপার! তাও তো বহু লোক বাড়ি ফেরে, নইলে আর ট্রাম-বাসে এত ভিড় হয় কেন ? সন্ধেবেলা নিজের বাড়িতে ফিরে লোকেরা কি করে, আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়। সারাদিন অফিস-টপিসে বন্দী থাকার পর আবার সন্ধেবেলা থেকেই গৃহবন্দী ?

এতদিন আছি, তবু কলকাতা শহরটা আমার কাছে পুরোনো হয়নি। এখনো নির্লজ্জের মতন বলতে পারি, এই শহরকে আমি ভালোবাসি। কোনো মেয়েকে এখন আর ভালোবাসার কথা বলা যায় না, সে-রকম আর ফ্যাশান নেই, কিন্তু এই শহরকে ভালোবাসার কথা বলতে দ্বিধা হয় না। সারা পৃথিবীর লোক যখন কলকাতার নিন্দে করছে, তখনো আমি একে ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরতে চাই। কলকাতার বাইরে যেখানেই যাই, কিছুতেই মন টেঁকে না, দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসার জন্য মন ছটফট করে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক বড়ো শহরের ছবি আমি দেখেছি, আমার চোখে তারা ফিলম স্টারের মতন, তাদের চটক আছে, কিন্তু তাদের ভালোবাসা যায় না।

একা হাঁটতে হাঁটতে আমি মনে মনে দু'লাইন কবিতা বিড়বিড় করছিলাম। পুরোনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে, কেউ বা আগ্রায় কেউ দিল্লির আনাচে-কানাচে। অরুণকুমার সরকারের কবিতা, বহুদিন আগে যখন পড়েছিলাম, তখন এ লাইনগুলো আমার কাছে সত্যি ছিল না, এখন মর্মান্তিক সত্যি। এই যে সন্ধেবেলা আমি একা একা হাঁটছি, একজন কোনো বন্ধুর কথাও মনে পড়ে না, যার সঙ্গে এখন দেখা করতে যেতে পারি। কারুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করা কিংবা গল্প করার স্বভাব আমার কোনোদিনই ছিল না—আগে এমনিই হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যেত—এখন তারা সবাই বাড়ি ফিরে গেছে, আমি একা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি।

'পুরোনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে, কেউ বা আগ্রায় কেউ দিল্লির আনাচে কানাচে...।' অনেক বন্ধু সত্যিই দিল্লি-আগ্রা-কানপুর-বোম্বাই চলে গেছে

চাকরির জন্য, মাঝে মাঝে সেসব জায়গায় গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে সত্যিই তারা গম্বুজ হয়ে আছে কি না। ভাস্কর তখন বিলেত যাচ্ছিল এয়ারপোর্টে ওর হাত ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন মরতে যাচ্ছিস ওখানে ? কি হবে কি ? ভাস্কর মৃদু হেসে বলেছিল, দ্যাখ না, বেশিদিন থাকব না— বিলেতে আমার নামে একটা রাস্তা বানিয়েই চলে আসব। তারপর সাত-আট বছর কেটে গেল। কলকাতার প্রতিটি অলিগলি ওর চেনা ছিল, এখন বিলেতে কোন বিরাট নামের রাস্তায় ও হারিয়ে গেছে জানি না। আমার ধারণা ভাস্কর ওখানে রোড ইনস্পেক্টরের কাজ নিয়েছে, রাস্তা মেরামতির তদারকি করছে এখনো, রাস্তা বানাবার সুযোগ পাচ্ছে না।

একসময় সন্ধেবেলা আমি টিউশানি করতাম। বন্ধুদের কি ঘোরতর আপত্তি ছিল তাতে। হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপে অস্থির করে তুলত আমাকে। প্রায়ই যাবার পথে হাত ধরে আমাকে আটকে রাখত, চলন্ত বাস থেকে টেনে নামাতো। ছাত্রের বদলে ছাত্রীদের পড়াতুম বলে বন্ধুদের আরো বেশি উৎসাহ ছিল আমাকে না-যেতে দেবার। কিংবা, একথা বলা হয়তো ঠিক হলো না, আড্ডা মারাটাই ছিল তাদের প্রধান আকর্ষণ, একজন আড্ডাধারীর অনুপস্থিতিও সহ্য হতো না ওদের। প্রায়ই ডুব মেরে পরের দিন ছাত্রীদের বাড়িতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা আমাকে বলতে হতো।

যে-কদিন যেতাম, ফিরতাম রাত সাড়ে আটটা আন্দাজ। তখন বন্ধুবান্ধবরা কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। কিন্তু একজন করত। এলগিন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত আমার বন্ধু বুঢ়ঢা। আমি তো কোনো না কোনো বাসে ফিরবই, তাই সাড়ে আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত এলগিন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে বুঢ়ঢা প্রত্যেকটা বাস থামতেই চেঁচিয়ে উঠত, এই নীলু, নেমে আয়! নেমে পড়ে ওকে জিজ্ঞেস করতাম, কিরে, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

বুঢ়ঢা মুখ-চোখের একটা বিরক্ত ভঙ্গি করে বলত, দূর ছাই, ভালো লাগে না এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে।

—এত তাড়াতাড়ি কি বলছিস! এখন তো ন'টা বাজে!

—ধ্যাৎ! এই তো কলির সন্ধে!

রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি আড্ডা দিতাম, কে জানে! তবু কথা ছিল অফুরন্ত। প্রত্যেক রাতে বাড়ি ফিরেই মনে হতো কাল আবার কখন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। সেই বুঢ়ঢা এখন আছে লিবিয়ায়, জানি না সেখানে সে এখন কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে! আমি কলকাতার রাস্তায় একা একা হাঁটছি।

বাবা আমাকে কো-এডুকেশানাল কলেজে পড়তে দেবেন না বলে আমি বাধ্য হয়ে ভর্তি হলুম বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক খাজার-মার্কা কলেজে। আমার

বন্ধু আশু শুধু আমারই জন্য সেই কলেজে চলে এল। ওর রেজাল্ট ভালো, অবস্থা ভালো, বাড়ির আপত্তি নেই—ও অনেক ভালো কলেজে পড়তে পারত—শুধু আমার সঙ্গে পড়বে বলেই চলে এসেছিল ঐ দূরের কলেজে। একদিনের বিচ্ছেদও সহ্য হতো না। তখন আমরা ভাবতাম, সারা জীবনে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—সব সময় পাশে পাশে থাকব। এখন আশু এই কলকাতা শহরেই আছে, অথচ কারুর বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন ছাড়া দেখা হয় না।

একটা বয়েস ছিল যখন আমরা কেউ মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার সময় পেতাম না। আমরা কয়েকজন পুরুষ মিলে এমন নিবিড় বন্ধু ছিলাম যে আলাদা ভাবে কেউ যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত সেটাকে মনে করতুম অপরাধ। আমি কখন কোথায় আছি—বন্ধুরা তা সব জানে। প্রেমে পড়তে হলেও যেন এক সঙ্গে পড়তে হবে। পড়তুমও তাই, অনেক সময় একটি মেয়ের জন্য পাঁচজনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতুম, একটি মেয়ের জন্য পাঁচজনের বুক কাঁপত, একজনকে খুশি করার জন্য পাঁচজনে ব্যগ্র হতুম। আলাদা কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে তার কথা বন্ধুদের কাছ থেকে লুকোবার জন্য কি দারুণ উৎকণ্ঠা—বাড়ির লোকের কাছ থেকে লুকোবার জন্যও এত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়নি। আবার, প্রেমের ব্যাপারে কোনো সংকট দেখা দিলে—বন্ধুদের কাছেই সাহায্য চাইতে হতো—তখন কারুর কোনো ঈর্ষাবোধ ছিল না। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকত, কলকাতা শহরের বন্ধুত্ব নিয়ে থ্রি কমরেডস-এর মতন আর একখানা দুর্দান্ত উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতাম। হায়, আমার সে রকম লেখার ক্ষমতা নেই!

প্রত্যেক বন্ধুর মা-ই ভাবতেন, তাঁর ছেলেটি খুব ভালো—বাকি বন্ধুরাই ছেলেটির মাথা খাচ্ছে, পড়াশুনা করতে দিচ্ছে না, চাকরিতে উন্নতি করতে দিচ্ছে না। বন্ধুদের মায়ের সামনে পড়লেই আমি কাচুমাচু হয়ে যেতুম, মুখে একটা অপরাধীর ভাব ফুটত। তেমনি, আমার মায়ের সামনে অন্য বন্ধুদের। কিন্তু মা-বাবারা হাজার চেষ্টা করেও যা পারেননি, সময় তা পেরেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কেউ চাকরির জন্য, কেউ বিয়ে করার কুফলে, কেউ অন্য ধান্দায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে চতুর্দিকে। আমি যেমন কলকাতার রাস্তায় বিষণ্নভাবে একা একা হাঁটছি, তেমনি ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য বন্ধুরা কেউ হয়তো লিবিয়ায় কিংবা বিলেতে কিংবা দিল্লিতে একা একা হাঁটছে মন্থর পায়ে।

রেড রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এ কথা মনে পড়ায় হঠাৎ একবার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বন্ধুদের নাম ধরে ডাকি। যেন আমার চিৎকার ডাল্টনগঞ্জ কিংবা কানাডাতেও পৌঁছে যাবে। চিৎকার করে বলি, বুঢঢা, আশু, উৎপল, ভাস্কর,

সমীর, শরৎ—আর, আর একবার চলে আয় সবাই! আয়, পুরোনো কালের মতন আর একবার আমরা কলকাতা শহরটাকে তোলপাড় করি! আগে পাঁচ-সাত জনে মিলে যেমন একটি মেয়েকে ভালোবাসতুম, তেমনি ভাবে এই কলকাতাকে সবাই মিলে ভালোবাসি।

কিন্তু নাম ধরে ডাকার ইচ্ছে হতেই, আমার এত বন্ধুদের বদলে শুধু সৌমেনের কথাই বেশি করে মনে পড়ল। এক সরস্বতীর পুজোর দিন আমরা সবাই মিলে এক বাড়িতে বসে গুলতানি করছিলাম, সৌমেনের আসার কথা ছিল, সে আসেনি বলেই আমরা বেরুতে পারছিলাম না। সৌমেন থাকত হাওড়ায়। দুপুর ঘোর হয়ে এল, তবু সৌমেন এল না, আমরা সবাই রেগে খুব গালাগালি করছিলুম ওকে! বিকেলেও সৌমেন এল না, কিন্তু ওর খবর এল।

ধুতিটাকে লুঙ্গি করে জড়িয়ে পরেছিল সৌমেন, পাশের বাড়ির বাচ্চারা সরস্বতী পুজো করছে, সেখানে অঞ্জলি দিয়েই বেরুবে, উঠোনের পাঁচিলের পাশে উঁকি দিয়ে দেখছিল—পুজো শেষ হতে কত দেরি। আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল সৌমেন, বারবার তাড়া দিচ্ছিল ওদের। কাছেই ছিল একটা তোলা উনুন, তার আগুন লেগে যায় সৌমেনের ধুতিতে। ধুতিটা চট করে খুলে ফেলতে পারত, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে পারত—কিন্তু চরম সময়ে নাকি কিছুই মনে আসে না, সৌমেন আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, মা, মা—। আগুন তখন দপ্ করে ছড়িয়ে গেছে সারা গায়। সৌমেনের মা তা দেখে অস্বাভাবিক ভয় পেয়ে বুদ্ধিভ্রান্ত হয়ে এক বালতি জল ছুঁড়ে দিলেন। তাতে আগুন নিভল না, ফল আরো খারাপ হলো। তারপর দু'দিন একটা কথাও বলতে পারেনি, যেটুকু সময় জ্ঞান ফিরেছে, শুধু চেঁচিয়েছে, জ্বলে গেলুম।— আড্ডা দেওয়া হলো না সৌমেনের, একটা অতৃপ্তি নিয়ে চলে গেল।

বহুদিন সৌমেনের কথা মনে পড়েনি। আজ মনে পড়তেই বুকটা ভারী হয়ে এল, গলার কাছে ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। ফিসফিস করে বলতে লাগলুম, সৌমেন, সৌমেন, তুই কোথায় আছিস? শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? আয়, আর একবার প্রাণভরে আড্ডা দিই।

সন্ধেবেলা একা ছিলুম বলে মৃত বন্ধুর কথাই বেশি মনে পড়তে লাগল।

১৫

ভ্রমণকাহিনী পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। গল্প উপন্যাস পড়ে প্রায়ই নিরাশ

হতে হয়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীতে সে সম্ভাবনা নেই। লেখাটা ভালো হোক বা না হোক—কিছুক্ষণের জন্য তো সেই বর্ণিত জায়গাটায় মনে মনে ঘুরে আসা যায়।

আমার নিজেরও ইচ্ছে করে একটা ভ্রমণকাহিনী লিখে ফেলি। কিন্তু কোন জায়গার কথা লিখব, কোনো দুর্গম পাহাড়ে কিংবা অচেনা জনপদে তো যাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি এই পৃথিবীর কত রহস্য, মনোহারিনী শোভা আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেল। বছরের পর বছর কলকাতা শহরেই বন্দী হয়ে আছি। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লেখার খুবই সাধ আমার। তাই ঠিক করলুম, কলকাতা শহরের একখানা ভ্রমণকাহিনী নিয়ে হাতে খড়ি করা যাক।

এক নাতিশীতোষ্ণ অপরাহ্নে, খাঁটি পরিব্রাজকের মতন সঙ্গে কিছু মালপত্র না নিয়ে, পকেটে সামান্য কিছু টাকাকড়ি, আমি কলকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে একটি নীলরঙা দোতলা বাসে উঠে বসলুম। বাসটি সেখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং বেশ ফাঁকা ছিল, দোতলার জানলার পাশে একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন পাওয়া গেল! সেই দিনই যে ভ্রমণ করার খুব একটা ইচ্ছে আমার ছিল তা নয়, জীবনে অনেক মহৎ কার্যের মতন আমার সেই অপরাহ্ণ-ভ্রমণও আকস্মিক। আমার উদ্দেশ্য, শিয়ালদহ নামক অঞ্চলে নেমে কোনো একটি কর্তব্য সমাপন, কিন্তু তা বদলে গেল কার্যকারণবশত। সূত্রপাত হলো এই ভাবে যে, বাস ছাড়বার আগেই বিড়িতে শেষ টান দিতে দিতে কণ্ডাক্টর মহোদয় টিকিট গুচ্ছে আঙুল চালিয়ে আমার নাকের সামনে এনে এক প্রকার উৎকট শব্দ করতে লাগলেন। আমি তখন পথের সৌন্দর্য নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলুম। সেই শব্দে চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, কি ? তিনি বললেন টিকিট, আমি জামার পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত পাঁচ টাকার নোটটি এগিয়ে দিলাম। কণ্ডাকটর সেদিকে পলকের মাত্র চাহনি দিয়ে বিরক্ত-মিশ্রিত স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা ? নেমে যান!

আমি হতবাক।

আমার বরাবরই কলকাতা শহরের বাসের ভাড়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। ধরা যাক, একশো মাইল দূর থেকে কেউ ট্রেনে চেপে কলকাতা শহরে আসতে চায়। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলে ভাড়া তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ'টাকা, প্রথম শ্রেণীতে প্রায় বারো টাকা দিতে হবে। একই দূরত্ব একই ট্রেন, শুধু আসনের আরাম অনুযায়ী বিভিন্ন দাম। অথচ কলকাতায় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জগামী বাসে যারা হাতল ধরে ঝুলছে, যারা ভিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে, যারা অস্থায়ী মহিলা আসনে বসে সদা কম্পিত, যারা জানলার পাশে নিশ্চিন্ত আরামে আশ্রয় পেয়েছে সকলেরই টিকিটের ভাড়া এক হয় কি প্রকারে ? সুতরাং আমার মনে হলো কর্তৃপক্ষের বুঝি এতদিনে চেতনা ফিরেছে। দোতলার জানলার ধারের আসনকে এয়ারকণ্ডিশনড কামরার মর্যাদা দিয়ে

ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কত ভাড়া? কণ্ডাকটরটি পুনশ্চ বিরক্তিভরে বললেন, বললুম তো খুচরো নেই। নেমে যান! নেমে যান।

শাস্ত্রে আছে, যেসব মানুষের শরীর অত্যধিক রোমশ হয়, যাদের বর্ষাকালে জন্ম, যাদের শরীর রোগা নয়, আবার খুব স্থূলও নয়, যাদের চোখ বড়ো কিন্তু নাক ছোট, যারা দ্রুত স্নান সারে কিন্তু খাবার খেতে দেরি করে, যারা দিনে ঘুমোয় কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে,—সেই সব মানুষ অত্যন্ত গোঁয়ার প্রকৃতির হয়। আমার সঙ্গে এর প্রত্যেকটার মিল থাকা সত্ত্বেও আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ হিসেবে তেমন পরিচিত নই। কিন্তু এক নিরুপদ্রব বিকেল বেলা নিশ্চিত ভাবে বাসের জানলায় বসেছি, এমন সময় আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলেই 'নেমে যান' বলায় চড়াৎ করে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠল। একবার বললেও হয়ত অতটা মনে করতুম না, কিন্তু পরপর দুবার নেমে যান নেমে যান্ আমার কানে অতিশয় রুক্ষ শোনাল। তখন আমি স্থির ভাবে বললুম, আমি নেমে যাব না, আমি এখানেই বসে থাকব। এই বাস যতদূর যায় ততদূর যাব তার মধ্যেও যদি আপনার খুচরা না হয়—তবে এই বাস যতবার আজ যাতায়াত করবে আমি এখানেই বসে থাকব—যদি তাতে পাঁচ টাকার পুরো ভাড়া হয়!

অতএব, এরপর আমার যাত্রার আর কোনো উদ্দেশ্য রইল না, আমি ভ্রমণকারীর মতন নিরাসক্ত ভাবে বসে রইলুম। অন্যদিন কাজের জন্য বাসে চাপতে হয়, তখন তাড়া থাকে কতক্ষণে পৌছুব। আজ সে রকম কিছু নেই বলেই অনেক কিছু চোখে পড়তে লাগল।

পাইকপাড়ার রাজারানীদের স্মৃতিমণ্ডিত রাস্তা ধরে বাস ছুটছিল, অচিরে তা দুবার ডানদিকে বেঁকে বেলগাছিয়ায় এসে পৌছুলো। বেলগাছিয়ার রাস্তাটুকু অতিশয় অভিনব। এখানে বাস কিছুক্ষণ ঘোড়ার চাল অনুকরণ করে। প্রতি কদমে বাসটি লাফিয়ে উঠছে ও ডান দিকে বাঁ দিকে হেলছে—সেই অনুযায়ী যাত্রীরাও, একবারে সামনের আসনে কয়েকটি শিশু ছিল, তারা আনন্দ খলখল করতে লাগল। আমার মনে পড়ল অতি শৈশবে দার্জিলিং গিয়ে বাবার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে আমারও এই প্রকার আনন্দ হয়েছিল। যে-সব বাচ্চারা আজকাল দার্জিলিং যেতে পায় না তাদের আনন্দের জন্যই বোধহয় বেলগাছিয়ার রাস্তায় এই বন্দোবস্ত। তারপরই বাসের নৃত্য থামল, জলের সর সর শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি ব্রিজের পাদদেশ সম্পূর্ণ জলমগ্ন। গত পুজোর পর আর একদিনও বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়ে না—কিন্তু বেলগাছিয়া ব্রিজের কাছে কোমর জল, বাস তার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল। কলকাতার বাসগুলি সত্যিই বাঘের বাচ্চা, জল-স্থলের

কোনো বাধাই তারা মানে না, মনে হয় শূন্য পথেও তারা যাতায়াতে পারঙ্গম। এক মহিলা সেই কোমর জলে রিক্সা চেপে আসছিলেন, রিক্সা থেকেই তিনি বাসের পা-দানিতে লাফ দিয়ে পড়লেন।

বাস ব্রিজের ওপর উঠল। এবার দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ব্রিজটি বেশ উঁচু, দূরে অনেক নীচে শ্যামবাজারের গমগমে জনতা। ব্রিজের দু'পাশে বহু আঁকিবুকি কাটা রেল লাইন—দিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতা, মেদুর সন্ধ্যা তার ওপর ঝুঁকে আসছে। ডানধারে পার্শ্বনাথের ঠাণ্ডা ছিমছাম মন্দির, ভিতরে জলাশয়, তার আশেপাশে সুবেশ নর-নারী। বাঁদিকে একটি শিব মন্দিরের শুধু চূড়াটুকু উঠে আছে, তার ওপর প্রাইভেট বাসের কণ্ডাকটবরা কি কারণে যেন পয়সা ছুঁড়ে দেয়। বাস এখানে একবার শরীর ঝাড়া দিল, যেন শহরতলি ছেড়ে শহরে ঢুকবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে। শ্যামবাজারে এসে থামা মাত্র একটা বিশাল ভিড় বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সার্কুলার রোডের একটি বিশেষত্ব আছে —এতদিন চোখে পড়েনি। সার্কুলার রোডের বাঁ পাশে প্রায়শই বস্তি, কিন্তু ডান পাশে সবই প্রায় পাকাবাড়ি। সার্কুলার রোডের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এত বস্তি কেন, বস্তির বদলে ব্যারাক বাড়ি তুলে দিলে স্থান সঙ্কুলান হতো—এসব কথা তুলছি না। একটা রাস্তার একদিকে বেশি বস্তি অন্যদিকে বেশি পাকা বাড়ি—এর কারণ কি ? তখন মনে হলো, হয়তো কলকাতার প্রাচীনকালের চিহ্ন এখানে এখনো রয়ে গেছে। সার্কুলার রোড তো খাল ভরাট রাস্তা। বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যে খাল কাটা হয়েছিল—সেটাকেই পরে বুঁজিয়ে রাস্তা হয়েছে। অর্থাৎ এই রাস্তাটার ডান দিকে ছিল কলকাতা শহর, বাঁ দিকে গ্রাম—বাঁ দিকের বস্তিগুলোর এখনো বোধহয় সেই গ্রামের চিহ্ন রয়ে গেছে।

শিয়ালদহে এসেও আমার মন কেমন করল না। বিবাগী হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি—আজ আর কর্তব্যকর্ম থাক। ইতিমধ্যে পুরোনো যাত্রীরা অধিকাংশ নেমে গিয়ে নতুন যাত্রীদল উঠেছে। এক এক এলাকার যাত্রীদের পোশাকেও কিছু কিছু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে—কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। মৌলালি থেকে বাঁ দিকে ঘুরতেই দৃশ্য আমূল বদলে গেল। এ এক নতুন কলকাতা। ঝকঝকে পরিষ্কার দু'পাশের বাড়িগুলি নতুন, জানলার পরদায় হরেক শোভা, বারান্দায় রেলিং ধরে ঝোকা মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী, পুরুষদের পায় হরিণের চামড়ার চপ্পল। পথও দুভাগ করা, মাঝখানে সবুজ ঘাসের নর-চারণ ক্ষেত্র। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরোন, তখন তাঁর গুরু অ্যারিস্টটল নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীর যত জায়গাতেই যাও, মানুষের মতন এত আশ্চর্য জিনিস আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং বাসের জানলায় বসে আমি যে শুধু প্রাকৃতিক

দৃশ্যই দেখছিলুম, তা নয়, দোতলায় প্রত্যেক যাত্রীর ওঠা-নামা এবং ধরন-ধারণও লক্ষ্য করছিলুম। তাছাড়া, আজকালকার ভ্রমণকাহিনীতে একটি সুন্দরী নায়িকা এবং দুটো-একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা না থাকলে জমে না। আমার এ ভ্রমণ-কাহিনীতেও তার অভাব নেই, যথা সময়ে বলছি।

বাস তখন ভিড়ে ভর্তি, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের দুটি আসনই ভর্তি, তাছাড়াও দু-একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি বসেছি অনেক দূরে, সেখান থেকে হঠাৎ শিভালরি দেখাবার অবকাশ নেই। আমার পাশে আগাগোড়া বসে আছে একজন হিন্দুস্থানী, তার প্রতি আমার রাগের উদ্রেক হবার কোনোই কারণ নেই, কিন্তু তাঁর কাঁধে একখানি ময়লা গামছা। আমার বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, এই ভর সন্ধ্যাবেলা তুমি কি বাসে চেপে কোথাও স্নান করতে যাচ্ছ ? তা যদি না হয় তবে ঐ মহামূল্য গামছাখানা বাড়িতে রেখে এলে কি তুলসীদাসের রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যেত ? আমার সামনেও সীটের দুজন প্রৌঢ় অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় পঞ্চাশ হাজার কিংবা ষাট হাজার টাকার কি একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। পিছনের সীটে দু'জন যুবক ভারতের ক্রিকেট ভাগ্য নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত। একেবারে সামনের সীটে বসা এক ভদ্রলোক একেবারে পিছনের সীটে বসা একজন চেনা লোককে দেখে চিৎকার করে সারা বাস শুনিয়ে ঘোঁতনদা'র বিয়ের দিন কি কাণ্ড হলো সেই গল্প শুরু করলেন। বাস সি. আই. টি. রোড ছেড়ে বাঁ দিকে বেঁকল।

বণ্ডেল রোড, চার নম্বর গেট, এই সব নামগুলো কেমন যেন অচেনা। এতকাল কলকাতা শহরে আছি অথচ চার নম্বর গেটের পাশে থাকি—একথা কারুকে বলতে শুনিনি। অথচ কণ্ডাকটর চার নম্বর গেট, চার নম্বর গেট বলে চেঁচাচ্ছেন—অমনি একদল লোক হুড়হুড় করে নেমে যাচ্ছে, একদল লোক উঠছে। এখানেও তো কম লোক থাকে না। আমার ইচ্ছে হলো, একদিন পায়ে হেঁটে এ রাস্তা দিয়ে ঘুরব। এখানে রাস্তাটা খুব ছোট, দুটো বাস পাশাপাশি এলে সরু হয়ে কাৎ হয়ে যেতে হয়। উগ্র কাঁচা চামড়ার গন্ধ। পাশে রেল লাইন। ছোট ছোট খাপরার ঘরে গরু ছাগল আর মানুষ এক সঙ্গে রয়েছে। রাস্তায় কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে। বড়ো শহরের এই রকমই বৈশিষ্ট্য। 'বড়ো'র পীরিতি বালির বাঁধ, খনে হাতে দড়ি খনেক চাঁদ।' এই মাত্র ছিল সি. আই. টি. রোডের চমৎকার রাস্তা, সাজানো বাড়িঘর—মাঝখানে চামড়ার হঠাৎ গন্ধ আর বস্তি আর আবর্জনা—আবাব একটু পরেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মর্ত্যের স্বর্গ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে বাস হাজরা রোডে পড়ল।

এখানে হঠাৎ বাস প্রায় খালি। মনে হয় বাসে চড়ার মানুষ এসব রাস্তায়

খুব কম থাকে। এখন দোতলা বাসের জানালার ধারে ধারে একজন একজন বসে আছে। পাশের সীটগুলো প্রায় ফাঁকা। আমার পাশের লোকটিও কখন যেন নেমে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ উগ্র সেন্টের গন্ধ নাকে লাগল।

'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন'?

চমকে উঠলুম। কণ্ডাকটর নয়, একটি তরুণী, হালকা নীল রঙা লাইলন জর্জেট পরা, কানে দুটি মুক্তোর দুল। মেয়েটিকে সুন্দরীই বলতে পারতুম, কিন্তু ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধ সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল। মেয়েটির পিছনে বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে একটি পুরুষ, পুরুষটিকে দেখলেই বোঝা যায়—কোনো এক গোধূলি লগ্নে তিনি তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। ব্যাপারটা বোঝা গেল, বাসের প্রায় সব কটা আসনই একটা একটা খালি, ওরাঁ পাশাপাশি বসতে চান। মেয়েটি ব্যগ্র গলায় আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন?'

আমি মেয়েদের অন্ধ স্তাবক। কিন্তু এটুকু জানি, মেয়েদের আর যত গুণই থাক—সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ মেয়েরই ভদ্রতাবোধ তেমন প্রবল নয়। ট্রামে-বাসে হিলতোলা জুতোয় পুরুষদের পা মাড়িয়ে দিয়ে মেয়েরা অক্লেশে ভ্রূক্ষেপহীন থাকে, লেডিস সীটে বসে থাকা পুরুষদের তুলে দিয়ে তাদের প্রতি একটু সামান্য কৃতজ্ঞতার হাসি বিলোতেও তারা কার্পণ্য করে, এই ধরনের স্বার্থপর অনুরোধও তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। এই জন্যই পুরুষটি সলজ্জ মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যাই হোক, মেয়েদের দেখে তড়াক করে আসন ছেড়ে দিতে আমার বেশ ভালোই লাগে, তাতে মনের মধ্যে এক ধরনের সুড়সুড়ি বোধ করি। কিন্তু এক্ষেত্রে, ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধের জন্য মেয়েটিকে আমি গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছিলুম। আমি বিলিতি-প্রেমিক নই, কিন্তু দিশী সেন্টের গন্ধের চেয়ে ঘামের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, কাঁচা চামড়ার গন্ধ, পেট্রোল পোড়ার গন্ধ এসব স্বাভাবিক গন্ধও আমার অনেক ভালো লাগে। কিন্তু মেয়েটির অনুরোধ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সেইজন্য শীতকালের পুকুরে স্নান করতে নামার সময় যে রকম আলস্য লাগে—সেই রকম ভঙ্গিতে আমি চটিতে পা গলাতে গলাতে বললুম, উঠতে হবে? আচ্ছা—

মেয়েটি বোধহয় আমার ভঙ্গি দেখে অপমানিত বোধ করল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে মেয়েটি সামনের সীটের আরেকজন পুরুষের পাশে বসে পড়ে স্বামীকে বলল, তুমি ওখানেই বসো—একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।...পুরুষটি লাজুক মুখে আমার পাশে বসলেন। আমি হাসি চেপে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলুম। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, ঐ তো ট্যাক্সি যাচ্ছে, ডাকোনা ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

রাস্তা দিয়ে আলো জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, পুরুষ ও নারীটি বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সমস্বরে চেঁচাতে লাগল সেটার উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সিটা হঠাৎ থেমে পড়ল এবং দোতলা বাস তার পিছনে একটা টুঁ মারল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল জগৎ সংসার, ঝন ঝন—আমার কপাল ঠুকে গেল সামনের সীটে, মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়, বাসসুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাকসিডেনট! অ্যাকসিডেনট!

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ভিড়, দুপদাপ করে আমরা সবাই বাস থেকে নেমে পড়লুম। সেই মেয়েটির হাত ধরে পুরুষটি পিছন দিকে দ্রুত পালাল। আমার ভ্রমণ পর্বেরও সেইখানেই শেষ।

ভ্রমণের অশেষ উপকারিতা। সেদিন আমি ভ্রমণ করব এই মনস্থ করাতেই শেষ পর্যন্ত আমার বাসের ভাড়া লাগেনি।

১৬

ভেবেছিলুম এড়িয়ে যাব, ফুটপাত বদল করব। কিন্তু তিনিই তাঁর কোচকানো ভুরুর নীচের নিষ্প্রভ চোখ দুটি দিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন, বললেন, কী রে, তুই অমুক না? দাঁড়া, মনে করে দেখি, নাইনটিন ফিফটির ব্যাচ। কী, ঠিক বলেছি?

পা দুটো জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রণাম করতে হবে। আমি বালকের মতন মুখভঙ্গি করে বললুম, হ্যাঁ স্যার। তারপর, যেন মাটিতে পয়সা পড়ে গেছে, কুড়োচ্ছি—সেরকম ভাবে কোনোরকমে ঝুপ করে নিচু হয়ে কোনক্রমে পা দুটো একটু ছুঁয়েই আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ভালো আছেন, স্যার?

এরপরের ঘটনা অত্যন্ত একঘেয়ে এবং অতি সাধারণ হতে পারত। পুরোনো ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের পথে দেখা হওয়া এরকম আকছার অনেকের হচ্ছে। কথাও বাঁধাধরা, মাস্টারমশাই ছাত্রটির নাম মনে করার চেষ্টা করবেন—অঙ্ক কিংবা সংস্কৃত শিক্ষক হলে নামটা মনে করেও ফেলবেন ঠিক, তারপর প্রণাম, ঘাড় চুলকানো, কোথায় থাকিস: কী কাজ করিস, ছাত্রটি চেষ্টা করবে কতক্ষণে কেটে পড়া যায়, মাস্টারমশাই চেষ্টা করবেন, ছাত্রটি যদি বড়ো চাকরি বা ব্যবসা করে তবে তার ওখানে তাঁর নিজের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে বা ভাইপোকে ঢোকানো যায় কিনা, আজকালকার ছাত্ররা কত খারাপ হয়ে গেছে—আগেকার ছাত্ররা কত ভালো ছিল, এই আলোচনা ইত্যাদি। কিন্তু আমি একটু ইয়ার্কি করার চেষ্টার ফলে সব ব্যাপারটা বদলে গেল।

গল্প-উপন্যাসে শিক্ষকদের খুব মহৎ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়। আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গোটা ছাত্রজীবনে আমি কোনো মহৎ শিক্ষকের দেখা পাইনি। এমনি কোনো অধ্যাপক বা শিক্ষকের কাছ থেকে এমন একটি কথাও আমি শুনিনি যা আমার জীবনে দাগ কেটেছে বা আমার জীবনের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আমি যতখানি শ্রদ্ধা করি, কোনো শিক্ষককে তার চেয়ে একচুলও বেশি শ্রদ্ধা করি না। পুরোনো শিক্ষকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করা নিয়ম, অথচ বন্ধুর বাবার সঙ্গে দেখা হলে তো তা করতে হয় না সুতরাং ওটা আমার পছন্দ নয়। আমি সাধারণত শিক্ষকদের দেখলে না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। নেহাৎ মুখোমুখি পড়লে উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন একটা প্রণাম এবং দু-চারটে মামুলি কথা বলতেই হয় ভদ্রতাবশত।

চৌধুরী স্যার আমাদের অঙ্কের ক্লাশ নিতেন। আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখনই তিনি বুড়ো, এই আঠারো বছরে তিনি আর একটু বুড়ো হয়েছেন এবং রিটায়ার করেছেন। বিষম রাগী ছিলেন, কথায় কথায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাতেন, কনফাইন করতেন, খুব গালাগাল দিতেন, ওর প্রিয় গালাগাল ছিল, চেহারা দেখলেই বোঝা যায় 'গোমুখ্যুর বংশে জন্ম!' চৌধুরী স্যারের উপর খুব রাগ ছিল আমাদের—এখনকার ছেলেরা শিক্ষকদের ছুরি দেখায়, বোমা মারে—আমরা অতটা করতুম না বটে, কিন্তু ক্লাশে বেড়াল ডাকা কিংবা গণেশ চৌধুরীকে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলা, গনশা, কী রে গনশা, কলা খাবি ?—এসব খুব চলত।

সুতরাং সেই চৌধুরী স্যারকে দেখে আমার খুব খুশি হওয়ার কথা নয়, পুরোনো কথা মনে পড়ল। আমি একটু ইয়ার্কি করার লোভ সামলাতে পারলুম না। নানা কথার পর উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই কতদূর লেখাপড়া করেছিলি ? এম. এ. পাশ করেছিলি তো ?

—আমি বললুম, না স্যার।

—এম. এ. পাশ করিসনি ? তোর বাবা পড়াল না ? তাহলে বি. এ. পাশ করেই।

—না. স্যার, বি. এ. পাশও করতে পারিনি।

—বি. এ. পাশ করিসনি ?

—না। আই. এস-সি.-তে পর পর দুই বছর গাড্ডু খেলুম, তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দিলুম।

—আই. এস-সি. ফেল করেছিলি, তুই তো লেখাপড়ায়...কলেজে গিয়ে...শেষ পর্যন্ত ফেল করলি ?

—হ্যাঁ স্যার, অঙ্কতেই পর পর দুই বছর গাড্ডু মেরে আর ধৈর্য রইল না, ছেড়ে দিলুম পড়াশুনো।

—অঙ্কে ফেল করলি? আই. এস-সি.-তে...সোজা অঙ্ক...ফেল করলি?

মাস্টারমশাইর মুখখানা বদলে গেল, ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ, ছানি পড়া চোখ দুটো ভিজে ভিজে, এগিয়ে এসে আমার হাতখানা চেপে ধরে কাতর আর্তনাদ করে বললেন, অঙ্কে ফেল। অঙ্কেই—

তখন তো আর অন্য কিছু বলা যায় না আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মাস্টারমশাই বললেন, তুই বাবা একটু আমার সঙ্গে যাবি? তোর সঙ্গে দুটো কথা বলব—কাছেই আমার বাড়ি, আয় না, দশ মিনিট!

এমনভাবে বললেন, যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাছাড়া আমার সঙ্গে কী কথা বলবেন তা শোনারও কৌতূহল ছিল। সঙ্গে গেলুম। কাছেই গলির মধ্যে বাড়ি, একতলার অন্ধকার ঘর, পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খোলার চেষ্টা করলেন, হাত কাঁপছে ওঁর—তালা খুলছে না, আমি সাহায্য করতে এলুম। উনি বললেন, ছেলেটা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। একাই থাকি।

ঘর ভর্তি ছেঁড়া বই, তক্তাপোষে বিছানা গোটানো, দুটো চেয়ারও ছিল, আমাকে খাতির করে বললেন, বোস বাবা, ঐ চেয়ারটাতে বোস! মাস্টারমশাইকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল, নিজে ঝিম মেরে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তাঁর মন যেন শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। দুজনেই চুপচাপ, একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। পরিবেশ সহজ করার জন্য আমিই কথা তুললুম, স্যার আপনি তো আর এখন ঐ ইস্কুলে নেই।

—না, দু-বছর আগে রিটায়ার করেছি। এক বছর এক্সটেনশানও দিয়েছিল...

—এখন কি তাহলে অন্য কোথাও...

—না রে বাবা, দুটো টিউশনি করি—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হাজার সাতেক টাকা পেয়েছি, নিজেরও জমেছিল তিনচার হাজার—আর যে-কটা দিন বাঁচব—ভালোই চলে যাবে। ছেলেও দেয় কিছু মাঝে মাঝে—একেবারে বাপকে ফেলেনি, শুধু ওর বউ—এর সঙ্গে আমার বনে না।

—তাহলে স্যার সারা জীবন তো প্ররিশ্রম করলেন, এখন একটু দেশ ভ্রমণ-ট্রমণ, মানে কোথাও গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম—

—হ্যাঁ কাশীতে গিয়েছিলাম গত বছর, কিন্তু অন্য কোথাও মন টেঁকে না—

আবার হঠাৎ থেমে গেলেন, সোজাসুজি তাকালেন আমার দিকে, অসহায় বৃদ্ধের স্তিমিত ছলছলে চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ভাঙা-ভাঙা গলায়

বললেন, তোকে যে কথাটা বলব বলে ডেকে এনেছি, তোর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি বাবা, তুই আমায় ক্ষমা কর।

—সে কি?

—আমি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে বলছি যে আমাকে তোরা ক্ষমা করিস, আমি অনেক দোষ করেছি, মহাপাপ করেছি—

আমি চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। বৃদ্ধের চোখে স্পষ্ট জলধারা। আমি বললুম, না না, স্যার, একি বলছেন আপনি, আমরাই কত দোষ করেছি—

– না রে, ওসব না। আজ জীবনের শেষ সীমায় এসেছি, দু-চারদিন পরেই সব ছেড়ে যেতে হবে—আজ সব কথা মনে পড়লে বড়ো অনুতাপ হয়। ছেলেদের শিক্ষার ভার নিয়ে কত ফাঁকি দিয়েছি, ক্লাশে ঘুমিয়েছি কতদিন, প্রাইভেট টিউশনি করার ঝোঁকে ক্লাশে পড়ানো ফাঁকি দিয়েছি, বড়োলোকের ছেলেদের বেশি শাস্তি দিতুম যাতে তারা আমাকে প্রাইভেট টিউটর রাখে, সত্যিকারের বিদ্যাদানের বদলে শুধু ধমকধামক দিয়ে—ওরে মহাপাপ, এসব মহাপাপ করেছি আমি—

—না স্যার, আমরাই অমনযোগী ছিলুম, ক্লাশে গণ্ডগোল করতুম-

—ছেলেরা তো দুষ্ট হবেই, কিন্তু সত্যিকারের বিদ্যা অর্জনের আনন্দ যদি তাদের চিনিয়ে দেওয়া যেত, তা দিইনি ফাঁকি দিয়েছি—কত হাজার হাজার ছেলের জীবন অন্য রকম হতে পারত—

মাস্টারমশাই ময়লা রুমাল বার করে চোখের জল মুছলেন। এখন আর কান্না লুকোনোর কোনো চেষ্টাই নেই। জীবনের অস্ত-গোধূলিতে এসে বৃদ্ধের স্বেচ্ছা-অনুতাপ। এখানে কিছু বলাও যায় না। অন্যের চোখের জল দেখলে আমারও চোখে জল আসতে চায়- এই আমার এক বিশ্রী চোখের অসুখ, সুতরাং আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলুম। মাস্টারমশাই আবার বললেন, আমার ছেলেটা কলেজে পড়ায়, ওকে আমি বলি, আর সব কাজে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু মাস্টারিতে ফাঁকি দেওয়া মহাপাপ। কিন্তু সেও দেখি ঠিক মতন ক্লাশে যায় না, নোট লেখার জন্য ব্যস্ত, বাড়িতে কোচিং পড়াবার বদলে থিয়েটার কাগজে বক্তৃতা দেয়- আমার কথা শুনবে কেন? আমারও বলার মুখ নেই আমি নিজেই—

—স্যার, আমি তাহলে আজ যাই?

—যাবি? যদি পারিস ক্ষমা করিস—আর কটা দিনই বা বাঁচব—এখন মনে হয় জীবনটা যদি আবার গোড়া থেকে শুরু করা যেত—তাহলে এবার একটুও ফাঁকি দিতাম না, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে—

—আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় স্যার আবার যদি ছাত্রজীবনটা গোড়া থেকে

শুরু করা যেত—তাহলে এবার সত্যিই মন দিয়ে পড়াশুনা করতুম। মাস্টার-মশাইদের অসম্মান করতুম না, জ্ঞানের মর্ম এখন বুঝতে পেরেছি—কিন্তু এসব কথা বড্ড দেরিতে মনে পড়ে—

আসবার সময় মাস্টারমশাইকে আমি আবার প্রণাম করলুম। এবার সত্যিকারের আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে।

১৭

হ্যালো? জয়ন্তী আছে? কে জয়ন্তী? আজ দুপুরে কি করলুম জানিস? গেস হোয়াট?

—কী?

—ওকি, তোর গলা ওরকম কেন? ঘুমোচ্ছিলি?

—না-না। দুপুরে কি করলি বল না!

—দাড়া এক সেকেণ্ড। মা ঘরে এসেছে, চুপ, শোন তোর হিস্ট্রির নোটগুলো আমায় একটু দেখতে দিবি—?

—হি-হি-হি, ন্যাকা। দুপুরে কি করলি বল না।

—জানিস ভাই, আমার স্মিথের বইটা খুজে পাচ্ছি না...

—এই শর্মিষ্ঠা চুপ করে রইলি কেন?

—চুপ, আচ্ছা, মা চলে গেছেন। জানিস আজ দুপুরে সোবার্সকে ট্রাঙ্ককল করেছিলুম।

—সোবার্স? রিয়েলি? পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ—। এমন মজা, হা-হা-হা।

—কী বলল? কী বলল?

—ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যালো, হ্যালো, জয়ন্তী শুনতে পাচ্ছিস, সোবার্স আমাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কে? আমি বললুম, সেই যে ক্যালকাটা টেস্টের ফিফথ ডে-তে একটি মেয়ে প্যাভেলিয়ানে আপনার কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছিল... মেরুন রঙা সিল্কের শাড়ি, হলদে কাশ্মিরী স্টোল, সাদা রঙের ঘড়ির ব্যাণ্ড—সেই মেয়েটিকে—

—হি-হি-হি—চিনতে পারল? যাঃ, আঃ, লাইনটায় এত ডিসটার্বেন্স হচ্ছে, চিনতে পারল?

—হ্যাঁ, ও বলল, ঠিক চিনতে পারছি। আমি জিজ্ঞেস করলুম, হা-হা-হা, তুমি

অঞ্জুকে কি দেখে পছন্দ করলে? বাঙালি মেয়ে তোমার পছন্দ হলো না?

—কী বলল? কী বলল? হ্যালো? আঃ, লাইনটায় এমন।

—কী বলল জানিস? হা-হা-হা...ব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টি হতে রাজি হয়েছে, মিঃ দাশগুপ্ত, আপনি তা হলে—হ্যালো, এ আবার কে? হ্যালো জয়ন্তী?

—হ্যাঁ, বল, মাঝখানে অন্য কে-যেন কথা বলছে, তারপর সোবার্স কি বলল?

—সত্যি, ওর খুব সেন্স অব হিউমার আছে। সত্যিকারের পারফেক্ট অল রাউণ্ডার।

—কী বলল বল না? অঞ্জুর নাম শোনার পর।

—বলল,...হা-হা-হা, আই মে ইয়েট চেঞ্জ মাই মাইণ্ড। বুঝলি?

—তোমরা এখন একটু লাইন ছেড়ে দেবে? ক্রস কানেকশন হয়ে গেছে।

—কে? ক্রশ কানেকশন হয়েছে তো আপনি লাইন ছেড়ে দিন! আমরা জরুরি কথা বলছি।

—আমারটাই বেশি জরুরি। তোমরা লাইন ছেড়ে দাও।

—আপনি তুমি বলে কথা বলছেন কেন? ভদ্রতাও জানেন না।

—শোন খুকুমনি, আমার ট্রাঙ্ককল, আমি দেরি করতে পারছি না, তোমাদের অনুরোধ করছি।

—আবার খুকুমণি বলছেন? অভদ্র কোথাকার।

—আমি সত্যি অভদ্র নই, কিন্তু এত বিশেষ দরকার—দয়া করে শোনো।

—আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না।

—আমিও ঠিক তাই। এখন তোমার বদলে মিঃ দাশগুপ্তার গলা শোনাই আমার পক্ষে বেশি জরুরি। পরে অবশ্য তোমার সঙ্গে কথা বলে ধন্য হতে পারি—

—দূর ছাই।

ক্রি-রি-রি-বিং। হ্যালো? কে জয়ন্তী? এমন অভদ্র লোকের পাল্লায় পড়ে লাইনটা কেটে দিতে হলো—

—আমি জয়ন্তী নই, আমি গারফিল্ড সোবার্স কথা বলছি।

—আবার? চারিদিকে খালি অসভ্য লোক। আপনি কে?

—বললুম তো, সোবার্স। চিনতে পারছেন না?

—ইনক্রেডিবল। সোবার্স বাংলা জানেন না।

—কলকাতায় এসে থাকব বলেই তো একদিনে তাড়াতাড়ি বাংলা শিখে নিলাম।

—মোটেই না, আপনি একটি অসভ্য চ্যাংড়া। এখানে কিছু সুবিধে হবে না। আপনি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন?

—কি করব? টেলিফোন তুলেই যদি মেয়েদের গলা শোনা যায়, তাহলে না শুনে পারি?

—সত্যি করে বলুন, আপনি কে? আপনার নাম কি?

—সত্যি বলব? আমার নাম যযাতি।

—যযাতি, যযাতি কি?

—শুধুই যযাতি। শর্মিষ্ঠা, তুমি আমায় চিনতে পারছ না? আমি সেই অনন্ত যৌবন যযাতি, তোমার জন্য।

—আবার অসভ্যতা? আপনার লজ্জা করে না?

—লজ্জা করা উচিত তো তোমার। যযাতির বদলে তুমি সোবার্সকে—

—দূর ছাই।

ক্রি-রি-রি-রিং। হ্যালো? আপনি কে বলছেন, আগে নাম বলুন।

—ওকি রে শর্মিষ্ঠা, তোর কি হলো? আমি জয়ন্তী বলছি।

—জয়ন্তী? বাবাঃ, বাঁচলুম। এমন সব বাজে লোকেরা টেলিফোন করে বিরক্ত করে না। এই মাত্র একটা লোক টেলিফোন করে যা-তা বলছিল—

—কি বলছিল রে?

—ঐ, যা সব ছেলেরাই বলে, আমাকে ভালোবাসে, আমাকে না দেখলে বাঁচবে না।

—হি-হি-হি, তোর এত অ্যাডমায়ারার, কি করবি বল। নাম বলেনি? রণবীর নয় তো?

—কে জানে! একবার বলছিল সোবার্স, একবার যযাতি—কি করে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পায় বলত? ভূতুড়ে ব্যাপার—আমার নামই বা জানল কি করে?

—তা হলে বোধহয় প্রদ্যোৎ ব্যানার্জি। ও তো সব সময়ই তোকে টেলিফোন করার চেষ্টা করে।

—দু চক্ষে দেখতে পারি না ছেলেটাকে। এমন ন্যাকা—

—জানিস, কাল আমাকেও দু'জন টেলিফোন করেছিল, বিকাশ আর ধনঞ্জয়—

—ধনঞ্জয়? ওর সঙ্গে তোর তো ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ। জন্মেও ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। তবু টেলিফোন করে বিরক্ত করবে, কাল দুপুরে একটু পড়তে বসেছি—

—হি-হি-হি, তুই এখনো দুপুরে পড়তে বসিস।

—কি করব, অভ্যেস তো রাখতে হবে। ১০৮ দিন কলেজ বন্ধ।

—সত্যি ভাই, দুপুরগুলো যে কি করে কাটাই। ধনঞ্জয় কি বলল?

—তোর তো খুব ধনঞ্জয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখছি। কি রে, ভেতরে ভেতরে—

—আমার বয়ে গেছে। ওসব কবি-টবি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

—তোর লেটেস্ট এখন কে রে? বিমান?

—বিমান তো দিল্লি চলে গেছে। বোধহয় ওখানকার কলেজেই ট্রান্সফার নেবে।

—আহা, তাই তোর এত মন খারাপ, হি-হি-হি।

—মন খারাপ আবার কোথায় দেখলি? তুই হেনরি মিলারের সেই বইটা ফেরৎ পেয়েছিস? আমায় দে-না।

—ওটা! সুমিতা নিয়েছে, দুবার পড়েছে। তুই লুকিয়ে রাখতে পারবি তো বাড়িতে? বড়োরা কেউ দেখলে, ইট মাইট...বুঝলি তো একটা আননেসেসারি গণ্ডগোল—অবশ্য সবাই পড়তে চায়, লাবণ্যর ছোট কাকা, বুঝলি হি-হি-হি, সেই যেন সেন্ট্রালের সেক্রেটারি, খুব মরালিস্ট, হাতে বইখানা দেখে কেড়ে নিলেন, তারপর দেখা গেল তিনি নিজেই গোপনে বিভোর হয়ে পড়েছেন হি-হি-হি।

—হিপক্রিট। তুই আমাকে কবে দিচ্ছিস? আমার বাড়িতে একটাও বই নেই, সব বই—

—কি, চুরি গেছে?

—না-না, বলছি, না-পড়া গল্পের বই একটাও নেই, আচ্ছা শোন—

—দাঁড়া এক মিনিট, কে যেন বাইরে ডাকছে। লাইনটা ধরে থাকিস,—ছাড়িস না।

—নিঝুম সন্ধ্যায়, ক্লান্ত পাখি গায়...তুম সে মোহাবৎ হো গোয় হ্যায় মুঝে পালকো কি ছাঁউ...

—কি রে, গান শুরু করেছিস। এই শর্মিষ্ঠা শোন, প্রদীপ্তদা এসেছেন।

—তা হলে আমি রেখে দিচ্ছি। তোমরা এখন নিভৃতে কুজন শুরু করো।

—না-না, শোন প্রদীপ্তদা সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তুই যাবি?

—তোমাদের সঙ্গে আমি গিয়ে কেন ভিড় বাড়াব বাবা? শেষে আমায় অভিশাপ দেবে—। টু ইজ কমপানি, থ্রি ইজ ক্রাউড।

—যাঃ। চল্ না, প্রথমেই একটা সিনেমায় যেতে রাজি হয়ে গেলে ছেলেরা বড্ড লাইসেন্স পেয়ে যায়। হি-হি-হি— জানিস তো কী রকম হ্যাংলা সব—

—আমি তোকে শীল্ড করতে যাব? মোটেই না—

—এই এই শোন, প্রদীপ্তদা তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন—হ্যালো শর্মিষ্ঠা,

চলো না, একটা সিনেমা দেখে আসি?

—কী ব্যাপার, ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হওয়ার ক্যাণ্ডিডেটের পড়াশুনো ছেড়ে এত সিনেমা দেখার জন্য ব্যস্ততা?

—পড়াশুনো? তিন মাস বই ছুঁয়েছি নাকি? প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেটদের মতন দুপুরবেলা বাড়িতে বই মুখে নিয়ে বসে থাকব? চলো, চলো।

—কী বই দেখব? হিন্দী ইংরেজি একটাও তো বাকি নেই। আজকাল এক-একটা বই এত বেশি দিন চলে—

—সব দেখা হয়ে গেছে? তা হলে চলো বাংলা।

—বাংলা? ঐ একঘেয়ে প্যানপ্যানানি? নাঃ,আপনারা দুজনেই যান।

—না, তুমিও চলো, তুমি না গেলে ভালো লাগবে না।

—ইস। আমার জন্য যেন কত ব্যাকুল আপনি। আর ভদ্রতা করতে হবে না।

—তুমি জানো না, আমি মনে মনে কতখানি...একটু দেখা পাবার জন্য, একটু কথা—

—থাক, থাক, ওদিকে আবার শুনে ফেলবে। তা হলে দুকূলই হারাবেন।

এই রকম সংলাপ আরো বহুক্ষণ চলবে। একটি কলেজের এবা তিনজন স্কলারশীপ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী।

১৮

কী থেকে শুরু হয়েছিল জানি না, আমি যখন মাঝপথে বাসে উঠেছি, তখন পাশাপাশি দুটি সীটে তুমুল ঝগড়া চলছে। দু'পক্ষই প্রায় মধ্যবয়স্ক বাঙালি। মূল যোদ্ধা দুজন, কিন্তু বিয়েব দিন বরেব সঙ্গে যেমন নিতবর থাকে ডুয়েলে থাকে সেকেণ্ডম্যান, তেমনি ট্রাম-বাসের ঝগড়াতেও উভয় পক্ষেই একজন অন্তত সঙ্গী থাকে। এখানেও তাই। এপাশে দুজন, ওপাশে দুজন। এপাশেও একজন ধুতি, একজন প্যান্ট, ওপাশেও তাই।

ঝগড়ার ডিগ্রিও আছে। প্রথমে একটু একটু গলা চড়বে। তারপর মুখ খারাপ। তারপর হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াতে পাবে। আমি যখন প্রত্যক্ষদর্শী হলুম, তখন "ভদ্রলোকের মতন জামাকাপড় পরলেই ভদ্দরলোক হয় না,...ইতরের মতন কথা বলবেন না" "অত গরম দেখাচ্ছেন কি, কেন মারবেন নাকি? ঢের ঢের মারনেওয়ালা দেখেছি"—এই ধরনের শ্রবণ-সুখকর বাক্যবলী বর্ষিত হচ্ছে।

এপাশের নিতবরটি বলছে, "ছেড়ে দে সুখেন, বাজে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট করে কি হবে।" ওপাশের নিতবর: "মুখ সামলে কথা বলুন। কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন।"

বাস ময়দানের গা ঘেঁষে ছুটছে। আগুনের হল্কা মাখানো বাতাস। মেজাজ সকলেরই গরম, একটুতেই ঝগড়া তুমুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। ঝগড়ায় জড়িয়ে না পড়ে ঝগড়া শুনতে এবং দেখতে আরো ভালো লাগে। আমি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলুম।

হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সব কিছু বদলে গেল। হাতাহাতির ঠিক আগের মুহূর্তে সংলাপ এই ধরনের চলছিল, "ঠিক আছে, বাস পাড়ায় আসুক, টেনে নামাব। দেখাচ্ছি আজ, কত ধানে কত চাল। কালীঘাটের লোকেদের এখনো চেনোনি।" অন্যপক্ষ: "আমরাও গরচার লোক—গরচার লোকের গায়ে হাত দিয়ে কলকাতা শহরে কেউ এ পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়নি। ভারী কালীঘাট দেখাচ্ছে।"

—গরচা দেখাবেন না। গরচা আমাদের ঢের চেনা আছে।

—চেনা থাকলে, গরচার লোকের সামনে কেউ বুক বাজিয়ে কথা বলে না। টেংরি খুলে নেব।

—ঢের ঢের টেংরি খুলে নেনেওয়ালা দেখেছি। গরচার জগুদা আমার দাদার শালা—তার কথায় পাড়ায় ছেলেরা ওঠে বসে।

অপরপক্ষে এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপর ঈষৎ কম জোরালো গলায়, কোন জগুদা? জগদীন্দ্র সরকার?

—হ্যাঁ, পুলিশে কাজ করেন। ছ' ফুট তিন ইঞ্চি হাইট।

—মোড়ের মাথায় সাদা বাড়ি যার?

—তিনতলা বাড়ি। নীচতলায় রেডিওর দোকান—

—সে কি মশাই। উনি যে আমার মেসোমশাই। উনি আবার আপনার দাদার শালা হলেন কি করে?

—আলবাৎ। আমার দাদার নাম নীতীশ মজুমদার। জগুদার আপন বোনের সঙ্গে...

মিনিট দু-একের মধ্যে সব ঝগড়া মিটে গেল। দূর সম্পর্কের হলেও দুই পক্ষই দুইপক্ষের আত্মীয়। নিছক আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এ ধরনের তিক্ত ঝগড়া করার জন্য ওরা খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মাপ করবেন দাদা। কিছু মনে করবেন না।

—না-না, ওরকম হয়েই থাকে। মানে মেজাজ কখন কার কি রকম থাকে, বুঝলেন না, ছি-ছি, কত খারাপ কথা বলেছি।

—ভুলে যান ভুলে যান। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। আজই আসুন না।

—না, না আজ নয়। আর একদিন যাব, নিশ্চয় যাব। এই তো আলাপ হয়ে গেল এখন—

—বাড়িতে গিয়ে বলব বৌদিকে। আপনারা নামটা কি বললেন?

আমি ততক্ষণে একটা বসবার আসন পেয়েছি। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলুম, ওঁরা তাহলে এত ঝগড়া করছিলেন কি জন্য। এরকম তুমুল ঝগড়া—আর একটু হলে হাতাহাতি, রক্তপাত এমনকি খুনোখুনিও হতে পারত। কিন্তু এত সহজে থেমে গেল যখন, তখন ঝগড়াটা কি না হলেও চলত? এই খুনোখুনির ঝগড়া কি একটা নিছক খেলা। একজন জগুদার নামেই মন্ত্রের মতন কাজ হলো। জগুদা—একজনের দাদার শালা, অন্য জনের মেসোমশাই। তাহলে সম্পর্কটা কি দাঁড়াল? দাদার শালার ভায়রাভাইয়ের ছেলে। এর চেয়ে ওরা দুজনেই যে একই দেশের লোক—এটা কি আরো নিকট সম্পর্ক নয়? এটা কি ঝগড়া না-করার কারণ হতে পারে না?

এরকম ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে ট্রামে বাসে। সবচেয়ে কুৎসিত হাস্যরসের অবতারণা হয় পাশাপাশি দুটি লেডিজ সীটেই পুরুষ যাত্রী বসে থাকলে। কোনো মহিলা উঠলেন, দু সীটের দু পেয়ার যাত্রীই তখন "মানিকতলার রাস্তা দেখায় রত।" ধারের সীটের দুজন পাশের লোকের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে খুব মনোযাগ দিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখবে। কাছাকাছি মহিলা এলে পুরুষ মাত্রই তার দিকে একবার চেয়ে দেখবে—এইটাই প্রাকৃতিক এবং জৈব নিয়ম। এই সব নিয়ম উল্টে যায়—যখন কোনো পুরুষ লেডিজ সীটে বসে থাকে। তখন সেই পুরুষের কাছে পৃথিবীর যে-কোনো দৃশ্যই আকর্ষণীয়—একমাত্র নারীর রূপ ছাড়া।

সেই রকমই একদিন পাশাপাশি দুটি সীটেই চারজন পুরুষ বসে, বাচ্চা কোলে করে এক মহিলা উঠলেন। যা হয়, কেউই সীট ছাড়লেন না, এক পেয়ার ভাবলেন অন্যরা ছাড়বে, অন্যরাও তথৈবচ। মহিলাটি যে সীটের কাছাকাছি—সেই সীটের দুজনের একজন তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লেন, বাকি জন জানলার বাইরে মুখ রেখে অনবরত থুতু ফেলে যেতে লাগলেন। বাস ভিড়ে থৈ থৈ করছে, কণ্ডাক্টর ঝুলছে বাইরে—গাছে লটকানো ঘুড়ির মতন—তার ওসব দেখার সময় নেই। তখন পাশের লেডিস সীটের এক ভদ্রলোক বললেন এদিকে চেয়ে, ও মশাই, আপনাদের সীটটা ছেড়ে দিন না।

যে ভদ্দরলোক জানলা দিয়ে থুতু ফেলায় ব্যস্ত, তিনি বারেক মুখ তুলে বললেন, এটা লেডিজ সীট নয়। আমি দেখেই বসেছি।

—লেডিজ সীট নয় মানে ?

—তাকিয়ে দেখুন না।

—নিশ্চয়ই লেডিজ সীট।

—চোখ থাকে তো ভালো করে দেখুন।

বাসের কোনো লোকের আর কোনো কাজ নেই। সবাই ঝুঁকে সেই সীটের চারপাশে দেখলেন। স্টেট বাসের কোন কোন্ আসন মেয়েদের—তা সকলেরই মুখস্ত। দোতলা বাসে দুদিকে দুখানা লম্বা সীট, তার পাশে দুখানা করে। বাকিগুলো সব ভর্তি, শুধু দুপাশের দুটিতে এখন পুরুষ বসা।

দেখা গেল, জানলা দিয়ে থুতু-ফেলা লোকটির একটা যুক্তি আছে। বাসের দেয়ালে যেখানে 'লেডিজ সীট' লেবেল আঁটা থাকে, সেই লেবেলটি নেই, খুলে পড়ে গেছে, কে যেন সেখানে খড়ি দিয়ে কথাটা লিখে রেখেছিল— লেখাটাও অস্পষ্ট হয়ে প্রায় মুছে গেছে।

—লেখা না থাকলেই বা। সবাই জানে এটা লেডিজ সীট—

—মোটেই না। লেখা নেই কেন ? তাহলে সবগুলোই কি লেডিজ সীট ? সবই পাকিস্তান। মামদোবাজি—

এরপর কনভেনশান বনাম চাক্ষুষ প্রমাণ এই নিয়ে রীতিমত বচসা শুরু হয়ে গেল। খুব বেশি দূর গড়াল না, কারণ ছেলে কোলে মহিলাটি রাগতভাবে বললেন, আপনারা ঝগড়া করছেন কেন ? আমার বসার দরকার নেই, আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তখন ওপাশের সীটের থেকে একজন, এতক্ষণ পরে শিভালরাস হয়ে কোনোক্রমে শরীরটা একটু উঁচু করে বললেন, আপনি এদিকে আসুন। আসুন।

মহিলা তবু বললেন, না, আমার দরকার নেই। আধবসা লোকটি ঝপ করে আবার নিজের জায়গায় ভালো করে বসলেন।

বলতে ভুলে গেছি, দুই সীটের চারজন ভদ্রলোকই পরিচ্ছন্ন পোশাকে ভূষিত, নিখুঁত দাড়ি কামানো, নির্ভুল মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি।

দু-এক স্টপ পরেই আর একজন মহিলা উঠলেন—প্রায় প্রৌঢ়া, কিন্তু সাজ-পোশাকে খুব আড়ম্বর, চালচলন বেশ সপ্রতিভ। ভিড় ঠেলে তিনি এদিকে চলে এসে নিজেই মেয়ে-কণ্ডাক্টর সুলভ গলায় বললেন, সীট। লেডিজ সীট।

সেই সীটের একজনের ঘুম তখনো ভাঙেনি বোঝা যায়, ডালহৌসি স্কোয়ার পৌঁছাবার আগে তাঁর কানের কাছে বোমা ফাটালেও ঘুম ভাঙবে না। জানলা-দিয়ে থুতু-ফেলা ভদ্রলোক তখনো থুতু ফেলে চলেছেন। একবার সামান্য মুখ তুলে চেয়েই তিনি আৎকে উঠলেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, আরে মিলিদি, আসুন আসুন!

মিলিদি তার কি ধরনের দিদি হলো আমি জানতে পারিনি। কিন্তু কুৎসিত এই আত্ম-পর বোধ। থুতু-ফেলা ভদ্রলোক সীট ছেড়ে এবার আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি এতক্ষণ চুপ করে দেখছিলাম। কিন্তু কিছু একটা করার জন্য ছটফটও করছিলুম অনবরত। আমার পায়ে ভারী বুট জুতো—তলায় দু-একটা পেরেক উঠেছে আমি জানি। একটু ধাক্কার সুযোগে ভদ্রলোকের পায়ে আমার জুতোটা তুলে খুব জোরে চেপে দিলুম। ভদ্রলোক আর্তনাদ করে উঠে আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। আমি কাচুমাচু মুখে বললুম, সরি। দেখতে পাইনি, মাপ করবেন।

পাঠক-পাঠিকারা হয়ত বলবেন, আমি ট্রাম-বাসের কথা নিয়ে বড়ো বেশি বার লিখছি। কিন্তু ট্রাম-বাসেই আমার সবচেয়ে দুঃখের সময় কাটে। সম্ভ্রান্ত, সভ্য চেহারার লোকদের নীচতা, স্বার্থপরতা, বাচ্চা ছেলের মতন বসার জায়গার প্রতি লোভ, মেয়েদের প্রতি সম্মানবোধের অভাব, নোংরামি—এসব গিস্‌গিস করে কলকাতার ট্রামে-বাসে। আমার অনবরত মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ভাবি সামান্য পনেরো-কুড়ি মিনিটের যাত্রায় বসার জায়গা নিয়ে যারা নিজেদের মধ্যে এমন লড়াই করছে, তারা কি কোনোদিন বৃহৎ আদর্শের জন্য লড়াই করতে পারবে?

১৯

যেদিন সিগারেটের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে যায়, মনের ভুলে চা খেয়ে ফেলি দশ কাপের বেশি—সেসব দিন বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ ঘুম আসে না, যত যাচ্ছেতাই বই-ই হোক পাতার পর পাতা উল্টে যেতেই হয়, তারপর —যখন মধ্যরাত ঝিমঝিম করে, আরশোলা কিংবা টিকটিকিরও নিশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়, দূরে অপস্রিয়মাণ কোনো গাড়ির আওয়াজ পর্যন্ত করুণ মনে হয়, তখন ইচ্ছে করে আলো নিবিয়ে দিই—তার পরই, অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে একটা হাল্কা জগতের মধ্যে ডুবে থাকি।

তখন ঘুমও নয়, জাগরণও নয়। সেই অবস্থাটাকেই তন্দ্রা কিংবা আবল্লী বলে হয়তো, কিংবা ঠিক তাও নয়, ডান পায়ের পাতাটা চাদরের বাইরে বেরিয়ে গেছে —একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে, ঠিক টের পাচ্ছি, কিন্তু পা-টা সরাতে ইচ্ছে করে না—মনে হয় একটু নড়লে চড়লেই কি যেন একটা ভেঙে যাবে। একটা অদ্ভুত নেশার মতন।

আমি স্বপ্ন খুবই কম দেখি, কিন্তু ঐ রকম আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে যখন আমার

শারীরিক জ্ঞান ঠিকই আছে, কিন্তু শরীরটা যেন হাল্কা, খুব হাল্কা, সেই সময় আমি প্রায়ই নানারকম শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ কোনো অদ্ভুত আওয়াজ কিংবা গলার স্বর। এ পৃথিবীতে আমি অনেক কিছু ভয় করি, অনেক মানুষকে ভয় করি, মেয়েদের তো প্রায় সকলকেই, খুব জোরে ছুটে যাওয়া ট্রাক দেখলে আমার ভয় করে, মাঠের মধ্যে মেঘ-গর্জন শুনলে আমার ভয়-ভয় করে, এমনকি, হাসপাতাল দেখলেই আমি ভয় পাই। কিন্তু বহুকাল আমার একা ঘরে শোওয়া অভ্যেস এবং বেশ কয়েক বছর আমি কবরখানার পাশের একটি বাড়িতে কাটিয়েছি বলে আমার ভূতের ভয়টা নেই। ভূত বিশ্বাস না-করার মধ্যে কোনো সাহসের পরিচয় নেই। বরং ওটা একটা করানো ব্যাপাব। ভূত কিংবা জন্মান্তর কিংবা স্বর্গনরক বিশ্বাস থাকলে বরং ভালোই হতো, তা হলে অন্তত আশা করা যেত, যারা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আবার কখনো না কখনো দেখা হবে। মানুষের মায়া বড়ো বেশি, কারুকেই ছাড়তে ইচ্ছে করে না, মনে হয়, যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন সবাই থাক।

সুতবাং, রাত্তিরবেলা ঐ রকম সব শব্দ শুনে আমার ভয় হয় না। একদিন গভীর রাত্রে শুনতে পেলাম, আমার জানলায় কে যেন ঠক ঠক করে শব্দ করছে। কেউ যেন আমায় গোপনে ডাকছে, এই রকম একটু থেমে দুবার করে ঠক ঠক শব্দ। জানি. স্বপ্ন নয়. কেননা অন্ধকারেও আমি আমার সম্পূর্ণ শরীর দেখতে পাচ্ছি, মশাবিব আয়তন রেখাও স্পষ্ট, একদিকের জানলার একটা ভাঙা শার্শী দিয়ে ঢুকছে চাঁদের আলো। শুধু মাথার মধ্যটা হাল্কা, খুব হাল্কা। সেই হাল্কা বোধের মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচল। যুক্তি বলছে রাত্তির আড়াইটের সময় জানলায় ঠক ঠক করার মতো মানুষ তোমার চেনা কেউ-ই নেই। সুতরাং, ও শব্দটা আর কিছুই নয়, জানো তো, টিকটিকি যখন আরশোলা ধবে—তখন বারবার মাথার ঝাপটা দিয়ে আরশোলাটাকে আগে মেরে ফেলে, তখন খায়। সুতরাং, ওটা আর কিছুই নয়, টিকটিকির ঝাপটানি। আবার যুক্তির বিপরীত যে আচ্ছন্নতা—সেখান থেকে মনে হচ্ছে—কিন্তু টিকটিকি কি ঠিক ওরকম নির্দিষ্ট সময় অন্তর আওয়াজ করে? অবিকল মানুষের মতন? আওয়াজটা এমন, যেন কারুর ঠিক ঐ সময়ে এসে জানলায় টোকা মেরে সংকেত জানানোর কথা ছিল। বেশ কিছুক্ষণ আমি সেই আওয়াজটা শুনলুম। টিকটিকি না কোনো মানুষের সঙ্কেত—এই দুই সন্দেহের দোলায় আমি দুলতে লাগলুম। ভূত হবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না—ভূতরা অশরীরী—ইচ্ছে করলে তারা হাওয়া হয়ে ঘরে ঢুকতে পারে—জানলায় ঠক ঠক করবে কেন! আর থাকতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে? সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা থেমে গেল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, কে? এবার ফিসফিসে

গলায় উত্তর পেলাম, আমি! আমি!—সেই গলার আওয়াজটা এমন, যেন, চিনতে পারছ না আমি কে? আমারই তো আসার কথা ছিল। পুরুষের গলা। তবু, আমি জিজ্ঞেস করলুম আবার, কে? আর কোনো উত্তর নেই। আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলুম, না, আর কোনো শব্দ হলো না। তখন মনে হলো, তা হলে টিকটিকিই। 'আমি' কে বলল? হাওয়া—হাওয়ায় শব্দ। পরমুহূর্তেই আমি দ্রুত উঠে এসে আলো জ্বেলে বারান্দায় এলুম। জানলায় কেন, আশেপাশে কোথাও কোনো টিকিটিকি নেই। আর কেউ-ই নেই। একটা মসৃণ চাদরের মতন নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে —হাওয়া তাকে আন্দোলিত করছে না পর্যন্ত। কিছুই লাভ হলো না উঠে এসে, শুধু শুধু ঐ আচ্ছন্ন অবস্থাটা কেটে গেল।

আর একদিন ঐ রকম অবস্থার মধ্যে—আমি যখন ছেলেবেলার কথা ভাবছি, তখন হঠাৎ শুনলাম, আমার পাশে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গভীর দুঃখের নির্জন বুক-চাপা কান্না। ধড়মড় করে পাশ ফিরলুম। কেউ নেই। আলো জ্বাললুম—ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, ঘরেও কেউ নেই। তা হলে কি আমিই কাঁদছিলুম? আমার এক বন্ধুর ঠাকুর্দাকে দেখেছিলুম—তিনি ঘুমের মধ্যে নিজের নাক ডাকার আওয়াজে নিজেই জেগে উঠতেন। একা ঘরে প্রচণ্ড জোরে নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন—কে? কে? স্বপ্ন দেখতে দেখতে অনেকে ফুঁপিয়ে কাঁদে—তা হলে আমিও কি, না, আমার চোখের পাশে জল লেগে নেই, তা ছাড়া আমি স্বপ্ন দেখছিলুম না—ছেলেবেলার কথা ভাবছিলুম—আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু শব্দটাও এত স্পষ্ট শুনেছি—যে অবিশ্বাস হয় না। রাত্তিরবেলা অনেক সময় অনেক দূরের শব্দও খুব কাছের মনে হয়—দূরে কোথাও এই মধ্যযামে কেউ আকুল হয়ে কাঁদছে—আমি তাই শুনতে পেলাম? বিশ্বাস হয় না। কিংবা, ভেনিসের সেই হাতুড়ে ডাক্তার ফ্রয়েডের ধারণা অনুযায়ী—ছেলেবেলায় আমি কারুকে কাঁদিয়েছিলাম—অবচেতন মনে সেইটাই আবার শুনতে পেয়ে আমায় জেগে উঠতে হলো? ধুৎ! সারাজীবনে অনেক মানুষই অনেক মানুষকে কাঁদায়—একা মাঝরাতে সেই কান্নার স্বর শুনে চমকে উঠতে হবে কেন? আবার আলো নেবাতে যাব, হঠাৎ চোখে পড়ল—আমার মশারির মধ্যে একটা সুন্দর রুপোলি মথ আটকা পড়ে ফরফর করে উড়ছে। তা হলে কি এই মথের ফরফরানিটাকেই আমি কারুর আকুল কান্নার ফোঁপানি হিসেবে শুনেছিলাম? আলমারির মাথা থেকে একটা টিকটিকি এই সময় ডেকে উঠল, ঠিক ঠিক ঠিক।

ভারি সুন্দর এই ঘুম আর জাগরণের মাঝখানের অবস্থাটা। দুর্লভ নেশার মতন। স্বপ্নের জগৎ উদ্ভট আর অবাস্তব, জাগরণের জগতটাও তাই। কিন্তু এই

মাঝখানের অবস্থাটা—যখন চৈতন্যের প্রান্তসীমায়—তখন হাওয়া উত্তর দেয় 'আমি', 'আমি', মথের ফরফরানির মধ্যে শোনা যায় মানুষের কান্না, গাছের পাতাগুলো প্রশ্ন করে, কেমন আছ ? কেমন আছ ?—টিকটিকি মনের কথার জবাব দেয়, ফুলদানির ওপর এক ঝাঁক পরী এসে বসে হাসাহাসি করে। আমি বিভোর হয়ে সেই সময়টা উপভোগ করি। চোখ বন্ধ হয়, চোখ খোলা, কান খোলা—শরীর জেগে আছে, শুধু মাথার মধ্যটা হাল্কা, খুব হাল্কা—তাই সব কিছুর মানে বদলে যায়। এই অবস্থার মধ্যেই কি শঙ্করাচার্য মায়াবাদ উপলব্ধি করেছিলেন ?

প্রায় রাত্তিরেই আমার এই রকম অনেক চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়। আর একটা ঘটনা বলে শেষ করছি। মশারির মধ্যে ঢুকে সিগারেট টানা বিপজ্জনক—একবার ঘুমিয়ে পড়ার ফলে তোষক পুড়িয়ে, ঘরে আগুন জ্বেলে জীবন্ত দগ্ধ হতে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। আজকাল আর করি না, কিন্তু এক-একদিন রাত্রে তৃষ্ণা আর কিছুতেই মেটে না। অনবরত গলার মধ্যে কষ্ট পেতে ইচ্ছে করে। সেই রকম এক রাত্রে, মাথার পাশে অ্যাশট্রে নিয়ে শুয়ে পর পর সিগারেট টানছিলুম। মশারি ফেলিনি তখনো। কয়েকটা সিগারেট শেষ করার পর আলো নিবিয়ে শুয়ে আছি, তখন ঐ রকম আচ্ছন্ন অবস্থা—ঘুম আর জাগরণের দোলাচলে আবিষ্ট হয়ে আছি। হঠাৎ হাতের ধাক্কায় অ্যাশট্রেটা ছিটকে নীচে পড়ে অনেক খানি গড়িয়ে গেল। অ্যাশট্রেটা মাটিতে গড়িয়ে যাওয়ার যে আওয়াজ—তার মধ্যে আমি স্পষ্ট একটি মেয়ের গলা শুনতে পেলাম। সেই কণ্ঠ আমায় বলছে, আবার তুমি অত বেশি সিগারেট খাচ্ছো ? ছিঃ।—আমি একেবারে আমূল চমকে উঠলাম। অত্যন্ত চেনা গলা। মেয়েটার নাম ছিল অনু। টানা দুটি কোমল চোখ, বাঁশীর শব্দের মতন সুন্দর গলার আওয়াজ ছিল তার। ফাস্ট ইয়ারে যখন পড়ি—তখন অনুর জন্য আমি পৃথিবীটাকে তুচ্ছ করতে পারতুম। এমন ঈর্ষাপরায়ণ ছিলুম যে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে অনুকে একটা কথা বলতে দেখলেও সহ্য করতে পারতুম না। অনু বলেছিল, তুমি প্রতিজ্ঞা করো আর সিগারেট খাবে না। যদি খাও তা হলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব না, কথা বলব না, কিছু না।—আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। সেই অনু আজ মধ্যরাত্রে আমার সঙ্গে আবার কথা বলছে ?

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। আমি উঠে অ্যাশট্রেটা কুড়িয়ে এনে আবার একটা সিগারেট ধরালাম। চালাকি পেয়েছে ! আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি—কক্ষনো ভাঙি না। অনুর সঙ্গে যতদিন দেখা হতো—তখন আর সিগারেট সত্যিই খাইনি। কিন্তু অনুই বা সতেরো বছর বয়সে মরে গেল কেন ? ওর কি মরে যাবার কথা ছিল ? ও বলেনি, সিগারেট না খেলে ও চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে ? ও কেন কথা রাখেনি ? আমার বুঝি অভিমান নেই ? রাগ নেই ?

২০

মন খারাপের কথা কারুকে বলতে নেই। প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা রকম মন খারাপ থাকে, গোপনতাই তার পবিত্রতা।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক মানুষের মতই আমি সুখে আছি। স্বার্থপর ছাড়া সুখী হওয়া আজ আর বিশেষ কারুর পক্ষে সম্ভব নয়, আমিও পরিমিতভাবে স্বার্থপর। দেশে এত দুর্যোগ দুর্দিন গেল, তবু এর মধ্যে, সত্যিকথা বলতে কি, আমি প্রতিদিন দু'বেলাই যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য পেয়েছি। শৈশবে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ছিলাম শহর থেকে বেশ দূরে এক পল্লী অঞ্চলে, সে-সময় শুধু আলু সেদ্ধ খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছিল, এইটুকু মনে আছে—তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর বিনা আহারে কাটাতে হয়নি একবেলাও। বড়োজোর পোনা মাছের বদলে তেলাপিয়া খেতে হয়েছে, ভাতের বদলে শুকনো রুটি—কিন্তু একে খাবারের কষ্ট বলা যায় না। পোশাক পরিচ্ছদেরও কোনো অভাব নেই, পুজো-আর্চ্চা কিংবা নেমন্তন্নের দিনগুলোর জন্য কাচানো ধুতি ঠিক জমা থাকে, অন্যদিন আটপৌরে ট্রাউজার্স—তারও ফ্যাশন অনুযায়ী পায়ের ঘের ক্রমশ সরু হচ্ছে। দু'তিন জোড়া জুতোও মজুত। আমার ঘরের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে না, বরং বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলে পায়ের ওপর নরম রোদ খেলা করে। ট্রাম-বাসে খুব ভিড় হলে মাঝে মাঝে অনায়াসেই ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতা করতে পারি। এই শহরে আমার বন্ধু-প্রিয়জনের-শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই। আমার স্বাস্থ্য প্রায় ভালোই। আমি রসিকতা শুনে হাসতে পারি। এই দেশ কিংবা ভারতবর্ষের স্ট্যাণ্ডার্ডে আমি যথেষ্ট নিরাপদ এবং সুখী মানুষ বলা যায়।

তবু মাঝে মাঝে কেন ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে? দুরন্ত বেগে ছুটে আসা গাড়ি দেখলে, এক এক সময় কেন হঠাৎ প্রবল ইচ্ছে হয় সামনে লাফিয়ে পড়ি? কেন কখনো কখনো কোনো নিরাবয়ব মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আন্তরিক কাতরতার সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয়, আমার ক্ষমা করো? কেন?

ভাত খেতে বসে তরকারি কিংবা মাছের ঝোলে হঠাৎ একটা চুল দেখতে পেলে বুঝতে পারি সেটা কারুর দোষ নয়। তবুও অবুঝভাবে মন খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময় আমি আমার প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ঐরকম কোনো অদৃশ্য চুলের অস্তিত্ব টের পাই, আমার গা গুলিয়ে ওঠে। অনেক সময় ধপধপে পাট-ভাঙা পোশাক পরতে গিয়েও অকারণেই মনে হয়, তাতে যেন বমনোদ্রেককারী ময়লা লেগে আছে, আমার শরীর কুঁকড়ে ওঠে। স্পষ্ট টের পাই, অনেক স্বার্থপরতার বিনিময়ে আমি আমার সুখ ক্রয় করে চলেছি! চোখ শুকনো, আজকাল আর কান্না পায় না—কত বছর যে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিনি, তা মনেও পড়ে না

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, নিরালায় বসে যদি একদিন ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারতুম, বুকটা হাল্কা হতো। কিন্তু কাপুরুষ বা মেয়েদের মতন কেন কাঁদব, তাও যে জানি না।

সকালবেলা ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে দু'খানা খবরের কাগজ পড়ি অনেকক্ষণ ধরে। কত দীর্ঘকাল সংবাদপত্র আমাকে কোনো সুসংবাদ দেয়নি, তবু কোন প্রত্যাশায় আমি কাগজ মুখের সামনে মেলে সকালগুলো ব্যয় করি? সত্যিই সুসংবাদের প্রত্যাশায়, না সাধ করে দুঃখ পাবার জন্য? খবরের কাগজ পড়ার পর প্রতিদিন সকলে আমার ব্যাখ্যাহীনভাবে মন খারাপ থাকে।

হয়তো রাস্তা দিয়ে কোনো নারীর সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছি মনোরম সন্ধেবেলা, অল্প শীতের হাওয়া দিচ্ছে, সার্কুলার রোডের একটা গাছে রং-বেরঙের ঝলমলে আলো জ্বলছে বড়োদিন উৎসবের প্রস্তুতিতে। ইচ্ছে হলে আরো বেড়ানো যায়, ইচ্ছে হলে কোনো মোলায়েম রেস্তোরায় বসে উষ্ণ কফির সঙ্গে সঙ্গে সোহাগ-বাক্য বিনিময় করা যায়, হাতে হাত ছুঁয়ে যেতে পারি পরস্পরের তবঙ্গ। এই তো জীবন, এই তো সুখ। কে তা অস্বীকার করবে। তবু কিছুক্ষণ পাশপাশি হাঁটার পর আচমকা খেয়াল হয়, অনেকক্ষণ আমি কোনো কথা বলিনি। পার্শ্ববর্তিনী নারী সকৌতুকে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, তোমার কপালটা কুচকে আছে কেন? আমি সচকিত হয়ে হাত দিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করি। সত্যিই কপালে অনেকগুলো সিঁড়ি। হাত দিয়ে জলে আকা ছবির মতন সেগুলো মুছে দেবার চেষ্টা করি। কেন এরকম? আমার তো কোনো দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয়।

এসবের কোনোই মানে বুঝতে পারি না। কারণ খুঁজতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছি। মাঝে মাঝে শুধু যেন অস্পষ্ট ঝিলিক দেখতে পাই।

হয়তো আজ হরতাল। সকাল থেকেই সে জন্য আমার মন খারাপ। অথচ, কেন? সব মানুষই ছুটি চায়, আচমকা ছুটিতে তো আরো বেশি আনন্দ। ইস্কুল-কলেজে পড়ার সময় কমিটির সেক্রেটারি কিংবা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে কিরকম মহানন্দে কলরব করতে করতে সিনেমা দেখতে যেতুম, মনে নেই? রোজ কারুর অফিস যেতে ভালো লাগে না, আমারও লাগে না। হরতালের দিন তো অবিমিশ্র ছুটি। ইচ্ছে হলে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা যায়, গোয়েন্দা গল্পে মগ্ন থাকা যায়। ট্রাম-বাস না হয় বন্ধ, কিন্তু কাছাকাছি বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে তাসের হুল্লোড় তো জমানো যায় অনায়াসেই। এই তো আরাম, এই তো সুখ। কিন্তু আমার মন খারাপ হয়। শুয়ে শুয়ে আমি মন খারাপের কারণ খোঁজার চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে হয় প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে জেলে আটকে কারুকে যদি প্রচুর সুখাদ্য এবং উত্তম বস্ত্রও দেওয়া হয়—তবু কি সে সেই অবস্থাকে

সুখের মনে করবে ? আমি সেই রকম বন্দী। আমাকে এইভাবে বন্দী করা হয়েছে, সেটাই আমার মন খারাপের আসল কারণ নয়। আসল কারণ, আমি এই বন্দীত্বের অবসানের জন্য কোনো চেষ্টাও করছি না। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিবাদ জানানোর জন্য দেশব্যাপী হরতাল ডাকা একটা কাপুরুষতা, এবং আমিও ডবল কাপুরুষ, এর সক্রিয় প্রতিবাদ করার সাহস আমার নেই। আমার আত্মীয় পরিজনের নিরাপত্তা, আমার দু'বেলার খাদ্য আমার শৌখিন পোশাক, আমার সন্ধেবেলার বেড়ানোর অধিকার—এইসব সামান্য সুখ কেনার জন্য আমাকে স্বার্থপর ও কাপুরুষ হয়ে আমার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ গোপন রাখতে হবে। হরতালেরও প্রতিবাদ করি না, যে-সব কারণে হরতাল ডাকা হয়—তারও প্রতিবাদ করতে পারি না। আমি পুলিশের গুলির বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে যাইনি, আবার বিপক্ষের ইট বা হাতবোমার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে চাই না। তাহলে আমি কোথায় আছি ? আসলে আমি একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, অনেকটা স্বেচ্ছায়। যে রাস্তায় গণ্ডগোল—সেইসব রাস্তা আমি সযত্নে পরিহার করি, উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। আমি ব্ল্যাক মার্কেটে বেশি দামে চাল কিনি। এইসব ক্ষুদ্রতার বিনিময়ে আমার সামান্য সুখ, আমার স্বস্তি।

আমি কার মতো? পাশাপাশি আমরা দু'জনে এক বাসে উঠলুম। আমার পাশের সেই অপরিচিত যুবকটির চেহারা মাঝামাঝি ধরনের, দাড়ি কামানো, পরিষ্কার ভাবে চুল আঁচড়ানো, পাট-ভাঙা প্যান্ট ও সার্ট, জুতো চকচকে, হাতে একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, চোখে রোদ-চশমা। ঐ রোদ-চশমা ও ব্যাগটি বাদ দিলে যুবকটির সঙ্গে আমার খুব বেশি অমিল নেই। আমি যুবকটির শরীর ও মুখের প্রতিটি রেখা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলুম। খানিকটা ভিড়ের বাসে আমরা পাশাপাশি দাড়িয়ে, যুবকটি জানেও না অতিশয় দক্ষ গোয়েন্দার মতন আমি তার দিকে নজর রাখছি। ওর সঙ্গে আমার মিল দেখে আমি ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগলুম। যুবকটির মুখের ভঙ্গি হাল্কা ধরনের, চঞ্চল ভাবে এদিকে ওদিকে চাইছে, মেয়েদের সীটের প্রতিটি মেয়ের মুখে বার তিনেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে একজনের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতে ও পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করার আগে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিল, আশ্চর্য, যুবকটি আমার ব্রাণ্ডের সিগারেট খায়। ঐ যুবকটিও কি আমারই মতন বন্দী? ওরও কি অত্যন্ত অকারণে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় ? একথা জানার এমন দুরন্ত ইচ্ছে হচ্ছিল আমার যে আমি ঠিকই করেছিলুম, ওর কাঁধে টোকা মেরে ওকে এ কথাটা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করব। কিন্তু সেই সময়ই যুবকটি একটা কাণ্ড করল। খুবই সাধারণ ব্যাপার বলতে গেলে। একটি সীট খালি হয়েছিল, সঙ্গে

সঙ্গে যুবকটি স্প্রিং-এর মতন শরীর সক্রিয় করে আরো দুটি যুবা ও এক বৃদ্ধকে ধাক্কা দিয়ে অন্ধের মতন সীটে বসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ আমার অহংকার জেগে উঠল। না, আমি ঐ যুবকটির মতন মোটেই নয়। আমি দেশের জন্য লড়াই করিনি কিন্তু ট্রাম-বাসের সীটের জন্য লড়াই করব—এ পরিণতি আমার এখনো হয়নি। আমি এক জায়গায় থেমেছি। কিন্তু ঐ যুবকটি ঘুমন্ত, ও ঘুমের ঘোরে হাঁটছে এবং বেঁচে আছে।

আমি কি রামখেলাওনের মতন? আমাদের বাড়ির পাশের বস্তিতে রামখেলাওন থাকে। গলায় পেতলের চাক্তি ঝোলানো রামখেলাওনকে আমি মাঝে মাঝে টিউবওয়েলের পাশে দাঁড়াতে দেখি। আগে বিশাল তাগড়া জোয়ান ছিল রামখেলাওন, এখন অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। স্পষ্টই পেটভরা খাবারের অভাব কিংবা অপুষ্টিকর খাদ্যের ফল। তবু রামখেলাওন ওর ঝকঝকে কাঁসার থালাটা নিয়ে টিউবওয়েলের পাশে এসে দাঁড়ায়, চেচিয়ে ওঠে, আয়, আয়, রে-রে-রে আঃ, আঃ! সঙ্গে সঙ্গে গুটি চারেক কুত্তা কোথা থেকে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে আসে। রামখেলাওন তার সামান্য খাদ্য থেকেও দু'খানা রুটি রোজ বাঁচিয়ে রাখে, সেইগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে মহানন্দে ছুঁড়ে দেয়। টিউবওয়েলে আঁচাবার সময় রোদ্দুরের আভায় রামখেলাওনকে মনে হয় একজন পরিতৃপ্ত মানুষ। ওর মনে গ্লানিবোধ নেই। কিন্তু রামখেলাওনও ঘুমন্ত মানুষ, ওর চোখ দেখে বোঝা যায়।

না, আমি রামখেলাওন কিংবা বাসের ঐ সীট-লোভী যুবকটির মতন নই। আমার মতন মানুষের একটা বিরাট দল আছে—কিন্তু আমরা কেউ কারুকে কোনোদিন চিনতে পারব না। আমরা প্রায় নিজের তৈরি এক-একটা দুর্গ বা বন্দীশালায় লুকিয়ে আছি। কিন্তু, আমাদের সকলেরই অনিদ্রা রোগ।

২১

বাসে উঠল দুটি যুবতী মেয়ে। একজনের চোখে সোনার চশমা, অন্যজনের কপালে সবুজ টিপ। দু'জনেরই চেহারা এমন যে, পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকেই চোখ বদলে তাকাতে হয়। একজনকে ফেলে আরেকজন রাখা যায় না।

একটিমাত্র সীট খালি। ওদের সৌন্দর্য যেমন প্রায় সমান, বসবার দাবিও দু'জনেরই সমান। সুতরাং সবুজ টিপ সোনালি চশমাকে বলল, তুই বোস্।

সোনালি চশমা বলল, তুই বোস না!

—না, তুই।

—আহা, তুই বোস।

সময় দুপুর। অল্প ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অল্প গরমে অস্বস্তি বোধ করছিলুম, মেয়ে দুটি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় সুগন্ধ ভেসে এল, চোখেও শান্ত প্রলেপ পড়ল। আরো মিনিট কুড়ি বাসে থাকতে হবে, কিন্তু কুড়ি মিনিট এখন আর খুব দীর্ঘ বোধ হলো না। অন্যদিকের মেয়েলি সীটে দু'জন মহিলার পাশে একজন পুরুষ, সেই পুরুষটি এমনই বে-রসিক যে এই নতুন যুবতী দুটির দিকে একবারও চেয়ে দেখল না, মনোযোগ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফুটপাত, আঁস্তাকুড়, ট্রাম-লাইন দেখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বসল সোনালি চশমা, সবুজ টিপ দাঁড়িয়ে। সোনালি চশমা বলল, তুই ওদিকে গিয়ে বোস না। ওদিকে তো একটা সীট খালি আছে।

সবুজ টিপ ঝংকারময় গলায় উত্তর দিল, খালি কোথায়? লোক বসে আছে তো!

—উঠতে বল না!

—না। লোককে উঠিয়ে আমি বসতে চাই না।

—ঐ ভদ্রলোকেরই উচিত সীট ছেড়ে দেওয়া।

—তুই কি করে বুঝলি যে—? সবাইকে কি চেহারা দেখেই বোঝা যায়?

দু'জনে চোখাচোখি করে হাসল। বুঝতে পারলুম আসলে, ওরা বলতে চাইছে চেহারা দেখলেই কি বোঝা যায় ভদ্রলোক? কিন্তু ওপাশের যে লোকটি সীট না ছেড়ে ব্যগ্রভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে, তার ওপর আমার খুব রাগ হলো না। তা হলে, আবার, আমার চোখ নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হতো। মানুষের যদিও দুটো চোখ, কিন্তু একসঙ্গে কেউ দু'দিকে কখনো তাকিয়ে দেখতে পারে না।

মেয়ে দুটি বেশ সপ্রতিভ, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার একটু, উঁচু গলাতেই নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কে শুনছে না শুনছে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে জড়তাহীন গলায়। রসিকতাগুলো একেবারে খেলো নয়, খানিকটা সুশিক্ষার ছাপও আছে।

আমি হঠাৎ মেয়ে দুটির কাছে খুব কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লুম। ওদের আমি নাম জানবো না, জীবনে আর কখনো দেখাও হবে না, মাত্র এই কুড়ি মিনিটের বাস জার্নিতে ওরা আমার বিরক্তি অপহরণ করে নিল, আমার চোখের দৃষ্টিকে সুসহ করে দিল, তিন-চারজন পিছনের পুরুষের বাজারদর বিষয়ে হেঁড়ে গলায় আলোচনা শুনতে যে আমি বাধ্য হলুম না—তার বদলে ওদের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেলুম এজন্য মেয়ে দুটির প্রতি আমার খুবই র, তেমনি সারা বাসের বিরক্তিকর দুপুরের

ভিড়ের মধ্যে এই দুটি ঝলমলে মেয়ের উজ্জ্বল কথাবার্তা সব জিনিসটাকে সুন্দর করে দিল।

হঠাৎ এক সঙ্গেই দুজন পুরুষ উঠে গিয়ে একটা পুরো সীট খালি হয়ে গেল। এবার আমার বসবার পালা। কিন্তু সবুজ টিপ তখনো দাঁড়িয়ে, সুতরাং তাকে বসবার সুযোগ দিয়ে আমি দাঁড়িয়েই রইলুম। সবুজ টিপও দাঁড়িয়ে রইল। সোনালি চশমা বলল, এই সীট খালি হয়েছে বোস না।

সবুজ টিপ বলল, না—

সোনালি চশমা : কেন ?

—পুরুষদের সীটে আমি বসব কেন ?

—ওখানে একজন পুরুষও তো মেয়েদের সীটে বসেছে।

—অন্য কেউ বে-আইনী কাজ করলে আমিও কি করব ?

—এর মধ্যে আইন আবার পেলি কোথায় ? বসার জায়গা নিয়েও আইন! যে-যেখানে খালি পাবে বসে পড়বে—

সোনালি চশমা সবুজ টিপের হাত ধরে জোর করেই বসিয়ে দিল। তখনো পাশে একটা জায়গা খালি। আমি ইচ্ছে করলেই বসতে পারি, কিন্তু মেয়েরা মুখ ফুটে না বললে আমি ভরসা পাই না। একবার একজন মধ্যবয়স্ক মহিলার পাশে আমি বসবার পর তিনি হঠাৎ ফুঁসে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি বসলে যে বাছা ? গঙ্গাস্নান করে এসেছি, তুমি ব্রাহ্মণ তো ? আমি ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র—একথা শুনে তিনি এমন কটমট করে তাকালেন—

কিন্তু, এই ঝকঝকে তন্বী যুবতী নিশ্চিত সে-রকম হবে না। কিন্তু, ঐ যে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, আর কি এখন বসা যায় ? মেয়েদের পাশে জায়গা থাকলে—প্রথম সুযোগেই বসতে হয়, একটু দেরি করলে আর হয় না, খানিকটা বাদে হঠাৎ ঝুপ করে বসে পড়লে কী রকম বিসদৃশ দেখায়।

সোনালি চশমা খিলখিল করে হেসে উঠল, ফিসফিস করে সবুজ টিপকে বলল (আমি শুনতে পাচ্ছি), তুই এমন গোমড়া মুখ করে আছিস, তোর পাশে কেউ বসতেই চাইছে না।

—আমার কোনো আপত্তি নেই, যে কেউ বসতে পারে!

—তুই বললি না, শুধু শুধু দুজনের জায়গা—

—তুই উঠে আয় না।

—সেই একই তো কথা। আমার পাশে [illegible] —আবার দুজনের কুল কুল করা হাসি। সে হাসির কারণ কি কেউ জানে না? আমি নাকি? মেয়েরা দুটি মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে [illegible] তাকাচ্ছে, সে [illegible] আমিও বাদ যাইনি।

কী প্রাণবন্ত মেয়ে দুটি! বাতাসে ম্যাজিকের ছোঁয়া লাগিয়ে এমন সুন্দর দুপুরে বাসযাত্রা আমার কোনোদিন হয়নি, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলুম। মনে মনে সে মেয়ে দুটিকে আমি যুগ্মভাবে 'মিস ক্যালকাটা' বলে ঘোষণা করে দিলুম।

সবুজ টিপ বলল, সত্যি তো কেউ বসল না।

তখন সমগ্র পুরুষ সমাজের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়ল। দুটি সাহসিনী যুবতী যদি এত সহজ ও অনাড়ষ্ট হতে পারে—তবে পুরুষরাই বা কেন ক্যাড হয়ে থাকবে? আমি ঝুপ করে সবুজ টিপের পাশে বসে পড়লুম, গলার স্বর আমার পক্ষে যতটা সম্ভব মিষ্টি করে বললুম, ধন্যবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজি ঘটে গেল। মেয়ে দুটির মুখ মুহূর্তে শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেল, দু'জনে আর একটিও কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওদের দু'জনেরই মুখে স্পষ্ট ভূত দেখার ভয়। আমি বিষম নার্ভাস হয়ে পড়লুম। আমি তো বেশ দূরত্ব রেখেই বসেছি, মুখখানা হাসি হাসি করেই রেখেছি, এবং বিনীত কণ্ঠে বলেছি, ধন্যবাদ! তাতেই অমন হাসিখুশি দুটি কন্যা হঠাৎ যেন কুঁকড়ে গেল, কেন নিভে গেল মুখের আলো, কেন থেমে গেল কথার খুশি?

মেয়েদুটির নাম আমি কোনোদিন জানবো না, ওদের সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না, এবং আমি কোনোদিনই জানতে পারব না, কেন মুহূর্তে ওদের কলহাস্য থেমে গিয়েছিল। ঐ কুড়ি মিনিটের বাস রাস্তা ওরা আমাকে কৃতজ্ঞ করেছিল, সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আমি বলেছিলাম ধন্যবাদ। তবে? কোথাও বোধহয় একটা আইন আছে, একটা সীমারেখা, সভ্যতা শুধু এই পর্যন্তই এগিয়েছে যে, বাসে অপরিচিত মেয়ের পাশে কোনো পুরুষ আজকাল বসলেও বসতে পারে, কিন্তু কথা বলা চলবে না! কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ বলা তো সভ্যতা, তাও চলবে না?

হঠাৎ মেয়ে দুটি নামার জন্য উঠে দাঁড়াল। আমার বিষাদ ও অস্বস্তি কাটাবার জন্য, আমি যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ধন্যবাদ। মেয়ে দুটির মুখ এমন—যেন পুরো মুখই ঘোমটায় ঢাকা! ধীরপদে বাস থেকে নামল, তারপর পথে দাঁড়িয়ে সোনালি চশমা ও সবুজ টিপ এই দু'জনেই খরদৃষ্টি হেনে আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় বলল, অসভ্য কোথাকার!

ওরা জানল না, সেই মুহূর্তে ওদের আবার কি রকম সাধারণ দেখাচ্ছিল। সাধারণ, আর সবার মতন। তখন আমি ওদের যুগ্ম 'মিস ক্যালকাটা' পদবী ফিরিয়ে নিলাম।

২২

অঞ্জন বলল, ওর এখন কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না, পৃথিবীকে ও আগে যেরকম দেখতে পেত, এখনো সেইরকমই পায়, ঘাড়ে ঘুরিয়ে তাকাতে হয়।

আর সবাই সমস্বরে অঞ্জনকে সমর্থন করল, সবাই বলল, সত্যি কিছু যায় আসে না, দুটো চোখ থাকার খুব বেশি উপযোগিতাই টের পাওয়া যায় না।

এই সব সান্ত্বনার কথা। অঞ্জনের একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। মোটর গাড়ির দুর্ঘটনায়। সে দুর্ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে চাই না, প্রত্যেক মানুষকেই অনেক দুঃখ-বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—সুতরাং অন্যের দুঃখ-বিপদের কথা বেশি শুনে লাভ কি।

চোখটা বাঁচাবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিছুতেই কিছু হলো না—তবে সৌভাগ্যের কথা এই, ডান চোখটার কোনো ক্ষতি হয়নি। অঞ্জন এখন সুস্থ হয়ে উঠে চোখে চশমা পরে।

আমাদের যাদের দুটো করে চোখ এখনো আছে, আমরা চোখ না থাকার দুঃখ কি বুঝব? অঞ্জনকে ফাঁকা সান্ত্বনা দেবার কোনো মানে হয় না। অঞ্জনের অবস্থাটা বোঝাব জন্য আমি অন্যের অগোচরে একটা চোখ বন্ধ করে দেখার চেষ্টা কবলুম। তাতে মুস্কিল এই, একটা চোখ জোর করে বন্ধ করলে অন্য চোখটাও ছোট হয়ে আসে। যাই হোক, একটা চোখ হাত দিয়ে চেপে, অন্য চোখটা বড়ো বড়ো করে মেলে দেখলুম, এক পাশে অন্ধকার থাকলেও একটা দিকের সব কিছুই ভালো করে দেখা যায়—কোনো অসুবিধে হয় না বটে। আর নিজের নাকটা বেশ চোখে পড়ে, দু'চোখ খোলা থাকলে নাকটা আমরা দেখতে পাই না, এখন নাকটাই এক দিকের দৃশ্য আড়াল করে রাখে।

যাক, অঞ্জনকে তা হলে খুব বেশি অসুবিধের সত্যি পড়তে হবে না। অন্তত, দুটি চোখই যে যায়নি, কিংবা গাড়ির দুর্ঘটনায় গোটা প্রাণটাই যে হারায়নি—সেই জনাই ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

বন্ধুবা যখন অঞ্জনকে খুব সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং দুটো চোখ থাকা আর একটা চোখ থাকায় কোনোই অসুবিধে নেই—এরকম বোঝাচ্ছে, তখন আমি আলটপকা বলে ফেললুম, একেবারে অসুবিধে যে হবে না, সে কথা বলা যায় না।

—কেন?

—একটা অসুবিধে তো হবেই। অঞ্জন আর মেয়েদের দেখে এক চোখ টিপে তাকাতে পারবে না।

আশা করেছিলুম, সবাই হাসবে। অঞ্জনও হাসতে হাসতে বলবে, যা, যা! বরং মেয়েরা ভাববে আমি সব সময় তাদের দিকে একচোখে তাকিয়ে আছি!

ভেবেছিলুম, এ ব্যাপার নিয়ে ফাঁকা সান্ত্বনা দেবার বদলে হাসিঠাট্টা করাই ভালো। কিন্তু তা হলো না। অঞ্জন উৎকট গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যরা জোড়া জোড়া চোখে আমার দিকে ভৎর্সনার সঙ্গে তাকাল!

আমার যা বরাত। ঠিক জায়গায় কিছুতেই হাসির কথাটা বলতে পারি না! ভুল জায়গায় রসিকতা করতে গিয়ে বোকামির একশেষ করে ফেলি। ভালো উদ্দেশ্যে কিছু করতে গেলেও খারাপ হয়ে যায়।

অঞ্জন বিমর্ষ ভাবে বলল, আমার দরকার নেই, তুই-ই এখন থেকে যত ইচ্ছে ওরকম ভাবে তাকাবি!

—না, না, তুই ভুল বুঝেছিস। আমি ওভাবে বলিনি!

আমি একটা নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হিসেবে গণ্য হলুম, অঞ্জনের সঙ্গে আমার মন কষাকষি হয়ে গেল। অঞ্জনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় না।

অঞ্জন জানে না, আমার ঐ ভুল রসিকতার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি আর তারপর থেকে মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাই না পর্যন্ত। লক্ষ্মণের মতন মেয়েদের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে কথা বলি। তবু আমি অঞ্জনের কাছে অপরাধী হয়ে রইলুম। লোকমুখে শুনতে পাই, অঞ্জন আমার সম্পর্কে যা মতামত প্রকাশ করে এখন, তাতে মনে হতে পারে আমি একটা হৃদয়হীন, নরাধম। আমার একটা চোখ উপড়ে যদি অঞ্জনকে দেওয়া যেত, তা হলেও আমি রাজি ছিলুম। কিন্তু চক্ষু ব্যাঙ্কে জীবিত মানুষের চোখ নেয় না।

কি আমার অপরাধ? একটা না হয় বাজে রসিকতা করেছিলুম, ওরকম তো অনেকেই করে। ভালো রসিকতা করতে না পারা তো মানুষের পক্ষে মারাত্মক দোষের নয়। অথচ অঞ্জনের সঙ্গে এক সময় কত বন্ধুত্ব ছিল, এক সঙ্গে একই মেয়ের প্রেমে পড়তাম দু'জনে। এক সিগারেট দুজনে বদলাবদলি করে খেতাম।

অঞ্জনের অফিসের বন্ধু অসিত আমাকে বলল, ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন, মানুষের শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে কক্ষনো রসিকতা করতে নেই। ওটা খুব টাচি ব্যাপার। যার যে শারীরিক খুঁৎ নেই, সে সেটা না থাকার দুঃখ কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

আমি বললুম, বাঃ, আমার শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে যে কত লোক রসিকতা করে? আমি একটু বেশি রোগা আর লম্বা বলে বন্ধুরা আমার নাম দিয়েছিল 'ঝুলঝাড়া'। আমি কি তাতে রেগেছি? আমার গায়ের রং বেশি কালো বলে, কখনো কখনো ওরা আমাকে বলে আবলুস লম্বুস! অঞ্জনও তো কতবার বলেছে, তাতে কি আমাদের ঝগড়া হয়েছে? অঞ্জনের গায়ের রং ফর্সা আর স্বাস্থ্য ভালো, ও কি করে আমার মতন কালো আর রোগা লোকের দুঃখ বুঝবে?

অসিত বিজ্ঞের মতন হেসে বলল, কালো ফর্সা-টর্সা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু চোখ থাকা-না থাকার ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক বুঝতে পারছেন না ? কথাতেই বলে, চক্ষুরত্ন! তাও যদি অ্যাকসিডেন্টে সেটা নষ্ট হয়—

—প্রাণে যে বেঁচে গেছে সেটাই আনন্দের ব্যাপার। আমি তাই আনন্দ করতে চাইছিলাম! আমি চাইছিলাম, ও যাতে নিজের দুঃখ নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে।

—সব দুঃখ নিয়ে হাসা যায় না!

তারপর অঞ্জন একদিন আমার বাড়িতে এল দেখা করতে। আমি এক চেয়ারে হেলান দিয়ে, আর এক চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আলস্য করছিলাম, অঞ্জন ঘরে ঢুকে আমার সামনাসামনি দাঁড়াল। দুটি চোখ স্পষ্ট মেলে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, আরে, ভালো হয়ে গেছে ?

অঞ্জন উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নতি করেছে, সেজন্য আমি সেই মুহূর্তে পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিকের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। অঞ্জনেব মুখের সুন্দর শান্ত শ্রী আবার ফিরে এসেছে।

আমি অতি উৎসাহে ওব হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, কি করে হলো ? কবে অপারেশন করালি ?

একজন সাহেব ডাক্তার প্রতি বছর এখানে আসে গরীব লোকদের চোখের চিকিৎসা করতে—অঞ্জন তার সঙ্গে বিশেষ বন্দোবস্ত করে চোখের অপারেশন করিয়েছে। অনেক টাকা খরচ হয়েছে, তা হোক্!

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতেই কথা বলছিল অঞ্জন, শেষকালে বলল, আমি চোখ ফিরে পেয়েছি, কিন্তু দু'চোখের দৃষ্টিশক্তি পাইনি। তাতে কিছু যায় আসে না—দেখার ব্যাপারে তো আমার কোনো অসুবিধে নেই!

—তার মানে ?

—আমার এ চোখটা পাথরের। পাথরের ঠিক নয়, প্লাস্টিকের, বিদেশেই শুধু এগুলো হয়—আমি খুব লাকি, এখানে করাতে পেরেছি। এখন দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। তুই-ও তো পারিসনি!

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই অঞ্জন বলল, আমি বিয়ে করছি, সামনের সপ্তাহে। তোকে নেমন্তন্নের চিঠি দিতে এসেছি!

আমি নেমন্তন্নের চিঠিটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলাম। অঞ্জন বলল, যাকে বিয়ে করেছি, তাকে এখনো বলা হয়নি। বছরখানেক যাক, তারপর না হয় বলব—দেখে তো কিছুই বুঝবে না। না বললে কোনোদিন জানতেও পারবে না।

আমি কোনো কথা বললাম না।

অঞ্জন কিন্তু খুব হাসিখুশির ঝোঁকে আছে। খুব হালকা ভাবে বলল, তুই বলেছিলি, আমি এক চোখ টিপে তাকাতে পারব না। এখন পারি, দেখবি?

অঞ্জন ওর ভালো চোখটা বন্ধ করে শুধু প্লাস্টিকের চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল। সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই একটু ভয় ভয় করতে লাগল আমার। এই চোখ কোনোদিন কাঁদবে না, কোনোদিন ঘুমোবে না, কোনোদিন অবাক হবে না—শুধু তাকিয়ে থাকবে!

অঞ্জন হো-হো করে হেসে বলল, কি রে, ঠিক হয়নি?

আসল চোখ নষ্ট হওয়ায় আমি রসিকতা করতে চেয়েছিলুম। আজ অঞ্জন আমার সঙ্গে হালকা মনে দেখা করতে এসেছে, আমি একটাও হাসি-ঠাট্টা করতে পারলুম না। সেই কৃত্রিম চোখের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, হ্যাঁরে, দেখলে বোঝা যায় না, আর কোনোই অসুবিধে হবে না তোর!

২৩

এই কলকাতা শহরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অফিসে ঢোকার মুখে একটা ব্যাপার দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলুম। বারান্দার কোণে তিনটে বাথরুম। তিনটে বাথরুমের দরজায় আলাদা করে লেখা আছে, পুরুষ, মহিলা, গেজেটেড অফিসার।

ধর্মসাক্ষী, আমাকে দশ হাজার টাকা মাইনে দিলেও আমি ঐ অফিসে গেজেটেড অফিসারের চাকরি করতুম না। কিংবা আমাকে দেওয়াও হবে না। পুরুষ কিংবা মহিলা কারুরই ওখানে গেজেটেড অফিসার হবার যোগ্যতা নেই। গিয়েছিলুম ঐ অফিসের একজন কেরানির সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু দু'একজন গেজেটেড অফিসারকে একটু দেখে আসার লোভ সামলাতে পারিনি। চেহারা দেখে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না।

অবাক হয়ে ভাবি, ঐ অফিসের লোকেরা দিনের পর দিন এরকম একটা উৎকট রসিকতা সহ্য করছে কি করে।

আজকাল অনেক রকম দেশলাই বেরিয়েছে। একটা নতুন দেশলাই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম, হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল। লেবেলে যে কথাগুলো ছাপা আছে, তার মধ্যে একটা বানান ভুল। প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি, ভাবলুম, ফাকটরি কথাটার কি দু'রকম বানান হয়? বাড়িতে এসে ডিকসনারি দেখে পর্যন্ত মেলালুম, না, হতে পারে না, ফাকটরি কথাটার শেষে 'আই' চলতে

পারে না! তাহলে এরকম একটা ভুল ছাপা কি করে চলছে? দেশলাইটার মার্কা আমি বলে দিতে পারব না, তাহলে তাঁরা বোধহয় আমার সঙ্গে মামলা করবেন। কিন্তু একটা দেশলাইয়ের ব্যবসা তো সহজ ব্যাপার নয়, বারুদ নিয়ে কারবার! নিশ্চয়ই ওদের একটা অফিস আছে, সেখানে প্রচুর লোকজন খাটছে, এই ভুলটা তাঁদের কারুরই চোখে পড়েনি? নাকি কিছু আসে-যায় না?

নানান রকম ভুল আর উল্টাপাল্টা জিনিসের কথা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে বেশ সময় কেটে যায়। আজকালকার অনেক পূজা-সংখ্যার উপন্যাসে দেখা যায় হঠাৎ পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে যাচ্ছে, চেহারা কিংবা বাড়ি-ঘরের বর্ণনা মিলছে না, ঘটনার সামঞ্জস্য থাকছে না। এখন অনেক লেখক তাড়াহুড়ো করে লেখেন, পরে হয়ত দ্বিতীয়বার ছাপার সময় ভুল সংশোধন করে দেন। কিন্তু স্বয়ং বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে এবকম মাবাত্মক ভুল করেছেন। ভুল করাই বোধহয় ভারতবর্ষের ট্রাডিশন। যে-কোনো চরিত্রের বয়সের হিসেব করতে গেলেই তো গণ্ডগোল, তাছাড়াও রামায়ণের মূল ঘটনাতেও অসংগতি আছে। সীতাহরণের পর বেশ খানিকটা সাসপেন্স তৈরি করা হয়েছে। কে সীতাকে চুরি করল, সীতাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এসব বেশ আস্তে আস্তে উদঘাটিত করা হয়েছে। জটায়ুর মুখেই জানা গেল সীতা-লুণ্ঠনকারী হচ্ছে রাবণ। কিন্তু অতবড়ো রাজা রাবণ। তাঁর রাজত্বটা কোথায়—তা কেউ জানে না? রাবণ কোথায় থাকে—তা কেউ বলতে পারছে না, এমন কি সুগ্রীব জাম্বুবান, যারা বিশ্বভুবনের খবর রাখে, তারাও না! সীতার সন্ধানে সুগ্রীব পৃথিবীর সমস্ত দিকে তার বানর সেনা পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত সম্পাতির মুখে রাবণের ঠিকানা জেনে নিয়ে হনুমান সীতার খোঁজ নিয়ে এলেন। কিন্তু খানিকটা পরেই আমরা জানতে পারছি—সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের বেশ চেনা-পরিচয় ছিল। রাবণ একবার কিষ্কিন্ধ্যায় এসে একমাসের জন্য স্টেট গেস্ট হিসেবে থেকে গিয়েছিলেন। অতবড়ো একজন রাজ-অতিথির দেশের কথা যুবরাজ সুগ্রীব জানবেন না, তা হতেই পারে না। তাহলে রামকে তো তিনি প্রথমেই লঙ্কার খবর বলে দিলে পারতেন! অবশ্য, রামায়ণের সবটুকুই বাল্মীকির রচনা কিনা সে সম্পর্কে সংশয় আছে। অনেকেই বলেন, উত্তরকাণ্ডের অনেকগুলি সর্গ প্রক্ষিপ্ত।

একটি মেয়ের নাম অনিতা। আমি জিজ্ঞেস করলুম, নামের বানান কি লেখো, হ্রস্ব-ই না দীর্ঘ ঈ? মেয়েটি বলল, বাঃ, ন-এ দীর্ঘ-ঈ! তাছাড়া আবার হয় না কি!

আমি বললুম, হ্রস্ব-ই দিয়েও লিখতে পারো, কোনো ক্ষতি হবে না। নামের বানান তো—

মেয়েটি আমাকে মহামূর্খ মনে করে বলল—নাম তো কি হয়েছে, বাংলা

নামের বুঝি একটা মানে থাকবে না?

আমি মেয়েটিকে বোঝাতেই পারলুম না যে, অনিতা কোনো বাংলা বা সংস্কৃত নাম নয়। মেমসাহেবদের নাম থেকে নকল করা। বাংলায় অনিত অনিতার এরকম মানে করা যায় বটে, কিন্তু সেই মানেটা জানলে কোনো বাবা-মা মেয়ের ওরকম নাম রাখতেন না। আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েটির একুশ বছর বয়েস, অথচ এ পর্যন্ত তাকে কেউ ঐ ভুলটা ধরিয়ে দেয়নি। আমি তাকে হাসতে হাসতে বললুম, এখনই অত মানে বোঝার দরকার কি। আগে পরিণীতা হও তখন সব মানে বুঝবে!

ইংরেজিতে একটা ভুল অনেকদিন থেকে চলে আসছে। অনেক সরকারি চিঠির বয়ান এইরকম থাকে, 'এ লেটার ওয়াজ সেন্ট টু ইউ আণ্ডার দি সিগনেচার অফ...' এর আক্ষরিক অনুবাদ 'অমুকের সই-এর তলায় লেখা একটা চিঠি তোমায় পাঠানো হয়েছিল।' কিন্তু আসলে, সই-এর তলায় তো চিঠি থাকে না, চিঠির তলাতেই তো সই থাকে। তবে? শোনা যায়, রাজা প্রথম জেমস নাকি অহংকারবশত চিঠির নীচে নাম সই না করে চিঠির ওপর সই করতেন। তখন কথাটা চালু হয়েছিল, এখনো সেই ভুল চলছে।

প্রসঙ্গত এইরকম আর একটা ভুলের কথা মনে পড়ল। আমেরিকায় ফুটবল খুব জনপ্রিয় খেলা। লোকে এরোপ্লেনে চেপে ফুটবল খেলা দেখতে আসে। সেই ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা অর্থাৎ ইংরিজি ফুটবল খেলার কোনোই মিল নেই! আমেরিকান ফুটবল খেলায় পায়ের কোনো ব্যবহারই নেই, হাতে করে ডাবের মতন দেখতে বল নিয়ে ছোটাছুটি, ঘুঁষোঘুঁষি, মারামারি চলে। আমি একটি আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমরা ঐ খেলাটিকে ফুটবল নাম দিয়েছ কেন? প্রথমত বল জিনিসটা গোল হওয়ার কথা, তোমাদেরটা চ্যাপ্টা—আর পা দিয়ে সট মারার কোনো ব্যাপারই নেই—তবু ওটা ফুটবল খেলা হয় কি করে? সে মহা অবাক হয়ে বলল, ফুটবল খেলা হচ্ছে ফুটবল খেলা, এর আবার হওয়া না হওয়ার কি আছে?

ব্যবহারের ভুল অনেক সময়ই নজরে পড়ে এবং বেশ মজা লাগে। ট্রামে বাসে প্রায় সময়ই অন্য একটা লোককে কণ্ডাক্টর বলে ভুল হয়। এবং তাকেই বলতে ইচ্ছে হয়—বেলটা দিন তো। এরকম মনে করার প্রতিফলও আমি পেয়েছিলুম। একবার একটা চায়ের দোকানে একা একটা চেয়ারে বসে আমি চা খাচ্ছিলুম—চা শেষ হবার পরও বসেছিলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ দু'জন ভদ্রলোক মহিলা-ক্যাবিন থেকে খেয়ে বেরিয়ে এসে আমার টেবিলে এসে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে বেয়ারকে ডাকছি, আসছে না। কত হয়েছে আমাদের! পয়সাটা রাখুন! শেষকালে এতকাণ্ড করার পর আমাকে ওরা রেস্টুর্যান্টের ম্যানেজার

ভাবল ? তাহলে তো, এরপর কোনোদিন যে কেউ আমাকে কুস্তি প্রতিযোগিতার রেফারিও ভাবতে পারে! কিছুই আশ্চর্য নয়। পরিচিত অল্প-পরিচিতদের নাম ভুলে যাওয়াও অনেকের ব্যাধি। আমি একজন লোককে চিনি তাঁর সঙ্গে যতবারই আমার পথে দেখা হয়েছে, তিনি সাড়ম্বরে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন, এবং পাশে কেউ থাকলে তাঁকে আমার সম্পর্কে বলেছে আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আমার খুব বন্ধু ইয়ে, হ্যাঁ, কি যেন আপনার নামটা ? এই নাম ভুলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত যিনি, তাঁকেও আমি চিনি। তিনি অত্যন্ত পত্নী অনুগত-প্রাণ, বিয়ে হয়েছে আড়াই বছর, কিন্তু প্রায়ই বউয়ের নাম ভুলে যান। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমে জিজ্ঞেস করে যান, হ্যারে আমার বউয়ের নামটা যেন কি ? আজকাল তিনি বউয়ের নাম একটা কাগজে লিখে মানিব্যাগে রেখে দিয়েছেন। কখনো ডাকার দরকার হলে লুকিয়ে দেখে নেন।

আমি নিজেও একবার একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। কেন যে ওরকম ভুল হলো, আজ পর্যন্ত তার কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পাইনি। ছেলেবেলায় গ্রে স্ট্রিটের একটা বাড়িতে আমরা কয়েক বছর ছিলাম। বাড়িটা এমন কিছু ভালো নয়, কোনো বিশেষ মধুর স্মৃতিও নেই। সেই বাড়ি ছাড়ার এগারো বছর বাদে, তখন আমি গ্রে স্ট্রিট থেকে অনেক দূরে থাকি, কিন্তু সন্ধেবেলা সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে বাস থেকে নেমে পড়লাম গ্রে স্ট্রিটে। তারপর স্বপ্নচালিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়িটাব কাছে এসে, সোজা ভেতরে ঢুকে দোতলায় উঠে—যে ঘরে আমি থাকতাম, সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলাম, মা, মা, দরজা বন্ধ কেন ? খোলো—

এগারো বছরে সেই বাড়ির অনেক বদল হয়েছে, অন্য ভাড়াটেরাও বদলে গেছে, আমায় কেউ চেনে না। তখনও আমার ভুলটা খেয়াল হয়নি, আমি আর একবার ধাক্কা দিতেই একজন তরুণী মহিলা দরজা খুলে বললেন, কাকে চাই! তখন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। কেঁপে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। আমি নিরুত্তর। ঘর থেকে আর একজন পুরুষ বেরিয়ে এসে আমার আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাকে চান ? আমি বিড়বিড় করে কোনো রকমে বললুম, এ বাড়িতে অপূর্ব ব্যানার্জি থাকেন না ? তাহলে বোধহয় আমার ভুল হয়েছে ! আমি তখন ছুটে পালাতে পারলে বাঁচি। ভদ্রলোক বললেন, না অপূর্ব ব্যানার্জি বলে কেউ এ পাড়ায় থাকেন না। একেবারে দোতলায় উঠে এসেছেন —আমি বললুম, আমায় মাপ করুন, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি—লোকটি কৌতূহলী হয়ে তবুও জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মা মা বলে ডাকছিলেন দরজা ধাক্কা দিয়ে—

জানি পুরুষের অনুরোধে ধরণী দ্বিধা হয় না। কোনো রকমে চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, না, না আমি তো মা বলে ডাকিনি, তা কেন ডাকতে যাব, আপনি ভুল শুনেছেন, আমি মামা বলে ডাকছিলুম। অপূর্ব ব্যানার্জি আমার মামা হন। আচ্ছা চলি।

২৪

জামাটা পিঁজে গেছে, কলারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আঁশ, কাঁধের পাশে সামান্য ফাটতে শুরু করেছে, ডান হাতের কনুইয়ের কাছটায় একবার সেলাই করা, তবু জামাটা ফেলতে মায়া হয়। নীল-সাদায় ডোরাকাটা আমার জামাটার বয়েস পাঁচ বছর পূর্ণ হলো, এবার ওকে তোরঙ্গের নীচে নির্বাসন দেবার কথা কিংবা আগামী বছরের দোল খেলার জন্য জমিয়ে রাখা, কিংবা বাসনওয়ালীদের রুক্ষ হাতে সমর্পণ করলেও হয়, কিন্তু কিছুতেই জামাটাকে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছে করে না, নরম মোলায়েম স্পর্শ দিয়ে সে আমাব শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। ডায়িং ক্লিনিং-এ পাঠালে পাছে ওর সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তাই আমি ওকে নিজেই সাবধানে বাড়িতে কেচে নিই। এখন শীতকালে কোট বা সোয়েটারের নীচে পরলে ওর ছেঁড়া অংশ আর তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু বুকের কাছাকাছি থাকে।

জামাটাকে বিসর্জন দেওয়া মানেই তো কত স্মৃতি নষ্ট করা। অনেক জামা-কাপড়ের মধ্যে কোনো একটার প্রতিই অনেক সময় বেশি মায়া পড়ে, গত পাঁচ বছরে আমার কত জামা ছিঁড়ল, হারাল—কিন্তু এই নীল-সাদার ডোরাকাটা জামাটাই আমার প্রাণের বন্ধু।

মনে পড়ে, পাঁচ বছর আগে নতুন এই জামাটা কিনে দুমকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রামপুরহাট থেকে বাসে যাবার পথে প্রথম শীতের অবসন্ন আলোর সন্ধ্যায় কোনো একটা কারণে হঠাৎ আমার খুব মন খাবাপ হয়ে যাবার পর চোখে পড়েছিল ছোটখাটো দু-চারটে পাহাড়, অবোলা জন্তুর মতন রাস্তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি হিমালয় অভিযাত্রী সংঘের সদস্য কোনোদিনই হবো না। কিন্তু প্রায়ই আমার কোনো পাহাড় চূড়ায় উঠতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোনো পাহাড়ের শিখরে একা উঠে উড়িয়ে দিই আমার নিজস্ব পতাকা। সেদিন হাতের কাছেই অতগুলো চমৎকার শান্তশিষ্ট পাহাড় দেখে আমার খুব লোভ হচ্ছিল। এই নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটাকে আমি সেদিন পতাকা করে উড়িয়েছিলাম।

সেই বাসে চারজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী ছিল। কি ঝকঝকে কথা,

আর খুনসুটি হাসি তাদের, কার না ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, সংক্ষিপ্ত প্রবাসের দিনগুলো রঙ্গরসে ভরাতে। কিন্তু আমি হেরে গেলুম, যেমন অনেক খেলাতেই হেরে যাই। বাস ছাড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটি মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল, আমি শশব্যস্তে সেটা তুলে দিয়ে ভূমিকা পর্যন্ত সেরে রেখেছিলুম। মেয়েটি আমার দিকে মৃদ হেসে বলেছিল, ধন্যবাদ। আরো আড়াই ঘণ্টা এক সঙ্গে যেতে হবে—মাঝপথে ওদের জন্য চা এনে দিয়ে কিংবা অন্য কোনো ছলে ওদের সঙ্গে আলাপ জমাবার পরিকল্পনায় মশগুল ছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। মেয়ে চারটি তাদের কাচ ভাঙা কণ্ঠস্বরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, লেকে সাঁতারের ক্লাব, নিউ মার্কেট, কোন কোন চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়মিত দেখা যায়—এই সব আলোচনায় বিভোর হয়েছিল। আমি মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলুম, ওদের মুখের রেখায়, হাসির ভঙ্গি, শাড়ির ভাঁজ —এবং মেয়েদের আরো যা-যা দেখার শুধু তাই দেখছিলুম, তখন জানলার বাইরে তাকাইনি, পাহাড় কিংবা জঙ্গল দেখিনি, প্রকৃতি দেখার সময় ছিল না। চোখের সামনে জ্যান্ত প্রকৃতি থাকতে কে আর বন-জঙ্গল দেখতে চায়। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন তার কানের কাছে কব্জি তুলে বলল, ইস, ঘড়িটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরাধা, তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে?

চারটি মেয়েরই হাতে ছোট জ্বলজ্বলে ঘড়ি, কিন্তু দেখা গেল চারজনের ঘড়িতে চাররকম সময়। তাই তো স্বাভাবিক। ওরা তন্বী, ওরা যুবতী ও সৌভাগ্যবতী —ওরা চারজনই আলাদা আলাদা সময় ভোগ করবে—তাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা সঠিক সময় জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা সময় নিয়ে কলহ করে কালক্ষরণ করতে লাগল। অনুরাধার ধারণা তার ঘড়িটাই ঠিক কিন্তু রুচিরা বলছে তার ঘড়ি রেডিও মেলানো। শারমি তার দৃঢ় বিশ্বাস তার ঘড়ি কখনো এক সেকেণ্ডও শ্লো-ফাস্ট হয় না—আর দময়ন্তীর ঘড়ি তো থেমেই আছে—ধুকধুক শব্দও নেই। মোটমাট ওদের পরস্পরের ঘড়িতে পাঁচ থেকে আধঘণ্টা সময়ের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত কার ঘড়িতে ঠিক সময়—তা জানার জন্য পরস্পরের মধ্যে বাজি রাখল। রুচিরা বলল, অন্য কারুর ঘড়িতে দ্যাখ তাহলে কটা বাজে?

মেয়েদের সবচেয়ে কাছের সীটে আমি বসে আছি। আমার ফুলহাতা নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটায় কব্জি পর্যন্ত বোতাম আঁটা। ওরা আমার দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন করল, কটা বাজে? কিন্তু আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই, আমি ঘড়ি হাতে দিই না। সময়কে অত নিখুঁতভাবে জানার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আলোর যেমন সাতটা রং, সেইরকম ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে, রাত্রি, গভীর রাত্রি—এই সাতটা বেলা আমি খালি চোখে দেখতে পাই—এতেই

আমার কাজ চলে যায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ করার এই তো সুযোগ। ঘড়ি নেই শুনলে ওরা কি আর আমায় পাত্তা দেবে? আমার বেশভূষা দেখে ওরা ধরেই নিয়েছে—আমার যখন চোখ কান সবই ঠিক আছে—তখন হাতে ঘড়িও আছে—তাই তো থাকে। সুতরাং আমি স্মার্ট হবার জন্য বললুম, আপনাদের ঘড়ির সময়গুলো যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিন—তাহলেই ঠিক সময় পেয়ে যাবেন।

মেয়েদের কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই আমার পাশের ব্যাচ থেকে একজন যুবা বলে উঠল—এখন ঠিক চারটে বেজে সাতচল্লিশ। যুবকটি আস্তিন গোটানো কব্জি উঁচু করে ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে—ঘড়িটার চেহারাই এমন ইম্প্রেসিভ যে, দেখলেই মনে হয়—ওরকম ঘড়ি ভুল সময় দিতে পারে না। যুবকটি তবুও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, কী রে বরুণ তোর ঘড়িতে কটা বাজে? সঙ্গী উত্তর দিল ঠিক, ঐ চারটে বেজে সাতচল্লিশই। রুচিরা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, দেখলি বলেছিলুম না, আমারটাই—

যুবক দুজনের নিখুঁত পোশাক, চুল ও জুতো সমান ঝকঝকে এবং ওদের হাতে সঠিক সময়। ওরাই জিতে গেল। যুবক দুজনের একজন ঐ মেয়েদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি কি প্রশান্তর বোন? সেই মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত মুখে বলল, হ্যাঁ, আপনি আমার দাদাকে চেনেন বুঝি? যুবকটি বলল হ্যাঁ, চিনি মানে—আপনার দাদার এক বন্ধু আমারও খুব বন্ধু, সেই হিসেবে একবার... আমার বন্ধুর নাম সিদ্ধার্থ মিত্র। রুচিরা বলে উঠল, ও, সিদ্ধার্থদা? হ্যাঁ হ্যাঁ—

সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আর কথার অভাব হয় না—যুবক দুটির সঙ্গে মেয়ে চারটি প্রচুর ভাব বিনিময় করতে লাগল। আমি একেবারে হেরে গেলুম। আমার দিকে ওরা ফিরেও চাইল না। বিষণ্ণ মুখে আমি প্রকৃতি দেখা শুরু করলুম জানলা দিয়ে।

সূর্য সবে ডুবছে। ডিমের কুসুম মতো লাল একদিকের আকাশ। চওড়া পথে শুধু আমাদের বাসটা একমাত্র ছুটছে, মাঝে মাঝে ধাবমান গাছ, দূরে কাছে দু-একটা টিলা। মন খারাপ হলেই প্রকৃতিকে বেশি ভালো লাগে সন্দেহ নেই। মেয়ে চারটিকে ক্রমশ আমার অসহ্য লাগল—মনে হলো হাল্কা, প্রগলভা, ফচকে মেয়ে সব—সময়ের মর্ম বোঝে না—তবুও হাতে ঘড়ি পরা চাই। আমি ক্রমশই পথের পাশের নীরব দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলুম।

বাস থামল এক জায়গায়। চা খেতে নেমে আমি কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলুম এরপর আরো বাস আছে? সে বললে অনেক অনেক। সেই বাসটা যখন আবার ছাড়ল—আমি আর তাতে উঠলুম না।

আস্তে আস্তে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগলুম। লাল কাঁকর মেশানো জমি, সজনে আর মহুয়া গাছ এদিক ওদিক ছড়ানো। নির্জনতা এখানে গগনস্পর্শী। কাছেই একটা খুব ছোট্ট পাহাড়। পাহাড় নয়, টিলা কিংবা ঢিবিও বলা যায়—আমি সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মনের ভেতরটা বিষম ভারী, বিষণ্ণতা আর অভিমান চাপ বেঁধে আছে। সেই নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে মনে হলো যেন সারা জীবনটাই বঞ্চিত হয়ে গেছি। অথচ কি জন্য? বাসের মধ্যে চারটি ঝকঝকে মেয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে অপর দুজনের সঙ্গে কথা বলেছে, সেইজন্য? অসম্ভব অবাস্তব এই বিষণ্ণতা —সামান্য একটা জিনিসও না পেলে—সারা জীবনের সমস্ত না-পাওয়া দুঃখ এসে ভিড় করে।

টিলাটার পাথরগুলো খাড়া এবং মসৃণ একটাও গাছ বা লতা নেই। কিন্তু খাঁজ রয়েছে অনেক, বেশি উঁচুও নয়। একবার সামান্য পা পিছলে ধাক্কা খেতেই ধারাল পাথরের খোঁচায় কনুইয়ের কাছে জামাটা ছিঁড়ে গেল। ইস, নতুন জামা! আমার প্রিয় নীল-সাদা ডোরাকাটা জামা। আর একটা দুঃখ বাড়ল। যুক্তিসঙ্গত ভাবে পর্যাপ্তভাবে আজ আমার মন খারাপ করার সময়।

কিন্তু টিলাটার ওপব যখন উঠে দাড়ালুম, সব বদলে গেল। বুকের মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিঃসঙ্গতা এত বিশাল যে তার রূপ অন্যরকম। টিলার ওপর দাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, সাঁওতাল পরগণার আকাশ ও প্রান্তর। দূরের গ্রামে দু-চারটি ফুটকি ফুটকি আলো—এছাড়া পাতলা জল-মেশানো ছাই রঙে ভরে গেছে দশদিক। টিলার ওপর আমি একা দাঁড়িয়ে —কিন্তু একটুও নিঃসঙ্গ মনে হলো না। মনে হলো এই পাহাড়, এই আকাশ ও ভবিষ্যৎ—এই বুনো ঝিঁঝির ডাক ও হাওয়ার খেলা—এ সবই যেন আমার। আমি এদের সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি। আমি জীবনে অনেক খেলায় হেরে গেছি —কিন্তু আমি একটা পাহাড় জয় করেছি। এই পাহাড় চূড়ায় আমার পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। পকেটে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই, আমি তখন আমার নীল-সাদা ডোরাকাটা জামাটা খুলে পতাকার মতন উড়িয়ে আপন মনে বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে বেচে থাকাটা বড়ো মধুর। যে-যাই বলুক, নানান দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে বড়ো আনন্দেই বেঁচে আছি। হে সময়, আমাকে আর একটু সময় দাও।

২৫

মাকড়সাটাকে আমি একটা টোকা মারলুম, ওটা মাটিতে পড়ল না, শূন্যে ঝুলতে

লাগল। তারপর, ওটা আবার আস্তে আস্তে ওর অদৃশ্য সুতো বেয়ে টেবিলের দিকে, আমার দিকেই ওঠার চেষ্টা করল। আমি বললুম, আবার ? যা, পালা! কিন্তু পালাবে কোথায় ? মাটিতে নামতে ভয় পাচ্ছে, হয়তো ভাবছে, মাটিতে নামলেই আমি ওকে জুতো দিয়ে থেঁৎলে দেব।

আমি নীচু হয়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিলুম। তখন আর ও উঠতে পারে না, টার্জানের মতো দুলতে লাগল। পাগুলিকে গুটিয়ে এনেছে বুকেব কাছে, মুখখানা অবিকল এক বুড়ো মানুষের মতন, একটু কুটিল কুটিল। শীতকালে গ্রামের বুড়োরা যে-রকম ঠ্যাং গুটিয়ে বসে, সেইরকম চেহারা। হাওয়ার মধ্যে হাত চালিয়ে ওর সুতোটা ধরে ফেললুম, ওকে কাছে এনে মুখখানা আরো একটু ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোন ফাঁকে টেবিলের পায়ার সঙ্গে ছুঁয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওটা টেবিলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন উঁকি মেরে দেখি, টেবিলের তলাটায় বিশাল মাকড়সার জাল পাতা, একেবারে জঙ্গলের মতন।

বাড়িতে ঝুলঝাড়া নেই। টেবিলের তলায় মাকড়সার জাল রাখা ঠিক না, টেবিলের নীচে পা রাখতে অস্বস্তি লাগবে সব সময়। মাকড়সা চেটে দিলে নাকি গরল হয়, মাকড়সার জাল আমার হাতে বা গায় লাগলে অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। সেটা তখন ওর জালের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জ্বলজ্বল করে আমার দিকে চেয়ে আছে। এক মুহূর্তে আমি ওর পাতানো সংসার লণ্ডভণ্ড কবে দিতে পারি। কিন্তু হাতের কাছে কিছু পাচ্ছি না। সেই সময় হঠাৎ এক বন্ধু আমায় ডাকতে এল। আমি টেবিলের তলায় সেঁধিয়ে বসে আছি দেখলে বন্ধুটি অবাক হয়ে যাবে —তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাত-টাত ঝেড়ে নিলুম। মাকড়সাটার কথা ভুলে গেলুম পরমুহূর্তে।

দিন কয়েক পরে আমি একটা অফিসে গিয়েছিলুম কোনো এক-টা কাজে। অফিসগুলোতে যা হয়, প্রথম যে লোকটিব কাছে আমি আমাব প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করলুম, তিনি বললেন, আপনি ঐ কোটপরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলুন। কোটপরা ভদ্রলোক আমার কথা আদ্দেক শুনেই বলে উঠলেন, এ তো আমার ডিপার্টমেন্টের নয়, আপনি পরেশবাবুর কাছে যান।

বিশাল লম্বা হলঘরের মতন অফিস, গোটা পঁচিশেক টেবিল পাতা, এর মধ্যে কোন টেবিলের অধিকারীর নাম পরেশবাবু তা আমার জানার কথা নয়। বাধ্য হয়েই সে কথা আমায় প্রকাশ করতে হলো। কোটপরা ভদ্রলোক, একেবারে পিছন ফিরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে পরেশবাবু। সেই পরেশবাবুর কাছে এসে শুনলুম, তিনি ঠিক পরেশবাবু নন, পরেশবাবু আসলে ছুটিতে—তিনি পরেশবাবুর জায়গায় বসে কাজ করছেন যদিও, কিন্তু তাঁর কাজ করছেন না—করছেন নিজের কাজ,

সে কাজের জন্য যেতে হবে মিস্ গাঙ্গুলির কাছে, যদিও তিনি, অর্থাৎ মিস গাঙ্গুলি, এখন সীটে নেই।

এরপরও যদি আমি রাগ করি, তবুও লোকে আমায় বলবে রগচটা। আমি চেঁচিয়ে বললুম, ওসব মামদোবাজি ছাড়ুন তো, আপনাদের মালিক কিংবা বড়োসাহেব কোন ঘরে বসে বলুন, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

বড়োসাহেব বসেন একেবারে ভেতরের দিকের এয়ারকণ্ডিসন ঘরে, গদি-মোড়া চেয়ারে তিনি আসীন। প্রথমে মিনিট পাঁচেক তিনি আমার সঙ্গে কথাই বললেন না, টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন দার্জিলিং-এ পটলের দাম বেশি কেন সেই বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। তারপর অতিকষ্টে চোখ তুলে বললেন, কি ব্যাপার ? আমি জানালুম। তিনি বললেন, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমার কাছে কেন ? মেঘেন্দ্রবাবুর কাছে যান।

আমি বললুম, উঁহু, আর কোনো বাবুটাবু নয়, আমি খোদ বড়োবাবুর সামনে বসে কাজ চাই! আমি টেবিলে টেবিলে ঠোক্কর খাব, আর আপনি এখানে বসে বসে আলু-পটলের গল্প করবেন—

তারপর আর কি, কথা কাটাকাটি থেকে টেবিল চাপড়ানো, চেঁচামেচি, বড়ো সাহেব ঘন ঘন বেল বাজাতে লাগলেন, তিনজন লোক এসে হাজির হলো, শেষ পর্যন্ত প্রায় এমন অবস্থা যে, আমাকে বোধহয় দারোয়ান দিয়ে বার করে দেবেন। তা যদি হয়ই, তবে আগে একটা কিছু লণ্ডভণ্ড করে যেতে হবে, আমি ভাবছি এই কথা।

ঠিক সেইমুহূর্তে হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমার রাগ কোথায় উবে গেল। ঐ রকম অবস্থাতেও আমি একটু মুচকি হেসে ফেললুম। রাগারাগির মাঝখানে আমি হাসছি দেখে, থেমে গিয়ে ভুরু দুটি কুঁচকে গভীর বিস্ময়ে বড়োসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাতে মিলটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমি আবার হেসে ফেললুম। বড়োসাহেবকে অবিকল সেই মাকড়সাটার মতন দেখতে। সুট-টাই পরে থাকলে কি হয়, সেইরকম হুবহু কোচকানো মুখ, সেইরকম জুলজুলে চোখ। কী রকম জাল পেতে বসে আছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

আমি আর কোনো কথা না বলে, তৎক্ষণাৎ সেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নিউ মারকেট থেকে একটা ঝুলঝাড়া কিনে সেই দণ্ডেই সোজা ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরে এসে, দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই প্রত্যেকটা মাকড়সার জাল ভাঙতে শুরু করলুম। টেবিলের তলায় উঁকি মেরে দেখি, হ্যাঁ, বড়োসাহেব ঠিক বসে আছে। চালালুম ঝুলঝাড়া। নিমেষে তার বাড়িঘর, সম্পত্তি, অফিস সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাকড়সাটা প্রথমে পালায়নি, টুপ করে খসে পড়ল মাটিতে,

আজ আর অদৃশ্য সুতো ছড়ায়নি, হয়তো হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বলেই মাটিতে পড়েও চুপ করে রইল। আগের দিনই আমি ওকে মারতে পারতুম, কিন্তু মারিনি বলে ও বোধহয় ভাবছিল আমি আজও ওকে দয়া করব। কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হাস্যে বললুম, ইস, দয়া? তখন মনে ছিল না? আমি থেৎলে মারার জন্য পা চালালাম, মাকড়সাটা ঠিক তখনই দৌড় লাগাল, ওর একটা পা আমার জুতোর কোনায় চাপা পড়েছিল, সেই পা-টা ছিড়েই পড়ে রইল, মাকড়সাটা দৌড়ে পালাল।

আমি পিঁপড়ের সমাজের হিটলার, পিঁপড়েদের জাত ধ্বংস করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। যেখানে সেখানে লালপিঁপড়ে দেখলেই আমি ক্ষেপে উঠি। আগে পিঁপড়েদের আমার ভালোই লাগত। ওদের নিয়ম শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় প্রভৃতি আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতুম। কিন্তু, একদিন আমার চিরুনিতে এক গাদা পিঁপড়ে লেগে ছিল, না দেখে সেটা ব্যবহার করায়—আমার চুলের জঙ্গলে পিঁপড়ে ছড়িয়ে যায় —এবং সারাদিন ধরে আমায় কুটুস কুটুস করে কামড়াতে থাকে। তার পরদিন থেকে রোজই দেখি, আমার চিরুনিতে পিঁপড়ে জমে, পিঁপড়েরা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে তো কোনো মিষ্টি ব্যাপার নেই, নিছক ঝাঁঝে ভর্তি, পিঁপড়েরা সেখানে কি চায়? পিঁপড়েদের এই অনধিকার চর্চা চলতেই থাকে, আমিও তাদের ধ্বংস করার জন্য ক্ষেপে উঠি। অনেক সময় একটা বা দুটো পিঁপড়ে দেখলে আমি তাদের পিছন পিছন গুঁড়ি মেরে যাই—তাদের বাসার সন্ধানে, সেখানে সব কটাকে একসঙ্গে মারবার জন্য। কোথাও কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর যদি একটা পিঁপড়ের সঙ্গেও দেখা হয়, তবে আমি মেয়েটির চেয়ে পিঁপড়ের দিকেই বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ি।

কিন্তু মাকড়সার বিষয়ে আমার অমন জাতক্রোধ জন্মে যায়নি। সেদিন ঐ বড়োসাহেব মার্কা মাকড়সাটাকে শাস্তি দেবার পর, আর আমি ওদের কথা ভাবিনি। বিশেষত ঐ কাণ্ডের দুদিন পরই আমি সেই অফিসটা থেকে একখানা রেজিস্ট্রি করা চিঠি পেলাম। আমি যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম, তার জন্য আর দ্বিতীয়বার যেতেই হলো না, ওরাই তৎপর হয়ে আমাকে সবকিছু বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভয় দেখানোতে তো কাজ হয়েছে বেশ।

সুতরাং দিন সাতেক বাদে আমি বারান্দার কোণ জুড়ে যখন আবার মাকড়সার জালের সমারোহ দেখতে পেলাম—তখন আমার মনের অবস্থাটা বড়ো বিচিত্র। ঝুলঝাড়াটাকে আমি বারান্দার কোণে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, সেটাকে ঘিরেও নতুন জাল পাতা হয়েছে। এবং বড়োসাহেব মার্কা মাকড়সাটা নির্ভুলভাবে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে। চিনতে আমার ভুল হয়নি, চার্লি চাপলিন মশা চিনতে পারেন, আর আমি মাকড়সা চিনতে পারব না? তাছাড়া, ওর একটা পা কম। আমাকে

দেখেই ও পালাবার চেষ্টা করল, এতে আমি বেশ খুশি হয়ে পড়লুম। তাহলে এবার ঢিট হয়েছে।

ওর সমস্ত বাড়িঘর সম্পত্তি আমি নষ্ট করেছিলুম—তারপর আবার ও নতুন করে এমন সব বানিয়েছে যে একে উচিত বাঙালি রিফিউজিদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা। ও অনেক নতুন ভাড়াটেও বসিয়েছে—কিংবা এরই মধ্যে ওর নিজেরই বংশবৃদ্ধি হয়েছে (বস্তুত, বড়োসাহেবের মতন মুখ হলেও ও যে মেয়ে মাকড়সা নয় তা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি না।) এ-কোণে সে-কোণে আরো পাঁচ-সাতটি মাকড়সা বসে আছে। আমি খুব কাছে গিয়ে ওদের ভালো করে নজর করে দেখতে লাগলুম, ওরা চুপচাপ আমাকে দেখছে সন্দেহ কি, চেষ্টা করলে প্রত্যেক মাকড়সার মধ্যেই মানুষের মুখের আদল খুঁজে পাওয়া যায়। আলাদা ধরনের মানুষ।

আমি সেই জালটা আর ভাঙিনি। ওরা সেখানেই আছে—এমনকি, ছোটখাটো কোনো পোকা বা মাছি আমার কাছাকাছি এলে—আমি সেগুলোকে আধমরা করে সেই মাকড়সার জালে ফেলে দিয়ে আসি। আমি ওদের পুষছি। আবার কখনো কোনো অফিস-টফিসে খারাপ ব্যবহার করলে—বাড়িতে ফিরে প্রতিশোধ নিতে হবে তো।

২৬

একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পাঁচজন ডাক্তার ছিলেন। সাজানো শামিয়ানার নীচে চেয়ারগুলোতে বসা মানুষগুলো সবাই সুসজ্জিত, ফুল ও গোলাপজলের গন্ধ ম' ম' করছে, বাচ্চা ছেলেদের হুড়োহুড়ি, কুমারী মেয়েদের তীক্ষ্ণ হাসি, রেকর্ডে সানাইয়ের সুর মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে। সেকেণ্ড ব্যাচ এই মাত্র খেতে বসল, এখন আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পরে ব্যাচের জন্য। বরের সঙ্গে মুচকি হাসি বিনিময় এবং সাতপুরুষের বাঁধা রসিকতা হয়ে গেছে উপহার দেবার সময় কনের চেয়েও কনের পাশে বসে থাকা অন্য মেয়েদের মুখ দেখা হয়ে গেছে ভালোভাবে, এখন শুধু অপেক্ষা। আমি চুপচাপ বসে ছিলুম, বুঝতে পারলুম আমার পাশের পাঁচজন লোকই ডাক্তার।

বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। এক পেশার লোকরা যেখানেই একসঙ্গে মেলে, সেখানেই পেশাদারী কথা। উৎসবে, আনন্দে, শোকে, শোকযাত্রায়, রাজদ্বারে শ্মশানে—যেখানেই এক পেশার দু'জন লোকের দেখা হলো, সেখানেই

শুরু হবে, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'শপ টক'। দু'জন কেরানিতে দেখা হলেই বড়োসাহেব কিংবা ডি এ ইনক্রিমেন্ট, দু'জন ব্যবসায়ীতে দেখা হলেই মন্দা বাজার, দু'জন ইঞ্জিনিয়ারের দেখা মিলেতে চাকরির সুখসুবিধে প্রসঙ্গে। (এক মাত্র সাহিত্যিকদের দেখেছি, পরস্পর দেখা হলে সাহিত্য সম্পর্কে একটিও কথা না বলে, বরং গোপন করে, অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।) যাই হোক, আমার পাশে বসে থাকা একজন কোঁচানো ধুতিপরা ফুলবাবু—যাকে দেখলে অনায়াসে সেতারবাদক বলে মনে হতে পারে, তিনি হঠাৎ তাঁর পাশের ট্যুইলের স্যুট পরা দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে বললেন, মুখার্জি তোমার সেই হেপাটাইটিসের পেসেন্টটা মারা গেছে? টুইডের স্যুট উত্তর দিলেন, না তার হঠাৎ গল ব্লাডার ফেটে—। পাশের ফ্লানেলের স্যুট বললেন, আমার সেই মাড়োয়ারী রুগীটা ছিল না, তার হঠাৎ কান দিয়ে এমন রক্ত বেরুতে লাগল গলগল করে, একসঙ্গে দেড় পাউণ্ড দু'পাউণ্ড রক্ত।

পাঁচজনেই সে আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন, বুঝলাম, পাঁচজনই উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার। কী সুন্দর অল্প শীতের সন্ধ্যা, ফটফট করছে জোৎস্না, সানাইয়ে ইমন-কল্যাণ বাজছে, রঙীন বসনা সুন্দরীরা সিল্কের শাড়িতে শপ শপ শপ করে ঘোরা-ফেরা করছে, এই সময় সেই পাঁচজন জীবনে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার রক্ত, থুতু, পেচ্ছাপ, বমি, থ্রম্বসিস, ক্যানসার—এই সব ভালো ভালো বিষয় নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়লেন। আমি অবশ্য এমন রুচিবাগিশ নই যে, সে জায়গা ছেড়ে উঠে যাব, বরং কান খাড়া করে ওদের আলোচনা শুনতে লাগলুম। ভালোই লাগতে লাগল, এইসব উৎসব-আনন্দের মধ্যেও বসে রোগ-শোক-মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা শুনলে বেশ বোঝা যায়, জীবনটাই তো মায়া।

ক্রমশ রোগ-রুগীর প্রসঙ্গ ছেড়ে উঠল ডাক্তারি পেশার প্রসঙ্গ। পাঁচজন ডাক্তারই দেখলুম, এ বিষয়ে একমত যে, ডাক্তারিতে আর আজকাল সুখ নেই। ওমুক হাসপাতালের চৌধুরী—দেখলেন তো কি করে আমার প্রমোশনটা আটকে দিলে। আরে ভাই মিকশ্চারের জন্য বেশি দাম না নিয়ে উপায় আছে? শুধু তো গরীবকে বাঁচালে চলবে না—নিজেকেও তো বাঁচতে হবে! আউটডোরের সব প্রেসক্রিপশানেই 'রিপোর্ট' না লিখে উপায় কি, একটা ভালো ওষুধ পাওয়া যায়? ফ্যামিলি প্ল্যানিং না কচু, আগে সরকারি অফিসারদেরই ফ্যামিলি প্ল্যানিং দরকার! —ওদের মধ্যে যাঁর চেহারা সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দূর দূর, এর চেয়ে ইনজিনিয়ারিং পড়লে ঢের ভালো হতো!

শুনে আমি স্তম্ভিত। ছেলেবেলায় কত স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবো। হতে পারিনি বলে, সারা জীবন খেদ রয়ে গেল। ভেবেছিলাম, ডাক্তারিই সব জীবিকার সেরা,

কোনো ডাক্তারকে কখনো গরীব দেখিনি, আর ডাক্তারিতে সেই সঙ্গে একটা সেবা করার কিংবা পয়সা নিয়ে পরোপকার করার গোপন আনন্দও পাওয়া যায়। আর এইসব প্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররা বলছেন, ডাক্তারির চেয়ে ইঞ্জিনিয়াররাই সুখী ? আমার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় খুব দুঃখিত বোধ করছিলুম, কিন্তু পরের ব্যাচে খাবার ডাক পড়তে, তখুনি সব ভুলে গেলাম।

আমার এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার, তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে আরো দু'জন ব্যক্তি বসা, তাঁরাও ইঞ্জিনিয়ার, বড়ো সরকারি চাকুরে! যথারীতি আমাকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা পেশাগত আলোচনা শুরু করলেন। স্পেয়ার পার্টস, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান—এই সব। কতক্ষণ আর নীরবে বসে থাকব, সুতরাং এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের বেশ স্বাধীনতা আছে, সুখ আছে, তাই না ? ওঁরা তিনজনেই একেবারে রে-রে করে আমাকে তেড়ে উঠলেন। সুখ স্বাধীনতা—চালাকি পেয়েছ ? চাকরি নিয়ে কি ভুলই করেছি। যাঁদের আলাদা ফার্ম আছে...কিংবা আসল মজা তো কন্ট্রাকটারদের। দ্যাখো না, কাজ কবব আমরা—অথচ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররাই যেন সবজান্তা, পদে পদে তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে—আমরা প্রাণপণ খাটছি, অথচ সাপ্লায়াররা এমন সব বাজে মাল দিচ্ছে—তারপর কথার কথায় বিদেশী এক্সপার্ট। বিদেশ থেকে বামা-শ্যামা-যদু-মধু টেকনিশিয়ানদেব নিয়ে আসছে, গায়ের চামড়া সাদা হলেই হলো. তাদের অধীনে আমাদের কাজ করতে হবে।

—এর চেয়ে ভাবছি, জার্মানিতে একটা চান্স পেয়েছি, সেখানেই চলে যাব।

—আমি তো ভাবছি চাকরি ছেড়ে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে লেকচারারের চাকরি নেব, তাতে অন্তত এমন কথায় কথায় ওপরঅলার কথা শুনতে হবে না।

—দূর দূর! এর চেযে বাবা বলেছিলেন ডাক্তারি পড়তে, তখন বাবার কথা শুনিনি, এখন দেখছি তাতেই অনেক ভালো হতো।

আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলুম। তারপর দেখতে লাগলুম সবারই অভিযোগ আছে। আজকাল ইস্কুল মাস্টাররা সবাই প্রায় এম. এ. পাশ. তাঁদের দুঃখ, কেন কলেজের অধ্যাপক হতে পারলেন না। তাঁদেরও তো একই যোগ্যতা ছিল। কলেজের অধ্যাপকদের দুঃখ, তাঁরা কেন আই. এ. এস. হতে পারলেন না। কিন্তু বাজে বাজে ছেলেও তো আই. এ. এস. হয়ে সুখে আছে— নেহাত তাঁদের বয়েস পেরিয়ে গেছে, তাই! এমনকি কত অগামার্কা ছেলেও ডবলু. বি. সি. এস. হয়ে হম্বিতম্বি দেখাচ্ছে, কত লোকের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছে। আই. এ. এস.-দের দুঃখ, এখনো ব্রিটিশ আমলের আই. সি. এস.-দেরই সম্মান এ দেশে, অথচ, এব চেয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সিটা পাশ করলেই—। উকিলের দুঃখ তিনি কেন

ব্যারিস্টার নন, ব্যারিস্টারের দুঃখ তিনি কেন ফিনান্স মিনিস্টার নন। বাজারে, তরকারিওয়ালার দুঃখ সে কেন মাংসওয়ালা নয়, মাংসওয়ালার দুঃখ সে কেন ফিল্মস্টার নয়। এমনকি একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষকেও আক্ষেপ করতে শুনলুম, দূর দূর, এর চেয়ে মেয়ে হয়ে জন্মালেও ভালো হতো, তা হলে তবু ট্রামে-বসে অন্তত মাঝে মাঝেও বসার জায়গা পেতুম।

একদিন গঙ্গার পাড়ে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নৈশ নদীর শোভা দেখছিলাম। পাশেই ধুনী জ্বালিয়ে দুজন অল্পবয়সী সাধু। লাল ন্যাকড়া জড়ানো গাঁজার কল্কেতে টান দিতে দিতে, তারা মশগুল হয়ে কি যেন আলোচনা করছে। কান পেতে শুনলুম—আর মহারাজ, এ লাইনে আজকাল কোনো ফায়দা নেই। মানুষ একেবারে ধরম করম ভুলে যাচ্ছে। সাধুসন্ন্যাসীকে দান ধ্যান করে না। ভক্তি শ্রদ্ধাও করে না। সেদিন মোটর গাড়ি নিয়ে চারজন বাবু এলেন, এসে বলল, এ সাধু, গাঁজা সাজো। আরে, আমি কি তোর বাপের নোকর ? কোথায় আমায় নিবেদন করবি, আমি প্রসাদ দেবো। তা না, আমায় হুকুম! একজন তো আমার ঠ্যাং ধরে ছড় ছড় করে টানতে লাগল—এমন হারামজাদা— ।—যা বলেছ, কাল থেকে শুধু একটা বাঁধাকপি সেদ্ধ খেয়ে আছি। পেটে একদানা চাল পড়েনি। আমিও ভাবছি এ লাইন ছেড়ে দেব। আবার সংসার-আশ্রমেই ফিরে যাব। সংসারে থেকেও তো ভগবানকে ডাকা যায়। ভাবছি এবার একটা বিয়ে করে, সংসারেই ঢুকব— ।

আমি আর থাকতে পারলুম না, বলে উঠলুম—খবর্দার সাধুজী, ও কম্মো করতে যেও না। আবার সংসারে ঢুকলে একেবারে গোলকধাঁধায় পড়ে মারা যাবে বলে দিচ্ছি। যা আছ, বেশ আছ ?

———

সামনে আড়ালে

যোগব্রত চক্রবর্তী
প্রিয়বরেষু

বলুন তো আলোতে কী দেখা যায় না? বলুন, বলুন, একমাত্র কোন জিনিস আলোতে দেখা যায় না?

আমি রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বেণী দুলিয়ে, কচি মাথা ঝাঁকিয়ে রেবা বলল, বলুন বলুন, বলতে পারছেন না?

আমি মাথা চুলকে বললুম, না তো!

—ভাবুন একটু। কী, পারবেন না ঠিক? অন্ধকার! আলোতে অন্ধকার দেখা যায় না। নাঃ, আপনি কিচ্ছু জানেন না।

রেবা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুধু আমি কেন, ঘরে আরো দু'তিনজন ছিল, রেবার ধাঁধার জবাব কেউই তো দিতে পারেনি।

রেবা আমার বন্ধু নীতিশের বোন। দশ-এগারো বছর বয়েস থেকে ওকে দেখছি, ভারী সুন্দর ছটফটে মেয়ে রেবা। আমরা নীতিশদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছি বা তাস খেলছি, রেবা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে আমাদের এক-একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করত। ওর মুখ-চোখ দেখে মনে হতো, এইমাত্র ও নিজেই ধাঁধাটা বানালো—এবং এখুনি ও কারুকে পরীক্ষা করতে চায়। বেশির ভাগ ধাঁধাই রেবার নিজস্ব, আমি আগে অন্য কারুর মুখে শুনিনি। আরেকবার ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বলুন তো, ভগবানকে সব সময় কোথায় পাওয়া যায়?

আমি বলেছিলুম, এ আবার একটা ধাঁধা নাকি? ভগবান সারা পৃথিবীতেই সব সময় ছড়িয়ে থাকেন, শুনেছি।

—নাঃ, তা নয়! কোথায় আপনি সব সময়ই ইচ্ছে করলে দেখতে পাবেন?

—এটা বড়ো শক্ত, রেবা। এটা আমি পারব না।

রেবা খিলখিল করে হেসে বললে, কী যে আপনি, মোটেই মাথা ঘামাতে চান না। একটু ভাবুন, এটা খুব সহজ।

আমি একটুক্ষণ মাথা চুলকে বললুম, কোথায় সব সময় ভগবানকে দেখতে পাব? উঁহু, এটা খুব শক্ত, আমি কিছুতেই পারব না।

—পারলেন না? ডিকশনারিতে! যে কোনো ডিকশনারির মধ্যেই ভগবান পাবেন।

তখন রেবার বয়েস পনেরো-ষোল হবে। ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখছি,

তাই ওর বড়ো হয়ে ওঠাটা মনে থাকে না। ওকে ছেলেমানুষই মনে হয়। আমি হয়তো রেবাকে দেখে একদিন বললুম, কী রেবা, এবার কোন ক্লাস হলো? তোমার স্কুল-ফাইন্যাল কোন বছর?

রেবা বলল, বাঃ, জানেন না বুঝি! আমি তো এখন কলেজে পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার আমার।

আমি চমকে গেলুম। সত্যি তো, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেছে। রেবা এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি, বিনুনির তলায় আর লাল রিবনের ফুল বাঁধে না। দিব্যি একটা কলেজের মেয়ের মতনই তো দেখাচ্ছে। অথচ, এতদিন একেবারেই লক্ষ্য করিনি। সেদিনও রেবা একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল। দু'একটা কথার পরই আমায় জিজ্ঞেস করল, নীলুদা, বলুন তো বাটা বানান কি?

আমি সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এর মধ্যে আবার কিছু চালাকি আছে বুঝি? এ বানান তো সবাই জানে!

রেবা হাসি চেপে বলল, বলুন না! ভয় পাচ্ছেন কেন?

—বাংলায়?

—ইংরিজিতে।

আমি তখনো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে বললুম, বাটা বানান বি এ টি এ। কেন?

রেবা গম্ভীর মুখ করে বলল, হয়ে গেছে?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

—সত্যি?

আমি এমন গোবর গণেশ ধরনের যে তখনো ধাঁধার সে ইয়ার্কিটা ধরতে পারিনি। রেবা রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ে বলল, ওমা, আপনার বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে? কবে হলো? আমরা নেমন্তন্নই পেলুম না! দাঁড়ান, মাকে বলছি—

আমি দেখলুম, রেবা এখন কলেজের মেয়ে হলে কি হয়, সেই রকমই ছেলেমানুষ আছে। আমি ওর পিঠে একটা কিল মেরে বললুম, গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি না?

রেবা ঠোঁট উল্টে বলল, ইস, ভারী গুরুজন!

তারপর নীতিশ চলে গেল পশ্চিম জার্মানিতে। এক বছরের নাম করে গিয়ে আর ফিরল না। নীতিশের বাড়ির আড্ডাটা আমাদের উঠে গেল। রেবার সঙ্গেও আর দেখা হয় না। ক্বচিৎ হয়তো পথে-টথে দেখা হয়ে যায়। একবার গড়িয়াহাটার মোড়ে দেখা হলো, আরো তিন-চারটি রঙিন মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। আমি

হাসিহাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলুম, কি, ভালো আছ?

রেবা দল ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, উঃ কদ্দিন বাদে দেখা। আর আসেন না কেন আমাদের বাড়িতে?

আমি বললুম, যাব একদিন, মা ভালো আছেন তো? তোমার এবার ফোর্থ ইয়ার, না? কি অনার্স নিলে?

রেবা বলল, আপনার কিছু মনে থাকে না। কতদিন কেটে গেছে তা খেয়াল আছে? আমি এখন সিক্সথ ইয়ারে পড়ি, এ বছর ফিলজফিতে এম. এ. দেব।

সত্যি তা হলে অনেকদিন কেটে গেছে। রেবা তা হলে এখন আর মেয়ে নয়, নারী যাকে বলে। মেয়েরা বোধহয় সময়ের চেয়েও আগে এগিয়ে যায়। গত ছ'সাত বছরে আমি যত বড়ো হয়েছি, রেবা তার চেয়েও অনেক বেশি বড়ো হয়ে গেছে মনে হয়। সেই রকমই ঝলমলে মুখ, শিশুর মতন চাহনি, অথচ এরই মধ্যে এম. এ. পড়ে? ভোজবাজী নাকি?

রেবা বলল, আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন? চলুন, আমাকে এগিয়ে দেবেন বাড়ি পর্যন্ত। আমি রাজি হলুম।

রেবার কিন্তু সেই ধাঁধা জিজ্ঞেস করা স্বভাব তখনো যায়নি। একটু দূর হাঁটতে-না-হাঁটতেই আমাকে একটি কঠিন ধাঁধা জিজ্ঞেস করে বসল, একটি ওজন-যন্ত্রে তিনখানা মাত্র বাটখারা দিয়ে তেইশ সের কি করে মাপা যায়— এই ধরনের জটিল অঙ্ক। আমি বললাম, তুমি পাগল হয়েছ? একেই ধাঁধা-টাধা আমার মাথায় ঢোকে না, তার ওপর আবার অঙ্ক! ছি! সবাইকে সব ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে নেই।

রেবা হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা, এইটা বলুন। খুব সোজা। আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞেস করব, খুব চটপট উত্তর দিতে হবে? পারবেন?

—বাংলা না ইংরিজি? ইংরিজি হলে ভয় আছে, বাংলা হলে পারতেও পারি।

—বাংলা। খুব সোজা। তিনটে বানান জিজ্ঞেস করব, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে। বলুন, পিপীলিকা।

আমি বললুম, প্রথমটা হ্রস্ব-ই, তার পরেরটা হবে দীর্ঘ-ঈ, আবার হ্রস্ব-ই।

—পরিণাম?

—র-এ হ্রস্বই। মূর্ধন্য-এ আকার।

—উঁহু।

—কী, হয়নি? কি বলছ তুমি?

—আবার বলুন, গোড়া থেকে, তাড়াতাড়ি বলুন পিপীলিকা? আমি বললুম।

—পরিণাম!

একটু ভেবে আমি আগের বারের মতো বললুম। রেবা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

উঁহু। আমি বেশ ছদ্ম ক্রোধের সঙ্গে বললুম, পরিণামে তুমি বলতে চাও দন্ত্যের ন ? মোটেই না, তোমাদের ক্লাসে বুঝি আজকাল এই রকম বানান শেখানো হয় ? স্পষ্ট নত্ব-বিধান—

রেবা কুলকুল করে হাসতে হাসতে বলল, আপনি যে কি ছেলেমানুষ ? পরিণাম বানান ভুল কে বলেছে ? কিন্তু উঁহু কথাটার বানান কে বলবে ? আমি তিনটে বানান জিজ্ঞেস করব বলেছিলুম, পিপীলিকা পরিণাম আর উঁহু! পারলেন না তো!

রেবা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। রেবাকেও আমি এই একবার ঠকিয়েছি। এই ধাঁধাটা আমি আগে থেকেই জানতুম। তবু ইচ্ছে করে বলিনি! ধাঁধা জিজ্ঞেস করে ঠকাতে পারলে যে-রকম উজ্জ্বল ভাবে হাসে, তা দেখতে আমার ভারী ভালো লাগে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে কি লাভ হতো ? কিছুই না। কিন্তু ঠিক উত্তর না দিয়ে আমি ওর মধুর হাস্যময় মুখখানি দেখতে লাগলুম।

তারপর আবার অনেকদিন রেবার সঙ্গে দেখা হয়নি। মাঝখানে কার মুখে যেন শুনেছিলাম রেবার বিয়ে হয়ে গেছে বেশ রোমহর্ষক ভাবে। বাড়ির অমতে, বাড়ি থেকে চলে গিয়ে রেবা বিয়ে করেছে ওর গানের মাস্টারমশাইকে। তার সঙ্গে রেবাদের জাত মেলে না, সামাজিক অবস্থা মেলে না, বয়সে মেলে না—লোকটি প্রায় প্রৌঢ়, রেবা তবু তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। খবরটা শুনে আমি ভেবেছিলুম, রেবাব স্বামী খুব ভাগ্যবান— কারণ রেবার মতন এমন সরল প্রাণবন্ত মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

তারপর কাল দুপুরে আমার রেবার সঙ্গে দেখা হলো। এসপ্লানেড ট্রাম গুমটির কাছে দারুণ রোদ্দুরে একটা হলদে শাড়ি পড়ে রেবা দাঁড়িয়েছিল। আমি দূর থেকেই চিনতে পেরেছি। চুপি চুপি পিছন দিক থেকে এসে আমি ওর কানেব কাছে মুখ দিয়ে বললুম, এই খুকী!

দারুণ চমকে রেবা মুখ ফেরাল। মুখখানা একটু শুকনো। তবু হাসি ফুটিয়ে বলল, ওমা, আপনি! কতদিন দেখা হয়নি।

আমি বললুম, খুব তো নিজেই এবার বিয়ে সেরে ফেললে, আমাদের নেমন্তন্নও করলে না।

ও বলল, আপনার পাত্তাই পাওয়া যায় না! প্রায়ই তো কলকাতার বাইরে, দেশের বাইরে থাকেন শুনেছি—

—এখন তো আছি। কোথায় বাড়ি তোমাব ? একদিন নেমন্তন্ন করো, তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করি, গান শুনি।

—আমি তো বাড়িতে থাকি না। আমি একটা কলেজে পড়াই আর মেয়েদের হোস্টেলে আলাদা থাকি।

—আর তোমার স্বামী?

—তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

—কেন? এই তো দু'এক বছর মাত্র বিয়ে হলো।

—বিয়ের কয়েক মাস পরে জানতে পারলুম, ওঁর আর একজন স্ত্রী আছে। পাঁচ-ছ বছর ধরে ওঁকে চিনি, কিন্তু কোনোদিন একথা জানাননি।

—সে কি! এ তো দারুণ বে-আইনী ব্যাপার। কেস করলে ওর লম্বা জেল হবে।

—আমি সেসব কিছু চাই না। ও কথা থাক।

এরপর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর কী কথা বলব ভেবে পেলুম না। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এখন ট্রাম এলে রেবা উঠে পড়লেই ভালো হয়। এখন রেবার মুখের দিকে তাকাতেই পারছি না আমি, পৃথিবীর সমস্ত গানের মাস্টারদের প্রতি রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগল।

একটুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রেবা আস্তে আস্তে বলল, নীলুদা, কোনো মানুষকে যদি কেউ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে, তবু সে সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয় না কেন বলতে পারেন?

আমি ধীরস্বরে বললুম, রেবা, আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না।

রেবা মাটির দিকে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি রেবার ধাঁধার উত্তর দিতে পারলুম না, তবু এই প্রথম রেবা নিজে খিল-খিল করে হেসে উঠতে পারল না।

২

বাস শুদ্ধ সব লোক হেসে উঠল হো-হো করে। উচ্চ হাস্য, হাসির ঢেউ, একজনের হাসি গড়িয়ে যাচ্ছে অন্যের মুখে।

অফিস যাবার সময় কেউ আবার হাসে নাকি কলকাতা শহরে? সকলেই মনে মনে কাঁদে অথবা প্রকাশ্যে ক্রুদ্ধ, কপালে ঘাম, চার দিকে মানুষের দেয়াল। অফিস যাবার সময় মাত্র দুটি জিনিস মনে থাকে, যে-কোনো বাস বা ট্রামের একটা হ্যান্ডেল ছোঁয়ার সামান্য অধিকার আর অফিসের হাজিরা খাতায় লাল পেন্সিলের দাগ। বাড়িতে স্ত্রীর কপালে সিঁথির সিঁদুর মুছে যাক ক্ষতি নেই, তবু অফিসের খাতায় যেন লাল দাগ না পড়ে। আমি একেবারে বাসের মাঝখানে, জমাট ভিড়ের

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ছিলুম, হাসির কারণটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে ঝগড়া করবে, অথবা উচ্চকণ্ঠে তেতো রাজনীতি অথবা লেডিস সিটের সামনে বেশি ভিড় কেন—এই নিয়ে প্রাকৃত আলোচনা—এই তো সকাল সাড়ে ন'টার ট্রাম-বাসে স্বাভাবিক নিয়ম, হঠাৎ নিয়ম ভেঙে এই প্রবল গ্রীষ্মে বসন্তের এক ঝলক হাওয়ার মতো কী করে এল হাসির ঢেউ ? বাস থেমে আছে। সম্ভবত ট্রাফিক পুলিশের কর-রেখা এখন বিচার করছে ড্রাইভার। আমি ছটফটিয়ে উঠে এদিক-ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করতে লাগলুম, কি হয়েছে ? কী হয়েছে ? সবাই হাসিতে ব্যস্ত, কেউ উত্তর দিচ্ছে না। আমি পাশের দৈত্যাকার লোকটিকে অনুনয় করলুম, আমায় একটু দেখতে দিন না। আমিও একটু হাসতে চাই। লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আশপাশের সকলের মাথা ডিঙিয়ে প্রায় জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খ্যা-খ্যা করে হাসছে। আর বলছে উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, ওদের উঠতে দিন!— সঙ্গে সঙ্গে সকলের আবার হাসির হুল্লোড়।

আমি বেপরোয়া হয়ে, কী অসম্ভব উপায়ে কে জানে, ঠেলেঠুলে জানলার কাছে চলে এলুম। এসে যা দেখলুম, তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের দু'পাশে এল স্মিত হাস্য। একজোড়া টাটকা নবদম্পতি বাসে ওঠার চেষ্টা করছে।

দমদম থেকে বাস আসছে কলকাতায়। বিদেশ থেকে অনেক টুরিস্ট এসে গাইডদের সঙ্গে নিয়ে দমদমের বাসের ছবি তুলে নিয়ে যায়—কলকাতার বাসে কতটা ভিড় হয় তার প্রমাণ হিসেবে। সেই বাসে, অফিসের সময় উঠতে এসেছে নবদম্পতি। হাসবে না লোকে ?

বরের চেহারা রোগা, কালো, বছর তিরিশেক বয়েস, মুখময় পাউডার, গায়ে ঝলঝলে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে টোপর। সে অনুনয় করে বলছে, একটু উঠতে দিন না। বিশেষ দরকার!

আর সেই কথা শুনে পা-দানির ওপর থিকথিক-করা লোকগুলো, যারা জানলা ধরে ঝুলছে, যারা মাডগার্ডে বসে আছে, যারা কিছুই না ধরে চুম্বকের মতো স্রেফ বাসের গায়ে লেগে আছে, তারা সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন! উঠতে দিন না! কনডাকটার হাসছে, গাড়ি থামিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারও হাসছে।

বরের পাশে নতমুখী বধূ। তখনো লাল চেলী পরনে, গলায় বাসি ফুলের মালা, নিশ্চয়ই চোখে জল। আমি মেয়েটির মুখ দেখতে পাইনি, চোখ দেখতে পাইনি, কিন্তু নিশ্চয়ই সেই ছোট্টখাট্টো মেয়েটি সুন্দরী, অন্তত বিয়ের দু'তিন দিন কোন মেয়ে সুন্দরী নয় ? ওদের সঙ্গে আরো দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে, একজনের হাতে ফুল আঁকা টিনের সুটকেস।

বরকে দেখে মনে হয় কোনো কারখানার ভদ্র মজুর। কী এমন ওদের জরুরি দরকার কে জানে, যে বাসি বিয়ের দিনে এমন সময়েই ফিরতে হবে। ছেলেটিকে কি বিকেলের সিফট-এ যেতে হবে কারখানায়? কিংবা অন্য কিছু ব্যস্ততা। কিন্তু বিয়ের পরদিন বর-বউয়ের প্রথম একসঙ্গে যাত্রা, তাও এই ভিড়ের বাসে? ওরা পাগল নাকি! অবশ্য, যদি যেতেই হয়, কী করেই বা ওরা যাবে। বর-বউ হেঁটে যাচ্ছে, এ দৃশ্য আরো হাস্যকর। হয়তো ট্যাক্সি করা ওদের পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা, কিন্তু জীবনে এই একবারও কি বিলাসিতা চলে না! অবশ্য, তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল, এই সময় কোনো ট্যাক্সি পাওয়ার চেয়ে একটা মোটর গাড়ি কেনা অনেক সহজ।

হাসছিলুম আমিও, কিন্তু ভিতরে একটা গভীর দুঃখবোধও জেগে উঠেছিল। এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে, সকাল সাড়ে ন'টায় বাসে একটি সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে ঠেলে ঠুলে ওঠার চেষ্টা করতে দেখব—কোনোদিন ভাবিনি। আমি জানতুম, যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, যে কোনো বঙ্গ-যুবকই বিয়ের দু'তিনটি দিনের রাজা। অথচ এই বর্বর বরটা আজও বরযাত্রীদের মধ্যে উঠে দুশো জনের একজন হতে চাইছে! রাস্তা দিয়ে কত মোটর গাড়িও তো যাচ্ছে, কেউ তো হুস করে হঠাৎ থামিয়ে ওদের বলতে পারত, চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি। থাক, ওরা ঘোর দুপুর পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক, ততক্ষণ রাস্তার মজাখোর জনতা ওদের দেখে হাসুক!

বাস একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ ধরে রস উপভোগ করার ধৈর্য সবারই নেই। দুমদুম করে টিনের গায়ে আওয়াজ হলো, একজন চেঁচিয়ে উঠল, চলুন, আর নয়! অফিসে লেট হয়ে যাবে দাদা এই বর-বউ দেখতে দেখতে। রোগা চেহারার বরটি তখনো ওঠার নিষ্ফল চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাস স্টার্ট নেবার শব্দ, বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। খুব আস্তে চলতে শুরু করল, আরো বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, স্পীড নিল না। আবার ঘটাং ঘট আওয়াজ, আস্তে আস্তে চলতে চলতে দু' পা গিয়েই বাস থেমে গেল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কী হলো। কী হলো!

বাস থেমেই রইল, বেশ কিছুক্ষণ আরো বিদঘুটে ঘট ঘটাং আওয়াজ; তারপর ড্রাইভারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্রেক ডাউন, নেবে পড়ুন, বাস আর যাবে না!

একটু আগে ছিল হাসির ঢেউ, কিন্তু এখন ক্রুদ্ধ কলরোল। অবশ্য একথা সবাই জানে, একবার 'ব্রেক ডাউন' বললে, সে বাসে থেকে আর কোনো লাভ নেই। প্রবল চিৎকার করতে করতে সবাই নেমে যেতে লাগল, কে যেন বলে

উঠল, কী অপয়া বর-বউ দেখলুম রে বাবা! দেখা মাত্র গাড়ি খারাপ!

এখন এসব লোক কী করে পরের বাসে উঠে যাবে, তা কল্পনা করা ঈশ্বরেব পক্ষেও শক্ত। আমার অফিস-টফিসের ব্যাপার নেই, অন্য একটা কাজে যাচ্ছিলুম, এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলুম, যাক, আজকের মতো ছুটি! অফিস যাবার সময়ে মাঝপথে বাসে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বর-বউ তখনো দাঁড়িয়ে, বহুলোক তাদের ঘিরে আছে, দুটি সঙ দেখছে যেন তারা—সত্যিই অফিস যাবার ঘন্টায় প্রকাশ্য রাস্তায়, বর-বউ দেখা হাস্যকর ছাড়া আর কি! বউটির নিচু করা মুখ বুকের সঙ্গে মেশানো, নিশ্চয়ই চোখে জল।

আমার ইচ্ছে হলো, অযাচিতভাবেই বরকে গিয়ে ধমকে বলি, কী তোমার এমন জরুরি কাজ! যাও ফিরে যাও! অন্তত আর একটা বেলা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জামাই আদর খাওগে। তা, নয়, নতুন বউকে এই রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে...হাতে আবার টোপরটিও ধরে রাখা হয়েছে।

আমাদের ভূতপূর্ব বাসের ড্রাইভারটি বুড়ো মতন, এদিকে এল, মুখে চাপা হাসি। ড্রাইভার এসে বলল ওদের, আপনারা রোদ্দুবে দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ! এখন কোনো গাড়িতে উঠতে পারবেন না। তারচেয়ে, যান আমার এই খারাপ গাড়িতে উঠে বসে থাকুন!

মনে মনে আমি ড্রাইভারটিকে ধন্যবাদ জানালুম। বর টিনের সুটকেস নিয়ে ফাঁকা বাসের মধ্যে উঠে বসল লাজুক মুখে। সেই রকম নিচু মুখেই উঠে গেল ছোট্ট বউ আর তার সঙ্গে দু'তিনজন। লোকের চোখের আড়ালে গিয়ে যে ওরা বসতে পারল এতে খুশি হলুম আমি। যেন সমস্যাটা ছিল আমারই।

হঠাৎ দেখি বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। দারুণ চমকে তাকাল ভিড়েব লোকেরা। চলতে আরম্ভ করেই বাসটা দারুণ স্পীড নিয়েছে। দু'দরজার দুই কন্ডাকটার মুখ বাড়িয়ে, আর জানলা দিয়ে ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে চওড়া মুখে হাসছে। কয়েক সেকেন্ডের চমক, তারপরই ভিড়েব মধ্যে অট্টহাসি উঠল। সে হাসি আর থামতেই চায় না। এই লোকগুলি বোধহয় আজ আর অফিসেই যেতে পারবে না, তবু হাসছে হো-হো করে।

৩

আমাদের বাড়ির সামনে একটা আতা গাছ ছিল। একটা জমিদারবাড়ি এখন ফ্ল্যাটবাড়ি করা হয়েছে, কিন্তু বাগানে দু'একটা শৌখিনতার চিহ্ন এখনো থেকে

গেছে। আমাদের বাড়ি ছাড়া কলকাতা শহরে আমি আর দ্বিতীয় আতা গাছ দেখিনি।

গাছটা আমাদের ফ্ল্যাটের খুবই কাছে, দোতলা-সমান লম্বা, আমাদের দোতলা ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ওর পাতাগুলো পর্যন্ত ছোঁয়া যায়। ফিঙে, শালিক আর ইস্টকুটুম পাখি এসে বসে, মেটে সিঁদুর আর কালোয় মেশানো বড়ো সাইজের ইস্টকুটুম পাখিগুলো অন্য পাখিদের তাড়িয়ে দিয়ে আতায় ঠোক্কর দেয়। বিশেষ কিছু পায় না অবশ্য, এ গাছের আতাগুলো কেমন শুকনো-শুকনো, ছোট, ভেতরে সারপদার্থ কম। বাংলাদেশের জমিতে ভালো আতা গাছ হবার কথা নয়, তাই এ গাছটার চেহারাই অন্য রকম, দেওঘর-মধুপুরে যেমন বহু ডালপালা-ছড়ানো জননী-চেহারার আতা গাছ দেখেছি, এটা মোটেই সেরকম নয়। কেমন যেন লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা, সদ্যঢ় সরু হয়ে উঠে এসে, মাথার দুদিকে দুটি মাত্র ডাল বেরিয়েছে। যাই হোক, তবু তো আতা গাছ! বাড়িতে কেউ এলে আমি ডেকে ডেকে দেখাই। যেন ঐ গাছটা আমারই কীর্তি।

আমাদের ঠিক নীচের ফ্ল্যাটেই একটি হিন্দুস্থানী পরিবার থাকেন, ভদ্রমহিলাটি কাশীর মেয়ে, বেশ চমৎকার ভাঙা বাংলা শিখেছেন। কেন জানি না, তিনি ঐ আতা গাছটি দ'চক্ষে দেখতে পারেন না। বলেন, হাথ, এ আবার আতা গাছ আছে নাকি? জাত নষ্ট! ধ্যাৎ ধ্যাৎ!

বাড়ির কেয়ার-টেকারকে ডেকে তিনি প্রায়ই বলেন, গাছটা কেটে ফেলতে। ঘরের সামনে একটা গাছ, দেখতে ভালো না আছে। এটাকে কেটে দেও না।

মালিকের ভয়ে কেয়ার-টেকার কাটতে রাজি হয় না। আমরা বলি, ভাবীজী, গাছটা কাটবে কেন, থাক না। এত চেনা গাছের মধ্যে একটা আতা গাছ দেখতে বেশ ভালোই লাগে।

ভাবীজী বলেন, আতা কখনো দেখেননি নাকি? এটা গাছ না মুর্দা? ধ্যাৎ ধ্যাৎ!

বাড়িতে কোনো বন্ধুবান্ধব এলে প্রশ্ন করে, এটা কি গাছ রে?

আমি অন্যমনস্ক হবার ভান করে আলতো ভাবে বলি, আতা গাছ! তারা বলে, বাঃ, আতা গাছ এরকম হয় নাকি? এরকম লম্বা?

আমি প্রমাণ হিসাবে দ'একটা শুকনো আতা গাছের ডালে ঝুলছে দেখাই। কোনোটা আধখাওয়া কোনোটা শুকনো কাঠরঙা। সারা বছরই দ' একটা থাকে। ফ্ল্যাট বাড়ির গাছ—যে ইচ্ছে নিতে পারে, আমরা হাত বাড়িয়ে বা লাঠি দিয়ে অনায়াসেই আতাগুলো পেড়ে নিতে পারি, কিন্তু নিই-না, গাছটার জাতের প্রমাণ হিসেবে ফলগুলো গাছেই রেখে দিই। ওপাশের দিশি আমড়া গাছটার পাতা হয়, আবার পাতা ঝরে যায়, কিন্তু আতা গাছটা একটা রুক্ষ তেরিয়া ভাব নিয়ে সারা বছর এক রকম। পাখিরা, কেন জানি না, আমড়া গাছটার চেয়ে আতা গাছটাকেই

বেশি পছন্দ করে, একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠুক্‌রে ঠুকরে ওটায় গর্ত করতে চায়।

ভাবীজী কাপড় টানাবার জন্য একটা লোহার তার টান করে বেঁধেছেন আতা গাছটা আর নিজের ঘরের জানলার সঙ্গে। তারটা এমন টান যে, আতা গাছটা সামান্য হেলে গেছে। আমি বলেছিলাম, ভাবীজী, গাছটাকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি ?

ভাবীজী বললেন, ধ্যুৎ ধ্যুৎ, এ গাছ না মুর্দা ? জাত নষ্ট । আতা গাছ আপনি কি দেখেননি ? আমাদের কাশীতে আতা গাছ আছে, ইয়া ইয়া আতা হচ্ছে। আর এটাতে কি হয়—আতা না মোমফালি ?

আমি বলেছিলাম, গাছটা দেখতে তো ভালো। বেশ অন্যরকম—

একবার দেশে বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে ভাবীজী আমাদের জন্য অনেকগুলো আতা নিয়ে এলেন। বললেন, দেখুন, আতা কাকে বলছে। হ্যাঁ—এ হচ্ছে আসল আতা—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমি কি আতা দেখিনি নাকি? আতা এমন কিছু ভালো লাগে না খেতে!

—খেয়েই দেখুন, এ হচ্ছে আসলি জিনিস। মিষ্টি কি, গুড়।

আমার ভাইবোনরা বলল, সত্যি কি বিরাট বিরাট আতাগুলো, টুসটুসে হয়ে পেকে ফেটে গেছে।

ভাবীজী ছেলেমানুষীর মুখে গর্ব ফুটিয়ে বললেন, যে-রকম গাছ সে-রকম তো ফল হোবে। আতা গাছ এই রকম চওড়া, অনেক ডাল হবে, এমন ফল হোবে কি মাটি থেকেই হাত দিয়ে পেড়ে নিতে পারবেন। আর এখানে এটা কি আছে ? গাছ নাকি ? হাথ—

আমি বললুম, শুধু ফল দেখেই গাছের বিচার করতে হবে ? মনে করুন না, এটা শুধু গাছ, এমনই ভালো—

—তাহলে আতা গাছ কেন ? এমনি গাছ বললেই হয় ? আপনার বন্ধু-টন্ধু এলেই বলবেন কি, আতা গাছ, আতা গাছ—তারা ভাববে কি—আতা গাছ এই রকমই আছে, আতা গাছ এ রকমই দেখতে হয়। কেন, আমড়া গাছভি তো গাছ আছে, ওটা কেন দেখান না ?

—আমড়া গাছ তো সবাই চেনে। ওটা আর দেখবার কি আছে ? আতা গাছ তো কলকাতায় চট করে দেখতে পাওয়া যায় না—

সেবার আতা গাছটার ওপর ভাবীজীর রাগ যেন আরো বেড়ে গেল। সন্ধের দিকে তারটা ধরে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান মারেন যে গাছটা দুলে দুলে ওঠে। কিন্তু বেশ শক্ত গাছ, কলকাতার মাটি তার অপরিচিত হলেও দৃঢ়ভাবে ধরে আছে।

সত্যিকারের ফল ফলাতে চায় না, কিন্তু প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

ভাবীজীর কিন্তু গাছপালার খুব শখ, নিজের ঘরের চারপাশে নানান ফুল গাছ লাগিয়েছেন, ওর হাতের গুণে অল্প দিনেই থরে থরে ফুল ফুটে উঠল। একটা পেঁপে গাছও দু'এক বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠে দিব্যি বড়ো বড়ো পেঁপে ফলতে লাগল। ভাবীজী আমার মাকে নিজের গাছের পেঁপে উপহার পাঠিয়ে দিলেন। কি খুশিতে ঝলমল তার মুখ। শুধু আতা গাছটার ওপরেই যত রাগ। গাছটাকে ধরে ঝাকাতে দেখে আমি এক একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছি, ও ভাবীজী, গাছটাকে ও রকম করছেন কেন?

ভাবীজীও হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ওটা মরে গেলে, এটাকে কেটে বাগানের বেড়া বানাবো।

তারপর একদিন রাত্রিবেলা প্রচণ্ড ঝড় উঠল। সে কি ঝড়, বিশ্ব সেদিনই ধ্বংস হয়ে যাবে—এইরকম কাণ্ড, ভয়ংকর শোঁ-শোঁ আওয়াজ, ইলেকট্রিকের পোস্ট উল্টে গিয়ে সমস্ত তল্লাটটা অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়, পৃথিবী সত্যিই ভয় পেয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন, খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে প্রায় সারা রাতই ঝড়ের গর্জন শুনলাম। ঝড়ের মাঝপথে বৃষ্টি নামল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আচ্ছন্ন তন্দ্রায় সেদিন মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সত্যিই একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। কি রকম মাথার ওপর একটা কংক্রিটের ছাদ ও নিশ্চিন্ত বিছানা পেয়ে গেছি ভাগ্যবলে। গাছের পাখিদের আজ কি অবস্থা। কাল সকালে কি আর একটাও পাখি বেঁচে থাকবে?

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাড়ির সামনের বাগানটির অবস্থা একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতন। সারা বাগান লণ্ডভণ্ড, গেটের কাছটায় আমগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছে ইলেকট্রিকের তারে, একটা লাইট পোস্ট কাৎ হয়ে আছে, রিফিউজি কলোনির খড়ের চালগুলো থেকে গাদাগাদা খড় উড়ে এসে ছড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে।

আতা গাছটা কাৎ হয়ে আছে। বৃক্ষেরা নাকি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ, যেদিকে বাড়ি থাকে সেদিকে সাধারণত গাছ হেলে পড়ে না। আতা গাছটা আমাদের বারান্দার উল্টো দিকে অনেকখানি হেলে পড়েছে, অনেকগুলো শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ পড়ে যায়নি, কিছু শিকড় এখনো মাটি আঁকড়ে আছে—যেন গাছটা এখনো বাঁচতে চায়, বাঁচার তীব্র ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে ভূমিশয্যা নেয়নি। কেউ যদি গাছটাকে ঠেলে আবার সোজা করে দেয় ও হয়তো আবার বেঁচে উঠবে।

ভাবীজী শিশুর মতন আনন্দে বাগানময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ওঁর বাগানের ছোট ছোট ফুল গাছ বা পেঁপে গাছটার কোনো ক্ষতি হয়নি। কাপড় টাঙ্গানো তারটা ধরে ভাবীজী বারবার হ্যাঁচকা টান মারতে লাগলেন। আতা গাছটা নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল, তবু প্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা। আমার কেমন মনে হলো, গাছটা শারীরিক কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণায় শিউরে শিউরে উঠছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, কাশীর মেয়ের গায়ে বেশ শক্তি, একবার তারটা ধরে খুব জোরে টান দিতেই আতা গাছটার শেষ শিকড়গুলো পটপট করে ছিঁড়ে ঝপাস করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। ভাবীজী আনন্দে হাততালি দিলেন।

ভূপাতিত বৃক্ষ কি আমি আগে দেখিনি ? কিন্তু সেদিনকার সেই দেখার তুলনা হয় না। আগে, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গাছ দেখেছি। কিন্তু উঁচু থেকে, ওপরে দাঁড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়া একটা গাছকে দেখার অনুভব অন্যরকম। গাছটার সমস্ত পাতা সবুজ, জীবন্ত শরীর, দেখলে মনে হয়, এইমাত্র মৃত্যু হলো। বিশাল লম্বা শরীর, মাথার কাছে দুটি মাত্র ডাল, হাতের মতন ছড়িয়ে অবিকল মানুষের মতন গাছটা যেন এইমাত্র অসহায়ভাবে মরে পড়ে গেল। বুঝি একটা শালিকের বাসা ছিল, দুটো শালিক পিড়িং পিড়িং শব্দ করে গোল হয়ে ঘুরছে মাথার কাছে, অবিলম্বে দুটো শান্ত চেহারার গরু গাছটাব একেবারে ডগার দিকের কচি পাতাগুলো—গরুগুলো যা কোনোদিন ছুঁতে পাবার আশাই করেনি, এখন নির্বিকারভাবে ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। দৃশ্যটা এমনই ট্রাজিক যে হঠাৎই আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, বুঝি জল এসে যাবে।

গাছটাকে দেখে তখন আমার মানুষের মতনই মনে হয়েছিল। কোনো নিস্ফল মানুষেরই মতন অসহায়ভাবে শুয়ে আছে। যেন কোনো মহাকাব্যের ট্রাজিক চরিত্র —মহাভারতের কর্ণ। পরের ঘরে মানুষ হয়ে যে সারাজিবন শুধু দুঃখই পেয়ে গেল।

৪

যেসব মানুষ একা ভয়ংকর পর্বত-শিখরে ওঠেন, যারা দুঃসাহসে সমুদ্র সাঁতরে পার হন, তাঁদের কারুর সঙ্গে আমাব কখনো দেখা হয়নি। অথচ খুব ইচ্ছে হয়। দেখা হলে একটা সামান্য প্রশ্ন করতুম। জিজ্ঞেস করতুম, এই যে দুঃসাহসের কৃতিত্ব স্থাপনের প্রয়াস, এর মধ্যে একটা উপকারী অহংকার আছে ঠিকই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার অন্য একটি কৌতূহলের উত্তর দিন দয়া করে। সেই বিপদ

ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনো এক সময় কি আপনার জীবনের সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে ? আপনি জীবনে যা-যা ভুল করেছেন, তার জন্য ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে ? আজ পৃথিবীতে মানুষ কোথাও আর স্বেচ্ছায় ক্ষমাপ্রার্থী নয়। কিন্তু যখন সে অত্যন্ত নির্জন, তুষার-ঝড়ের মধ্যে পাহাড়-শিখরে কিংবা হিংস্র জলজ জন্তু ও তরঙ্গসঙ্কুল মধ্য-সমুদ্রে, যখন প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুভয় তার নির্জনতাকে চরম করে, তখন একবারের জন্যও কি, জীবনের কোনো অপরাধ বা ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয় ?

অন্যসময় আজকাল আর কেউ ক্ষমা চায় না। পৃথিবীতে মানুষের যত ঝগড়া, পরস্পরের মনে দুঃখ দেওয়া—তার অধিকাংশই তো ভুল কারণে, ভুল বুঝে —একবার অকপট ক্ষমা প্রার্থনায় হয়তো সব মিটে যেত। খুব সামান্য দু'একটা ঘটনা উল্লেখ করি।

আমার পাশের বাড়িতে একদিন সকালবেলা তুমুল কোলাহল শুনতে পেলাম। যেন সে-সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহই নেই—এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়, অথচ সেদিকেই কান ফেরানো আমার, চোখ বারবার সেদিক থেকে ঘুরে আসছে।

গণ্ডগোলটা পরেশকে নিয়ে। পরেশকে বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহ করা হচ্ছিল, আজ সকালে সাড়ে তিনশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে না—নিশ্চয়ই পরেশের কাজ। সত্যসিন্ধুবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নিমোখারাম কোথাকার! জানি তো, মানুষের উবগার করলে আজকাল কোনো লাভ নেই, সবাই নিমোখারাম! দে টাকাটা বার করে দে, তারপর দূর হয়ে যা! নইলে তোকে আমি পুলিশে দেব!

পরেশের বয়েস উনিশ-কুড়ি, রোগা, লাজুক, কমার্স পড়ে, আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে। পরেশ সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িতে আশ্রিত, গ্রাম সম্পর্কে না কি রকম যেন খুব দূরত্বের আত্মীয়তা আছে, অনাথ ও নিঃসম্বল বলে সে ওবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে। অর্থাৎ কিছুটা চাকরের কাজ, কিছুটা ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা—অনেক সচ্ছল বাড়িতেই এরকম দু'একটা ছেলে থাকে, যে বাড়ির ইলেকট্রিক খারাপ হলে সারাবার ব্যবস্থা করে, দুধের কার্ড করতে লাইনে দাঁড়ায়, গৃহিণীর জন্য ম্যাটিনির টিকিট কাটে, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ উঠেছে শুনে যাকে পাঠানো যায়, বাড়িসুদ্ধ সবাই বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে যে বাড়ি পাহারা দেয় —পরেশও ঠিক সেইরকম, ঠিক চাকর নয়—কারণ মাইনে পায় না, খাওয়া ও পরার বিনিময়ে 'বাড়ির ছেলের মতো' থেকে কাজকর্ম করে।

পরেশকে আমি মোটামুটি ভালো ছেলে বলেই জানতুম, কিন্তু আজ ওবাড়ির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, পরেশই চুরি করেছে। সত্যসিন্ধুবাবুর অফিসে যাবার

কোটের পকেটে টাকা ছিল, পরেশ তাঁর শোবার ঘরে আজ সকালে দু'বার ঢুকেছিল কেন? পরেশের উত্তর বড়ো নড়বড়ে, একবার খবরের কাগজ নিতে, আর একবার —ক'টা বেজেছে দেখার জন্য। কেন, একতলার বসবার ঘরেও তো ঘড়ি ছিল? ও ঘড়িটা খুব স্লো!

কাল অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল, টাকাটা কোটের পকেটেই রেখেছিলেন, এই সকালের মধ্যে আর কে নেবে? রান্না করার ঠাকুর দোতলায় ওঠে না, ঠিকে ঝি আজ আসেইনি, নিজের ছেলেমেয়েরা তো নেবে না, আর নেবে কে, পরেশ ছাড়া?

মেজ মেয়ে ঊর্মিলা বলল, হ্যাঁ আমিও দেখলুম, ও তোমার ঘর থেকে বেরুচ্ছে সাড়ে আটটার সময়, আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল।

পরেশ শান্তভাবে বলল, আপনাকে আমি সব সময়ই ভয় করি।

সত্যসিন্ধুবাবু বললেন, টাকাটা বার কর! আজকাল রক্তের সম্পর্কের লোকদেরও বিশ্বাস নেই—তার এইসব বাজে...তখনই তোমাকে বলেছিলাম...দুধকলা দিয়ে...ওঁর স্ত্রী বললেন, আগে তো কোনোদিন খারাপ কিছু দেখিনি...নিজের ছেলেব মতো আদর-যত্নে রেখেও যদি...। পরেশ বারবার দৃঢ়স্বরে বলছে, সে টাকা নেয়নি। সত্যসিন্ধুবাবু হঠাৎ রাগের মাথায় পরেশের বাবা-মাকে জড়িয়ে একটা গালাগালি দিয়ে ফেললেন। পরেশ বলল, ওসব নোংরা কথা বলবেন না। আমরা গরীব ঠিকই কিন্তু...।

এরকম ঝগড়া কিছুক্ষণ গড়ালো। সত্যসিন্ধুবাবুর অফিসের বেলা হয়ে যায়। তিনি পরেশের গালে জোরে একটি চড় কষালেন, গৃহিণীর অনুরোধে তাকে আর পুলিশে দিলেন না—তক্ষুণি তাকে দূর হয়ে যেতে বললেন বাড়ি থেকে। একটা টিনের সুটকেশ আর রংজ্বলা সতরঞ্চির বিছানা নিয়ে পরেশ চলে গেল—যাবার সময় শুধু তিক্তস্বরে, একটু চেঁচিয়ে বলে গেল—পুলিশে দেবার উপায়ও ছিল না আপনার। যে টাকাটা আপনার হারিয়েছে, সে টাকাটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন তাও তো পুলিশকে বলতে হতো। ঘুষের টাকা।

দুদিন পর, সত্যসিন্ধুবাবুর ছোটছেলে আমাদের বাড়িতে লুডো খেলতে এসে ফিসফিস করে বলল, জানেন, পরেশদা চোর নয়। বাবা টাকাটা খুঁজে পেয়েছেন! — শুনে আমি শিউরে উঠলুম। টাকা যদি না নিয়ে থাকে তবে টিনের সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে পরেশ কোথায় গেল? এই শহরে নিঃসম্বল অবস্থায় সে কি করবে? তার ওপর আবার ভুল অপমানের গ্লানি। ছেলেটা আত্মহত্যা করবে না তো।

কিন্তু পরেশের সঙ্গে আমার শিয়ালদা স্টেশনেই দেখা হয় গেল। সে স্টেশনে

রাত্রে শোয়, দিনের বেলা পোস্ট অফিসের সামনে বসে মনিঅর্ডার ফর্ম লিখে বারো আনা একটাকা উপার্জন করে। এখন আর কলেজে যাচ্ছে না, চোখে-মুখে তার একটা ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার ছাপ পড়েছে।

একদিন সুযোগ পেয়ে সত্যসিন্ধুবাবুকে আমি একথাটা জানিয়ে দিলুম যে, পরেশ এখন শিয়ালদা স্টেশনে রাত্রে শোয়। সত্যসিন্ধুবাবু হঠাৎ বিব্রত মুখে বললেন, যাও, ওর ঐরকম শাস্তি হওয়াই উচিত। টাকাটা তুই নিসনি, তা বললেই পারতিস! তা নয় মুখে মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! আমি ওর বাপের বয়েসী, এতদিন মানুষ করলুম, একটু শ্রদ্ধাভক্তি নেই! গেছে আপদ গেছে!

সত্যসিন্ধুবাবু এ-পাড়াতে বেশ একজন শ্রদ্ধেয় লোক। খুব বড়ো চাকরি করেন, সুদর্শন প্রৌঢ়, পাড়ার ক্লাবের তিনি সভাপতি, একটি স্কুলের সহ-সভাপতি, দুর্গাপুজোয় প্রচুর চাঁদা দেন। পরেশকে তিনি অন্যায় সন্দেহ করেছিলেন, এজন্য পরেশের কাছে যদি তিনি ক্ষমা চাইতেন—তাঁর গৌরবের একটুও হানি হতো না —কিন্তু পরেশের জীবনটা হয়তো বদলে যেত। তার বদলে পরেশ কোন ছন্নছাড়া জীবনে চলে গেল। একদিন হয়তো পরেশ এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আসবে। কিংবা, সে না পারলেও পরেশের ছেলে হয়তো একদিন এসে প্রতিশোধ নেবে সত্যসিন্ধুবাবুর ছেলের ওপর। এইরকমই চলবে। তার বদলে, আমি কল্পনা করলুম, রাত্রি সাড়ে দশটায় সত্যসিন্ধুবাবু নিজের গাড়ি নিয়ে গেছেন শিয়ালদা স্টেশনে, ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে পরেশ শুয়ে আছে বিমর্ষ মুখে, হয়তো বিকেল থেকে কিছু খায়নি, চোখ দুটো থরথর করছে তার, এমন সময় তিনি যদি ওর মাথার পাশে গিয়ে বলতেন—বাবা পরেশ, তোকে আমি ভুল ভেবেছিলাম, আমায় ক্ষমা কর! পরেশ নিশ্চয়ই তখন চমকে মুখ ফিরিয়ে থেকে, একটু পরে অভিমানে কেঁদে ফেলত। সেই মধুর দৃশ্যটি সম্ভব হতো, একটি মাত্র ক্ষমা প্রার্থনায়। কিন্তু, তা সম্ভব হবে না। কারণ, আজকাল কেউ ক্ষমা চাইতে জানে না।

আমিও পারিনি। জীবনে কত ভুল করেছি, কত মানুষের ওপর অন্যায় ব্যবহার করেছি, পরে মুখ ফুটে ক্ষমা চাইতে পারিনি। আমি ভেবেছি, ক্ষমা চাইলে যদি অনাধুনিক হয়ে যাই, যদি মনে হয় সেটা ন্যাকামি! কোথাও কেউ ক্ষমা চায় না —বাধ্য হয়ে বিপদে পড়ে বা ভয়ে ভয়ে ক্ষমা চাওয়া নয়, এমনিই স্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃশর্তভাবে আর কেউ ক্ষমা চায় না। পৃথিবীর বহু বড়ো বড়ো ভুলের কথা জানি, কিন্তু আমার একটি সামান্য ভুলের কথা বারবার মনে পড়ে, আমি তার জন্যও ক্ষমা চাইতে পারিনি।

আমি এক মনোরম বিকেলবেলা এক বান্ধবীর সঙ্গে চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দূর থেকে একটি পরিচিত লোককে আসতে দেখতে পাই। এক ধরনের

পরিচিত লোক থাকে—যাদের সঙ্গে বারবার শুধু পথেই দেখা হয়। আমি তার বাড়ি চিনি না, সে আমার বাড়ি চেনে না, অথচ পথে পথে দেখা হয়— সারাজীবনই এইরকমই পরিচয় থেকে যায়। এই লোকটিও সেইরকম।

লোকটি অতিশয় ভালোমানুষ, দেখা হলেই কোনো রেস্টুরেন্টে বসতে চান, নিজে পয়সা খরচ করেন, পরিবর্তে কোনো উপকার চান না, কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলতে চান।

লোকটির সঙ্গে প্রায় মাস তিনেক পরে দেখা, কিন্তু সেই মুহূর্তে লোকটির সঙ্গে কথা বলার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। বান্ধবীর সঙ্গে সময় কাটাবার অতি লুব্ধতায় আমি লোকটিকে না-দেখার ভান করছিলুম। তবু লোকটি পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, এই যে, কী খবর? আমি সাদামুখ করে বললুম. ভালো।

লোকটি তখনো উজ্জ্বল হাস্যে বললেন, তারপর সেদিন যে কথা ছিল—আমি তখনো নির্বিকারভাবে বললুম, কি কথা বলুন তো!

লোকটি একটু থতমত খেয়ে বললেন, কী চিনতে পারছেন না নাকি? আমি বললুম, হ্যাঁ মানে, ঠিক কোথায় আলাপ মনে পড়ছে না, তবে...

লোকটি বিবর্ণমুখে বললেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না? আমি বললুম, হ্যাঁ, মুখ চেনা-চেনা লাগছে, তবে...। লোকটি আবার বললেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না?—আমি তখনো মরীয়া হয়ে প্রচণ্ড ক্যাডের মতো বললুম, হ্যাঁ, তা, আপনার নামটা...।

লোকটির মুখ পাংশু হয়ে কুঁকড়ে গেল, মৃদুস্বরে বললেন, আচ্ছা থাক! তারপর হনহন করে চলে গেলেন।

আমার পাশে দাঁড়ানো বান্ধবী বললেন, ঐ লোকটির নাম তো অনিমেষ ভট্টাচার্য! তুমি চিনতে পারলে না? আমি বললুম, তুমি কি করে জানলে, তোমার চেনা? বান্ধবী হেসে বললেন, বাঃ, একদিন সেই যে আমরা চায়ের দোকানে বসেছিলাম, এই ভদ্রলোক এসে বসলেন, তুমি আলাপ করিয়ে দিলে, উনি খুব মজার মজার গল্প বলছিলেন, আমার মনে আছে, আর তোমার মনে নেই!

আমার সবই মনে ছিল, তবু কেন যে ওরকম ব্যবহার করলুম ওর সঙ্গে, আজও জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠল সেই বিবর্ণ, অসহায় অপমানিত মুখ। এবং তার চকিত পলায়ন। নিজের প্রতি ঘৃণায় আমি ছি-ছি করতে লাগলুম। ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে লোকটির কাছে ক্ষমা চাই। কিন্তু অনিমেষ ভট্টাচার্য তখন ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছেন। যে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলার লোভে আমি লোকটিকে তাড়াতে চেয়েছিলুম, লোকটিকে তাড়িয়ে দেবার পর—সেই

বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতেও আর আমার ভালো লাগল না।

অনিমেষ ভট্টাচার্যের কাছে আমার আর কোনোদিনই ক্ষমা চাওয়া হয়নি। কারণ, তাঁকে কোথায় খুঁজে পাব জানতুম না। কীরকমভাবে ক্ষমা চাইব, মনঃস্থির করতেও কয়েকদিন কেটে গিয়েছিল। তা ছাড়া, হঠাৎ পথের মধ্যে দেখে ওঁকে ডেকে যদি বলতুম, শুনুন, সেদিন আপনাকে যে আমি চিনতে পারি নি —সেটা আমার ভুল হয়েছিল—তা হলে রাস্তার লোকেরাও আমার কথা শুনে হতভম্ভ হয়ে যেত। তবু, আমি অনিমেষ ভট্টাচার্যকে খুঁজতে লাগলুম। যদি পথে আবার কখনো দেখা হয়, সেইমত পথের সমস্ত মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে নজর রেখেছি। কিন্তু অনেকদিনের মধ্যেও তার সঙ্গে দেখা হলো না। ভদ্রলোকের ঠিকানাও আমি জানতুম না। সামান্য একটা ব্যাপার, তবু আমার মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে রইল।

তারপর আমার অপর এক বন্ধু কথায় কথায় একদিন বললন, তুই অনিমেষ ভট্টাচার্যকে চিনতিস ? গালুডিতে যাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা ছিলাম সবাই ? শুনলুম, গত সোমবার সেই ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেছেন।

আমার ইচ্ছে আছে, পর্বতশিখরে উঠে কিংবা গভীর সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আমি অনিমেষ ভট্টাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইব।

৫

প্যান্ট-সার্ট পরে সবে মাত্র জুতোয় ফিতে বেঁধেছি, এমন সময় হৈ-হৈ করে বৃষ্টি এল। অথচ বেরুতেই হবে আমায়। কয়েকদিন বুক-পোড়ানো গরমের পর বৃষ্টির জন্য আকাশের পায়ে ধরে সাদাসাধি করেছিলুম, কিন্তু এখন এমন জরুরি সময় বৃষ্টি আমার মোটেই পছন্দ হলো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে পা ঠুকতে লাগলুম।

মিনিট দশেক পরেই বৃষ্টি থামল যাহোক। গলির মোড়েই আর এক বিপত্তি। একটা বাস একটা গমবোঝাই লরিকে গোঁয়ারের মতন ধাক্কা মেরেছে। কেউ ভেঙে টুকরো হয়নি একটা মানুষও মরেনি, কিন্তু দু'জনেই এমন বেঁকে দাঁড়িয়েছে যে, পথ জোড়া, অর্থাৎ কিছুক্ষণ বাস চলবে না। এখান থেকে হেঁটে অন্য বাসের রাস্তায় যেতে হলে দশ মিনিট হাঁটতে হয়। হেঁটেই যেতুম, কিন্তু বৃষ্টিতে সামনে এক জায়গায় জল জমেছে, ওখানটা আমায় পেরুতে হলে জুতো প্যান্ট ভেজাতে হয়। একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এখন যদি জুতোটা ভিজে পা স্যাঁতসেঁতে

হয়ে থাকে, তাহলে তো কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরুবে না। অথবা, সব কথাই বোকা বোকা শোনাবে।

আমাদের এখানে সাইকেল রিক্সা। দূরে একটি খালি রিক্সার টিনটিনি আওয়াজ শুনতে পেলুম। রিক্সাওয়ালা বলাই আমার চেনা, প্রায় ওর গাড়িতে বাজার থেকে আসি। হাত তুলে বললুম, বলাই দাঁড়াও।

বলাই আমার সঙ্গে চোখাচোখি না করে বলল, এখন আমি ভাড়া যাব না।

আমি একটু অনুনয়ের সুরে বললুম, ঐদিকেই তো যাচ্ছ, নিয়ে চলো না।

—যেতে পারি, এক টাকা ভাড়া লাগবে!

আমি শুনে অনড়। তিরিশ পয়সার রাস্তা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ বলুক, তার বদলে সোজা এক টাকা! আমি কড়া গলায় বললুম, ব্যাপারটা কি ? একটাকা চাইতে তোমার লজ্জা করে না। আট আনা দেব, চলো—

—বললুম তো, ভাড়া যাব না।

বলাইয়ের প্রত্যাখ্যান সপাং করে আমার মুখে লাগল। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ছোঁড়াটার দু'গালে দুই থাপ্পড় কশিয়ে দি। কিন্তু তার আর সময় পেলুম না। একজন সুসজ্জিত প্রৌঢ়, হাতে চামড়াব ব্যাগ, মেঘলা দিনেও চোখে কালো রোদ-চশমা, ভারী গলায় বললেন, চলো এক টাকাই দেব! এই বলে তিনি বলাইয়ের রিক্সায় উঠে বসলেন!

আমি অপমানে নীল-লাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তাবপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, প্যান্টের পা দুটো ইয়াঙ্কি কায়দায় হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে জুতো খুলে হাতে ঝুলিয়ে উদাসীন মুখে জলের মধ্যে সপ সপ করে হাঁটতে লাগলুম।

পরদিন সকালে মুদি দোকানে ব্লেড কিনতে গেছি। আমি একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু দাড়ি কামাবার সময় পাতলা বিলিতি ব্লেড না হলে আমাব চলে না। ডিভ্যালুয়েশনের পর এসব ব্লেডের দাম বেড়ে গেছে। কিন্তু দোকানের মালিক অধিকারীদা বললেন, আপনাব কাছ থেকে বেশি দাম নেব না, আমার পুরোনো কেনা ছিল, অন্যের কাছ থেকে বেশি নিচ্ছি, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাদা কথা। বসুন, বসুন, ঐ টুলটায় বসুন।

এই সামান্য কৃপার পরিচয় পেয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। আমি তো বেশি দাম দেবার জন্য তৈরি হয়েই ছিলুম। অধিকারীদা মুদিব দোকানের মালিক হলেও অনেকটা বন্ধুর মতন। আমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করতে খুবই ভালোবাসেন। ওঁর এখনো দৃঢ় ধারণা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে।

পাকিস্তান থেকে এসে ব্রজকিশোর অধিকারী এখানেরই একটা রিফিউজি কলোনিতে উঠেছিলেন, একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতেন, উনি আই. এ.

পাশ এবং সংস্কৃতে বেশ ভালো জ্ঞান। প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টারও হয়েছিলেন, হঠাৎ মাস্টারিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। ইস্কুলের সেক্রেটারি অর্থাৎ আমাদের এলাকার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিজীবন কুণ্ডুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি লাগত। হরিজীবনবাবু সেই ইস্কুলের আবহমানকাল ধরে সেক্রেটারি এবং ওখানে একটি অলিখিত আইন এই যে, সেক্রেটারির যে কন্যারত্নটি আবহমানকাল ধরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, তাকে হেড মাস্টার বিনা পয়সায় পড়াবেন। এবং প্রত্যেক বছর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পর ছাত্রীর বদলে শিক্ষক মাথা পেতে গালাগালি খাবেন। এই সব ব্যাপারে চটাচটি করে অধিকারীদা মাস্টারি ছেড়ে মুদিখানা খুলেছেন। উনি এখন বলেন, দূর শালা! মাস্টারি করে পেটও ভরছিল না, মান-সম্মানও থাকছিল না। উঠতে বসতে ঐ শালা কুণ্ডুকে তোসামোদ করতে হতো। এখন মুদি হয়েছি, এতে সম্মান থাক না থাক, পেট তো ভরছে।

পেট যথেষ্টই ভরছে, অধিকারীদা এই দু'তিন বছরেই যথেষ্ট উন্নতি করেছেন, শুনেছি রিফিউজি কলোনীর মধ্যেই তিনি তিনতলা বাড়ির ভিত খুঁড়েছেন, সম্প্রতি। অধিকারীদা'র একমাত্র উচ্চাভিলাষ, একটি স্কুল খোলা—এবং তিনিই হবেন সেই স্কুলের সেক্রেটারি।

হরিজীবন কুণ্ডুকে আমি চিনি। ওর দশবারোখানা লরির ট্রান্সপোর্টের ব্যাবসা, আলু-পেঁয়াজের হোল-সেলার, পাঁচ-সাতখানি বাড়ির ভাড়া খাটানো ইত্যাদি নানান কাণ্ড। ওর ছেলে শম্ভু আমার সঙ্গে কলেজে এক সঙ্গে পড়ত, প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম। শম্ভু বছর চারেক আগে মোটর-দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কিন্তু হরিজীবনবাবু এখনো আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, এমনকি ওঁর কন্যারত্নটিকে বিয়ে করে আমায় ধন্য হয়ে যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন এক সময়। আমি অবশ্য, ওকে দেখলেই সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

যাই হোক, মুদির দোকানে বসে অধিকারীদা'র সঙ্গে ভিয়েৎনাম বিষয়ে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছি, এমন সময় একটি খরিদ্দার এল। তাকিয়ে দেখি, কালকের সেই রিক্সাওলা বলাই, সর্ষের তেল কিনতে এসেছে। অধিকারীদা ওকে গ্রাহ্য না করেই বললেন, তেল নেই।

বলাই ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, একটুও নেই? আমার যে একেবারে বাড়ন্ত!

—আছে, কিন্তু তোকে আমি বিক্রি করব না।

—কেন?

—ছ'টাকা কিলো দিতে পারবি?

—ছ'টাকা? গত হপ্তায় নিয়ে গেলুম চার টাকা চল্লিশ!

—আমার স্টকে দু'এক টিন আছে, তা তোকে দিতে যাব কেন তবে? আমার

বাঁধা বড়ো খদ্দেরদের ফিরিয়ে দেব? ছ'টাকা করে পারিস তো দে, নিয়ে যা। তোরা তাও পারিস, তোদেরই তো এখন রাজত্ব।

—চার টাকা থেকে ছ'টাকা! গরীবদের ওপর—

বলাই তেল না নিয়েই ফিরে গেল। অন্য কেউ হলে আমি ব্যাপারটায় বিরক্ত হয়ে অধিকারীদাকে দু'চার কথা বলতুম। কিন্তু বলাইয়ের ব্যাপারে আমার মনে হলো, বেশ হয়েছে। ওর কালকের ব্যবহারে এখনো আমার রাগ পড়েনি। অধিকারীদাকে কিন্তু আমি বলাই সম্পর্কে আগে কিছুই বলিনি। উনিই বরং বললেন, তুমি হয়তো ভাবছ, আমিও পাকা কালোবাজারী হয়েছি। কিন্তু ব্যাবসা করতে গেলে অনেক কিছু ঠেকে শিখতে হয়। কাল হরিজীবনের (এখন আর বাবু বলেন না) গোডাউন থেকে আলু-পেঁয়াজ আনতে গেলুম, আলুর দাম চাইলে আশী পয়সা কিলো। অথচ বাজারে তখনো সত্তর দাম যাচ্ছে। কী বললে জানো? আলুর স্টক কমে এসেছে, বড়ো বড়ো পাইকারদের না দিয়ে তোমাকে দিতে যাব কেন, যদি বেশি দাম না দাও! নিতে হয় নাও, নইলে পথ দেখো। কথাটা ঠিক, বড়ো খদ্দেররাই লক্ষ্মী, জিনিস শর্ট পড়লে তাদেরই আগে দিতে হয়। আমি আর কথা না বাড়িয়ে অধিকারীদার দোকান থেকে উঠে পড়লুম।

পরদিন বিকেলবেলা আবার বৃষ্টি, আবার রাস্তায় জল। তবু ভাগ্যি এখনো বাস বন্ধ হয়নি। চলন্ত গাড়ি থেকে কাদা ছেটার ভয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে বাসের বদলে একটা মোটরগাড়ি এসে থামল আমার সামনে। হরিজীবন কুণ্ডু মুখ বাড়িয়ে বললেন, কোথায় যাবে বাবাজী? উঠে পড়ো গাড়িতে।

উঠলুম। প্রশস্ত নতুন গাড়ি, ভাঙা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তবু ঝাঁকুনি সামান্য। যাক, বসুদের আড্ডাখানা পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় আরামে যাওয়া যাবে। হরিজীবনবাবু মোলায়েম গলায় বললেন, কোথায় থাকো বাবাজী, আজকাল আর দেখি না তোমাকে? আমি বললুম, এই আর কি। আজকাল আর কিছুই ভালো লাগে না।

—কোথায় চললে এখন?

আমি উদাস হয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, দেখি, কোনো ঠিক নেই। ভাবছি গোয়াবাগানের রামকৃষ্ণ মিশনে যাব একবার। ওখানে সন্ধেবেলা বেদপাঠ হয়, আমি শুনতে যাই মাঝে মাঝে।

—তা বেশ বেশ; হে-হে, এই বয়সে তোমার মতন এমন ধর্মে মতি আজকাল আর...বিয়ে-থা তো করলেই না...

—আপনি কোথায় চললেন?

—আর বলো কেন? আমরা সংসারের ঘানিতে বাঁধা। কর্তব্য করে যাচ্ছি। যাচ্ছি খুচরো পয়সা যোগাড় করতে।

—খুচরো পয়সা?

—হ্যাঁ, খুচরো পয়সা। আজ আমার ছ'খানা লরি ছাড়বে, তার জন্য দেড়শো-দুশো টাকার খুচরো ভাঙানি দরকার। সিকি-আধুলি।

—লরির জন্য এত সিকি-আধুলি।

—তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই জানো না দেখছি। অন্তত তিরিশ চল্লিশ টাকার খুচরো সঙ্গে না দিলে লরিওয়ালা গাড়ি ছাড়তেই চায় না। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে পুলিশকে পয়সা দিতে হবে না?

—লরিওয়ালা পুলিশকে টাকাপয়সা ছুঁড়ে দেয় বটে দেখেছি, কিন্তু কেন দেয় বলুন তো? বুঝতে পারি না!

—আগেকার দিনে বিধবাদের দেখেছ? যখন গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন, রাস্তার দু'পাশে ঠাকুর দেবতার মন্দির দেখলেই একটা করে পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। এখন আমাদের সেই অবস্থা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দেয় এরা।

—কেন? শুধুই ভক্তির জন্য?

—হে-হে। বলেছ ভালো। প্রত্যেক ট্রাকের পারমিট হচ্ছে ছ'টন মাল নেওয়া। আমাদের আট টন না নিলে গাড়ি ভর্তি হয় না, খরচ পোষায় না। ফলে সবাই আট টন করে নেয়। কিন্তু বেশি মাল নেবার জন্য কোনো ট্রাকের বিরুদ্ধে মামলার কথা কখনো শুনেছ? শোনোনি তো! তার কারণ, বন্দোবস্ত আছে, ট্রাফিক কনস্টেবল দেখলে চার আনা, মোটরবাইকে চড়া সার্জন এসে ধরলে আট আনা, আর পুলিশের গাড়ি হলে পাঁচ টাকা। এই বাঁধা রেট। এখন এক-একটা গাড়ি যাবে কানপুর, আমেদাবাদ পর্যন্ত। কত পয়সা ফালতু যায় বলো তো? মা ষষ্ঠীর কৃপায়, আমাদের দেশের আর যা কিছুরই অভাব থাক, পুলিশের তো অভাব নেই! হে-হে-হে—

মা ষষ্ঠীর কৃপা শুনে আমিও না হেসে পারলুম না। হরিজীবনবাবু রুমালে মুখ মুছে আবার বললেন, আট টন মাল নিলে ট্রাকের কোনোই ক্ষতি হবে না, এ জন্য কোনোদিনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, তবু এই ভ্যানতাড়া আইন করে রেখেছে। আরে বাপু, তোদের স্টেট বাসে যে কমড়ো গাদা করে এত লোক তুলছিস, এত লোড তোলার কোনো নিয়ম আছে? তার বেলা কিছু না। ট্রাফিক পুলিশের পাশ দিয়ে বাস ঠিক চলে গেল, কিন্তু লরি এলেই চার আনা। আর এই কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আমার বাড়তি খরচা হচ্ছে, এবং আমি কোনো হিসাব দেখাতে পারব? ইনকামট্যাক্সওলাদের আমি বোঝাতে পারব যে মশাই, ঘুষ দিতে আমার এত টাকা খরচ হয়েছে? তখন সেখানেও—

আমি, চেঁচিয়ে বললুম, থামান, থামান, আমি এসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম, এত সব অকাট্য যুক্তি দেখে আমার মাথা ঘুরছিল।

মাঝে মাঝে পরপর কয়েকটা এমন ঘটনা আসে চোখের সামনে যে, মনে হয় তারা যুক্তি করে এসেছে, এসে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে আরম্ভ করে। এর তিন-চারদিন পর, একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল! বড়ো রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি রাত বারোটা আন্দাজ। বিয়ের তারিখ, সুতরাং রিক্সা পাবার আশা খুব কম। চোখের সামনে ঝলমলে পোশাকপরা যাত্রী যাত্রিনীদের নিয়ে সটসট করে রিক্সা চলে যাচ্ছে। আরো দু'তিনজন লোক রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে। বহুদিন পর অনেক সুখাদ্য খেয়েছি—সুতরাং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করাই স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল—মনকে এই সব যুক্তি বোঝাচ্ছি, হঠাৎ আমার কাছেই এসে একটা রিক্সা খালি হলো। দেখি সেই বলাইয়ের রিক্সা। সেদিন ওর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, সুতরাং ওর রিক্সায় আমার উঠতে ইচ্ছে হলো না। তখন পাশ থেকে আর একজন লোক এসে বলল—চলো, ভাড়া যাবে?

বলাই গম্ভীর মুখে বলল, এক টাকা ভাড়া লাগবে!

—এক টাকা? তিরিশের জায়গায় যাট নাও, তা বলে এক টাকা?

—ওর কম হবে না!

—চালাকি পেয়েছ?

—যেতে হয় চলুন, নইলে দূরে আমার অন্য সওয়ারি দাঁড়িয়ে আছে। তারা এক টাকা দেবে।

বলাই বেশ স্পর্ধার সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। যে ভদ্রলোক দর করছিলেন তাঁকে আমি চিনতে পারলুম। আমারই প্রতিবেশী, অত্যন্ত সজ্জন, পুলিশে চাকরি করেন। সম্প্রতি একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে এ পাড়ায় এসেছেন। ভদ্রলোক এখন অবশ্য সাধারণ পোশাকপরা। লোকটি বেশ সাদালাপী ও ভদ্র। ওঁর অন্য নানাদিকে উৎসাহ আছে। পাড়ার ক্লাবের সাহিত্য বাসরেও উনি মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন শুনেছি। আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে! চলুন, একসঙ্গে হেঁটেই যাওয়া যাক তা হলে। আমি বললুম, চলুন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোকটি এক সময় বললেন, রিক্সাওলার কাণ্ডটা দেখলেন? তিরিশ নয়া'র জায়গায় একটাকা ভাড়া? এত রাত্রে রিক্সা বেশি নেই, আর অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, সেই মওকা বুঝে যা-তা দাম হাঁকছে! একটু সুযোগ পেলেই সবাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দেশের সব রকমের মানুষের মধ্যে যদি ও রকম নীতির অভাব দেখা যায় তাহলে দেশের উন্নতি হবে কি করে?

আমি বললুম, যা বলেছেন স্যার। দেশের উন্নতির কথা ভাবতে গেলে রাত্তিরে

আর ঘুমই আসে না। এই জন্য আজকাল ঘুমের বড়ি খাওয়া শুরু করেছি।

৬

ডাল্টনগঞ্জ থেকে মাইল পনেরো দূরে বেথলা, তারপর থেকে সংরক্ষিত বনভূমি। এখানে হরিণ আর বুনো মোষ চরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে দু-একটা চিতার ডাক শোনা যায়, আর কখনো কখনো ছিটকে আসে হাতির পাল। মিশিরজি একটা আগুন জ্বালানো বাখারি তুলে বলল, ঐ দেখুন না হাতির পায়ের ছাপ, টাটকা, কাল রাত্তিরেই এসেছিল, ঐ দেখুন নাদি পড়ে আছে!

আমার সঙ্গে এক বন্ধু ও তার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয় এবং গাড়ি খারাপ হয়। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার, সমস্ত অরণ্যদেশ রহস্যময় হয়ে এসেছে, দূরের যে-কোনো আওয়াজকেই আমরা বাঘের ডাক বলে মনে করছি।

গাড়িটা ঠেলে ঠেলে আমরা নিয়ে এলাম চেক পোস্ট পর্যন্ত, এখানকার চৌকিদার মিশিরজি, তার কাজ গাড়ি এবং ট্রাকগুলো পরীক্ষা করে দেখা—কেউ হরিণ মেরে নিয়ে যাচ্ছে কিনা অথবা চোরাই কাঠ। লণ্ঠন উঁচিয়ে মিশিরজি আমাদের দেখে বলল, ক্যা, পেট্রোল খতম? জেনানা আউর লেড়কি হায় সাথ মে—আপলোগকো তো বোহুৎ মুশকিল হো জায়গা! তারপব মিশিরজি গলায় উদাত্ত আশ্বাস এনে বলল যে, যাক ঠিক আছে—অন্য ট্রাক এলে সে আমাদের জন্যে পেট্রোল চেয়ে দেবে, সে গরমিণ্টের পেয়ারের লোক, তার কথা অমান্য করবে—এমন ট্রাকওলা এ-তল্লাটে নেই।

আমরা জানালুম যে, আমাদের গাড়ির মেশিনে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সারা সন্ধে আমবা দুজনে ঠোকাঠুকি করেও কিছুই করতে পারিনি। আজ রাতে আর এ-গাড়ি চালাবার উপায় নেই। পেট্রোল আমাদের গাড়ি ভর্তি গবগব করছে—ইচ্ছে করছে পেট্রোল ঢেলে গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিই!

মিশিরজির ছোট্ট ঘরটার সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা বিশাল গুঁড়িতে, কয়েকজন লোক সেই আগুন ঘিরে বসে হাত সেঁকছে। আশেপাশের গাও থেকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছিল ওরা। একটু শরীরটা গবম করে ফিরে যাবে, ছোট কলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেদম গাঁজা টেনে সবার চোখ লাল। তার দুদিন আগে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অর্থাৎ প্রবল শীতের সময়।

আমরা রিজার্ভড ফরেস্টে পিকনিকে এসেছিলুম গাড়ি ভর্তি খাবার ও তেল

নিয়ে, সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। আগুন ঘিরে বসে থাকা লোকগুলি যদি দুর্বৃত্ত প্রকৃতির হয়, রূপসী বন্ধুপত্নীর শরীর-ভরা গয়নার লোভে যদি এই নিঝুম রাত্রিতে আমাদের আক্রমণ করে, তবে আত্মরক্ষার জন্য মুখ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই। অন্ধকার নির্জনতায় আগুনের চারপাশে বসে-থাকা অপরিচিত লোক দেখলেই ডাকাত মনে হয়, সাধারণ মুখও মনে হয় ভয়ংকর। কিন্তু মিশিরজির গলার আওয়াজ শুনলে বোঝা যায়, লোকটা খাঁটি। জোয়ান শক্ত চেহারা, মাথায় ফেটি বাঁধা, গায় খাঁকি রঙের কোট, হাতে একটা মশালের মতো জ্বলন্ত কাঠ —অথচ লোকটার গলার আওয়াজ শিশুর মতো কচি, কিছুটা অহংকারী, কিন্তু শিশুর অহংকার। মিশিরজি হুংকার দিয়ে উঠল, এই ছেদিয়া, সাহেবলোগ আউর মাতাজিকে লিয়ে কুর্সি লাগাও।

একটা খাটিয়া আর দুখানা চেয়ার বেরুলো। বন্ধুটি ভালো হিন্দী জানেন, তিনি লোকগুলির সঙ্গে আমাদের সম্ভাব্য নিষ্ক্রমণের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, তাঁর গলা ঈষৎ ছমছমে। আমি লোকগুলির দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে সিগারেট ধরালুম। একমাত্র মেয়েরাই বিপদের একেবারে মুখোমুখি না-হওয়া পর্যন্ত অকুতোভয় থাকে। বন্ধুপত্নী অম্লানবদনে হুকুম করলেন, থোড়া পানি দিজিয়ে তো, পিনে কা পানি। আগুন-পোহানো একটা লোক ঘর থেকে শশব্যস্ত হয়ে জলের কুঁজোটা এনে দিতে যেতেই মিশিরজি হা-হা করে উঠল। তার হাত থেকে কুজো কেড়ে নিয়ে ধমকে ঠেট হিন্দীতে যা বলল, তার অর্থ এই যে সে একটা অচ্ছুৎ ভুঁইয়ার, সে জল ছুঁয়ে দিল কোন সাহসে ? তার হাতের ছোঁয়া জল কি এই ব্রাহ্মণরা খেতে পারে ? মিশিরজিও ব্রাহ্মণ—সেই শুধু বাবুদের জল দিতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি জানলে কী করে যে আমরা ব্রাহ্মণ ?

কথা না বলে বড়ো বড়ো চোখ মেলে এমন স্তম্ভিতভাবে মিশিরজি দাঁড়িয়ে রইল যে, তার অর্থ আমার কী মাথা খারাপ ? এই রকম ভদ্দরলোকের মতো চেহারা, সাহেবি পোশাকপরা লোকরা কখনো ব্রাহ্মণ না হয়ে পারে ? এটুকু বোঝার বুদ্ধিও কি তার নেই ? তারপর কলসীর সবটা জল ফেলে দিয়ে আবার কুয়ো থেকে জল আনতে গেল সেই শীতের মধ্যে।

কাঠ-চেরার মতো একটা জোরালো আওয়াজে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বসতেই ওরা একজন হেসে বলল, উয়োতে ভৈঁইষছে, বাবু!—আমি অবশ্য বুনো মোষকেও খুব একটা বন্ধুস্থানীয় মনে করি না। তাছাড়া যে-হাতির পাল কাল এসেছিল, তারা আজও একবার বেড়াতে আসবে কিনা কে জানে! মনকে অবশ্য বোঝাচ্ছি যে আমাদের জন্য তো আর ভয় কিছু না, ভয় শুধু সঙ্গের মহিলা ও শিশুর জন্য।

আগুন-পোহানো লোকগুলির চোখে আমাদের ছোট্ট দলটি বেশ একটা কৌতূহলের সামগ্রী হয়েছে, ওরা বাড়ি যাবার জন্য উঠি-উঠি করেও যেতে পারছিল না। আমাদের কিছু-একটা ব্যবস্থা ওরা দেখে যেতে চায়। আমাদের অবশ্য কোনোই ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা নেই। সন্ধে পর্যন্ত এখান দিয়ে বাস যায়, শেষ বাসও চলে গেছে, কোনো ট্রাক থামিয়ে ওঠা যেতে পারে—কিন্তু মেয়েদের নিয়ে ট্রাকে ওঠা নিরাপদ নয়—ট্রাক-ড্রাইভারগুলো নাকি অধিকাংশই 'শ্বশুরাকা বেটা'। মিশিরজির ঘরে অবশ্য আমরা থেকে যেতে পারি— তাতে সে ধন্য হবে। কিন্তু আমরা ঠিক করলুম, সারারাত ঐ আগুনের পাশেই বসে জেগে কাটিয়ে দেব, সঙ্গে খাবার-দাবার তখনো আছে, এছাড়া শীত নিবারণের জন্য ব্র্যাণ্ডি।

মিশিরজিকে দেখলাম সবাই খুব খাতির করে। তার কারণ শুধু যে সে ব্রাহ্মণ তাই নয়, সে গভর্নমেন্টের লোক। এ তল্লাটে বন-জঙ্গলের মধ্যে সেই একমাত্র গভর্নমেন্টের লোক, সে রিপোর্ট করলে যে-কোনো লোককে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। এ কারণে মিশিরজিরও অহঙ্কারে যেন মাটিতে পা পড়ে না। মাঝে মাঝে চেক পোস্টের ওদিকে গাড়ি থেমে হর্ন দিচ্ছে, মিশিরজি চাবি দিয়ে গেট না খুলে দিলে যেতে পারবে না। হর্ন শুনে মিশিরজি মশালটা তুলে দেখে নিচ্ছে—ট্রাক না জিপ না মোটরগাড়ি। ট্রাক হলে তার আর নড়বার নামটি নেই। ওখানেই বসে থাকে। বন্ধ গেটের ওপাশে বারে বারে হর্ন দেয়। মিশির তবু চুপ করে বসে থেকে মিটিমিটি হাসে। আর বিড়বিড় করে—ইঃ! অত ফটফটিয়া কিসের? হতো গরমিণ্টের গাড়ি, ছুটে গিয়ে খুলে দিতুম। প্রাইভেট হয়েছিস, এখন ঠার যা। অগত্যা ট্রাকের ড্রাইভার নেমে গেট টপকে এদিকে আসে, মিশিরজির সামনে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে অনুনয় করে। সে তখন চাবির থোকা হাতে নিয়ে হেলতে দুলতে যায়। মশাল উঁচিয়ে সারা গাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখে, মাডগার্ডে একটা চাটি লাগিয়ে বলে, যাও, পাস।

আমি মিশিরজিকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এই জঙ্গলে একা একা থাক, তোমার ভয় করে না? সে আত্মপ্রসাদের সুরে বলল, ডর লাগলে কি হবে, গরমিণ্টের কাজ, করতেই তো হবে। আগে যে লোকটা ছিল, একদিন রাত্রে হাতি এসে তার ঘরটা ভেঙে দিল, সে লোকটাও মরে গেল। সে লোকটা যে রাত্রে ঘুমোতো। মিশির কখনো রাত্রে ঘুমোয় না, আগুন জ্বেলে বসে থাকে।

আমি বললুম, মিশির, রাত্রে তোমার একা-একা ভয় লাগে না?

—তা তো লাগেই। এ শালা গাছপালা আর জন্তু জানবর, এ কি মানুষের বন্ধু হতে পারে? মানুষ মানুষকে চায়। কিন্তু কী করব, গরমিণ্ট যে তাকে এখানেই থাকতে বলেছে। সে গরমিণ্টের জন্য এত করে—অথচ গরমিণ্ট তার কথা মাঝে

মাঝে ভুলে যায়। এই দেখুন না, একটা টর্চ কবে থেকে স্যাংকসেন হয়ে গেছে, অথচ এখনো টর্চ এল না। লণ্ঠনের ক্রাচিন নেই আজ দু'হপ্তা, তবু গরমিণ্টের হোঁস নেই।—তারপর হেসে সোহাগের সুরে মিশির আবার বলল, আহা সে বেচারা গরমিণ্টই বা কি করবে। তাকে তো কত দেখতে হয়। আমার মতো চৌকিদার আরো কত আছে জেলা ভরে, পালামৌর জঙ্গল-ভরা চৌকিদার, সবার জন্যে ভাবতে ভাবতে গরমিণ্ট বেচারা থকে যায় মাঝে মাঝে।

বন্ধু বললেন, মিশিরজি তুমি বিয়ে করোনি কেন?

মিশির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ জঙ্গলে কে থাকবে আমার কাছে? পাহাড়িয়া মুণ্ডা কিংবা ওরাওঁ—এ-সব ছোট জাতের মেয়েরা জঙ্গলে থাকতে পারে কিন্তু ব্রামভনের মেয়ে কী করে থাকবে? তারপর মিশির হা-হা করে হেসে উঠে বলল, একটা সাচবাত আপনাদের বলি, বাবু। গরমিণ্ট এমন অভিমানী, কিছুতে সতীন সহ্য করে না। একবার গরমিণ্টের কাছ থেকে ডেফো (ডি এফ ও) সাহেব এলেন আমি তাঁকে বললুম, হুজুর, আমার একটো বাত আছে। সাহেব বললেন, বল ঝটপট। আমি বললুম, হুজুর, সরম লাগছে। সাহেব বললেন, তবে বলতে হবে না। আমি তখন বললুম, হুজুর, আমি একটা সাদি করতে চাই। সাহেব বললেন, কর না। আমি বললুম, হুজুর আপনি ব্রামভন, আপনি তো জানেন, কোনো ব্রামভনের লেড়কি এখানে থাকতে চাইবে না। তা হলে আমি কি করে সাদি করব? সাহেব হাসতে হাসতে বলল কী জানেন, তবে হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাদি কর, নয় সাদি করিস না। বুঝুন কী কথার কী উত্তর!

বন্ধুপত্নী এমন খিলখিল করে হেসে উঠলেন যে, বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায় আর কি। আমরাও মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলুম। মিশিরজি আহত মুখে বলল, আসল ব্যাপারটা বুঝলেন তো? গরমিণ্ট ডেফোর কাছে আগেই বলে দিয়েছে, মিশিরের বিয়ে করা চলবে না। আমাকে এই আঁধিয়ার জঙ্গলে বাঘ আর হাথির মধ্যে রেখে গরমিণ্ট দূর থেকে মজা দেখছে। দেখুক! আমিও পিছ-পা নই। হুঁশিয়ার থেকে পাহারা দিচ্ছি, এক রাত্তিরও ঘুমোইনি। দেখি, আমার ওপর গরমিণ্টের মায়া হয় কিনা। হেঃ। আমিও ব্রামভন গরমিণ্টও ব্রামভন। কেউ কারুর থেকে কমতি নেই।

আমি বললুম, মিশির, গরমিণ্ট যে তোমাকে মাঝে মাঝে ভুলে যায়, তাতে তোমার রাগ হয় না?

মিশির একটা উদাসীন ভঙ্গি করে বলল, ভুলে তো যাবেই। আমার মতন শ-ও শ-ও হাজার হাজার চৌকিদার লিয়ে গরমিণ্টের কারবার। তবু দেখুন বাবু সাহেব, ভুলে ভি যাবে, লিকিন তাও এত হিংসুট কি আমায় সাদি কিছুতেই করতে

দেবে না। আমায় এখানে একা রাখবে।

কথা বলতে বলতে মিশির অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশ্বরেরই মতন গভর্নমেন্ট তার কাছে এক দুর্বোধ্য, জীবন্ত অস্তিত্ব। মিশিরের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সে একদিন না একদিন গভর্নমেন্টকে স্বচক্ষে দেখার প্রত্যাশায় আছে।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পর ইংরেজিতে বললুম, মিশির হচ্ছে গভর্নমেন্টের প্রণয়ী। দয়িতাকে পাবার জন্য ভালোবাসার জোরে ও এই বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। সামান্য কোনো নারীকে বিবাহ-বন্ধনে বাধার ওর আর দরকারটাই বা কি?

৭

বি এন জি এস কথাটা তো সবাই জানেন, অর্থাৎ বিলেত না গিয়ে সাহেব! আজকাল ঐ রকম বিলেত না-যাওয়া সাহেবদের উপদ্রব বড়ো বেড়েছে। মাঝে মাঝে তারা বড়োই বিরক্ত করে।

আমরা কখনো বিলেত-ফিলেত যাইনি এবং কস্মিনকালে যাবার আশাও নেই বলে, কোনো লোভও নেই। কোথাও ও প্রসঙ্গ উঠলে আমরা বলি, দূর দূর, আজকাল বিলেত-ফিলেত যাবার মধ্যে কোনো মজা নেই, যদি কোথাও কখনো যেতেই হয়, একেবারে চাদে বেড়িয়ে আসব।

কিন্তু আপাতত যখন চাদে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এবং বিলেত যাবারও উপায় নেই, তখন মাঝে মাঝে শখ হয়, কোচবিহার কিংবা আলিপুরদুয়ার কিংবা পুরুলিয়া থেকে মাঝে মাঝে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? কাশী কিংবা কাশ্মীর, ঔরঙ্গবাদ কিংবা উটকামণ্ড যাবার সামর্থ্য আমার নেই। তাই কখনো কখনো ইচ্ছে হয়, পশ্চিমবঙ্গেই কোথাও বেড়িয়ে আসি। আমরা বাঙালিরা কজনই বা গোটা পশ্চিমবঙ্গ দেখেছি!

কুচবিহারের কথাই ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গেরই একটা শহর তো, কিন্তু কলকাতা শহরে খুব কম লোকই দেখি যারা কখনো কুচবিহারে গেছেন বা কুচবিহার সম্পর্কে কিছু জানেন। শোনা যায় শহরটা দেখতে সুন্দর, রাজার বাড়ি আছে, শুধু এইটুকুই ঐ শহর সম্পর্কে জ্ঞান, অথচ বাংলা দেশেরই শহর তো। এই মুহূর্তে কোনো বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসের নাম মনে পড়ছে না, কুচবিহারের পরিবেশ নিয়ে লেখা। কোনো কারণ নেই, ক'দিন ধরে কুচবিহার নামটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল, এক-একবার শখ হতে লাগল, চট করে কুচবিহার ঘুরে আসি। পশ্চিমবঙ্গকে সম্পূর্ণ

জানবার একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসে।

হঠাৎ ট্রেনে চেপে বসলে কোনো অসুবিধে ছিল না। আমাদের ভ্রমণ তো এই রকম, হঠাৎ খেয়াল হলো, অবিলম্বে ট্রেনে চেপে বসা। পৌঁছে থাকা-খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না, কিছু না হোক, হট্টমন্দির কিংবা রেলস্টেশনে তো শোবার জায়গা পাওয়া যাবেই, আর ভোজনং যত্রতত্র।

কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে একটু শৌখিনতা করতে ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয়, বেড়াতে গিয়ে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল চাই, ঘরে বসেই চা খেতে চাই, রাত্রে ঘুমোবার আগে, ইলেকট্রিক আলোর সুযোগ চাই। সুতরাং ভাবলুম, এ বছরটা তো আন্তর্জাতিক পর্যটন বৎসর—সুতরাং কোনো একটি পর্যটন সংস্থায় গিয়ে কুচবিহার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া যাক।

গেলুম একটা পর্যটন সংস্থায়। উঃ, বি এন জি এস-দের কি দৌরাত্ম্য সেখানে! সুন্দর ফুটফুটে চেহারার ছেলেমেয়েরা সেখানে কাজ করে। চমৎকার সাজপোশাক, বসে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-খুনসুটি করছে, কোনো সাহেব-মেম এলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে তারা, সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছে, ইংরেজির স্রোত বইয়ে দিয়ে সাহেব-মেমদেরও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিচ্ছে। পাঁচ মিনিটে সব কিছু বুঝিয়ে ফেলছে।

আমি নেটিব তো, সেই জন্য আমাকে কারুর গ্রাহ্য নেই। মেয়েদের চোখে চোখ ফেললে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে, ছেলেরা তো তাকাচ্ছেই না। সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, সে বলল, চল ওরা পাত্তা দিচ্ছে না, সরে পড়ি। কিন্তু আমার সরে পড়ার ইচ্ছে নেই, কেননা, আমার ধারণা, পর্যটক যে শুধু সাহেবরাই তার কোনো মানে নেই। বাঙালিরাও ভ্রমণে বেরুতে পারে। অন্তত কুচবিহার যাবার কোনোই বাধা নেই। তাছাড়া, ওরা বোধহয় আশা করে, আমরাই আগে কথা বলব।

যাই হোক, একজন যুবককে পাকড়াও করে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ ফেলে বললুম, আমি একটু কুচবিহারে যাব, আপনারা যদি—।

যুবকটি মাঝপথেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কুচবিহার? ওখানে আমাদের কোনো টুরিস্ট লজ নেই!

—তা না থাক। তবু ওখানকার সম্পর্কে কিছুটা খোঁজখবর—

—হোয়াই পারটিকুলারলি কুচবিহার? কুচবিহার যাবেন কেন?

—এমনিই! কেন ওখানে যাবার কোনো নিষেধ আছে?

—না। তবে ওখানে যাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। বেড়াতে যাবেন তো অন্য কোথাও যান না, শান্তিনিকেতন বা দীঘা—

—শান্তিনিকেতন বা দীঘায় গেলে শান্তিনিকেতন বা দীঘাতেই যাওয়া হবে,

কুচবিহার যাওয়া হবে না। কেউ যদি শখ করে কুচবিহারে যেতে চায়—

—তাহলে চলে যান—

—কি করে?

—প্লেনে চেপে, কিংবা ট্রেনে?

—না, মানে আমি জানতে চাইছিলুম?

—স্যরি, উই ক্যান্ট অফার য়ু মাচ হেলপ!

যুবকটি কাঁধ ঝাঁকালেন— শীতকালে হঠাৎ শরীরে জল পড়লে যেমন কেঁপে ওঠে লোক—কিন্তু যুবকটি নিশ্চয়ই ভাবলেন, ঐভাবে তিনি কাঁধ ঝাকিয়ে ফরাসি কায়দায় শ্রাগ করেছেন। তা ভাবুন বা করুন, তাতে তো আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কুচবিহার শহরে কি ওর কোনো ঘোরতর শত্রু থাকে, যার জন্য উনি কুচবিহার সম্পর্কে অমন বীতরাগ? মনে হয়, কুচবিহারে কেউ যান, এটা ওর একেবারে মনঃপূত নয়। আমাকে প্রতিহত করে উনি তখন উদাসীন মুখে টাইয়ের গিঁট ঠিক করছেন।

আমি তবু বিনীতভাবে বললুম, দেখুন, আমার একটু কুচবিহারে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল। ওখানে হোটেল ফোটেল কিরকম আছে—সরকারের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেই সব জানার জন্যই আপনাদের কাছে এসেছিলুম। আমি তো শুনেছি এইসব কথা জানাবার জন্যই আপনাদের অফিস খোলা হয়েছে।

যুবকটি পুনরায় রূঢ় ভাবে বললেন, বললুম তো, ও সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। গো টু দীঘা অর শান্টিনিকেটন।

এলাম আর একটি পর্যটন সংস্থায়। এবারে, একটি মহিলাকে গিয়ে বললাম, শুনুন, আমি একটু—

মহিলাটি হাতে পেন্সিল এবং পেন্সিলের মতন পাঁচটি আঙুল তুলে বললেন, গো টু দা জেন্টলম্যান ওভারদেয়ার প্লীজ।

মুখের বাক্যটি পুরো শেষ করতে না দিলে আমি ভয়ানক চটে যাই, তা ছাড়া, মহিলাটি যখন কাউন্টারেই দাঁড়িয়ে আছেন—তখন আমার সঙ্গে কথা বলবেন না কেন—তারও তো কোনো যুক্তি নেই। মেয়েরা শুধু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে, আর ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে—সরকারি অফিসে এরকম কোনো নিয়ম আছে নাকি? আমার বাংলা কথা শুনেও উনি কেন ইংরাজিতে কথা বলবেন?

কিন্তু মহিলাদের উপর চটে যাওয়া আমার ধাতে নেই বলে, মুখে তবু হাসি এঁকে রেখে কাউন্টারের অন্যধারের যুবকটির দিকে গেলুম।

এখানেও যথারীতি সুদর্শন যুবা, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, টাই-এ নিখুঁত গিঁট এবং ভাবলেশহীন মুখ। সিনেমার অভিনেতার মতন চোখ তুলে তিনি নিঃশব্দে

তাকিযে বইলেন। আমি আমাব সম্পূর্ণ মনেব ভাব তাঁব কাছে প্রকাশ কবলুম। তিনি বললেন, খোচবাহাব? ওয়ান মোমেন্ট। আমি দেখে দিচ্ছি—

আমি বিনীত ভাবে জানালুম, খোচবাহাব নামে কোনো জাযগায আমাব যাবাব ইচ্ছে নেই। আপাতত, আমি কুচবিহাবে যেতে চাই।

—দ্যাটস বাইট, খোচবাহাব, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। তিনি কী একটা বইযেব পাতা ওল্টাতে লাগলেন। দেখা গেল, আমাব কুচবিহাব যাওযাব ব্যাপাবে তাব কোনো উৎসাহ নেই তেমন, গেলেও হয না গেলেও ক্ষতি নেই—এই বকম ভাব। বইটা খুলে তাঁব নিজস্ব ভাষায আমাকে নানান তথ্য পবিবেশন কবতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি টেলিফোন ধবছেন পল নিউম্যানেব কাযদায, কথা বলছেন পুলিশ কমিশনাবেব মতন।

ততক্ষণে কুচবিহাবে যাবাব ইচ্ছে আমাব উপে গেছে, আমাব মাথা ধবেছে, এবং কান কটকট কবছে, চোখ জ্বালা কবা শুরু হযেছে। মনে মনে ঠিক কবেই ফেলেছি, যদি কখনো কুচবিহাব যাই তবে নিরুদ্দেশ যাত্রাব ভঙ্গিতে বেবিযে পডব। কেননা, কারুব কথাব মধ্যে ভাঙা ইংবেজি শুনলে আমাব মাথা ধবে, ইযার্কি ছাডা অন্যভাবে কেউ এক্সকিউজ মী বললে আমাব কান চুলকায। একবাব ইচ্ছে হলো, আচমকা ওকে একটা ধাক্কা দিযে দেখব, 'ঘডা অন্ধা' বেবিযে আসে কিনা।

তথ্য পবিবেশনে শেষ কবে যুবকটি সেই নিস্পৃহ, ভাবলেশহীন কঠিন মুখে আমাব দিকে ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকালেন। হঠাৎ আমাব মাযা হলো খুব। আহা, এত শখ এদেব সাহেব সাজাব, এই সব বি এন জি এস-দেব স[illegible]াইকে একবাব অন্তত বিলেত ঘুবিযে আনাই উচিত। এখনই যা মুখ-চোখেব চেহাবা, বিলেত না গেলে তো মুখেব চেহাবা দিন দিন আবো আঁট হযে আসবে। তখন কি আব তাকানো যাবে মুখেব দিকে। ববং সাহেবদেব দেশ ঘুবে এলে যদি সাহেব হবাব নেশা কাটে।

হঠাৎ একটু পবোপকাব কবাব ইচ্ছে হয আমাব। আমি আচমকা জিভ বাব কবে একটা ভেংচি কাটলুম যুবকটিব দিকে। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ভযে সবে গিযে বললেন, ওকি। ওকি।

আমি আবাব জিভ বাব কবে, চোখ উলটে, নাক বেকিয়ে আরেকখানা বিরাট

[illegible]

[illegible] ন্যাট? হঠাৎ আপনাব কি

[illegible] আমি এখানে ডিগবাজি খাব?

হাসি পাবে?

—আমাকে হাসাবার জন্য আপনার ব্যস্ত হবার কারণ কি? হঠাৎ হাসতেই বা যাব কেন আমি?

—এমনিই। লোকের সঙ্গে কথা বলার সময়ে একটু হাসি মুখ করে রাখলে ক্ষতি কি?

—অকারণে বোকার মতন হাসবই বা কেন?

—বোকার মতন? না হাসলেই মানুষদের মুখ বোকার মতন দেখায়। কেন, সাহেবরা বুঝি হাসে না কখনো?

—শাট আপ! আজেবাজে কথা বলবেন না বলছি।

—ঠিক আছে তা হলে, হাসবেন না। আরো গম্ভীর হয়ে থাকুন। আমিই না হয় একটু হাসি। বেশ জোরে জোরে খানিকটা হাসি, কি বলুন?

৮

অনাদিবাবুকে দেখতুম, ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে বাগানে যেতেন। দেখতাম অথবা শুনতামও বলা যায়।

আমি তো জীবনে সূর্যোদয় দেখেছি কয়েকবার মাত্র। বস্তুত চড়া লাল রং আমার সহ্য হয় না বলেই ভোরের সূর্য আমি পছন্দ করি না। ঘুম ভেঙে চোখ খুলে তাকাই সেই তখন, যখন ভোরের লাল সূর্য বেশ হলদেটে হয়ে এসেছে। এবং শেষ বিকেলেও আমি সাধারণত অফিসে বা চায়ের দোকানে বন্দী থাকি বলে—গাঢ় সূর্যাস্তও আমার জীবনে খুব বেশি দেখা হয়ে ওঠেনি। আমার দিন কাটে ফ্যাকাসে—ঝাপসা রঙের মধ্যে। কিন্তু রিটায়ার্ড উকিল অনাদি সেনগুপ্ত গত পঞ্চাশ বছর ধরে নাকি ভোর সাড়ে চারটার সময় ঘুম ভেঙে বাইরে আসেন!

বছর দুয়েক আগে আমি কিছুদিন বর্ধমানে ছিলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই অনাদিবাবুর বাড়ি, আমার শোবার ঘরের পিছনেই তাঁর বাগান। প্রত্যেক দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তের আগে বাগানে অনাদিবাবুর গান ও নাচে আমার ঘুম ভাঙে। অনাদিবাবু যখন বাগানে আসেন, তখন তাঁর হাতে জলের ঝারি ও খুরপি, পরনে হাফ-প্যান্ট ও পায়ে ঘুঙুর। গলায় রামপ্রসাদের গান। গানের সঙ্গে তাল ঠোকেন ঘুঙুর বাজিয়ে।

এক-একদিন ঘুম ভাঙে, তখন সূর্য ওঠেনি, শিয়রের জানলা দিয়ে আমি তাকিয়ে দেখছি, বাগানের প্রত্যেকটি গাছের পাশে ঘুরে ঘুরে অনাদিবাবু নেচে গান করছেন, আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী। তখন হয়তো কোনো স্বপ্ন

দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভেঙেছে, সেই অপ্রাকৃত আলোয় অনাদিবাবুর অস্তিত্বও আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হয়। কিছুক্ষণ দুর্বোধ্যতায় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আবার আমি বিছানায় পাশ ফিরে ভাঙা ঘুম মেরামত করার চেষ্টা করেছি।

অনাদিবাবু কিন্তু পাগল বা বাতিকগ্রস্ত নন। গান বা নাচের সঙ্গে গাছপালার ফলন-বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে—এরকম বিশ্বাসও তাঁর নেই। আসলে তাঁর খুব সাপের ভয়, বাগানে যদি সাপ থাকে এই আশঙ্কায় তাঁর গান ও নাচ—শব্দ পেলেই নাকি সাপ দূরে চলে যায়। এবং ওঁর ঘুঙুর পরার খবর ওর বাড়ির বাইরে আমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

বাগানের সম্পূর্ণ পরিচর্যা সেরে সাতটা আন্দাজ তিনি আমার জানলার পাশে এসে গলা খাকারি দিয়ে ডাকতেন, কী, ঘুম ভাঙল ? ইয়ং ম্যানের পক্ষে এত ঘুম—আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ—এই হচ্ছে গিয়ে... তখন আমি গভীর ঘুমে মগ্ন এবং সকালের ঘুম এক ডাকে ভাঙে না।

অনাদিবাবুকে আমার গোড়ার দিকে বেশ ভালোই লাগত। রিটায়ার্ড লোকেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলেন এবং উনিও সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে রাজ্যের কথা শোনাতেন কিন্তু ওঁর কথা শুনতে প্রথম প্রথম খারাপ লাগত না। লোকটির পুষ্পপ্রীতি ছিল অসাধারণ। স্বাস্থ্যবাতিক কিংবা অন্য কিছুর জন্যই ভোরে ওঠা নয়, শুধুই বাগানের জন্য। সকাল নয়, সারাদিনই প্রায় বাগানে কাটে তাঁর। এবং রিটায়ার করার বহু আগে থেকেই এই শখ।

বেশ বড়ো বাগান, অনেক ফুল ফোটে—যদিও অনাদিবাবু ফুল বিক্রি-টিক্রি করার কথা ভাবেন না, ফুলের আর কোনোই প্রয়োজন নেই। তিনি ফুলগুলোকে নিষ্কামভাবে ভালোবাসেন। নতুন গোলাপের চারা লাগাবার পর ওঁর ধৈর্য ডারুইনকে হার মানায়। যতক্ষণ না সেই গাছে ফুল ফুটছে—তিনি একাগ্রভাবে সেদিকে চেয়ে থাকেন।

সকালবেলা সেদিন এসে বলেন, জানেন এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলুম না—তখন ওঁর দীর্ঘশ্বাস ও করুণ মুখচোখে ফুটে ওঠে পুত্রশোক, কিন্তু আসলে মারা গেছে একটা চন্দ্রমল্লিকার চারা। মফঃস্বল আদালতের উকিল ছিলেন, জীবন কেটেছে নোংরা আদালত ঘরে চোর-জোচ্চোর আর বদমাসের সঙ্গে, তবু কি করে ওঁর এমন সৌন্দর্যবোধ রয়ে গেছে ভেবে আমি আশ্চর্য হতুম। উনি আমাকে বিভোর হয়ে বলতেন, ক্যালিফোর্নিয়া পপি যখন প্রথম ফোটে—ফুলের ভেতরটা তাকিয়ে দেখবেন, কী নরম রঙ, ওরকম রং আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখবেন না!...ওটা কি ফুল বলুন তো ? চিনতে পারলেন না ? কাঞ্চন!...ওকি আপনি অতসীও চেনেন না। অবশ্য এরকম ডবল-অতসী আমিও আগে দেখিনি! ওটা? ওটা বিদেশী ফুল

—ওর নাম নাসটেসীয়ান। আহা, ওই বেলফুলগুলো দেখুন, বড়ো অভিমানী ওরা, একটু যত্নের ত্রুটি হলেই কী রূপ, আহা চক্ষু সার্থক!

ফুল সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন কোনো ঔৎসুক্য নেই! কিন্তু ফুল সম্পর্কে অনাদিবাবুর ওরকম আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে আমার ভালোই লাগত। তা ছাড়া, আমার শিয়রের জানলা দিয়ে যখন তাঁর বাগানের নানা ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধ ভেসে আসত—তখন আমি বিনা পয়সার আনন্দ উপভোগের স্বাদ পেতুম!

অনাদিবাবুর তেমন কিছু শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, কথা বলে দেখেছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর কোনো জ্ঞানই নেই। বেশির ভাগ লোকই যে-রকম হয়, ইস্কুল-কলেজে পড়েছেন ডিগ্রি নেবার জন্য, বাকি জীবনটা খরচ করেছেন জীবিকার জন্য, এর বাইরে আর কিছু নেই। তবু এই অপ্রয়োজনীয় পুষ্পপ্রীতি ওঁর মধ্যে এল কি করে? তবে কি ওঁর ভিতরে কোনো আলাদা সৌন্দর্যবোধ আছে—যা শিক্ষা কিংবা প্রেরণার অপেক্ষা রাখে না? কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধটাই বা কি করে একতরফা হয়? অনাদিবাবুর বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আমি খুবই দমে গেছি।

অনাদিবাবুর বাগান ঝকঝকে তকতকে সাজানো, কোথাও একটু অনাবশ্যক বা ময়লা নেই, ছবির মতন। কিন্তু ওর বাড়িটা যাচ্ছেতাই। অনাদিবাবুর তিন ছেলে—দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে অসবর্ণ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। খুব অভাবের সংসার নয়, কিন্তু বাকি ছেলেমেয়েগুলোর বিশ্রী জামাকাপড়, সারা বাড়িটা অগোছালো ছন্নছাড়া। বারান্দায় বসার জায়গায় কয়েকখানা বাজে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, কাপড়ের ওপর সূচের সেলাই-করা পুকুর পাড়ে তালগাছের একটা বিকট ছবি বাধানো। অনাদিবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন গোবিন্দর মা বলে—বললেন, আমাদের ইনেকে চা দাও এক কাপ—আবার চোদ্দ ঘণ্টা লাগিও না যেন!

চা নিয়ে এল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, যথারীতি কাপের কানাগুলো ভাঙা। মেয়েটি বলল, বাবা, তোমাকেও চা দেব? অনাদিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, দিবি না তো কি? আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে! মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, অনাদিবাবু আবার ডেকে বললেন, এই ভুন্টি (বেশ দেখতে মেয়েটিকে, কিন্তু তার নাম ভুন্টি) তুই আবার বাঁকা সিঁথি কেটেছিস? ইস্কুলে গিয়ে এইসব বিবিয়ানা শিখেছিস—ছাড়িয়ে দেব।

মেয়েটি থতমত খেয়ে বললে, কই না তো! দিদি তো চুল বেঁধে দিয়েছে!

আমি তাকিয়ে মেয়েটির চেহারায় কোনো বিবিয়ানার চিহ্ন দেখতে পেলুম না। ঐটুক মেয়ের রঙীন ফ্রক পরাই উচিত ছিল, বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করলেই ওকে মানাতো বেশি, কিন্তু সে-সব বোধহয় ওর বাবার পছন্দ নয়, মেয়েটি একটা

সাদা রঙের (সুতরাং আধময়লা) শাড়ি, পরা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, আজকালকার মেয়েদের ধরনে সিঁথিটা বুঝি একটু বাঁ পাশে। বাবার সামনে ভয়ে মেয়েটির মুখ আড়ষ্ট।

অনাদিবাবু ফের বললেন, দিদি? দিদি তো সিনেমা দেখে ওসব শিখছে! দাঁড়া, আজ আসুক হারামজাদী! বলেই অনাদিবাবু ফড়াৎ করে সিকনি ঝেড়ে চেয়ারের গায়েই হাত মুছলেন। ঘেন্নায় আমার গা বমি-বমি করছিল, কোনোক্রমে বিদায় নিয়ে ওঁর ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

এ কী ধরনের সৌন্দর্যবোধ? ভাষায় রুচিজ্ঞান নেই, আচার-ব্যবহার অসুন্দর অথচ ফুলের সৌন্দর্যকে ভালোবাসার কি যুক্তি? এখনো কানে ভাসে অনাদিবাবুর কথা, সব সাদা ফুলই কিন্তু একরকম সাদা নয়, বুঝলেন? রজনীগন্ধা আর গন্ধরাজ—এ দুটো হাতে নিয়ে দেখুন, দুটো দু'রকম সাদা। পপি ফুলের ভেতরে তাকিয়ে দেখবেন, আহা, কি নরম রং!—এই অনাদিবাবুকেই দূর থেকে চিৎকার করতে শুনেছি, এই লেটো (ছেলের নাম) আবার রেডিও খুলেছিস? দিনরাত খালি গান-বাজনা—হারামজাদা ছেলে জুতিয়ে তোমার—। দুর্বোধ্য মানুষ!

এরকম মানুষ আমি আরো অনেক দেখেছি। সেজ মাসিমাকে দেখেছি, গল্প-উপন্যাস পড়ার দারুণ নেশা। রোজ লাইব্রেরি থেকে বই আনা চাই-ই। শিকার কি অ্যাডভেঞ্চার তাঁর ভালো লাগে না, তার চাই শুধু প্রেমের কাহিনী। এবং সে প্রেমও ব্যর্থ হলে চলবে না। প্রায়ই আমাকে বলতেন, দূর, দূর, এ কি বই এনেছিস? এ যে একেবারে বাজে বই। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা-মেয়েটায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল! সেই সেজ মাসিমাকেই দেখেছি কোথাও চেনাশুনো কেউ প্রেম করে বিয়ে করলেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন। বলতেন ছি ছি, বাবা-মার কথা একবার ভাবল না, ছি ছি—। আমার মামাতো ভাই এম. এ. পড়ার সময় ক্লাসের একটি মেয়েকে বিয়ে করল বলে—মাসিমা সে বিয়েতে নেমন্তন্নই খেতে গেলেন না!

এরও না হয় মানে বুঝি, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর চরিত্রের কি মানে?

শশাঙ্কবাবু একজন প্রৌঢ় শিক্ষক, আমাদের প্রতিবেশী। জোয়ান দশাসই চেহারা, শিক্ষক হবার বদলে মিলিটারি অফিসার হলেই তাঁকে মানাতো। সকাল-দুপুরে মাস্টারি, তারপরও টিউশানি—দিনরাত অর্থোপার্জনের নেশায় কাটছে। কিন্তু ওঁরও আর একটা অদ্ভুত নেশা আছে।

বাড়ি ফেরার পথে তিনি প্রায়ই একটা কুকুরছানা কিংবা বেড়ালছানা নিয়ে আসেন। রাস্তার পাশে যদি দেখেন কোনো অসহায় বেড়ালছানা কিংবা কুকুরছানা মিউ মিউ বা কেঁউ কেঁউ করছে, তিনি জলকাদা-মাখা অবস্থাতেও তাকে বুকে

তুলে আনবেন। এই দুর্মূল্যের দিনেও খেয়ে ওঠার পর তিনি আট-দশটা কুকুরকে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ান।

অনেক বাড়ির বেড়াল পার করার জন্য শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে আসে। শশাঙ্কবাবু দেখতে পেলেই সে বেড়ালছানাকে বাড়িতে ডেকে নেবেন।

ওঁর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সস্তায় পেয়ে চারটি মুরগি কিনেছিলেন একবার, প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে খাবেন—এই মতলবে। তার মধ্যে দুটো মুরগি সকালবেলা শশাঙ্কবাবুর পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন, দুটো মুড়ি ছড়িয়ে দিলেন ওদের জন্য। সেগুলো মুহূর্তে শেষ করে মুরগি দুটো আবার মুখ তুলে চাইল। শশাঙ্কবাবু হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ, মুরগি দুটো আমার কি রকম পোষা হয়ে গেল, হাত থেকে মুড়ি খাচ্ছে!

তারপরই শশাঙ্কবাবু চলে গেলেন তাঁর প্রতিবেশীর কাছে। ও মুরগিদুটো মারা চলবে না। অনেক ঝুলোঝুলি করে তিনি সে দুটোকে কিনে নিলেন, সে দুটো তাঁর বাড়িতেই থেকে গেল। ছাগলের বাচ্চা কোলে নিয়ে শশাঙ্কবাবুকে ছুটির দিন মর্নিং ওয়াক করতেও আমি দেখেছি। পিছনে চলেছে কুকুরের পাল।

শশাঙ্কবাবুকে কি দয়ালু লোক বলব? ইস্কুলে ছাত্ররা ওঁর নাম দিয়েছে যমরাজ। ছেলেরা ওঁকে যমের মতোই ভয় করে এবং ওঁর হাতের থাপ্পড় খায়নি —এরকম ছেলে একটিও নেই। ঐ বিশাল পুরুষের হাতের থাপ্পড় যে কি ভয়াবহ, তাও অনুমান করা যায়। শুনেছি, ঐ ইস্কুলের ভোজপুরী দারোয়ানকে কি যেন কারণে তিনি একবার চড় কষিয়েছিলেন, সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে চাকরি ছেড়ে দেয়।

আমি শশাঙ্কবাবুর ছাত্র ছিলাম না, ওঁর নিষ্ঠুরতার কিছু-কিছু কথা জানি। এক রবিবার সকালে আমি কোনো কারণে ওঁর বাড়তে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা বলছি, এমন সময়ে একটা বাচ্চা ভিখারি মেয়ে ভিক্ষে চাইতে ওর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কথা থামিয়ে শশাঙ্কবাবু ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, একেবারে বারান্দার ওপর উঠে এসেছে—অ্যাঁ? যত রাজ্যের অজাত কুজাত ছোটলোক—একেবারে ঘরের মধ্যে, সাহস বেড়ে গেছে, না?

বলতে বলতেই উঠে গিয়ে শশাঙ্কবাবু সেই ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মেয়েটির কান ধরে মুচড়ে দিলেন। ঐ বিশাল পুরুষের হাত এবং রোগা-পাতলা মেয়েটির কান —মেয়েটা তীব্রভাবে কেঁদে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানের গোড়া থেকে রক্ত পড়তে লাগল। শশাঙ্কবাবু বললেন, দূর হ! শশাঙ্কবাবুর ঘরে বারান্দায় কুকুর-বেড়াল-ছাগল-মুরগি যথেষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পাশেই পড়ল মেয়েটির কয়েক

ফোঁটা রক্ত। আমি আবার গাঢ় লাল রং দেখতে পারি না—তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম, শশাঙ্কবাবুর ছোট ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেটা যখন খেতে বসেছিল, একটা কুকুরবাচ্চা এসে একেবারে ওর ভাতের থালায় মুখ দেয়। রাগের চোটে ছেলেটা, মোটে এগারো বছর বয়েস, গেলাস ছুঁড়ে মারে কুকুরটার দিকে। কুকুরটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে সমস্ত পোযা জন্তু-জানোয়ারের একবার খবর নেওয়া শশাঙ্কবাবুর অভ্যাস। সেদিন ফিরে ঐ ব্যাপার দেখে তিনি ছেলেকে তুলে প্রবল আছাড় দিয়েছেন। ছেলেটা সেই থেকে রক্তবমি করছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। কী বলব একে? দয়া?

৯

মেয়েটি বলল, দেখি, আপনার হাত দেখি। হাত দেখে আমি বলে দিচ্ছি আপনি কতদিন বাঁচবেন।

আমি সকৌতুকে বললুম, তুমি হাত দেখতে জানো নাকি।

—হুঁ। খুব ভালো জানি! দেখি, হাতটা দিন, বাঁ হাত।

—কিন্তু এরকম তো কথা নয়। এটা স্বাভাবিক হচ্ছে না।

—কি স্বাভাবিক নয়?

—মেয়েরা কখনো ছেলেদের হাত দেখতে চায় নাকি? ছেলেরাই তো প্রথম আলাপের কয়েক দিন পর মেয়েটির হাত দেখতে চাইবে। ডান হাতখানা টেনে নিয়ে, বেশ জোরে চেপে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকবে। কিছু বলবে না। তারপর মেয়েটি বলবে, কই কিছু বলছেন না যে। বলুন!—তখন ছেলেটি সোজা মুখ তুলে একদৃষ্টে মেয়েটির চোখের দিকে তাকাবে এবং আস্তে আস্তে বলবে, আমি হাত দেখে কিছু বলতে জানি না, চোখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারি—এই রকম ভাবেই তো প্রেমের সংলাপ শুরু হয়।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, বাঃ! ছেলেদের এসব গোপন পদ্ধতি আপনি আগে থেকেই আমাকে বলে দিচ্ছেন কেন?

আমিও হাসতে হাসতে বললুম, আমি কি তোমার প্রেমে পড়তে যাচ্ছি নাকি? প্রেমে পতনের পরই মূর্ছা। আমি শুধু তোমাকে সাবধান করে দিলুম, কোনো

ছেলের মুখে এসব কথা শুনেই মূর্ছা যেও না। এটা হচ্ছে ছেলেদের একটা মুখস্থ-করা টেকনিক। এখন তুমি যদি কোনো ছেলের হাত দেখতে চাও, তা হলে হয়তো সে ভাবতে পারে যে, তুমিই তার প্রেমে পড়তে চাইছ।

—আপনার নিশ্চয়ই সে ভয় নেই?

—ভয় কি বলছ, এরকম দুরাশাও নেই একটুও।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটি বলল, প্রেমে পড়ার জন্য ছেলেদের আর কি কি মুখস্থ-করা টেকনিক আছে বলে দিন তো। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাব!

—কেন, এত সাবধান হবার ইচ্ছে কেন? আঘাত পেয়েছ বুঝি?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, সে কথা আর আপনাকে বলে লাভ কি? আপনার কাছে তো আর সাবধান হবার দরকার নেই! সত্যি বলুন না, আপনি হাত দেখতে জানেন!

—না। তুমিই বরং আমার হাতটা দেখে দাও তা হলে!

—আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন?

—না!

—কেন?

—বড্ড মিলে যায় যে। ঐজন্য বিশ্বাস হয় না। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল, আমার কিছু লেখাপড়া হবে না। সত্যিই হয়নি। একজন বলেছিল ১৪ বছর বয়সে আমি হারিয়ে যাব, সত্যিই ১৪ বছর বয়সের পর থেকে এ পর্যন্ত আমি হারিয়ে রয়েছি। বলেছিল, বিদেশে ভ্রমণের রেখা আছে—আমি যেখানে জন্মেছিলুম সে জায়গাটা এখন পাকিস্তানে—সুতরাং বিদেশে ভ্রমণ তো হয়েই গেছে। বলেছিল, হাতে একেবারে টাকাপয়সা জমবে না। টাকাপয়সা হাতে আসেই না, সুতরাং জমার কথাও ওঠে না। এতগুলো সব মিলে গেলে ভাল্লাগে না! তাই মনে হয়, হাত দেখা না মাথা আর মুণ্ডু।

—আমার কিন্তু একটাও মেলেনি জানেন! আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি ২২ বছর বয়সে বিধবা হবো। তিনজন বাঘা-বাঘা জ্যোতিষীও আমার হাত দেখে সেই একই কথা বলেছেন, একেবারে স্পষ্ট নাকি লেখা আছে। ঐজন্য আমি রমেনকে বিয়ে করিনি। আর কারুকে করবও না। আমার এখন ২৭ বছর বয়েস, তা হলে বলুন, আমার হাতের রেখা কি মিলল? কুমারী আর বিধবা কি এক?

আমি বললুম, এই স্নিগ্ধা, তুমি যে দেখছি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। এতক্ষণ হাসি-ঠাট্টা হচ্ছিল বেশ। কী ব্যাপার? রমেন, কোন রমেন?

—ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিল রমেন সান্যাল, আপনার বোনের

সঙ্গে এক ইয়ারেই তো পরীক্ষা দিয়েছিল।

—সে ছেলেটা এত বোকা যে এই কথা বিশ্বাস করে বিয়ে করল না ? তোমার মতন এমন একটা চমৎকার মেয়েকে—

—রমেন রাজি ছিল। রমেনের বাড়ির লোক রাজি হয়নি কিছুতেই—আমার মতন রাক্ষসগণ মেয়েকে কিছুতেই ঘরে নিত না। তা ছাড়া, আমিও রমেনকে বিয়ে করতে রাজি হইনি।

—কেন ? তুমি এসব সিলি জিনিসে বিশ্বাস করো—

—দেখুন, রমেন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু ও এ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেনি, খানিকটা শিভালরি দেখিয়েই রাজি হয়েছিল। তাতে আমি রাজি হই কি করে ? যদি আমি মরে যেতুম, তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমার বিধবা হওয়া মানে তো রমেনের মরে যাওয়া, তাতে আমি কখনো রাজি হতে পারি ?

—রমেন এখন কোথায় ? বাইশ বছর পেরিয়ে গেছে, তার মানে তো ফাড়া কেটে গেছে।

—রমেন দিল্লিতে চাকরি পাবার পর ওখানে বিয়ে করেছে। ভালোই করেছে। বছরের হিসেব ভুল হতে পারে। বাইশ বছরে না হয়ে আমার বত্রিশ বছরেও ফলে যেতে পারত। আমি সে চান্স নিইনি। কিন্তু, এখন জ্যোতিষীদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, বিধবা আর কুমারী কি এক ? আমার হস্তরেখায় বিধবা হবার কথাই আছে, কুমারী থাকার কথা তো নেই ?

—তুমি এরকম একটি বোকা মেয়ে তা তো জানতুম না। এতদিন তো বেশ চালাক চতুর হাসিখুসি মেয়ে বলেই জানতুম। এরকম ভুতুড়ে বিশ্বাস নিয়ে জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় ?

—আমি যে অন্য সবার মিলে যেতে দেখেছি। রমেনের হাতে ছিল, ওর স্বাস্থ্যবতী, ভাগ্যবতী, লক্ষ্মীশ্রীময়ী বউ হবে। ও বলত, আমিই নাকি সেই মেয়ে। কিন্তু আমি নই, রমেন অবিকল ঐ রকমই একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখে আছে। আমার দাদার হাত দেখে বলছিল, বউয়ের ভাগ্যে অনেক টাকাপয়সা হবে। দাদা টি মার্চেন্ট বি চক্রবর্তী অ্যান্ড কোম্পানির এক পার্টনারের একমাত্র মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছে। আমাদের বাড়ির চাকরটার হাতে ছিল, ওর এক ছেলে সর্পাঘাতে মারা যাবে। সত্যি সত্যি দেশ থেকে সেই রকম চিঠি এল।

—আরো কত লোকের মেলেনি, শুনবে ? আমার কাকিমার হাতে ছিল—ওঁর তিনটি ছেলেমেয়ে হবে, তার মধ্যে বড়ো ছেলেটি কুলাঙ্গার হয়ে মাকে খুব কষ্ট

দেবে। কাকিমার একটিও সন্তান হয়নি। আর ঐসব ব্যাপারেই হাসপাতালে অপারেশন করাতে গিয়ে তিনি মারা গেছেন। আমাদের অধ্যাপক দীনেশবাবুর হাতে ছিল, উনি ১৪ বছর রাজবন্দী থাকবেন। অথচ পুলিশ ওঁর দিকে একবারও কৃপাদৃষ্টি দিল না। একবার শিক্ষক আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, সেবার দেড়শো শিক্ষক গ্রেপ্তার হলো, তবু পুলিশ বেছে বেছেই যেন ওঁকেই বাদ দিয়ে গেল। পুণ্যবান দীনেশবাবু গত বছর গঙ্গালাভ করেছেন পুলিশকে সম্পূর্ণ কলা দেখিয়ে। এর উল্টোও আছে, আমার পিসতুতো বোন মমতার সঙ্গে অসীমের বিয়ে হলো কতরকম কুষ্ঠী মিলিয়ে, সব পণ্ডিতেরা বললেন একেবারে রাজযোটক! আশি বছরের টানা দাম্পত্যজীবন বাঁধা। দেড় বছরের মধ্যে আকসিডেন্টে মারা গেল অসীম। আরো শুনবে?

স্নিগ্ধা ম্লানভাবে হেসে বলল, না। কিন্তু আমার মধ্যে যে বদ্ধমূল ভয় ঢুকে গেছে। আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারি না। কেউ যদি খানিকটা অ্যাডভান্স করে, আমি নিজেকে গুটিয়ে নিই। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি কি জানেন, আমি সাদা থান পরে কাশীর গঙ্গায় স্নান করছি।

আমি ওর পিঠে একটা কিল মেরে বললুম, দূর ছাই। রমেন গেছে, এবার হেমেনকে ডাকো।

—কে হেমেন?

—হেমেন না হয় বরুণ না হয় শ্যামল, না হয় বিমল। ওদের মধ্যে কেউ যদি তোমার হাত দেখতে চায়, তুমি আগে কিছু বলবে না। সে যদি অনেকক্ষণ তোমার হাত ধরে বসে থাকে এবং কিছু কথা না বলে, এবং খানিকটা বাদে তোমার প্রশ্নের উত্তরে সে যদি বলে, সে হাত দেখতে জানে না, সে চোখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারে, তবে তাকে বলো, ভবিষ্যৎ বলতে হবে না। আমার শুকনো চোখের মধ্যে চোখের জল দেখতে পাচ্ছেন?

—যদি দেখতে পায়, তবে কি হবে!

—চোখে চোখে তাকিয়েই সত্যি ভবিষ্যৎ দেখা যায়। যে তোমার চোখের জল দেখতে পাবে, সে তোমার জন্য মরতেও রাজি হবে। প্রেমিকার জন্য প্রাণ দেবার ইচ্ছে না হলে সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো জাগে না।

স্নিগ্ধা এতক্ষণ পরে আবার হেসে উঠে বলল, ইস, আপনি এমন ভাবে বলছেন, যেন আপনি সব কিছু জেনে বসে আছেন। যান, ওসব বই-পড়া বিদ্যে ফলাতে হবে না আমার ওপর।

১০

হঠাৎ আমরা দেখলুম, একদল প্রাণী জল থেকে সার বেঁধে পাড়ে উঠে আসছে। দু'দশটা নয় অসংখ্য।

কাকদ্বীপের জেটিতে আমরা চারজন পা ঝুলিয়ে বসে আছি। আমরা চারজন পুরুষ বন্ধু। এখনো পুরো বিকেল হয়নি, অথচ রোদ নেই, একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন মেঘও নেই আর, আকাশ ভরা নরম আলো। আমরা সিগারেট খেতে খেতে চারজনে জেটিতে বসে পা দোলাচ্ছিলাম।

নীচে এমন কুৎসিত কাদা যে তাকালেই গা ঘিন ঘিন করে। পা থেকে জুতো হঠাৎ খুলে পড়ে গেলে, সেটাকে আবার ঐ কাদায় নেমে তুলব কিনা এ নিয়ে গবেষণা করলুম কিছুক্ষণ। আমার পা থেকে চটি জুতো খুলে পড়ে গেলে আমি তুলতে রাজি ছিলুম না, এমনকি চশমা বা পকেট থেকে কলম পড়ে গেলেও না। অবশ্য ক্যামেরা বা ঐ ধরনের দামি জিনিস পড়ে গেলে আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়তে রাজি ছিলুম।

এখানে গঙ্গা ডায়মণ্ডহারবারের মতন সমুদ্রপ্রতিম বিস্তৃত নয়। মাঝখানে চর জেগে উঠে নদীকে দু'ভাগ করে দিয়েছে। সেই নতুন চরে ছোট ছোট চারা গাছ ভরে আছে, আমাদের সকলেরই ইচ্ছে হলো ঐ দ্বীপের একটা কোনো নাম দিয়ে একটা উপনিবেশ পত্তন করি। আমাদের সেই স্বাধীন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা কি রকম হবে, তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দ্যাখ দ্যাখ! কী আশ্চর্য।

প্রথমেই সাপের কথা ভেবে আমরা চমকে উঠেছিলুম। পরে আট চোখে আমরা জলের দিকে তাকালুম। জল পেরিয়ে কাদার ওপরে কি যেন কতগুলো জীব উঠে আসছে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য সার বেঁধে। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম, জীবগুলো মাথায় ভর দিয়ে দিয়ে কাদা দিয়ে হেঁটে আসছে। কুমীর আর কচ্ছপ ছাড়া আর তো কোনো প্রাণীর কথা শুনিনি—যারা জল থেকে উঠে পাড়েও স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে। খুব যখন মেঘ করে কই মাছও পাড়ে উঠে আসে জানি। এবং সে সব কই মাছ নাকি গাছেও ওঠে—শুধু গাঁজাখোররাই তাদের দেখতে পায় অবশ্য। কিন্তু এরকম সার বেঁধে শত শত প্রাণীর জল ছেড়ে মাটিতে উঠে আসার দৃশ্য কখনো কল্পনাও করিনি।

প্রাণীগুলিকে বিকট দেখতে, কিন্তু আকারে ছোট বলেই ভয়াবহ নয়। দেড় আঙুল দু'আঙুল লম্বা, ট্যাংরা মাছের মতো আকার, কিন্তু মুখ শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়ো, অনেকটা ভাল্লুকের মতো—এবং কোনো ল্যাজ নেই। চোখ দুটো একেবারে মাথার ওপরে। আমরা আট চোখে ব্যগ্রভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম।

কাদার মধ্যে সেই শত শত জলজ প্রাণী খেলা করছে, হেঁটে হেঁটে ঘুরছে। ওদের হাঁটা খুব মসৃণ নয়, মাঝে মাঝে বোকার মতো পিছলে পড়ে যাচ্ছে। কাদার মধ্যে অবশ্য পা পিছলে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু ওরা তো পা দিয়ে হাঁটছে না, হাঁটছে মাথা দিয়ে—বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটতে চায়, অথচ যেন হাঁটা ঠিক অভ্যেস হয়নি এখনো। যেগুলো সদ্য জল থেকে উঠে আসছে সেগুলির গায়ে দেখতে পাচ্ছি শোল মাছের মতো চক্র কাটা। একটু বাদেই কাদায় ওদের চেহারা কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতির মধ্যে কোনোরকম অসামঞ্জস্য আমাদের সহ্য হয় না। জলে পাথর-ভাসা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি জলের মাছ পাড়ে উঠে হাঁটাহাঁটি করবে, এটাও কম বিরক্তিকর নয়। এগুলো মাছ বা পোকা, তাই বা কে জানে! দেখতে মাছেরই মতো অনেকটা, কিংবা মাছ না হলেও বা কি। চিংড়ি মাছও তো মাছ নয়, পোকা। এ লবস্টার ইজ এ লেডি ফিস—কিন্তু লবস্টার লেডিও নয়, মাছও নয়। তবু মাছ ছাড়া যার ভাত রোচে না, সেইরকম অনেকেরই সবচেয়ে প্রিয় মাছ হচ্ছে চিংড়ি।

আশেপাশে কয়েকজন বেকার চাষাভুষো শ্রেণীর লোক ছিল নদীর পাড়েই, দু-তিনটে খড়ের ঘর—বোধ হয় সেখানকার বাসিন্দা। ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, এগুলো কী বলতে পারো?

—সেগুলো তো মাছ! না-খাওয়া মাছ।

—না-খাওয়া মাছ মানে?

—উসব মাছ লোকে খায় না। খায়ও বটে, ছোটজাতে খায়।

—তোমরা কী জাত?

—কৈবর্ত।

—ও, আচ্ছা। তা তোমরা খাও না কেন? মাছের এমন আকাল, আর এখানে দেখলুম—এরা হাজারে-হাজারে উঠে আসছে।

—ওসব নিচু জাতের মাছ! আমরা ওদের বলি, ডাক, ডাকমাছ। কেউ বলে ডাকু মাছ।

—ডাকমাছ কেন? ডাকনাম হলো কেন?

—কি জানি বাবু। আমরা মুখ্য লোক কি আর ওসব জানি!

এ মাছের নাম আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু 'নিচু জাতের মাছ' কথাটার মধ্যে যেন কিছুটা রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পেলাম। অর্থাৎ এরা আর পুরোপুরি মাছ নয়, মাছের সমাজে অস্পৃশ্য, মাছের বদলে স্থলজ প্রাণী হবার দিকেই ওদের ঝোঁক। বাদুড় যেমন পাখি নয় ওরাও তেমনি মাছ নয়।

আমরা চার বন্ধু তখন আর আকাশ দেখছি না, নদী দেখছি না, নবীন দ্বীপ দেখছি না, আমরা শুধু একমনে কুৎসিত কাদার ওপর সেই বিকট চেহারার

মাছগুলোর খেলা দেখতে লাগলুম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার দিব্যদর্শন হলো। আমার মনে হলো, ওরা আসলে টেরাডাকটিল আর ডাইনোসরদের বংশধর। সেই যেমন একদিন জল ছেড়ে প্রাণীরা উঠে এসেছিল মাটিতে, আমাদের প্রপূর্বপুরুষেরা, বিশাল বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় তারা মাতামাতি করেছিল, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের শব্দ উঠেছিল, এরাও তেমনি জল ছেড়ে উঠে আসতে চাইছে। কয়েক বছব পরেই হয়তো এরা গিরগিটি বা সাপ হয়ে ডাঙায় ঘুরবে।

ডাকমাছগুলো জল থেকে উঠেই কিন্তু আর জলের কাছাকাছি থাকছে না, সরে আসছে, গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কখনো বা পরস্পর মারামারি করছে। সেই মারামারি দেখায় আমরা নতুন মজা পেয়ে গেলুম। যেগুলো খুব বাচ্চা, সেগুলো ঘুরছে নির্ভয়ে, কিন্তু সমান চেহারার দুটো জোয়ান মাছ কাছাকাছি এসেই রুখে দাঁড়াচ্ছে। জল থেকে যখন উঠে আসছে, তখন মারামারি নেই, কিন্তু স্থলের ভিতরে যত আসছে ততই মারামারি বাড়ছে। যেন স্থলভাগের অধিকার নিয়ে লড়াই। পৃথিবীতে এখনো তিন ভাগ জল—জলের অধিকার নিয়ে ঝগড়া হয় না, কিন্তু স্থলের দখল নিয়ে যুদ্ধ চলে অনবরত, এটা ওরা কত তাড়াতাড়ি শিখে যাচ্ছে।

ভারী মজার সেই যুদ্ধের দৃশ্য। দুটো ছাগলের মতো মুখোমুখি গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে যায়, ওদের ভাল্লুকের মতো বিকট মুখটা আরো ফুলে ওঠে, বিশাল হাঁ করলে ভিতরে একটা কালো গর্ত দেখা যায়, এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যপক্ষ বিদ্যুৎগতিতে সরে যায়।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম, লাগ লাগ, লেগে যা! নারদ! নারদ! সাবাস মরদ কা বাচ্চা!

কে হারবে কে জিতবে এই নিয়ে আমরা এক-একজন এক-একটার পক্ষ নিয়ে বাজী ধরি। কখনো ওবা চার পাচ দিকে চার পাচ জোড়া লড়াই করছে, কোনটাকে দেখব, বুঝতে পারি না। ক্রমশ ওদের মধ্যে একটা তুমুল যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে একটা অন্যটাকে হারিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে। সেই সভ্যতার আদিকালে সমস্ত প্রাণীরা যেমন জল থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হয়ে গেছে—এখানেও আমরা যেন সেই পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলুম। জল থেকে ওরা উঠেছে এক সঙ্গেই ঝাঁক বেঁধে—তখন কোনো ঝগড়া নেই-- কিন্তু কি আশ্চর্য, যতই ওরা বেশি পাড়ের দিকে আসছে ততই লড়াই লাগছে। তা হলে যুদ্ধ কি এই মাটিরই দোষ?

জোয়ারের জল আস্তে আস্তে বাড়তেই লড়াই ক্রমশ থেমে যায়। হেরে-যাওয়া মাছগুলো গর্তে ঢুকে যায়, কয়েকটা গুণ্ডা শ্রেণীর মাছ শুধু টহল দিতে থাকে। আমাদের তখন লড়াই দেখার নেশায় পেয়ে গেছে। আমরা আরো লড়াই বাধাবার

জন্য ওদের উত্তেজিত করি। হুস যা না, ওদিকে যা! ঐ যে ওদিকে! এই পেট-মোটা, ঐ ঘাড়-উঁচুটার কাছে যা না! ছোট ছোট ইঁটের টুকরো এনে আমরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদের বিব্রত করার চেষ্টা করি। কিন্তু হঠাৎ মাছগুলো যেন উদাসীন হয়ে যায়। যেমন হঠাৎ লড়াই আরম্ভ করেছিল, তেমনি হঠাৎই আবার থেমে যায়। যেন বিকেলের এইটুকু সময় ওদের খেলাধুলো বা কুস্তি করার সময়। কিংবা হয়তো ওরা জেনে গেছে, জোয়ারে এর পরে এই কাদা জমির সবটুকুই ডুবে যাবে, সুতরাং জমির অধিকার নিয়ে আর মারামারি করে লাভ নেই।

কিন্তু মারামারি থেমে যাওয়া আমাদের একটুও পছন্দ হলো না। আমরা চারজন ছুটোছুটি করে বড়ো বড়ো ইঁটের টুকরো খুঁজে নিয়ে এসে অজানা আক্রোশে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলুম। ওদের গায়ে সহজে লাগে না, বা নরম কাদায় আছে বলে ইঁট লাগলেও ওদের আঘাত লাগে না। কিন্তু আমরা তখন হিংস্র হয়ে উঠেছি। ইঁট ফুরিয়ে যেতেই রাস্তা থেকেই খোয়া ভেঙে নিয়ে আসতে লাগলুম।

এমন সময় দূরে একটা গণ্ডগোল শোনা যায়। একটু দূরের খড়ের ঘরগুলোর পাশ থেকেই উত্তেজিত চিৎকার আর গালাগালির আওয়াজ। এক বন্ধু খুশিতে উদ্ভাসিত মুখে বললে, ওখানে মারামারি হচ্ছে, চল দেখতে যাই।

হাতের ইঁট ফেলে দিয়ে আমরা সেদিকে ছুটলাম! ওখানে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। দুপক্ষেই দু-তিনটি স্ত্রীলোক আর দু-তিনটে রোগা চেহারার পুরুষ, মুখে অকথ্য গালাগালি আর হাতে বাঁশের কঞ্চি। আন্দাজে বুঝলুম, এ বাড়ির বাচ্চা ছেলেকে ওবাড়ির বাচ্চা ছেলে মেরেছে, এই নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর পারিবারিক কুৎসায় নেমে এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আমরা বেশ উপভোগ করতে লাগলুম। একটু পরে যখন সত্যিই হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল, তখন হাসিমুখে আমরা চার বন্ধু পরস্পর চোখ টিপলুম। অর্থাৎ কোনপক্ষ জিতবে, কোন পক্ষ হারবে, এসো তাই নিয়ে বাজি ধরা যাক!

১১

বই কেনার বদলে আমি নতুন বন্ধুর সংখ্যা বাড়িয়ে চলি অনবরত। ফলাফল একই। নতুন বই কেনার মতন যদি যথেষ্ট অতিরিক্ত টাকাপয়সা না থাকে, তবে নিত্যনতুন বন্ধুর কাছ থেকে দু'একখানা করে বই হস্তান্তরিত করার সুযোগ পাওয়া যায়ই। অবশ্য সামান্য ছোট অসুবিধে এতে মাঝে মাঝে হয়, যখন সদ্য নতুন কোনো

বন্ধুর কাছ থেকে সবেমাত্র দু-দিনের কড়ারে একটি বই চেয়ে নিয়েছি, তখনই যদি কোনো পুরোনো দাগী বন্ধু এসে হাজির হয়ে বলে, কি রে, আমার অমুক বইটা ফেরৎ দিলি না? এই নিয়ে তুই আমার একুশখানা বই ইত্যাদি। সেই সমস্ত অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাবার জন্য একটা কিছু তাৎক্ষণিক উপায় খুঁজে নিতে হয়।

অপরের বই চেয়ে এনে ফেরৎ না-দেবার ব্যাপারে আমার কোনো গ্লানি নেই। কারণ, এই সার সত্য আমি জেনে ফেলেছি, প্রত্যেক বইয়েরই একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। লক্ষ্মীর মতোই, বই জিনিসটাও বেশ চঞ্চল, সে কখনো এক লোকের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে চায় না। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের নাম লেখা বইও আছে আমার বাড়িতে, সেগুলো কি করে যে এল, তা আমি বিন্দুমাত্র জানি না।

আবার নতুন আলাপ হওয়া কোনো লোকের বাড়িতে প্রথম দিন গিয়েই আমি দেখতে পেয়েছি আমার নাম লেখা বই আলমারিতে বিরাজমান। এই রকমই নিয়ম।

কিন্তু চেয়ে-আনা বই সাধারণত একটু পুরোনো হয়। অথচ নতুন টাটকা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, গন্ধ শুঁকতে আমার ভালো লাগে। এজন্য বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করার স্বভাব হয়ে গেছে আমার। আমার এক বন্ধু স[illegible] দাঁড়িয়েই সাপ্তাহিক পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো পড়ে ফেলে নিয়মিত। আমি কোনো বড়ো দোকানে ঢুকে দশ বারখানা নতুন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটা দুষ্প্রাপ্য বই চেয়ে বসি। সেটা না পেয়ে, খুবই দুঃখিত হবার ভান করে দোকান ছেড়ে চলে আসি।

বই কেনা না হলেও, বইয়ের দোকানে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব টুকরো সংলাপ বা দৃশ্য শুনতে বা দেখতে পাই, তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

যেমন, একদিন দেখেছিলাম, একটি তন্বী যুবতীর সঙ্গে একটি ছিপছিপে চেহারার যুবক এল দোকানে। মেয়েটি কিছুটা চঞ্চলা, গা ছাড়া সিল্কের শাড়ি পরেছে বলে সমস্ত শরীরময় চঞ্চলতা। যুবকটি সে তুলনায় বেশ ধীর। কিছু বই উল্টেপাল্টে দেখার পর যুবকটি বলল, তোমাকে আজ একটা কবিতার বই কিনে দিই।

—ধুৎ কবিতা!—এই কথাটা বলে যুবতী এমন একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি তুলল ঠোঁটে যে, আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

অসীম অবজ্ঞার সঙ্গে উল্টানো সেই স্ফুরিত অধরে এমন একটা সৌন্দর্য ছিল, যার তুলনায় পৃথিবীর সব কবিতাই তুচ্ছ, (সেই মুহূর্তে)। বস্তুত, কোনো

মেয়ের মুখে অমন নিখুঁতভাবে কবিতার সমালোচনা, আমি এর আগে বা পরে আর শুনিনি। দেখিনি বলাই বেশি সঙ্গত।

শেষ পর্যন্ত সেই যুবতীটি কি বই নিলেন— তা অবশ্য বলাই বাহুল্য। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, যদি বুঝতে না পেরেও থাকেন, তবু আমি বলব না।

আর একদিন, একটি যুবতী একা এসেছেন। মাথায় সিঁদুর দেখলেই মনে হয়, নতুন কয়েক মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, ইয়ে, মানে ইযের সেকেণ্ড পার্টটা আছ ?

দোকানের একজন কর্মচারী বললেন, কোন বইটার সেকেণ্ড পার্ট ?

—ইয়ে মানে ঐ যে সেকেণ্ড পার্ট।

—কোন বইয়েব ?

যুবতীর মুখ নম্র লজ্জায় ভরে গেল। অপর একজন কর্মচারী বললেন, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। তিনি ভিতর থেকে একটা বই এনে দেখিয়ে বললেন, এইটা তো ?

মেয়েটি সম্মতি জানিযে মুখ নিচু করলেন। তারপর নিচু মুখ করেই হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে টাকা বার করতে অনেকটা সময় লাগল। মেয়েটি বই নিয়ে বেরিয়ে যেতেই একজন কর্মচারী অপরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি করে বুঝলি —এই বইটারই সেকেণ্ড পার্ট চেয়েছিল ? অপরজন মুচকি হেসে বললেন, মুখ দেখেই বুঝতে হয়! মাথায় নতুন সিঁদুব, মুখে লজ্জা—সেকেণ্ড পার্টেই তো সন্তান পালন বিষয়—

আর একটি দোকানে— সে দোকানে ইংরিজি-বাংলা সব রকম বই-ই পাওয়া যায়। একজন মধ্যবয়স্ক লোক ঢুকে জিজ্ঞেস করল আপনাদের কাছে পিকুইক পেপার্স আছে ? দোকানেব কর্মচারী উদাসীন ভঙ্গি করে বলল, আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে ভোলানাথ কিংবা অন্য কাগজেব দোকানগুলোয় খোঁজ করুন। এটা বইয়ের দোকান!

—পূরবী আছে ? সেদিন দোকানে অনেক ভিড়, আমিও সেদিন যা থাকে কপালে আজ একটা কিনেই ফেলব— এই রকম ঠিক করে ফেলে বহু বই ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ নিচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে। দোকানে আমাকে বাদ দিয়েও চার-পাঁচজন, কাউন্টারের এক কোণে একটি পূর্ণ উদ্ভাসিত যুবতী নানা বই দেখছেন, খুব মনোযোগ দিয়ে আমার ডান পাশে একটি যুবক রবীন্দ্রনাথের বই দেখছিলেন। হঠাৎ যুবকটি জিজ্ঞেস করলেন, পূরবী আছে ?

দোকানের কর্মচারী একটু ইতস্তত করে বললেন, না, ক্ষণিকা কিংবা পলাতকা আছে—দেব ?

—কেন, পূরবী নেই?

কর্মচারীটি আরো ইতস্তত করে বললেন, না, মানে—

—আমার যে পূরবীই দরকার!

কর্মচারীটির মুখখানা কাতর হয়ে এল। যুবকটি বিরক্তভাবে দোকান ত্যাগ করলেন! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি যুবক ঢুকে বললেন, ইস, পূরবী, তোমাকে অনেক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বড্ড দেরি হয়ে গেল—

কাউন্টারের কোণে দাঁড়িয়ে যুবতীটি এবার মুখ তুলে চাপা কৌতুকে দোকানের কর্মচারীকে বললেন, একে ও বলে দিন না, পূরবী নেই। বলে দিন, এখন শুধু ক্ষণিকা কিংবা পলাতকা আছে!

এফস্কট ফিটজেরাল্ডদের সঙ্গে দেখা হয় কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়। একজন বৃদ্ধ লোককে দেখলুম একদিন, এককালে খুব লম্বা ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন বলা যায়, এখন কিছুটা ন্যুব্জ ও শীর্ণ চেহারার, মাথার চুল ধপধপে সাদা। চোখে পুরু চশমা। বললেন, অমুক বইটা আছে?

—না, আমাদের কাছে নেই।

—আর, পাওয়া যায় না?

—যায় হয়তো। আমরা রাখি না। কেউ চায় না আজকাল।

—কেউ চায় না, না?

বৃদ্ধ নিচু গলায় আপন মনেই বললেন, বইটা আমারই লেখা। আজকাল আর কেউ পড়তে চায় না, না? এক সময় কিন্তু অনেকে চাইত। 'ভারতবর্ষে' আমার বই বেরিয়েছে ধারাবাহিক, শরৎবাবু প্রশংসা করেছিলেন—এখন কেউ পড়তে চায় না! শরৎবাবুর বই তো এখনো পড়ে।

আমি পরে বইটি খুঁজে নিয়ে পড়ে দেখছিলাম। সত্যিই বইটির এক সময় খুব চাহিদা ছিল, উনিশশো তিরিশ সালে বইটির চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বেরিয়েছিল!

এরই বিপরীত ধরনের আর একটি লোককে দেখেছিলাম—কোনোদিনও ভুলব না তাকে। একটি বইয়ের দোকানের এক কোণে একটি মলিন পোশাক-পরা প্রৌঢ়কে দোকানের কর্মচারী বার বার জিজ্ঞেস করছেন, কী চাই আপনার? লোকটি হাত তুলে প্রতীক্ষার ভঙ্গিতে বলছিলেন, পরে-পরে—আগে একটু ফাঁকা হোক!

লোকটির পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে কেডস জুতো। হাতে একটি মোটা ফাইল। লোকটি নির্বিকার হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে বহুক্ষণ প্রায়। একটু ক্রেতার ভিড় হালকা হতে তিনি বললেন, আমি একটি পাণ্ডুলিপি এনেছি। আপনারা যদি প্রকাশ করেন—

দোকানের কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মাপ করবেন, আমরা নতুন লেখকের বই ছাপি না।

লোকটি সামান্য হেসে উত্তর দিলেন, হুঁ—আমি তো আর নতুন লেখক নই। এই বয়েসে কি আর নতুন করে লেখা শুরু করা যায়? আমি ইতিপূর্বে সাতখানি গ্রন্থ লিখেছি। ন্যাগ্রোধন্যায়ের টীকা, বাসুদেব চরিত, দক্ষযজ্ঞের গূঢ় কথা...

—ছাপা হয়েছে সেসব বই?

—না, এখনো একটিও ছাপা হয়নি। এবার একটি একটি করে ছাপা শুরু করব। আমার শ্রেষ্ঠ বইটিই এনেছি। আপনাদের জন্য।

—মাপ করবেন, ওসব বই আমরা ছাপি না।

—আহা, কি সব বই বুঝলেন কি করে? এখনো তো পড়েনই নি! আমার এই গ্রন্থটির নাম 'অন্তরীক্ষ রহস্য'। চোখে দেখা জগতের বাইরে যে বিশাল জগৎ —সে সম্পর্কে আমার দীর্ঘজীবনের যে উপলব্ধি, তাই লিখেছি। ছাপালে প্রায় চার শো কি পাঁচশো পাতা হবে। এই গ্রন্থ পড়ে মানুষ অন্তর্জীবনে শান্তি পাবে।

—ওসব জ্ঞানের কথা আর কে আজকাল পড়তে চায়? আপনি অন্য জায়গায় দেখুন।

—অন্য কোন প্রকাশালয় এই প্রকার গ্রন্থ ছাপান?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চান, তবে বলে দিচ্ছি কেউ ছাপবে না। ওসব পণ্ডিতি বই নিজের খরচেই ছাপান আজকাল সবাই। বছরে দশখানা বিক্রি হয় কি না হয়।

—না, না, এ সেই প্রকার বই নয়। এতে একটিও হাল্কা কথা নেই। প্রমাণ এবং ব্যুৎপত্তি ব্যতীত একটি কথাও লিখিনি। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি এসব বই ছাপার ব্যয় কি করে সঙ্কুলান করব? আপনারা পড়ে দেখুন!

—পড়ে দেখে আমরা কি করব? বললুম তো।

—আহা পড়েই দেখুন না, বইতে যদি কোনো ভুল থাকে, তথ্যের কোনো দোষ থাকে, তা হলে আমি ছাপার জন্য মোটেই পীড়াপীড়ি করব না। পড়ে দেখুন আগে।

—বলছি তো, আমাদের পড়ে কোনো লাভ নেই। এসব বই চলে না, আমরা ছাপতে পারব না।

—পড়বেনও না?

—না। মাপ করবেন। আচ্ছা নমস্কার।

প্রৌঢ়টি রক্তহীন মুখে আবার বললেন, পড়েও দেখবেন না? দীর্ঘ সাত বৎসরের পরিশ্রমে লিখেছি, তা শুধু একবার পড়ে দেখতেও আপত্তি! সাত বছর

দিন-রাত্রি খেটে যা লিখেছি—তা সবই ব্যর্থ? আমার মধ্যম কন্যা সম্পূর্ণ বইটা কপি করে দিয়েছে, মুক্তোর মতন তার হস্তাক্ষর, সে লেখা পড়ে দেখতেও আপত্তি! থাক,...আচ্ছা, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?

দোকান থেকে ওঁকে এক গ্লাস জল দেওয়া হলো। প্রৌঢ়টি লোভীর মতন সমস্ত জল যেন শুষে খেয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফাইলের দড়ি বাঁধতে লাগলেন আবার। বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন, আর শোনা গেল না। ফাইল বাঁধা হলে সেটা হাতে নিয়ে দোকান ছেড়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। হঠাৎ ফাইলটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। শশব্যস্তে ঝুঁকে পড়ে ফাইলটা কুড়িয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন। আদর করার মতো আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে ধুলো ঝাড়ছিলেন তিনি। সেই সময় আমি তাঁর মুখের দিকে আবার তাকালাম।

সে রকম অপমান ও দুঃখে কুঁকড়ে-ওঠা মুখ একবার দেখলে এ-জীবনে আর ভোলা যায় না।

১২

আমাদের ইস্কুলের থিয়েটারে যে ছেলেটা প্রতাপাদিত্যের পার্ট করেছিল, তার সঙ্গে এখনো আমার প্রায়ই দেখা হয়।

ক্লাস টেনে উঠে সেবার এমন থিয়েটার করেছিলাম যে, মাস্টারমশাইরা নাকি তার স্মৃতি এখনো ভোলেননি। এখনো ক্লাসে পড়াতে পড়াতে তাঁরা বলেন, হ্যাঁ, নাইনটিন ফিফটির ব্যাচের ছেলেরা ছিল বটে সত্যিকারের, যেমন পড়াশুনোয়, তেমন অন্যান্য অ্যাকটিভিটিতে।

শিক্ষামন্ত্রীর ভাইপো পড়ত আমাদের ক্লাসে, সুতরাং স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের থিয়েটারে চিফ গেস্ট হয়েছিলেন, প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় বিশ্বনাথ এমন মার-মার কাট-কাট অভিনয় করেছিল যে, হাততালির পর হাততালি এবং দু'খানা পদক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ওর নামে।

আমি অবশ্য ভিড়ের দৃশ্যে একবার মাত্র মঞ্চে এসে কোরাসে 'জয় মহারাজের জয়' এইটুকু মাত্র বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ভিড়ের দৃশ্যের সামান্য পার্ট পেয়েই আমি খুশি, কারণ অভিনয়ের শেষে যখন গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল, তাতে তো আমিও দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং ঠেলেঠুলে এসে দাঁড়িয়েছিলাম একেবারে শিক্ষামন্ত্রীর পাশেই।

বিশ্বনাথ আমাদের ক্লাসেও হিরো হয়ে রইল। পড়াশুনোয় তেমন ভালো ছিল না, কিন্তু চেহারাখানা ছিল সুন্দর, ফর্সা রং কোঁকড়ানো চুল, কথা বলার সময় বেশ গলা কাঁপাতে পারত। শিক্ষামন্ত্রী ওর কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করেছিলেন বলে মাস্টারমশাইরা বিশ্বনাথকে বেশ সমীহ করে চলতেন।

ফার্স্টবয় সুপ্রকাশদের বাড়িতে আমাদের ক্লাব ছিল, বিকেলে সেখানে আমরা জড়ো হতুম, সুপ্রকাশের বোন শিবানী আমাদের তেমন গ্রাহ্যই করত না বটে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বলত, বিশুদা। একদিন বিশ্বনাথ একটা নীল কাগজ দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, এটা কি জানিস ? লাভ লেটার!

আমি বললুম, দেখি, কে লিখেছে ? বিশ্বনাথ ছোঁ মেরে কাগজটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে ভরল।

আমি বললুম, কে লিখেছে বল না। বিশ্বনাথ এমনভাবে চোখ টিপল, যার মানে হয়, শিবানী। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম।

পুজোর ছুটির পরও আর একটা থিয়েটার করার জন্য বিশ্বনাথের খুব উৎসাহ ছিল। কিন্তু তখন সামনেই টেস্ট পরীক্ষা বলে মাস্টারমশাইরা রাজি হলেন না।

টেস্টে কোনোরকমে অ্যালাওড হলেও ফাইন্যালে বিশ্বনাথ পাশ করল না।

তারপর আমরা আলাদা আলাদা কলেজে ছিটকে গেলুম। ইস্কুলের বন্ধুদের অনেকের সঙ্গেই আর যোগাযোগ রইল না। প্রথম কয়েক বছর ইস্কুলের কোনো বন্ধুর সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে বিষম আনন্দ হতো, পুরোনো গল্প, ক্লাসে কে কবে কি ইয়ার্কি করেছিল সেইসব। তারপর যথা নিয়মে, কারুর সঙ্গে দেখা হলে, কী খবর, ভালো তো, আচ্ছা চলি।

আমি আর সুপ্রকাশ এক কলেজে পড়তুম, আমাদের বন্ধুত্ব টিঁকে গেল, শিবানীও আমাকে ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নীলুদা বলেই ডাকত এবং লাভ লেটার না লিখলেও একদিন আমার সঙ্গে একা সিনেমায় গিয়েছিল। বিশ্বনাথ দ্বিতীয়বার ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়ে দেয়।

একদিন সুপ্রকাশ আর আমি আসছি, পথে বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। সুপ্রকাশ বলল, এই যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, কেমন আছেন ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি রে বিশে, কেমন আছিস ?

বিশ্বনাথ একটু লাজুকভাবে হাসল। কি রকম একটা তফাৎ তৈরি হয়ে গেছে, স্কুলে পড়ার সময় বেশ একটা আত্মবিশ্বাস এবং অহংকার ছিল ওর, আমাদের সঙ্গে কথা বলত বেশ একটু উঁচু থাকে। এখন ও ম্যাট্রিকে ফেল করেছে এবং আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ি—শুধু এইজন্যই ওর মুখে একটা হীনমন্য লজ্জা ফুটে উঠেছে। তবু খানিকটা জোর করে হেসে বলল, আর আমার লেখাপড়া ধৈর্যে

কুলোলো না। চাকরিতে ঢুকে গেলুম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী চাকরি করছিস রে? খাওয়া আমাদের—

—বাবার বন্ধুর এক চায়ের কোম্পানি আছে। সেখানে বসছি। কি খাবি চল না।

বছরখানেক পর বিশ্বনাথের সঙ্গে আবার দেখা। পোশাক ও মুখ খানিকটা মলিন। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। বেশ শৌখিন ছেলে ছিল বিশ্বনাথ, ইস্কুলে পড়ার সময়ে ওর পকেটে চিরুনি থাকত, রুমালে সেন্টের গন্ধ পেতুম। জিজ্ঞেস করলুম, কি বিশে? কি খবর?

ও বলল, আর ভাই বলিস না! ভাগ্যটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল—বাবা মারা গেলেন, সেই চায়ের কোম্পানিটাও উঠে গেল। পরীক্ষায় গাড্ডু মারলুম, এখন আবার গাড্ডায় পড়েছি।

—কী করছিস এখন?

—তুই একটা লাইফ ইনসিওর করবি? আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমার আবার লাইফের দাম কিরে যে আবার ইনসিওর করাব? তা তুই সিনেমা কিংবা থিয়েটারে ঢুকলি না কেন?

—দূর দূর, ধরাধরি ছাড়া ওসব লাইনে ঢোকা যায় না। ঘোরাঘুরি করেছিলুম কিছুদিন। আমি নাকি বেঁটে, তাই ওদের পছন্দ হয় না। পাড়ার ক্লাবে অবশ্য এখনো থিয়েটার করছি।

তাকিয়ে দেখলুম, সত্যিই, স্কুলে পড়ার সময় বেশ সুদর্শন ছিল বিশ্বনাথ, কিন্তু তারপর আর লম্বা হয়নি। কি রকম যেন চ্যাপ্টা ধরনের চেহারা হয়ে গেছে। আমি বললুম, জানিস গত মাসে শিবানীর বিয়ে হয়ে গেল—আমাদেরই কলেজের এক প্রফেসারের সঙ্গে—

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ বলল, তাই নাকি? ভালোই তো—আমিও একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, শিবানীর চেয়ে ঢের সুন্দরী।

তারপর এই পনেরো ষোলো বছরে কত কি বদলে গেল। সবচেয়ে বেশি বদলাল বিশ্বনাথ। ওর উপর যেন শনির কু-দৃষ্টি পড়েছিল, ক্রমশ ও নীচে নামতে লাগল। জরির পোশাক ও পালকের মুকুট পরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় দেখেছিলাম ওকে, ভিড়ের দৃশ্যের মধ্যে থেকে আমি ওর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলাম! অথচ, ওর সঙ্গে আমার দেখা হলেই আজকাল ওর মুখখানা কাচুমাচু হয়ে যায়, দু'-একটা কথা বলেই সরে পড়ে। আর দেখাও হয়! কলকাতা শহরটাই এমন—যার সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই দরকার, তার সঙ্গে পথে-ঘাটে হঠাৎ কিছুতেই দেখা হবে না। আর যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো দরকার নেই, দেখা

হলেই বরং অস্বস্তি, সেই পাওনাদার কিংবা ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা হবেই।

কখনো বিশ্বনাথকে দেখি বইয়ের ক্যানভাসার হয়েছে। ও বললে, ধুৎ, বড়ো লোকেদের সঙ্গে চেনাশুনো না থাকলে ইনসিওরেন্সের এজেন্সিতে কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু মান নষ্ট! তার চেয়ে এই বইয়ের ব্যাবসা ধরেছি, অনেক সম্মানজনক! এর মধ্যে আবার বিয়ে করে মুস্কিলে পড়ে গেছি এমন! —কখনো ওকে দেখি বাড়ির দালাল হিসেবে, কখনো কোনো কোম্পানির বিল কালেক্টর।

হাতিবাগান বাজারে পাখির খাঁচা কিনতে গিয়েছিলাম। রবিবারের বাজারে বেশ ভিড়, অনেকক্ষণ ধরে পছন্দ-টছন্দ করার পর, দোকানদারকে দাম দিতে গিয়ে দেখি, বিশ্বনাথ। আমাকে ও প্রথমে লক্ষ্যই করেনি, আমি বললুম, কি রে বিশে!

আমাকে দেখে ওর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কবে এই দোকান করলি? ও বলল, দাঁড়া, এই খদ্দেরকে একটু ছেড়ে দিই। তুই এই টুলটায় বোস না। চা খাবি?

ময়লা ধুতি ও ফতুয়া পরে আছে। কত বদলে গেছে ওর চেহারা! সবচেয়ে বদলেছে ওর মুখ। জীবিকার যত নিচু স্তরে ও নেমেছে, ততই ওর মুখে একটার পর একটা পর্দা পড়েছে, কি রকম তেলতেলে, অকিঞ্চিৎকর, যে-কোনো মানুষের মতন মুখ, তাতে খানিকটা দীনতা ও লজ্জা মেশানো। ছেলেবেলার সেই অহংকার একটুও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ও বলল, শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করলুম। দেখলুম ওসব উঞ্ছবৃত্তি করে কোনো সুরাহা হয় না। তোরা হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাবি—

আমি বললুম, পাগলের মতন কথা বলছিস কেন? দোকান করেছিস তাতে লজ্জার কি আছে?

নিচু গলায় বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁরে, শিবানীর কোন পাড়ায় বিয়ে হয়েছে রে? ও যদি কখনো এখানে আসে, আমার সত্যি লজ্জা করবে।

আমি বললাম, ধ্যাৎ তোর ওসব ছেলেমানুষী এখনো আছে? জীবন যাকে যেটুকু দিয়েছে—এর মধ্যে লজ্জার কি আছে? বেচে থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। তুই তো কিছু অসম্মানের কাজ করছিস না!

বিশ্বনাথ যদি উল্টে আমাকে প্রশ্ন করত, তুই নিজে যদি এ অবস্থায় পড়তিস, তা হলেও কি এসব বড়ো বড়ো কথা বলতে পারতিস? কিন্তু এরকম প্রশ্ন করার সাহস ওর আর নেই।

বরং ও আমার খাঁচার দাম নিতে চাইল না—এও আরেক দীনতা, গলার

আওয়াজ মিনমিনে করে ও বন্ধুত্ব দেখিয়ে আমার সমান হতে চাইল। আমি জোর করে ওকে টাকা গুঁজে দিয়ে চলে এলাম।

সরস্বতী পুজোর সময় হাতিবাগান বাজারে ধুমধাম করে উৎসব হয়। দোকান কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে সিরাজদ্দৌল্লা নাটক হচ্ছে, এত ভিড় যে রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম। কি এক অজানা কৌতূহলে আমি ভিড় ঠেলে একবার নাটক দেখার জন্য উঁকি দিলাম—স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করছে বিশ্বনাথ। জরির পোশাক, মাথায় পালকের মুকুট। কি অহংকারী মুখ এখন বিশ্বনাথের, কি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর, সমস্ত মঞ্চ জুড়ে দর্পিত পদভারে ও ঘুরছে। ঘন ঘন হাততালি। দেখে আমার এমন ভালো লাগল!

মানুষের কোথাও না-কোথাও একটা মহিমার আশ্রয় আছে। এই কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্বনাথ অপরিমিত সুখী। মুখের পর্দা সরে গেছে, গলার আওয়াজে ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাস। আমি আগেও ভিড়ের দৃশ্যে ছিলুম, এখনো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম।

১৩

চৌরাস্তার মোড়ে মেজমামার সঙ্গে দেখা। চোখাচোখি হতেই উনি নিঃশব্দে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়েই রইলেন। যেন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি একটু আগে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিলুম যে-গলায়, এখন সেই কণ্ঠস্বর বদলে কৃতার্থ স্নেহভাজনের মতো নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছেন মেজমামা? বাড়ির সবাই ভালো আছেন?

উনি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ। যেন কিছু একটার প্রতীক্ষা করছেন। আমি তো জানি কিসের প্রতীক্ষা, কিন্তু না-বোঝার ভান করে দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখা যাক না, কি হয়।

কি রকম বিসদৃশ দৃশ্য, রাস্তায় মাঝখানে দুজনে দাঁড়িয়ে আছি, কোনো কথা নেই। মেজমামার মুখে প্রতীক্ষা, আমার মুখে কিছুই না। ব্যাপারটা যখন সত্যিই বিসদৃশ হয়ে এল, তখন মেজমামা চলার ভঙ্গি করে ঈষৎ অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, এবার বিজয়ার পর বাড়িতে এলি না? নাকি তোরা ওসব প্রণাম-ট্রণামের পাট তুলে দিয়েছিস?

একটু আগেই পুরোনো ইস্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাইকে দেখে পথের ওপরেই ঢিপ করে প্রণাম করেছি। এখনো মেজমামার কাছে ও কাজটা চট করে

সেরে নিতে পারতুম। কিন্তু আমি খুব বিনীতভাবে বললুম, না, প্রণাম করতে আমার খুবই ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি সবাইকে প্রণাম করি না।

মেজমামা বোধহয় আমার কথাটা ভালো করে শুনতে পাননি, থেমে গিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, বাবাকেও তো প্রণাম করতে যাসনি।

—ঐ যে বললুম, আমি আর আজকাল সবাইকে প্রণাম করি না!

—কি ?

মেজমামা থমকে গিয়ে বিষম অবাক হয়ে তাকালেন। ব্যাপারটা বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারলেন না। উনি কত আমায় ঘুড়ি ওড়াবার জন্য পয়সা দিয়েছেন, একবার সঙ্গে করে পুরীতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমায়, চাকরির জন্য তিন জায়গায় চেষ্টা করেছেন...সেই কৃপাধন্য আমি হঠাৎ ওঁকে অপমান করার চেষ্টা করব, উনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না। অত্যন্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেন আমি প্রণাম করতে পারছি না এই রকম অসহায় আমার মুখের চেহারা। খুবই লাজুকভাবে মাথা নিচু করে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে আমি বললুম, আপনারা কেউ আমার ছোটকাকার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে আসেননি তো, সেই জন্যে আমি আপনাদের প্রণাম করব না ঠিক করেছি।

—রমেশের বিয়েতে যাইনি তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক।

—ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। আমার ছোটকাকা তাঁর অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করেছেন, অন্য জাত, তাই আপনারা আসেননি!

—তোর পছন্দ-অপছন্দে কি আসে-যায়।

—কিছু আসে-যায় না। কিন্তু কাকে আমি প্রণাম করব না-করব তা তো আমিই ঠিক করেছি। যাদের ব্যবহার আমার কাছে অশ্রদ্ধেয় মনে হবে, তাঁদের প্রণাম করব না।

—জাত না মেনে বিয়ে করাটা বুঝি খুব শ্রদ্ধার কাজ ?

আমি অবাক হয়ে বললুম, জাত তো আলাদা নয়। সবাই তো হিন্দু। এক সময় এদের আলাদা আলাদা বর্ণ বলা হতো বটে!

—ওসব তোরা না মানলে কি হয়, সংস্কার ছাড়া এত সহজ নয়। বাবার অমত ছিল বলেই আমরা যাইনি। বাবা বুড়ো মানুষ—

—আপনার বাবা কত বুড়ো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়েও বয়স বেশি ? না, না, আমি এমন অসম্ভব বলছি না যে, বিদ্যাসাগরের আদর্শ সবাই মেনে নেবে —দেশের ব্যবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু আপনার বাবা অর্থাৎ আমার দাদামশাই গবেষণা করে তিনটে ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেয়েছেন। কলম্বোতে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন একসময়। তিনিও এসব যদি না বোঝেন, তবে সাধারণ লোকে

কি করে বুঝবে, বলুন? কারুকে না কারুকে তো এসব বাজে সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে? দাদামশাই কি জানেন না যে বাংলা দেশের এসব জাত-ফাতের ব্যাপারগুলো একেবারে ভুয়ো! এক সময় যে-যা পেরেছে নামের সঙ্গে ইচ্ছে মতন পদবী জুড়ে দিয়েছে।

—বাজে বকবক করিস না! খুব পণ্ডিত হয়েছিস! জাতের সংস্কার সব দেশেই মানে, ইউরোপ আমেরিকাতেও—

—তা জানি। হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে কিংবা ইহুদীর সঙ্গে খ্রিষ্টানের, এমনকি খ্রিষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্টদের মধ্যে বিয়ে এখনো অনেক শিক্ষিত লোকও মানে না, কিন্তু এ হলো ধর্মবিশ্বাসের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য, কায়স্থ আর সুবর্ণবণিক—এদের ধর্মবিশ্বাস কি আলাদা? একই আচার, একই তীর্থ, ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সেরকম একটুও তফাৎ আছে? আপনি বলুন?

মেজমামা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, খুব বড়ো বড়ো কথা শিখছিস না? নিজের মামাকেও জ্ঞান আর উপদেশ দিতে আসিস! তুই প্রণাম করতে এলেই বা নিচ্ছে কে?

আমি অত্যন্ত আহতভাবে বললুম, মেজমামা, আপনি রাগ করলেন? আমি কিন্তু মোটেই আপনার মনে আঘাত দিতে চাইনি। আমার আর কি বিদ্যেবুদ্ধি আছে বলুন! নিজস্ব কিছুই নেই। এ যা বললুম, সবই তো সাধারণ বই মুখস্থ-করা কথা! যেসব বই ইস্কুলে-কলেজে পড়ানো হয়, যেসব বই আপনি পড়েছেন আমিও পড়েছি...আপনি যেসব ভুলে গেছেন ইচ্ছে করে, আমি মনে রেখেছি—এই আমার দোষ!

—যা যাঃ! অসভ্য অভদ্র, বাউণ্ডুলে বিটনিক—

ঘরে ঢুকে দেখলুম বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, অর্থাৎ আমার জ্যাঠতুতো জ্যাঠামশাই খাটে পা ঝুলিয়ে বসে টপাটপ নারকেল নাড়ু ঠেসে যাচ্ছেন। ষাটের কাছাকাছি বয়েস, ঈষৎ মেদবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য টসকায়নি। আমাকে দেখেই স্থূল পা দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বসেই প্রণাম কর। কোলাকুলি করতে হবে না, আর উঠতে পারি না। এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি!

আমি মজা করার জন্য হাসতে হাসতে বললুম, কিন্তু আপনাকে ত আমি প্রণাম করব না!

—কেন রে ব্যাটাচ্ছেলে, প্রণাম করবি না কেন?

—আপনাকে কেন প্রণাম করব বলুন!

—সে কিরে? সম্পর্ক ভুলে গেলি নাকি? অ বৌমা, এ ছেলেটা কি আত্মীয়স্বজনকে একেবারে ভুলে বসে আছে নাকি?

আমি বেশ প্রফুল্লভাবে হাসতে হাসতেই বললুম, না, জ্যাঠামশাই, সম্পর্ক ভুলব কেন? কিন্তু আপনাকে প্রণাম করি কি করে, আপনি তো ব্রাহ্মণ নন!

—অ্যাঁ? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর? তোর বাপ যখন ব্রাহ্মণ ছিল —তখন আমি ব্রাহ্মণ নই?

—উহুঁ! আপনি তো আপনার ছেলের সঙ্গে এক শূদ্রের মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আর ব্রাহ্মণ রইলেন কি করে?

আমার জ্যেঠতুতো জেঠা এবার ঘর ফাটিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! তোরা আজকালকার ছেলে হয়েও এসব জাত-ফাত মানিস নাকি? আমরা বুড়ে হয়েও এসব ছাড়তে পারলুম—

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, একটু মানি এখনো। আপনার কণ্ট্রাক্টারির ব্যাবসা —আপনি ব্যবসার সুবিধার জন্যে গভর্নমেণ্টের এক শূদ্র অফিসারের কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে জোর করে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। বলুন, এটা কি ব্রাহ্মণের কাজ হলো?

জ্যেঠামশাই এবার হঠাৎ পা গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। তারপর রুক্ষ গলায় বললেন, ব্যাবসার সুবিধার জন্য ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এ কথা তোকে কে বলেছে?

—কাগজেই বেরিয়েছে। আপনার টেণ্ডারের রেট বেশি হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে কনট্রাক্ট দিয়েছে—কাগজওয়ালারা এ খবর ফাঁস করে দিয়েছে!

—কাগজওয়ালাদের মুখ ঠিক বন্ধ হয়ে যাবে! আমার টেণ্ডারের রেট বেশি, আমার জিনিসও অন্যাদের চেয়ে ভালো।

—না, তাও না। হাসপাতালগুলোতে আপনার সাড়ে নশো সেগুনকাঠের টেবিল সাপ্লাই করার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল সেগুলো সবই সেগুনকাঠের বদলে প্লাইউডের—

—তোর এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারটা কি রে? এ-সব ব্যাবসার হের-ফের। যারা ব্যাবসা করে তারা জানে আজকাল সবাই তো এরকম করছে।

—সবাই না, তবে অনেকেই যে এইরকম চুরি-জোচ্চুরি করছে তা তো জানিই। সেসব অসৎদেরও সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু তাদের আবার প্রণাম করাটাও একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না!

—তোদের বাড়িতে আমার আসাই ভুল হয়েছে! পাজী, ছুঁচো, বদমাস, বেল্লিক, বিটলে—

অন্যবার পুজোর পর প্রণাম করতে করতে কোমর বেঁকে যায়। এবার বেশ সুস্থ আছি। মাত্র দুটি প্রণাম করেছি। মাকে এবং পুরোনো ইস্কুলের সংস্কৃত মাস্টার-মশাইকে। খুঁজলে কি ওদেরও কোনো দোষ পাওয়া যাবে না? যাবে হয়তো! কিন্তু জননী এবং শিক্ষকের সব দোষ সহ্য ও ক্ষমা করা যায়।

১৪

মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর লাগে, আমার চোখে, যখন তারা প্রবল বাতাসের স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটে।

হু-হু করছে হাওয়া, চুল এলোমেলো এবং আঁচলটা পিছনের দিকে ডানার মতন উড়তে থাকে, মেয়েরা তখন বদলে যায়, তাদের চোখমুখ অচেনা মনে হয়।

সেই রকম হু-হু করা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক পলক তাকিয়ে বরুণাকেও আমার হঠাৎ সুন্দরী মনে হলো। অন্য কোনো সময় মনে হয়নি, একটু পুরুষালি ধরনের চেহারা বরুণার, বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্সার কাছাকাছি হলেও রাজপুতানিদের মতন চওড়া হাতের কব্জী এবং নাকটা গুজিয়ার মতন ছোট আর বোঁচা। অন্য সময় সুন্দরী মনে হয় না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বরুণাকে মনে হলো বত্তিচেল্লির আঁকা 'থ্রি গ্রেসেস'-এর অন্যতমা। আমি বরুণার দিকে আড়চোখে আবার তাকালুম। কিছু একটা কথা বলা দরকার, তাই বললাম, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে, না?

বরুণা যেন অন্য জগৎ থেকে কথা বলছে, সেইভাবে উত্তর দিল, আঃ, আমার ইচ্ছে করে, সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট ডিঙি নিয়ে একলা এরকম হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাই।

কথা হচ্ছিল নদীর পাড়ে! পাশেই বিশাল নিস্প্রাণ দামোদর। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল—গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুররা কথা বলার সময় কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে, সাধু বাংলা তারা কতখানি বোঝে—এই সব তথ্য সংগ্রহ করার। কলেজের কোনো একটা পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বাইচান্স সেই চাকরি পেয়ে যাই!

ন'জন ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ের একটি দল মিলে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতুম, ইস্কুল বাড়িতে ক্যাম্প করা হতো। সেই দলের একটি মেয়ে বরুণা, তখন আমরা বর্ধমানের কলানবগ্রাম, শক্তিগড় অঞ্চলে।

দলের চারটি মেয়ে আর চারশো মেয়েরই মতন, তারা ছেলেদের থেকে একটু দূরে আলাদা দল মিলে থাকে, লাজুক লতার মতন আড়ে আড়ে চায়, হাসির কথায় চুপ করে থাকে, আবার অকারণে হাসে, অকারণে ভয় পায়, পদে পদে "ইস্ কি বিশ্রী কাদা, উঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ..."। দলের মধ্যে যে-মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী ছিল—তাকে আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতুম, মিস পুটুলি, শাড়ি-ব্লাউজে জড়ানো একটা পুটুলির মতনই দেখতে ছিল তাকে। আমাদের বিকাশ মাঝে মাঝে মন্তব্য করত, ইস, অতই যখন লজ্জা, তখন চাকরি করতে আসা কেন?

একমাত্র বরুণা ছিল আলাদা। ডাকাবুকো ধরনের, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, ছোটখাটো খানাখন্দ দেখলে দিব্যি লাফিয়ে পার হচ্ছে, কখনো বা কাদার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে সাঁওতালনির মতন হি-হি করে হাসছে। বরুণা বলত—আমি চাকরিটা নিয়েছি কেন জানেন? এই যে বাড়ির লোকজন ছাড়াই একা-একা বেড়াবার সুযোগ পেলুম! বেড়াতে আমার এত ভালো লাগে!

সেই সময় আমার একটা গুরুতর অসুখ ছিল। ঘন ঘন প্রেমে পড়া। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে কোনো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসে-থাকা কোনো মেয়ের মুখ দেখেও এমন প্রেমে পড়ে যেতুম যে, মনে হতো, একে না পেলে আমি বাঁচব না। সাতদিনে আহারে রুচি থাকত না।

সুতরাং বরুণার সঙ্গেও যে আমি প্রেম করবার চেষ্টা করব, তাতে আর আশ্চর্য কি! বাকি ছেলেরা অন্য চারটি মেয়ের পিছনেই ঘুরঘুর করত, তাদের মুখের একটু হাসি চোখের ঝিলিক দেখবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। বরুণাকে ওরা একটু ভয়-ভয় করত, তাছাড়া বরুণা বেশ লম্বা, অন্য ছেলেদের প্রায় সমান সমান —দলের মধ্যে আমিই একটু বেশি লম্বা ছিলুম বলে—আমার পাশেই বরুণাকে একটু-একটু মানাত।

কিন্তু হায় হায়, বরুণার সঙ্গে আমার এক বিন্দুও প্রেম হলো না।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় দলপতি ছিলেন—আমরা যে কাজের জন্য এসেছি সেটা সার্থক হচ্ছে কিনা দেখার বদলে—ছেলেরা মেয়েরা সব সময় আলাদা থাকছে কিনা, এটা লক্ষ রাখাই ছিল যেন তাঁর প্রধান দায়িত্ব। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতুম না, এবং সব থেকে অগ্রাহ্য করত বরুণা।

বরুণা অনবরত আমাদের মধ্যে চলে আসত, খপ করে যখন-তখন হাত ধরত, ইয়ার্কি করে পিঠে কিল, পুকুর পাড়ে পা ধুতে গেলে গায়ে জল ছিটিয়েছে —এমনকি সন্ধের পরও এসে বলেছে, চলুন না এ গ্রামের শ্মশানটা দেখে আসি। কিন্তু গলার স্বর একটু গাঢ় করে কথা বলতে গেলেই বরুণা চোখ পাকিয়ে বলেছে,

এই, ওকি হচ্ছে, ন্যাকামি? ইস্, একেবারে গদগদ দেখছি!

না, ওরকম মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলা যায় না, ওদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব।

বরুণার বাড়ির কথা একটু একটু শুনেছিলাম। যৌথ পরিবার, জ্যাঠামশাই বিষয় আচারনিষ্ঠ, গোঁড়া। বাবা অধিকাংশ প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত যে-রকম হয়, কোনো বিষয়েই কোনো জোরালো মতামত নেই, মা বহুকাল হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, দাদা কাঠের ব্যাবসা ফেঁদেছে—আরো অনেকগুলো ভাইবোন। অর্থাৎ বরুণাদের বাড়িতে গিয়ে বরুণাকে দেখলে কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেতুম না নিশ্চিত, সব মেয়ের মতনই গুটি গুটি কলেজ যায়—বাড়ি আসে, মাসি-পিসির সঙ্গে নাইট শো-তে সিনেমা যায়, দাদার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে ঘরে ঢোকা বারণ।

কিন্তু বাড়ির সঙ্গে খুব বোঝাবুঝির পর চাকরি নিয়েছে, আমাদের দলপতি নীতিশদা ওর কাকার বন্ধু— তিনি ওর ওপর নজর রাখবেন এই শর্তে। বাড়ি থেকে সেই প্রথম আলাদা বেরিয়েছে বরুণা, তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে, পায়ে পায়ে ওর চঞ্চলতা, বরুণার মধ্যে একটা প্রবল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দেখেছিলুম।

বরুণা বলত, পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, আমার ইচ্ছে করে একা-একা ঘুরে বেড়াই! কোনো অচেনা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, আঃ, ভাবতে যা ভালো লাগে!

আমি বলতুম, ইস, মেয়ে হয়ে শখ কত!

বরুণার চোখ ঝলসে উঠত। তীব্র স্বরে বলত, কেন, মেয়েরা বুঝি পারে না? ছেলেরাই সব পারে? দেখলুম তো কত ছেলে, মেয়েরও অধম! দেখবেন, আমি একদিন আফ্রিকা চলে যাব, একটি নতুন নদী কিংবা জলপ্রপাত আবিষ্কার করব!

আমি হা-হা করে হাসতুম। বলতুম, দেখা যাবে! বড়োজোর স্বামীর সঙ্গে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া কিংবা বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদের ত্রিবেণী—এর বেশি না।

বরুণা তখন রাগের চোটে দুম করে আমার পিঠে এক বিরাশী সিক্কা কিল!

আল্পস পাহাড়ের উচ্চতা, মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ ওর মুখস্থ ছিল। হিট্টাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ব্যাপারে একজন সুইডিস মহিলার অভিযানের কথা ও আমাকে শুনিয়ে ছিল। বরুণাও ছেলেমানুষের মতন কল্পনা করত, ও নিজেও একদিন মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা হিমালয়ের জঙ্গলে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেবার আমাদের দলে বরুণা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছিল। মরা দামোদরের পাড়ে আমরা দুপুরে এসে থেমেছি। বিষম হাওয়া দিচ্ছে, মেঘলা আকাশ। প্রত্যেকের দশজন চাষীকে ইন্টারভিউ করার কথা, আসবার পথে একটা

বাজার দেখে তা আমরা সেরে ফেলেছি। শেষ শীতের শুকনো দামোদর—বিরাট চওড়া—কিন্তু বেশির ভাগই বালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জল। আমরা ঠিক করলুম, হেঁটে দামোদর পার হবো। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বর্ষার দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, আমরা শীতের দামোদর হেঁটে রেকর্ড করব। তখন 'আওয়ারা' বইটা সদ্য রিলিজ করেছে, আমি আর বিকাশ রাজকাপুরের ভঙ্গিতে হাঁটুপর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলুম। হঠাৎ বরুণা বলল, আমিও যাব!

দলপতি নীতিশদা আঁতকে উঠে বললেন, না, কক্ষনো না, বরুণা যাবে না।

বরুণা ততক্ষণে আঁচল কোমরে বেঁধেছে, বলল, যাবই!

নীতিশদা বললেন, না বলেছি ? অনেক জায়গায় কোমর এমন কি বুক জল!

বরুণা বলল, তা হোক, আমি সাঁতার জানি। ঐ তো চাষীর মেয়েরাও পার হচ্ছে!

নীতিশদা বললেন, ওরা ঠিক ঠিক জায়গা চেনে। এক এক জায়গায় দারুণ স্রোত আছে। বরুণা, যেও না বলছি, তাহলে তোমার বাবাকে আমি নালিশ করতে বাধ্য হবো!

বরুণা এবার ঠোঁট উল্টে বলল, করুন গে যান, আমার বয়ে গেল! ততক্ষণে সে ঢালু পাড় দিয়ে নামতে শুরু করেছে!

প্রথমে বালি, বালির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে ছুটতে লাগলুম। বরুণার শাড়ি হাওয়ায় উড়ছে, ওর মুখখানা উদ্ভাসিত সুশ্রী। আমারও এমন ভালো লাগছিল যে, আমি ল্যাং মেরে বিকাশকে বালির ওপর ফেলে দিয়ে দুজনে গড়াগড়ি করলুম, বরুণা মুঠোমুঠো বালি আমাদের গায় ছুঁড়ে মারতে লাগল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকি সবাই দেখছে—ওরা ভদ্র, সভ্য—ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একটু পরেই জলের ধারার কাছে পৌঁছোলুম। ঠাণ্ডা টলটলে জল—অঞ্জলি ভরে মুখে ছিটোলাম তিনজনেই, তারপর নেমে পড়লাম। বরুণা শাড়িটা হাতে ধরে উঁচু করে নিল। ক্রমশ ক্রমশ জল হাঁটু ছাড়াল—তখন বরুণা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বলল, ভিজুক গে।

সেই জল ছাড়িয়ে আবার বালি—ওপর থেকে বোঝা যায় না, কত চওড়া নদীর খাত! আবার বালি ছাড়িয়ে জল। এবার জল ঊরু ছাড়িয়ে গেল—জল ঠেলার সাঁ সাঁ শব্দ... বরুণা আনন্দে একেবারে খলখল করছে, একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে গিযে আমার হাত চেপে ধরল। আমি ওর কাঁধ ধরে বললুম, এবার দিই ডুবিয়ে ?

ও বলল, ইস, আসুন না দেখি, আমার গায ক্ম জোর নেই।

কোমর ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। বিকাশ বলল, জল আরো বাড়বে

নাকি? বরুণা সে কথা গ্রাহ্য না করে উত্তর দিল, এত ভালো লাগছে, আমরা যেন-ওপারে কি আছে জানি না, যেন একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি! হাওয়া খুব জোর, জলেও স্রোতের টান লাগল, আর ব্যালান্স রাখা যাচ্ছে না, বিকাশ ভয়ে ভয়ে বলল, হঠাৎ জোয়ার টোয়ার এল নাকি! আমি কিন্তু সাঁতার জানি না! বলতে বলতেই বিকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বললুম, আরে, ওকি করছিস! বরুণা বলল, সাঁতার জানেন না তো এলেন কেন! বিকাশ বলল, চলো,আমরা ফিরে যাই।

বরুণা বলল, মোটই না।

আমার দিকে ফিরে বলল, আপনি তো সাঁতার জানেন, আসুন আপনি আমি দুজনে যাই! বিকাশ বলল, নিলু, আমাকে আগে এ পাড়ে পৌঁছে দিয়ে যা। আমি পা রাখতে পারছি না! দুচোখ-ভরা বিদ্রূপ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকাল বরুণা। তারপর সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বরুণা বলল, আমি তাহলে একটু চললুম।

চাকরিটা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের। শেষ হয়ে যেতে তারপর আর কেউ কারুর খোঁজ রাখিনি। শুধু বিকাশের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুদিন আগে বিকাশ বলছিল, তোর সেই দেবী চৌধুরানী মার্কা মেয়েটাকে মনে আছে ? বরুণা ? সেদিন আমাদের এক কলিগের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, তার বউ সেই বরুণা। কি চেহারাই হয়েছে চেনা যায় না—এর মধ্যেই তিনটি বাচ্চা!

তার কিছুদিন পর আমিও একদিন বরুণাকে দেখেছিলুম দুপুরবেলা চলন্ত ট্যাক্সিতে। টাক মাথায় থালু-আলু মার্কা একজন লোক, নিশ্চয়ই বরুণার স্বামী, মুটিয়েছে বলে বরুণার মুখখানাও ভোতা ধরনের, সঙ্গে একটা দেড় বছরের ছেলে। খুব সম্ভবত সিনেমায় দুর্গম পাহাড় কিংবা নির্জন হ্রদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে। না চেনার কি আছে ? এইটাই তো স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা।

বরুণার কথা আজ আবার মনে পড়ল, কেননা, কাগজে দেখছিলাম আটটি বাঙালি মেয়ে হিমালয়ে উঠে রন্টি শৃঙ্গ জয় করেছে। ভাবছি, এই খবরটা পড়ে বরুণা খুশি হবে, না দুঃখিত হবে?

১৫

বারট্রাণ্ড রাসেল আমাকে বললেন, চলো হে ছোকরা, আগে বড়োবাজারটা ঘুরে আসা যাক।

আমি বললুম, স্যার বারট্রাণ্ড, ওখানে যেতে হলে আপনাকে তো চিৎপুরের ট্রামে যেতে হবে, তাতে আপনার কষ্ট হবে যে!

বৃদ্ধ দার্শনিক মৃদু হেসে বললেন, কেন বৎস, চিৎপুরের ট্রামের বিশেষত্ব কি?

আমি বললুম, ট্রাম জিনিসটাই বোধহয় আপনি বহুদিন দেখেননি। আপনাদের বিলেতে তো এসব পাট উঠে গেছে শুনেছি। এখানে—

—বাজে বোকো না। আমেরিকায় থাকতে শিকাগোতে ট্রাম দেখেছি, সানফ্রান্সিসকোতেও ট্রাম আছে। আর—

—আমেরিকাতেও ট্রাম আছে নাকি? জানতুম না তো?

—তুমি আর কতটুকু জানো? এবারে চিৎপুরের ট্রামের বৃত্তান্ত কি বলো!

আর্ল রাসেল, ট্রাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? বা যে-কোনো গাড়ি সম্পর্কে? গাড়ি হয় সামনে দৌড়োয় অথবা থেমে থাকে। কখনো পিছনেও আসতে পারে, কিংবা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে ঝাঁকুনি লাগে। কিন্তু, গাড়ি চলতে চলতে ডাইনে বায়ে কোমর দোলায় এ রকম হয় কখনো শুনেছেন? কী এক অলৌকিক কারণে, চিৎপুরের ট্রামে এই রকম হয়। সুতরাং ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুইস্ট নাচতে আপনার এই বয়সে বোধহয় অসুবিধে হবে! তা আপনাকে বৃদ্ধ দেখে যদি কেউ সম্মান করে সীট ছেড়েও দেয়, তবুও চিৎপুরের ট্রামেই, এখনো সব কাঠের বেঞ্চি। কোনো গদি নেই। আপনার লাগবে—

জ্ঞানবৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন, সে ব্যবস্থা আমার করা আছে। আমার প্যান্টের পিছনে গদি সেলাই করা। শান্তি আন্দোলনের সময় লণ্ডনের রাস্তায় যখন 'সীট-ইন' করেছিলাম, তখনি বসার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছি। তা যাকগে, ট্রামে আমাদের যাবার দরকারটাই বা কি বাপু? চিৎপুরের রাস্তায় বাস চলে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ চলে। খুব ভিড় হয় যদিও, তবু চলুন, বাসেই যাই।

চার নম্বর বাসে বিপুল ভিড়। এ রাস্তায় বাসে কম লোক উঠলেও বেশি ভিড় হয়, কারণ অধিকাংশ লোকেরই কোমরের বেড় সাধারণ মানুষের তিন গুণ। আমরা পেছনের দরজা দিয়ে উঠে এক কোণে গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়োমানুষের একটু বেশি কথা বলার স্বভাব থাকে। বারট্রাণ্ড রাসেল আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেমন, এ বাসে একটিও মেয়ে দেখছি না কেন হে?

আমি বললুম, এই ৯৪ বছর বয়সেও আপনার মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ আছে দেখছি!

—কার না থাকে? মরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের ঘোচে না।

—হুঁ। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারেই আপনাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল না?

—ওসব পুরোনো কথায় তোমার দরকার কি হে, ছোকরা? যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও!

—আছে, মেয়েরা আছে। বাসের সামনের দিকের কয়েকটা আসন শুধু মেয়েদের জন্য। ভিড়ের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

—ঐ জন্যই সামনের দরজায় এত ভিড়! তা তো হবেই। পুরুষেরা মেয়েদের কাছাকাছি দাঁড়াবার চেষ্টা যদি না করে, তবে সেটাই তো অস্বাভাবিক।

—দেখছেন না, বাসের পিছন দিকে সহজে কেউ আসতে চায় না।

—তা তো হবেই, সামনের দিকে ওরাই সুস্থ লোক। তা তোমাদের বাস কোম্পানি মেয়েদের সীট শুধু সামনের দিকে না রেখে সারা বাসে ছড়িয়ে দেয় না কেন? তাহলে ভিড়টাও ছড়িয়ে যায়। আমরা দু'একজনের দেখা পেতুম!

—সারা বাসে ছড়িয়ে দিলে মেয়েদের উঠতে নামতে অসুবিধে হতে পারে।

—কচু হতে পরে! মেয়েদের কিছুতেই কিছু অসুবিধে হয় না। পুরুষদের চেয়ে তারা যে-কোনো অবস্থার সঙ্গে বেশি মানিয়ে নিতে পারে। তুমি আমাকে সামনের দরজায় না তুলে এখানে তুললে কেন?

—আজ্ঞে, ওখানে অত ভিড়! আচ্ছা ফেরার সময় না হয়...

—সামনের দরজার কণ্ডাকটার মাঝে মাঝে তারস্বরে কী বলে চেঁচাচ্ছে?

—ও ভিড়কে উদ্দেশ্য করে বলছে, লেডিজ সীটের সামনে ভিড় করবেন না, পিছন দিকে এগিয়ে যান!

—বেশ করবে লেডিজ সীটের সামনে ভিড় করবে! মানুষের ইনসটিংক্টও বদলাতে চায়? আর কি বলছে, বললে?

—পিছন দিকে এগিয়ে যান—

—পেছন দিকে এগিয়ে যান? ওঃ হো-হো—

দার্শনিক তাঁর বাঁধানো দাঁতে ফটফটে সাদা হাসি হেসে উঠলেন, পিছন দিকে এগিয়ে যান? হাঃ-হাঃ-হাঃ, ওঃ, এমন মজার কথা বহুদিন শুনিনি।

—আর্ল সাহেব, এতে মজার কি পেলেন?

—তোমার মাথায় দেখছি পঞ্চগব্যের একটি মাত্র গব্যই ভরা! মজাটা বুঝতে পারলে না? পৃথিবীর সব মনীষীরা বলে গেছেন, সামনে চলো! তোমাদের ভারতীয় ঋষিরাও বলেছেন চরৈবেতি। আর এখানে শুনছি, পিছন দিকে এগিয়ে যান! ওঃ-হো-হো। এই বুঝি তোমাদের সাম্প্রতিক নীতি, পিছন দিকে এগোনো?

আমি ওঁর কাঁধে টোকা দিয়ে বললাম, চুপ চুপ, আস্তে। এসব কথা বলে

বিপদে ফেলবেন দেখছি। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। কলকাতা শহরে আপনার আত্মপরিচয় গোপন রাখাই ভালো। এখানকার লোক আপনার উপর খুব খুশি নয়।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর মুখে সরল চোখে বললেন, কেন আমি কি দোষ করেছি ?

—চীন যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল ? আজকাল মাঝে মাঝে বড়ো বেমক্কা কথা বলেন! কিউবা নিয়ে যখন হাঙ্গামা হয়, আপনি সেবারও কেনেডিকে দুম করে যুদ্ধবাজ বলে বসলেন। আপনার ধারণা ছিল, কেনেডি ছুতো করে কিউবা ধ্বংস করতে চাইছে। পরে দেখলেন তো রাশিয়া সুড়সুড় করে মিজাইলগুলো নিয়ে গেল তুলে!

—শান্তি! শান্তি! ওসব কথা থাক।

—বার্ধক্য সত্যি দ্বিতীয় শৈশব। আচ্ছা যাক, আমরা এসে গেছি।

বাস থেকে নেমে আমরা হ্যারিসন রোড ধরে বড়োবাজারের দিকে এগিয়ে চললুম। এখন আর বৃদ্ধ দার্শনিকদের মুখে কথাটি নেই—আস্তে ঠুকঠুক করে হাঁটছেন এবং অবাক বিস্ময়ে দেখছেন চারদিক! মুখে যুগপৎ প্রজ্ঞার জ্যোতি এবং শিশুর সারল্য। ধপধপে সাদা মাথার চুল, ভুরু দুটিও সাদা—তিনি বড়োবাজারের নোংরা রাস্তা দিয়ে দিয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলেন আমার সঙ্গে। আমি ঈষৎ নিচু স্বরে, খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে ওঁকে বললুম, প্রভু, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী...বড়োবাজার! এক নিবিড় সুষমায় যশের সৌরভে ভুবন আমোদিত। এই যানবাহনসঙ্কুল, গলিঘুঁজিময় পল্লী, বাংলা দেশের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। এবং যে-হেতু এই সমগ্র পল্লীটিই হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ, সুতরাং এখানকার অধিবাসীদের প্রত্যেকের আর আলাদা কোনো হৃৎপিণ্ড নেই। এই যে সারি-সারি দোকানপাট দৈর্ঘ্যে ছোট প্রস্থে বড়ো একশ্রেণীর মানুষ বসে আছ—এদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যেখানে হৃদয় থাকার কথা ছিল, সেখানে হৃদয়ের বদলে আছে একটি ক্যাশ বাক্স, প্রতিনিয়ত টাকার ঝনঝন শব্দ হয়, সেই শব্দে বাংলাদেশ কাঁপে।

দার্শনিক ধীর স্বরে বললেন, তোমার কথার মধ্যে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের সুর আছে। কিন্তু বণিকসমাজকে বিদ্রূপ করো না। বণিকদের তুচ্ছ করার অর্থ ইতিহাসের জ্ঞানের অভাব। গোষ্ঠীবদ্ধ হবার প্রথম স্তরে দলপতি কিংবা রাজা ছিলেন মাননীয়। এখন সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে বণিকই সমাজের প্রাণ। মানুষের জ্ঞান বা কল্পনাকে বিস্তৃত করেছে কে ? সাহিত্যিক বা শিল্পী নয়, বণিকরাই। নিজের দেশ বা গণ্ডির বাইরে যে মানুষ তাকাতে শিখেছে—তাও এই বণিকদেরই জন্য। তারাই পৃথিবীর মানচিত্র নির্দিষ্ট করেছে। আজ মানুষ এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে অনায়াসে বসতি

করতে পারে! আজ আর তুমি শুধু নিজের সমস্যায় বিব্রত নও, আলাস্কায় ভূমিকম্প হলে তুমি ব্যথা পাও, ভিয়েৎনামে বোমা পড়লে তোমার ভয় হয়, চন্দ্র অভিমুখে মহাশূন্যযান ছুটে গেলে তুমি উল্লাস বোধ করো—এরও মূলে আছে বণিকরাই।

আমি বললুম, তা মানি। কিন্তু আমাকে অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এই যে বণিকদের দেখছেন, আলুপোস্ত, মশলাপট্টি, কাপড়ের বাজার, বাসনপাড়া—এসব জায়গা ঘুরে আমরা দেখলুম, ছোট ঘর প্রায়ান্ধকার, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দম আটকানো ভিড়—এর মধ্যে যে সমস্ত বণিকরা বসে আছে—তাদের এই দিনরাত পরিশ্রম কিসের জন্য? এদের পোশাক-পরিচ্ছদ বহুমূল্য নয়, এরা অনেকেই নিরামিষাশী—সুতরাং এদের ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য কতই বা অর্থ লাগে? তবু এরা প্রাণপাত করছে কেন? লক্ষ টাকার পর আবার কোটি টাকা অর্জনের জন্য এরা রক্তক্ষয় করছে?

—দেশের ও দশের উপকারের জন্য!

—দেশের উপকার? আপনি বলছেন কী? আপনি জাতে ব্রিটিশ বলেই কি সব বণিককে সমর্থন করবেন? কথায় কথায় এদের অনেকেই উধাও করছে বেবি ফুড—তা কি শিশুদের উপকারের জন্য? চাল-ডাল-তেল-নুন—যা যখন পারছে লুকিয়ে ফেলছে চতুর্গুণ দামের লোভে—এর নাম দেশের উপকার? আপনি কী করে বলছেন, বুঝিয়ে দিন। শুধুমাত্র লাভের নেশায় এরা দিনের বেলায় অন্ধকার নামাচ্ছে—

—সে দোষ ওদের নয়। বণিককে যে দাতা হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। শ্রম থেকে উৎপাদন, উৎপাদন থেকে বিনিময়, বিনিময় থেকে বাণিজ্য, বাণিজ্য থেকে সমৃদ্ধি। বণিক সব সময় চেষ্টা করবে—বাণিজ্য থেকে যতদূর সম্ভব বেশি লাভ করা, এবং সেই লাভের অঙ্কে হবে নতুন নতুন বাণিজ্যের প্রসার। রক্ত খাওয়া যেমন বাঘের মজ্জাগত স্বভাব, এই স্বভাবকে দমন করা ঠিক নয়—তাতে দেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি। উৎপাদন কম হচ্ছে বলে যদি বণিক লাভের ইচ্ছেটা বদলে ফেলে পরোপকারী সেজে যায়, যদি সে স্থিরমূল্যে বিতরণ কিংবা দান করা শুরু করে, তবে বাণিজ্যের বিস্তার রুদ্ধ হয়ে যাবে, এর কুফল ভোগ করতে হবে আগামী বহু বছর। শ্রমে আলস্য, কিংবা উৎপাদন কমে যাওয়ার জন্য বণিক দায়ী নয়। বাণিজ্যের নীতি স্থির করবে দেশের সরকার। সরকার যদি উদাসীন হয়, কিংবা বণিকের পা-চাটা হয়, তবে সে দোষ তাদের নয়।

—কিন্তু প্রভু, এ দেশের মানুষ যে মরতে বসেছে।

বৃদ্ধ মনীষী আবার খুকখুক করে হাসতে লাগলেন। বললেন, বাসের ঐ

কণ্ডাক্টর কী যেন বলছিল? পিছন দিকে এগিয়ে যান! পিছন দিকে এগিয়ে যান! ও-হো-হো-হো। এরকম নতুন হাসির কথা বহুদিন শুনিনি। এই পিছন দিকে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে নতুন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। তারই প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। চলো, একজন বণিকের সঙ্গে একটু কথা বলি।

রাস্তায় কাদা থিকথিক করছে, রিকশা এবং ঠেলাগাড়ির ভিড় এড়িয়ে, একটা বিশালবপু ষাঁড়কে পাশ কাটিয়ে আমি বারট্রাণ্ড রাসেলকে একটি দোকানের সামনে নিয়ে এলাম। দোকানের মালিকটি প্রৌঢ়, মাথায় সোনালি রঙের পাগড়ি, কপালে এবং নাকে চন্দনের তিলক, হাসলে দু'টি সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত দেখা যায়! সেই শ্রেষ্ঠী নন্দনকে দার্শনিক বললেন, আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করব। তুমি একটি মাত্র কথায় তার উত্তর দাও। প্রশ্নটি হচ্ছে তুমি কি চাও?

বিনা দ্বিধায়, মুহূর্তমাত্র না ভেবে সে বলল, যুদ্ধ!

রাসেল আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, লোকটা সৎলোক। সত্যিকারের মনের কথাটা বলেছে। এই আলস্য ও জড়তা ভাঙার একমাত্র উপায় যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় উৎপাদন বহুগুণ বাড়তে বাধ্য—তাতে বণিকদের সমৃদ্ধি, তাই বণিক চাইবে যুদ্ধ। আর যুদ্ধে মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিনাশ বলে দার্শনিক চাইবে শান্তি। এই বণিক ও দার্শনিকের বিপরীত টানেই সভ্যতা টিকে থাকে। আমি এ কথা ভালোভাবেই জানতুম। কিন্তু মাঝখান থেকে এই আণবিক অস্ত্রগুলো এসেই যেসব গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। যুদ্ধ একবার বাধলে আর যে শেষ হবে না!

আমি বললুম, যুদ্ধ যুদ্ধ আপনার একটা বাতিক হয়ে গেছে! এখানে গোপন যুদ্ধ অনবরত চলেছে, তা বুঝি টের পেলেন না? যাকগে, চলুন এবার ফেরার বাসে উঠতে হবে। আবার পেছন দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক!

১৬

ওঃ, কতকাল যে মানুষের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা শুনিনি। অস্পষ্টভাবে যেন মনে পড়ে, ছেলেবেলায় প্রায়ই শুনতুম, পাশের বাড়ি থেকে বা চেনাশুনো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

একটি লাল পাড়ের শাড়িপরা প্রৌঢ়া মহিলা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, কী রকম যেন ঠাণ্ডা তাঁর চেহারা, কখনো তাঁকে চেঁচিয়ে হাসতে শুনিনি। —শুনেছিলাম, তাঁর স্বামী এগারো বছর আগে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন। সন্ন্যাসী হওয়াটা অবশ্য দূর কল্পনা, কারণ তিনি তো আর বাড়ি থেকে গেরুয়া

কাপড় পরে বেরোননি, এমনি একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। হাসপাতালে বা থানায় তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি, সুতরাং সকলে ধরে নিয়েছিল—তিনি সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন। এগারো বছরে আর ফেরেননি, কেউ জানে না তিনি বেঁচে আছেন কিনা, কিন্তু সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি, আমরা যাকে কমলামাসি বলতুম, তিনি লালপাড়ের শাড়ি পরে নিজের বৈধব্য অস্বীকার করতেন।

কখনো হয়তো তীর্থ থেকে ফিরে এসে কেউ খবর দিতেন, কমলার স্বামী যতীনবাবুকে দেখলুম হরিদ্বারে। আমাকে অবশ্য চিনতে পারল না, কিন্তু অবিকল যতীনের চেহারা। একমুখ দাড়ি, মাথায় জটা—তবু আমার চিনতে ভুল হয়নি।

হয়তো তার পরের মাসেই আবার অন্য কেউ বললেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে একজন সাধু দেখলুম, হুবহু যতীন রায়ের মতন, আমাকে দেখেই চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল!

কে জানে সত্যি ওরা যতীন রায়কে দেখেছিল কিনা, কিন্তু জর্দা ছাড়া যিনি পান খেতে পারতেন না, রোজ সকালবেলা পোষা পাখিকে ছোলা খেতে না দিয়ে যিনি নিজে চা পর্যন্ত মুখে দিতেন না (এসব আমার শোনা কথা, কখনো যতীন রায়কে আমি চোখেই দেখিনি)—সেই সংসারী এবং আসক্ত যতীন রায় একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে কিসের ডাক শুনতে পেয়ে কোথায় চলে গেলেন কে জানে।

কিন্তু রহস্যপূজারী শৈশবে আমি মনে মনে যতীন রায়কে খুব শ্রদ্ধা করতুম। কল্পনা করতে ভালো লাগত, কোথায় কোন বিজন বনে কিংবা পাহাড় চূড়ায় উদাসীন মুখে যতীন রায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওসব জায়গায় আর জর্দা কোথায় পাবেন, তাই এগারো বছর তিনি আর পান খাননি, ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়। আর এই বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় মুক্ত পাখিরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে—হয়তো সেই দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন।

আজকাল এই রকম সাধু হয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশের খবর একেবারে কানে আসে না। তাহলে এখন সাধু হয় কারা? সাধুদের সংখ্যা অনেক কমে আসছে নিশ্চিত।

চোখ বুজলেই দেখতে পাই হিমালয়ের বহু গুহা এখন খালি পড়ে থাকছে। শহরে ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়াটে যত বাড়ছে, তত খালি হয়ে আসছে হিমালয়ের গুহা, ওসব জায়গায় হোটেল খোলা হবে হয়তো। রুদ্রাক্ষের মালা পরবার জন্য আর একটিও লোক থাকবে না। রুদ্রাক্ষের মালা তখন শুধু পরবে শৌখিন আমেরিকান মেয়েরা। গেরুয়া কাপড়ের একমাত্র দরকার হবে, যাত্রায় কিংবা ফিল্ম স্টুডিওতে।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, অথবা বন্ধুবান্ধবদের মুখে, কোথাও সন্ন্যাসী বা নিরুদ্দেশে যাবার বিন্দুমাত্র ইশারা নেই। সব জায়গাতেই লেখা, আরো দাও, আরো ভোগ করব, আমি চাই ব্যক্তিগত মালিকানা। রূপং দেহি, ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, আয়ুং দেহি।

অনেক তদ্বির করে যে বেলগাছিয়ায় ফ্ল্যাট পেয়েছে, সে এখন চায় জমিদারি। যে বড়ো চাকরি পেয়েছে, সে যায় অন্যের চাকরি হরণ করতে, যে সুখী সংসার পেয়েছে, সে চায় অন্যের সংসার জ্বালিয়ে দিতে। নাঃ, চেনাশুনোদের মধ্যে কারুর তো আর নিরুদ্দেশে যাবার সম্ভাবনা দেখি না—যদি না, কারুর নামে পুলিশের হুলিয়া বেরোয়।

আমি নিজেও তো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনো বৃষ্টিভেজা নির্জন সাদা বাড়ি দেখলে ভাবি, ঐ বাড়িব বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খেতে পারলে আমার জীবন সার্থক হতো। চৌরঙ্গির কোনো দোকানে শো-কেসে ঠাণ্ডা কাচে মুখ লাগিয়ে ভাবি অনেক সময়, ভিতরের ঐ রকম একটা সুন্দর জামা আমার কতকাল পরার সাধ ছিল! নীল রঙের কোনো মোটরগাড়ি দেখলেই আমার মনে হয়, ঐ রকম কোনো মোটরগাড়ি পেলে আমি একদিন সমুদ্রের পাড়ে যেতাম। আমারও নিরুদ্দেশে যাওয়া হবে না।

'বাবলু ফিরে এসো, মা শয্যাশায়ী কত টাকা লাগবে জানাও—' কাগজের এসব বিজ্ঞাপনও আজকাল অনেক কমে গেছে। আগে যেন মনে হয় প্রত্যেকদিন চোখে পড়ত। বাবলুরা আর আজকাল রাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় না, খোকন কিংবা মন্টুরাও আজকাল পরীক্ষায় ফেল করে নির্লজ্জের মতো বাড়িতে বসে থাকে। মঞ্জুলাদের বিয়ে করতে না পেরে রমেশরা আর এখন সাধু হয়ে যায় না, বরং মঞ্জুলাকে বিয়ে করে সংসারী হয়ে যায়।

সেই সব নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন পড়ে মনটা বড়ো উদাস হয়ে যেত। একসময় মনে হতো, যারা ঐ নিরুদ্দেশে চলে গেল তারা আর ফিরবে না কোনোদিন, ঐ সব বাবলু-মন্টু-তপনরা অভিমানী মুখ নিয়ে চিরকাল পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে।

আমি যখনই কোনো অপরিচিত জায়গায় কোনো অভিমানী বিষণ্ণ মুখ দেখেছি তখনই মনে হয়েছে—এও বোধ হয় সেই নিরুদ্দিষ্ট দলবলের একজন, যে তারা বাবাকে শয্যাশায়ী করে, মাকে কাঁদিয়ে অন্ধ করে, দাদাকে টাকা পাঠাবার জন্য ব্যাকুল অবস্থায় রেখে একদিন বাড়ি ছেড়েছিল, তারপর আর চক্ষুলজ্জায় কিংবা এক জীবনের অভিমানে ফিরতে পারেনি।

আমার ছেলে বাবলু অমুক তারিখে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তারপর সে এত তারিখে আবার সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে—এবং আমি শয্যাত্যাগ করেছি—

এ-রকম কোনো বিজ্ঞাপন কখনো কাগজে বেরোয় না। আমরা শুধু নিরুদ্দেশেরই খবর জানি। ফিরে আসার খবর জানি না।

কিন্তু একজন ফিরে-আসা মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি একজন বিল্ডিং কনট্রাক্টর, অর্থাৎ অন্য লোকের বাড়ি তৈরি করে দেন। মধ্যবয়সী, মাথাজোড়া বিপুল টাক, কোনো হাসির কথা শোনার পর তিন মিনিট ধরে হাসেন। এক বন্ধুর বিয়েতে বহরমপুর গিয়েছিলুম, ঐ ভদ্রলোকটিই সেই বাড়ির বড়ো জামাই, তাঁরই হাতে আমাদের আপ্যায়নের ভার।

বাইরের ঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, তিনি অর্থাৎ পরিতোষবাবু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চা-খাবার, অফুরন্ত সিগারেট দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখছিলেন। হুড়মুড় করে বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের গল্প শুরু হলো।

এক বন্ধু আমেরিকার গল্প শুরু করে দিল, সুযোগ পেলেই সে বিলেত-আমেরিকার গল্প ফেঁদে বসে, আমরা তাকে জোর করে চাপা দিয়ে কেদার-বদরী ভ্রমণের কথা শুরু করলুম। গত মার্চ মাসে আমরা তিনজনে সেখানে গিয়েছিলাম, সুতরাং বারোয়ারি উপন্যাসের মতন যখন আমরা তিনজন রোমহর্ষকভাবে এক-একটা অধ্যায় বর্ণনা করছি, তখন পরিতোষবাবু হঠাৎ বললেন, কালী কমলী ধর্মশালার কথা আপনাদের মনে আছে? সেই যে কালো কম্বল গায়ে এক সাধু যে সব ধর্মশালা—

আমরা তিনকণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ...আপনি গিয়েছিলেন নাকি?

পরিতোষবাবু লাজুকভাবে হেসে বললেন, সেই ছেলেবেলায় আঠারো-উনিশ বছর বয়েসে—যখন বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম, তখন আমি ওখানেই ছিলুম।

—ওখানে ছিলেন? কতদিন?

—টানা তিন বছর! শীতের সময় হরিদ্বারে নেমে আসতুম, বসন্তে আর গ্রীষ্মে উঠে যেতুম পাহাড়ে। আহা, ভালোই ছিলাম!

আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন?—আমাদের প্রশ্নের মধ্যে অভদ্র রকমের অবিশ্বাস। এই রকম একটা গোলাকার হাসিখুশি লোক বাড়ি থেকে পালাতে যাবে কি দুঃখে।

পরিতোষবাবু লাজুক হাসি হেসে বললেন, সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম একসময়। তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি—ফার্স্ট ইয়ার—হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা—

পরিতোষবাবুর গল্পের মধ্যে খুব একটা বিশেষত্ব নেই। ধনী পরিবারের ছেলে, পড়াশুনোয় ভালো, তখনো ব্যর্থ হবার মতো কোনো প্রেমে পড়েননি, কিন্তু বাড়িতে সৎ মা ছিল—কোনো বিশেষ অসুবিধে ছিল না যদিও, তবুও এক সন্ধেবেলা মন

খারাপ করে উনি বাড়ি থেকে চলে যান।

তারপর যথারীতি 'খোকা ফিরে, এসো' বিজ্ঞাপন বেরোয়, কিছু পুরস্কারের ঘোষণা হয়েছিল, পরিতোষবাবু নিজে হরিদ্বারে বসে সে কাগজ দেখেছেন, তবু ফিরতে ইচ্ছে হয়নি, 'বাড়ি নয়, ও তো ইঁটের পাঁজা'—এই ধরনের এক মনোভাব নিয়ে তিনি জীবনে আর কখনো বাড়ি ফিরবেন না বা সংসার করবেন না—ঠিক করে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। তারপর, মাথা মুড়িয়ে, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে পুরো সাধু।

কিন্তু পরিতোষবাবু তাঁর ফিরে আসার কারণটা পুরো ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। শুধু বললেন, ধর্মে কিংবা ভগবানে তো খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। নেহাৎ বাড়ি বা সংসার সম্পর্কে বীতস্পৃহা নিয়ে বেশিদিন পাহাড়ে থাকা যায় না, বুঝলেন: একটা বাঙালি তীর্থযাত্রী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো, কথায় কথায় ওরা আমার পরিচয় জানতে পারলেন, তারপর ওদের অনুরোধেই ফিরে এলাম।

একজন স্থানীয় যুবক সেখানে বসেছিল। সে সকৌতুকে বলল, আপনারা আপাতত সেই বাঙালি পরিবারেরই অতিথি। পরিতোষদা সেই পরিবারেরই বড়ো মেয়েকে বিয়ে করেছেন। লীলাদির সঙ্গে তো আপনার হিমালয়েই আলাপ, না পরিতোষদা?

নেমন্তন্ন খেতে বসে একজন স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলাকে দেখলুম, তিনিই পরিতোষবাবুর স্ত্রী। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না পরিতোষবাবুর এবং প্রেমে না পড়েই তিনি গৃহত্যাগী হয়েছিলেন—প্রেমে পড়ার পর সংসারী হয়েছে—এ পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু বাড়ি সম্বন্ধে বীতস্পৃহা নিয়ে যিনি সংসার ছেড়েছিলেন, ফিরে এসে তিনি বিল্ডিং কনট্রাক্টর হয়ে বহু লোকের বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছেন এখন—এই ব্যাপারটিতে কেমন যেন দমে গেলুম, কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল, পরিতোষবাবুর সঙ্গে আর তেমন হেসে কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। মানুষ এরকম বিচ্ছিরি ভাবেও বদলায়?

১৭

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেনস-এর মধ্যে আমি বিকেলবেলা একটা সাপ দেখতে পেলাম। সত্যি ঘটনা। তখন পড়ন্ত বিকেল, আবছা লাল রঙের ছায়া পড়েছে বাগান জুড়ে, সূর্য ডুবে গেলেও আকাশে লাল মেঘ, হয়তো ঝড় উঠবে। এই সময় প্রচুর নবীন নারী-পুরুষ বেড়াতে আসে এখানে, জলের পাশে বসে যুবক-

যুবতীরা নিজেদের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে।

শুনেছি, প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে সন্ধেবেলা এই স্মৃতি-উদ্যান বেশ উপযুক্ত, কারণ এখানে চোঙা-প্যান্ট পরা, সিটি-মারা, অনার্য-ভাষী ছোকরার দল ঘোরাফেরা করলেও তেমন উৎপাত করতে সাহস পায় না। ফলে, ফুলবাগানের পাশে প্রচুর তরুণ-তরুণী।

অবশ্য, ঐ বাগানে আমার নিজের যাবার কোনো কারণই নেই। আমি সৌভাগ্যহীন, একলা, আমার উপস্থিতি সেখানে অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক।

আসলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আমি একা হেঁটে ফিরছিলুম ধর্মতলায়, পথ সংক্ষেপ করার জন্য রেসকোর্সের পাশ দিয়ে বেঁকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনসের মধ্য দিয়ে শর্টকাটের চেষ্টা করছি। ঢুকে বেশ ভালো লাগছিল, কতদিন এসব জায়গায় আসিনি, এখানে গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শিরশির শব্দ হয়, মাঝে মাঝে তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে শোনা যায় ফিসফিসিয়ে অভিমান বা উল্লাসের সুর।

সন্ধেবেলা একা কোনো জিনিস ভালো লাগলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আমারও যথারীতি মন খারাপ হয়েছিল, সুতরাং আমি আস্তে আস্তে হাটছিলুম। এমন সময় চিৎকার শুনতে পেলুম, সাপ, সাপ!

আবার বলছি, সত্য ঘটনা। সাপ শুনেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, না গাছে উঠব। কয়েক কোটি বছর ধরেই আমি সাপকে বিষম ভয় ও ঘৃণা করি।

গোটাকয়েক ছেলে, এদের সঙ্গে কোনো নারী নেই, কিন্তু হাতে ট্রানজিস্টার আছে, ওরাই প্রথমে সাপটিকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ঘাসের মধ্যে নয়, ঘাস থেকে বেরিয়ে সুরকি-ঢালা রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিল সাপটা, এই সময় ছোকরাদের চেঁচামেচিতে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে ও মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকায়।

প্রায় হাত তিনেক লম্বা, ধূসর গায়ের রং, নিশ্চিত বিষাক্ত। কারণ, যে-সাপ সোজা ছুটে না পালিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় সে বিষাক্ত না হয়ে যায় না।

আমি তৎক্ষণে আমার জামার সব-কটা বোতাম খুলে ফেলেছি, মুহূর্তে জামা খুলে ফেলার জন্য তখন আমি তৈরি। কারণ, আমি শুনেছিলাম, সাপ দেখলে ছুটে পালানো যায় না, সাপ সামনাসামনি এসে পড়লে গায়ের জামা খুলে ওর ওপর ছুঁড়ে দেওয়াই নাকি বাঁচার একমাত্র উপায়।

ছেলেগুলো রৈ-রৈ করে উঠল, কেউ ছুটে পালাল না। আমি অবশ্য জানি ওরা প্রত্যেকেই আমারই মতন কাপুরুষ, কিন্তু দলবদ্ধ হলে কেউ কারুর কাপুরুষতা দেখাতে চায় না। ওরা তখন মার মার, লাঠি নিয়ে আয়, তুই ওদিকে দাঁড়া—এই সব চিৎকার শুরু করল।

কিন্তু কারুব কাছেই কোনো অস্ত্র নেই, লাঠি তো দূরে থাক, চেঁচামেচিই চলতে লাগল বেশ খানিকক্ষণ, এর মধ্যে একজন বুদ্ধি করে নিজের পায়ের ছুঁচলো জুতোর একপাটি ছুঁড়ে মারল। জুতোটা সাপটার গায়ে লাগল না, সামনে গিয়ে পড়তেই সাপটা থমকে দাঁড়িয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। চড়াৎ করে দু'বার বেরিয়ে এল চেরা জিভ, অল্প একটু ফণা মেলে ধরল, এ তো নিশ্চিত বিষাক্ত।

আমি তখন যদিও নিরাপদ দূরত্বে আছি, কিন্তু ভয়ে বুক হিম হয়ে এল।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, এখানে ওখানে ঘাসের ওপর বসে আছে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী, কিন্তু কারুব কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ভ্রাম্যমাণ যুগলেরাও কেউ কৌতূহলী হয়ে এখানে এল না, এদিকে তাকালই না, হয়তো ভেবেছিল এসব ইয়ার্কি। ছেলের দল সাপটাকে তাড়া করতে লাগল, সাপটা এবার একটু দ্রুতভাবে ছুটে মেয়েদের জন্য নতুন তৈরি-করা বাথরুমটার পাশে একগাদা জড়ো-করা বালিব বস্তার ফাঁকে ঢুকে পড়ল।

ছেলের দল কোথা থেকে কয়েকটা ইঁটপাটকেল যোগাড় করে এখন সেই দিকে ছুঁড়ছে। কিন্তু এখন কোনোই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। সাপটা নিশ্চিন্তে বালির বস্তার আড়ালে লুকিয়ে। লাঠি হাতে একজন উদ্যানরক্ষীকেও দেখা গেল কাছাকাছি, উত্তেজিতভাবে বোঝান হলো সাপটার অস্তিত্ব, সে ঠোঁট উল্টে বলল, না, সাপ নয়।

—নিজের চক্ষে দেখলুম, ই-যা বড়ো সাপ। সাপ নয় কি বলছ।

—কলকাতা শহরে আবার সাপ কোথায় ?

—দেখো না ঐ বালির বস্তাটার কাছে গিয়ে!

লোকটি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেল। লাঠি দিয়ে একটা খোচা মারল বালির বস্তার মধ্যে। বেশ দূর থেকেও আমি স্পষ্ট ফোঁস শব্দ শুনতে পেলা। লোকটির মুখে স্পষ্ট ভয়, তবু উদাসীন গলায় বলল, ঢোঁড়া, ঢোড়া, বিষ নেই ও কিছু নয়।

এরপরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল, কিন্তু দেখা গেল বালিব বস্তা সরিয়ে সাপটিকে খোজার সাহস কারুরই নেই। একটু বাদে জটলা ভেঙে গেল। আমি তখনো দাড়িয়েছিলাম, এখন মুস্কিল হলো এই যে, আমাকে যেতে হলে এখন ঐ বালির বস্তাগুলোর পাশ দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু সে কথা ভাবতেই আমার বুক গুরগুর করতে লাগল।

অবশ্য, ভিড় ভেঙে যাওয়ায় ইতিমধ্যে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। অনেকে ঐ বালির বস্তাগুলোর পাশ দিয়েই নিরুদ্বেগে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা তো জানে না, আমি যে সাপটার অস্তিত্ব জানি! আমি ওপাশ দিয়ে যেতে পারব

না। ইচ্ছে হলে, আমি অবশ্য উল্টেদিকে ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে এমন কাপুরুষতা আছে যে আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

নিজের কোনো ব্যবহারে যখন নিজেরই লজ্জা হয়, তখন মনে হয় যেন আশেপাশের সব লোক আমার সেই বোকামি দেখে ফেলছে। আমার মনে হলো, আমি উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলে আশেপাশের সব লোক যেন হেসে উঠে বলবে, ইস, ভীতু কাঁহাকা। কিন্তু যাই হোক, স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে আমি সাপের পাশ দিয়ে কিছুতেই হাঁটব না।

সুতরাং আমি পাশের রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। যেন আমি এখানে চা খেতেই এসেছিলাম। আবার উল্টোদিকে ফিরে যাব।

তখনো চা খাওয়া শেষ হয়নি, ভয়ার্ত, মেয়েলী গলায় রিনরিনি স্বর শুনতে পেলাম, ওমা, এ কি—সাপ! সাপ!

আমি রেস্টুরেন্টে বসে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—দুটি ছেলে-মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাসের ওপর বসে আছে, খুবই তরুণ বয়স, এখনো কলেজের গন্ধ লেগে আছে গায়। তরুণীটি স্প্রিংয়ের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে উঠল, যুবকটিও উঠে দাঁড়াতেই তরুণী তার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, ঐ দ্যাখো, কত বড়ো সাপ।

আগেকার ছেলেগুলোর চিৎকারে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি, এবার একটি মেয়ের চিৎকারেই যথেষ্ট কাজ হলো। বহু কৌতূহলী লোক সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, অনেকে এগিয়েও গেল। একজন আবার চেঁচিয়ে উঠল, পুলিশ পুলিশ। পুলিশ কোথায়!

দেখা গেল, যুবকটি বেশ সাহসী—অথবা, প্রেমিকার সামনে কে না সাহসী হয়! সে বেশ দৃঢ়স্বরে বললে, দেখতে পেয়েছি, দাড়াও, নড়ো না, ভয় নেই।

সাপটা ওদের থেকে পাঁচ-ছ গজ দূরে, যুবকটির হাতে দুখানা মোটা বই ছিল, সে একটা বই ছুঁড়ে মারল সাপটার দিকে। বইটা সাপটার গায়ে গিয়ে লাগতেই সে ফণা তুলে বইটার ওপর ছোবল মারল। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বইটা ছুড়ে মারল। সাপটা আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট আহত হয়নি, এবার বেশ ভয় পেয়ে সরসর করে ছুটে পালাল।

এরপর অবশ্য বহু খোঁজাখুঁজি করেও আর সাপটাকে পাওয়া গেল না। নীরক্ত, বিবর্ণ মেয়েটিকে আলিঙ্গনে রেখে যুবকটি বেরিয়ে এল সুরকির রাস্তায়। মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলল, উঃ, আমার কত কাছে এসে পড়েছিল। যদি না দেখতে পেতুম—

আমি ভাবলুম, সাপটা মেয়েটার কাছে গিয়েছিল কেন? সাপটা কি আসলে ছদ্মবেশী শয়তান? ভিক্টোরিয়ার বাগানে না হয়ে ব্যাপারটা যদি ইডেন গার্ডেনে

হতো, তা হলে তো বর্ণনা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

এসব বাগানের মালিক কে? যদি ভগবান হয়, তবে আমার বলতে ইচ্ছে হলো, প্রভু, আর কেন ছলনা করছ? ঐ নিষ্পাপ সুকুমার যুবক-যুবতীর পিছনে আবার কেন শয়তানকে লেলিয়ে দিচ্ছ? একবার তো স্বর্গ থেকে পতন হয়ে গেছে, আবার তুমি ওদের কোথায় ঠেলে ফেলে দিতে চাও?

তখন দৈববাণী শ্রবণের মতো অনুভব হলো আমার, একবার যখন ওরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছে, তখন শয়তান আর কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষতি করতে পারবে না। দেখলি না, ছেলেটি কি রকম অবলীলাক্রমে সাপটার দিকে বই ছুঁড়ে মারল।

১৮

মেয়েদের ভালোবাসতে শেখার পরই আমি কুকুরকে ভালোবাসতে শিখি। হ্যাঁ, ভালোবাসা শেখারও তো নির্দিষ্ট স্তর আছে। এখন যে-কোনো যুবতী সুন্দরীকে দেখলে কিংবা তার সঙ্গে কথা বললে—এমনকি দূর থেকে গলার আওয়াজ শুনলেই বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, মনে হয়, এ জীবনটা মধুময়। কিন্তু বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় মেয়েদের একদম দেখতে পারতুম না।

প্রথম ইস্কুল জীবনে, সমবয়েসী মেয়েরা যখন গায়ে পড়ে মিশতে আসত, আমরা মোটেই তাদের পছন্দ করতুম না, বলতুম, তোমরা মেয়েরা আলাদা থাকো না গিয়ে। সেই যখন মেয়েরা গায়ে পড়ে মিশতে আসত— তখন তাদের গ্রাহ্যই করিনি—পরে, এখন বড়ো হয়ে ওঠার পর, মেয়েরাই আর আমাকে গ্রাহ্য করে না। কত আত্মাভিমানিনী, তেজি, উদাসীনা, মরীচিকার মতন মেয়েদের দিকে আমাদেরই গায়ে পড়ে ছুটোছুটি করতে হয়।

ছেলেবেলায় বন্ধুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলতে যেতুম, কোনো বন্ধুর বোন যদি সঙ্গে খেলার জন্য বায়নাক্কা করত—তখন মাথায় গাঁট্টা মেরে ভাগিয়েছি, অথচ, পরবর্তী কালে, হায়, কত বন্ধুর বোনের জন্য যে কত বুক খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে।

মেয়েদের না, কুকুরের কথা বলছি এখন। ছেলেবেলায় আমি কুকুর একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আমার ছোটকাকার একটা বিশ্রী, জঘন্য কুকুর ছিল, সেটা ন্যাকার মতন সবসময় পায় লুটোপুটি করত, আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না তাকে। ছোটকাকার কাছে কোনোদিন আমি পয়সা চেয়ে পাইনি, অথচ কুকুরের

জন্য—সাবান, ডগ বিস্কুট, (আমি নিজেই সে বিস্কুট দু'-একখানা লুকিয়ে খেয়ে দেখেছি, খুব খারাপ খেতে নয়), রবারের বল, রঙিন বগলস কিনে দিতে তিনি উদারহস্ত।

এটাই কুকুরটার প্রতি আমার শত্রুতার ছিল প্রধান কারণ। কুকুরটাও আমার দিকে এমন চোখ মিটমিট করে তাকাত—যার মধ্যে আমি স্পষ্ট একটা আদুরে হিংসুকপনা দেখতে পেতুম। আবার লাল্লি, লুল্লু, লালটুসোনা এইরকম কত ন্যাকা নাম ছিল তার। কুকুরটা ছিল ছোট্টখাট্ট, সুযোগ পেলেই আমি সেটাকে আড়ালে লাথি কষাতুম।

আমার দাদার এক বন্ধুর বাড়িতেও আমি যেতে পারতুম না কুকুরের ভয়ে। অবনীদা আমাকে দেখলেই বলতেন, হেমেন রায়ের যখের ধন পড়েছিস? শিবরামের মন্টুর মাস্টার পড়েছিস? আমাদের বাড়িতে আসিস, অনেক বই আছে, নিয়ে যাস! অবনীদাদের বাড়ির দরজায় একটা সিংহের মতো আকৃতির কুকুর বাঁধা থাকত, মানুষ দেখলেই সেটা মেঘ-গর্জনের মতো গম্ভীর গলার ঘাউ ঘাউ করে ডাকত। সেই ডাক শুনে সে বাড়ির ধারে-কাছে যাবারও সাহস ছিল না আমার।

কুকুরের মতন অমন একটা ভয়ঙ্কর জিনিসকে কেন মানুষ বাড়িতে খাতির করে রাখে আমি বুঝতেই পারিনি। একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, একটা নেড়িকুত্তা আমার পায়ে এসে খাক করে কামড়ে দিল। খুব বেশি লাগেনি বটে, কিন্তু বাড়িতে এসে সে কথা বলতেই সবাই আঁৎকে উঠে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কী রকম কুকুর ছিল? ল্যাজ গোটানো কান ঝোলা? জিভ দিয়ে লালা পড়ছিল?

ওসব কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি, সবাই বলল, আমার নাকি জলাতঙ্ক হতে পারে। ইনজেকশন দেওয়া হলো, তবু আমার জলাতঙ্কের আতঙ্ক কাটে না। তারপর প্রায় এক বছর গ্লাস, চৌবাচ্চা, নদী—যেখানেই জল দেখেছি আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি, ভেবেছি, জল দেখে কি আমার আতঙ্ক হচ্ছে? বুঝতে পারিনি, অনেকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই চোখে জল এসে গেছে।

তারপর তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, আমাদের পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এল। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক, ওরা বর্মা-ফেরৎ বাঙালি। ও বাড়ির লোকেরা হলুদ-সবুজ-রঙা সিল্কের লুঙ্গি পরে। ও বাড়ির ছেলেরা বাবাকে বলে ড্যাডি। ও বাড়িতে প্রায় সব সময় গ্রামাফোনে বিলিতি বাজনা বাজে। ওরা দোলের দিনও রঙ খেলে না, ছাদে নেট খাটিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে।

একদিন, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ওপর থেকে ব্যাডমিন্টনের কর্ক ঠক করে এসে আমার মাথায় পড়ল। তিনতলার ছাদের কার্নিস থেকে উঁকি মেরে একটি চতুর্দশী বালিকা সুরেলা গলায় আমার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, বলটা একটু ওপরে পৌঁছে দেবেন, প্লীজ—।

সেই থেকে আরম্ভ। তখন নাক ও ঠোঁটের মাঝখানে একটা কালো রেখা দেখা দেওয়ায় নিজেকে ছেলের বদলে পুরুষ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছি। ট্রামে বাসে কেউ 'তুমি' বললে চটে যাই। চেনাশুনো মেয়েদের দেখলে ভুরু তুলে গম্ভীর হয়ে থাকি, মনে মনে তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব। মনে হয়, আহা বেচারারা শুধু ছেলেবেলা নিয়েই মেতে থাকে। কোনো মেয়ে তখন আমাকে কিছু অনুরোধ করার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

সেই সময়, তিনতলার ছাদ থেকে একটা চোদ্দ বছরের মেয়ের সরাসরি হুকুম, বলটা ওপরে পৌঁছে দিন! কিন্তু তা শুনেই আমার মনে হলো, স্বর্গ থেকে কোনো দেবী আমাকে ডাকছেন। আমি কর্কটা হাতে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম। কী যেন ছিল মেয়েটির নাম, শোভনা কিংবা সুশোভনা, ঝকঝকে ফর্সা রং, ঘাগরার মতন কুচি দেয়া লাল টুকটুকে স্কার্ট পরা, গড়গড় করে ইংরাজিতে কথা বলছে, কর্কটা নেবার সময় আমার হাতে মেয়েটির ছোঁয়া লাগল, ঝনঝন করে উঠল আমার সারা শরীর। সেই দিন থেকেই আমার মেয়েদের প্রেমে পতন এবং মূর্ছার আরম্ভ।

আমরা ইস্কুলের তিনজন বন্ধু—প্রত্যেক দিন বিকেলে শোভনাদের বাড়িতে যেতাম। শোভনা আমাদেরই সমবয়েসী, অনায়াস স্বচ্ছন্দ ওর ব্যবহার। আমাদের রেকর্ড শোনাত, আমাদের সঙ্গে ওয়ার্ড-মেকিং খেলত, আমরা মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখতুম। আমরা তিনজনেই ওর প্রেমে পড়ে গেলুম। শোভনার মা আমাদের নানারকম খাবার খাওয়াতেন, সেইসঙ্গে রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা জল। তার আগে আমি কখনো অত ঠাণ্ডা জল খাইনি। একদিন তিনি নানারকম পায়েস আর পিঠে খাওয়ালেন, বললেন, তোমাদের বাড়িতে এসব হয়নি ? আজ যে নবান্ন!—আমরা কলকাতায় থেকেই নবান্নের কথা ভুলে গিয়েছিলুম, ওঁরা বার্মায় থেকেও তা ভোলেননি।

শোভনার মা শুধু রাগ করতেন আমাদের ক্যারাম খেলা দেখলে। বলতেন, ওসব বসে বসে কুড়েমির খেলা কেন, ছুটোছুটি করো না।—আমরা তখন সারা বাড়ি জুড়ে লুকোচুরি খেলতাম, শোভনা বলত, যে আমায় প্রথম খুঁজে বার করতে পারবে, তাকে আমি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেব!—এই কথা বলে শোভনা রহস্যময়ভাবে হাসত, আমি ভাবতাম, আমিই যদি ওকে প্রথমে খুঁজে না পাই

—তবে আমার সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েদের কথা লেখার জন্য এ লেখাটা শুরু করিনি। কুকুরের কথা —কুকুরও না, কাকের কথা।

যাই হোক, শোভনাকে দেখে মুগ্ধ হবার পর আমি কুকুরকেও ভালোবাসতে শুরু করি। শোভনাদের বাড়িতে একটা মাঝারি সাইজের কুকুর ছিল, আমি প্রথম সেটাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম। কিন্তু সেটা জাতে কুকুর হলেও স্বভাবে ছিল বিড়াল—এমন বাধ্য। শোভনা হুকুম করত, স্ট্যাণ্ড আপ, টেডি। অমনি সোজা হয়ে দাঁড়াত। শোভনা বলত, শেক হ্যাণ্ডস, টেডি! কুকুরটা অমনি একটা হাত বাড়িয়ে দিত।

বস্তুত, শোভনার যে-কোনো হুকুম পালন করার জন্য আমি কুকুরটার চেয়েও বেশি বাধ্য ছিলুম তখন। কিন্তু শোভনাকে খুশি করার জন্যই, আমি কুকুরটার সঙ্গে ঝগড়া করিনি। কুকুরটার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে যায়। আমার জীবনে সেই প্রথম কুকুর বন্ধু।

এখন শোভনা কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু কুকুর জাতটার প্রতি আমার বন্ধুত্ব রয়েই গেছে। কোথাও কোনো বাড়িতে গিয়ে কুকুর দেখলে একটু আদর করতেই ইচ্ছে হয় এখন। মাথায় চাপড় মারি না বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে চুঃ চুঃ শব্দ করি। এবং সব বাড়িতে গিয়েই গৃহস্বামিনীকে খুশি করার জন্য বলি, আমি অনেক কুকুর দেখেছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য ভালো কুকুর কোথাও দেখিনি। কী সুন্দর চোখ দুটো, একেবারে মানুষের মতন।

আমাদের বাড়িতে কোনো কুকুর নেই, কিন্তু আজ সকালবেলা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচে একটা ছোট্ট কুকুর দেখতে পেলাম। একটা খয়েরি রঙের নেড়ি কুত্তার বাচ্চা নিচের রকে বসে কিউ কিউ করে ডাকছে।

পাশের বস্তির দু'তিনটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেটাকে খোঁচাখুঁচি করছে, একজন আবার ওটার ল্যাজে দড়ি বেঁধে টানছে। এসব কুকুরের বাচ্চারা যে কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার যায়—কেউ জানে না!

সকালবেলার সব মানুষেরই মন একটু উদার থাকে। সুতরাং কুকুরের বাচ্চাটার প্রতি আমার বেশ খানিকটা দয়া হলো। ভাবলুম, বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ধমকে দিই। কিন্তু তখনই ওদের প্রতিও দয়া হলো। মনে হলো, আহা ওদেরও তো একটু খেলাধুলোর জিনিস পাওয়া দরকার। ওরা কুকুরটাকে নিয়ে খেলছে, খেলুক না। কুকুরটার যদি বাঁচার হয়, এমনিতেই বাঁচবে, কিংবা কপালে মৃত্যু থাকলে মরবেই।

পরক্ষণেই মনে হলো, এটা বেশি দয়ার বাড়াবাড়ি। অতএব বাচ্চাগুলোকে

বারণ করাই ঠিক করে, ওপর থেকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালাম। বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়ল, শুধু মনে মনে দয়া যথেষ্ট নয়। কুকুরটাকে কিছু খাওয়ানোও উচিত। কিন্তু সকালবেলা কুকুরের খাবার কোথায় পাব? ও আছে তো! পর পর পাঁচ দিন রুটি খেয়ে আমার মুখ পচে গেছে, কাল রাত্রে আর খেতে পারিনি। কাল রাত্রের রুটিগুলো এখনো টেবিলে পড়ে আছে। সেই কয়েকখানা রুটি নিয়ে এলাম।

অতটুকু বাচ্চা কি রুটি খেতে পারবে? এক টুকরো ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ওর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিলাম। বাচ্চাটা এসে রুটিটা কপাৎ করে গিলে, লোভীর মতন ওপরে তাকাল। আমি আর একটা টুকরো ছুঁড়ে দিলাম। আর, তখুনি একটা মজার ব্যাপাব হলো।

একটা কাক কোথা থেকে টুক কবে দ্বিতীয় রুটির টুকরোটা তুলে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এল আরো পাঁচটা কাক। পরের রুটির টুকরোও কাকের মুখে গেল। এর পর আরো কাকা এল, প্রায় পনেরো যোলোটা কাক। এত কাকও যে কোথায় ছিল কে জানে। শুরু হলো ছিনিমিনি খেলা। আমি রুটির টুকরো গুলি পাকিয়ে ছুড়ে দিচ্ছি, কাকের দল মাঝপথে হাওয়া থেকেই সেটা মুখে লুফে নিচ্ছে। দু'একটা টুকরো দৈবাৎ পড়ছে কুকুরটার সামনে, সে সেটা খেয়ে নিয়ে কাকেদের দিকে তাড়া করে যাচ্ছে।

ব্যাপারটার মধ্যে একটা মজার খেলা পেয়ে আমার বেশ ভালো লাগল। আমি অনবরত রুটি ছুঁড়ে দিতে লাগলুম।

মাথাব মধ্যে একটা ঝিনঝিনে শব্দ হতে লাগল, এই ব্যাপাবটা থেকে কি যেন আমার মনে পড়ার কথা। কি যেন মনে পড়ার কথা, কি যেন, অমনি মনে পড়ল, হঠাৎ শোভনাব কিশোরী মুখ। শোভনাদের বাড়ি, ওর মা, সেই লুকোচুরি খেলা। কিন্তু কাকদের ওড়াউড়ির সঙ্গে শোভনাদের বাড়িব কথা মনে পড়ার কি সম্পর্ক? কিছু একটা আছে, মনে করতে পারছি না, কিছু একটা।

যেই সেটা মনে পড়ল, অমনি আমি একা-একা হেসে উঠলুম। সত্যি যোগাযোগটা মজার। শোভনার মা একদিন নানারকম পায়েস আর পিঠে খাইয়ে বলেছিলেন, আজ নবান্ন, তোমাদের বাড়িতে এসব হয় না? নবান্নর দিন নতুন পায়েস খেতে হয় সবাইকে। শুধু নিজেরা নয়, পশুপাখিকেও খাওয়াতে হয়। খুব ছেলেবেলায় ঢাকায়, আমাদের দেশের বাড়িতে, আমরা নবান্নর দিন আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকদের ডাকতাম! এখন কলকাতায় কবে নবান্ন, তা টেরই পাওয়া যায় না! তোমরা যাও, ছাদে গিয়ে কাকদের খাইয়ে এসো আগে, শোভনা, যা ওদের

ছাদে নিয়ে যা।

কী আনন্দ লেগেছিল ছাদে সেদিন ছোটাছুটি করতে। নতুন চালের মিষ্টি গন্ধ আর শোভনার হাসির শব্দ একসঙ্গে মিলেমিশে আমার কৈশোরের সে দিনটাকে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। নিচে নেমে আসার পর সবাই লাইন করে বসেছিলাম, শোভনার মা আমাদের পরিবেশন করেছিলেন। কি মিষ্টি ছিল তাঁর হাতের রান্না।

মজার কথা এই, আজও সেই নবান্নের দিন। সকালের খবরের কাগজেই সে কথা পড়েছি, আমাদের বাড়ির কারুর সে কথা মনেই নেই। নবান্নের দিন কাকদের নতুন চালের ভাত খাওয়ানো নিয়ম, না? কাকেরা বোধহয় সেই প্রতীক্ষাতেই ছিল। আমি না জেনেই তাদের বাসি রুটি খাওয়াচ্ছি।

১৯

এখনো মাঝে মাঝে আমি মশা মারতে গিয়ে নিজের গালে থাপ্পড় মেরে বসি। পেল্লায় সেই থাপ্পড়ের চোটে নিজেব গালটা যখন জ্বলতে থাকে, তখন নিজের ওপর না মশার ওপব, কার ওপর, যে বেশি রাগ হয়, বুঝতে পারি না।

অনেক কিছুই এখনো বুঝতে পারি না। আমার দাদার ছোট ছেলে বিল্টু একটা ফড়িংয়ের ডানা ছিড়ে ফেলেছে নিষ্ঠুরভাবে, দেখে আমার এমন অসম্ভব শরীর শিউরে উঠল যে, আমি ঠাস করে ছেলেটির গালে এক চড় কষালুম। আমার চাষাড়ে হাত, ছেলেটার কচি মুখমণ্ডল মুহূর্তে রক্তিম হয়ে উঠল। টলটলে জলভরা দু'চোখে যত রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, কাকা, তুমি আমায় মারলে কেন?

কেন? মুখ ঝামটা দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ল, সত্যিই তো, ঠিক, কেন মারলুম? ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকরা যখন গিনিপিগ খুন করে, তখন গিয়ে থাপ্পড় মারি? আমি নিজেই তো আই. এস-সি. পড়ার সময় কত ব্যাঙ কেটেছি। কেউ আমায় সেজন্য শাস্তি দিয়েছে? বরং, ব্যাঙ না কেটে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল করলেই বহু শাস্তি পাবার সম্ভাবনা ছিল। বিল্টুর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে ওর কি পদ্ধতি কে জানে? আজ ফড়িংয়ের ডানা ছিঁড়ছে, ভবিষ্যতে ও যে আর-একজন ডারুইন হবে না—তা কে বলতে পারে? সুতরাং আমি বললুম, আচ্ছা যা, বিকেলে তোকে চকলেট কিনে দেব 'খন!

আমার বন্ধু প্রদীপ মোটরগাড়ি কিনেছে, পথের মোড়ে দেখা হওয়ায় বলল, চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই। বৃষ্টির পর সারা রাস্তা ভিজে ছপছপে, তবু পুজোর বাজারে অধার্মিক ক্রেতা-বিক্রেতার প্রবল ভিড়। রাস্তা গিসগিস করছে, গাড়ি চালানো সত্যিই মুস্কিল। এক ভদ্রমহিলা দুটি বাচ্চা নিয়ে একেবারে গাড়ির সামনে পড়েছিলেন, বিকট আওয়াজে ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে একটুর জন্য দুর্ঘটনা হলো না। প্রদীপ রুক্ষ মুখে বলল, দেখলি কাণ্ডটা। যদি এক সেকেণ্ড দেরি হতো, পাবলিকের হাতে আমায় মার খেয়ে মরতে হতো! লোকে রাস্তা চলতে জানে না, যত দোষ ড্রাইভারের—

আমি বললুম, যা বলেছিস।! অধিকাংশ লোকই শহরে থাকার যোগ্য নয়। বিহারী মজুরগুলোকে দ্যাখ না-- সব সময়েই যেন চান করতে যাচ্ছে, কাঁধে একটা গামছা। রাস্তায় হাঁটার সময় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে ঢুকবে! বাঙালগুলোও এতদিন কলকাতা শহরে আছে—অথচ রাস্তায় হাঁটার সময় যাবে একদিকে, তাকাবে আর একদিকে। সব কটা এণ্ডি-গেণ্ডি বাচ্চাকে নিয়ে পথে বেরুনো চাই—

প্রদীপ বলল, শুধু বাঙালদের দোষ দিস না, আমিও বাঙাল। কিন্তু ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অভ্যেস কারুরই নেই। পুলিশের উচিত জেব্রা-ক্রসিং দিয়ে সবাইকে রাস্তা পার হতে বাধ্য করা। এত গাড়িঘোড়া কলকাতা শহরে—

আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই! কতকগুলো সাধারণ ট্রাফিকের নিয়ম না জানলে কারুকে কলকাতা শহরে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়। হা-হা করে মাঝ রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে যাবে—হঠাৎ এপার থেকে ওপারে ছুটে যাবে, এদের ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া উচিত।

অথচ, নিজে যখন আমি পায়ে হেটে যাই, তখন মোটরগাড়ির উৎপাতে আমার গা জ্বলে যায়। ফর্সা জামাকাপড় পরে পথের ধার ঘেঁসেই যাচ্ছি, কোথা থেকে একটা মোটরগাড়ি হুস করে কাদা ছিটিয়ে জামাকাপড়ে বাটিকের কাজ তুলে দিয়ে গেল! নিষ্ফল আক্রোশে আমি মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তাকিয়ে থাকি সেই অপসৃয়মাণ গাড়িটার দিকে। তখন আমার মনে হয়, পথ তো পথচারীদের জন্যই। কলকাতা শহরে আর গাড়ি আছে কটা লোকের? পদযাত্রীরাই তো পথের মালিক। গাড়িওলাদেরই উচিত পথের লোকদের বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালানো। যদি না পার, গাড়ি না চালালেই হয়!

তবে, আমি প্রদীপকে ও-কথা বললুম কেন? শুধু কি ওকে খুশি করার জন্যই! কোনো তো দরকার ছিল না, ওকে খুশি না করলেও ও তো আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত ঠিকই। কিংবা, প্রদীপের বিপরীত কথা বললেই যে ও চটে

যেত, তারই বা মানে কি আছে? তাহলে ও-কথা বললুম কেন?

অনেক কেন'রই উত্তর জানি না। বারান্দা দিয়ে দেখলুম, একটা চড়ুই পাখি গুটি গুটি হাঁটছে। কাছে গেলেও উড়ল না। উড়তে শেখেনি। তা হলে তো বেড়ালের পেটে এক্ষুনি প্রাণ যাবে! তাড়াতাড়ি আমি চড়ুইয়ের বাচ্চাটাকে ঠাকুরঘরে এনে রাখলুম, জানলা বন্ধ করে। ওর খাবার জন্য চালের খুদ ছড়িয়ে দিলাম সামনে।

সে-সময় আমাদের কুচু নামে একটা পোষা বেড়াল ছিল খুব গুণ্ডা ধরনের। বেড়ালটা এমন ভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত যেন সব কথাই বুঝতে পারে। আমি তাকে কান ধরে শাসিয়ে দিলুম। আমি তাকে বললুম, দ্যাখ, এখন ক'দিন আমি তোকে না চিবিয়েই মাছের কাঁটা দেব, মাংসের হাড় একেবারে সাদা করব না, কিন্তু তুই খবরদার ঐ পাখিটাকে ধরতে যাবি না, বুঝলি।

কিন্তু বেড়ালের জাত তো। বিকেলের দিকে কোন ফাঁকে ঠিক ঢুকে পড়েছে, পাখিটার ওপর ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে আমি উপস্থিত! নিমকহারাম বেড়ালটার ওপর এমন রাগ হলো যে দরজার খিল দিয়ে আমি ওকে মেরে পা খোঁড়া করে দিলুম। বেড়ালটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে একেবারে বাড়ি ছেড়েই পালাল। মনে হলো, চড়ুইয়ের বাচ্চাটা আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পরদিন সকালবেলাই দেখা গেল, পাখিটা মরে কাঠ হয়ে আছে। বেড়াল ওকে ছোঁয়ওনি। তবু মরল কেন? খাবারও তো দিয়েছিলুম, বেশ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। তবে?

একটু ভাবতেই বুঝতে পারলুম, সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি পাখিটাকে খাবার দিয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু জল দিইনি। পুরো দেড়দিন জল না খেয়ে মানুষই বাঁচতে পারে কিনা সন্দেহ, এ তো একটা পাখি। বেড়ালটা খাদ্য হিসেবে পাখিটাকে মারতে গিয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে, আর আমি অমনোযোগের সঙ্গে দয়া দেখাতে গিয়ে অকারণে পাখিটাকে মারলুম।

মরার পর পাখিটার চোখ সাদা হয়ে গেছে। কালকের বেড়ালমারা ভাঙা খিলটা দেওয়ালের এক পাশে দাঁড় করানো! বাড়ির কেউ যাতে আমাকে না দেখে ফেলে, আমার পাপের কথা যাতে পৃথিবী জানতে না পারে, তাই আমি চুপি চুপি পাখিটার পা ধরে তুলে নিয়ে ছাদের কোণে ফেলে আসতে যাচ্ছিলুম। একগাদা চড়ুই আমার পর ওড়াউড়ি করে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। ছাদের পাঁচিলের ওপর বেড়ালটা বসে আছে, অলস চোখ তুলে আমাকে দেখে বেশ দীর্ঘ মীড় খেলানো গলায় বলল, মিঁ—আ—ও—ও!

তৎক্ষণাৎ পশুপক্ষীর ভাষা আমার শেখা হয়ে গেল। আমি বেড়ালটার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। চোখের মণিটা বিন্দুর মতন ছোট করে, অদৃশ্য ভুরু কুঁচকে বেড়ালটা আমাকে বলছে, খুব তো নকল দয়া দেখাতে যাওয়া হচ্ছিল, এখন! শুধু শুধু আমাকে মারলে কেন ? আবার, কেন ? আর পারি না। আশেপাশে কোনো মশা নেই, তবু আমি নিজের গালে কষে এক থাপ্পড় বসালুম। আর কোনো যুক্তিটুক্তির মধ্যে যাচ্ছি না আমি। পৃথিবীতে যা চলছে তাই চলুক। এসব 'কেন'র উত্তর খুঁজতে মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়!

২০

ল্যান্সডাউন রোডে একটা বড়ো গাড়ি-বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটের মাথায় এবং দেয়ালে মাধবীলতার ঝোপ। গেটের ওপাশে একটি নারী। সেই নারী দু'হাতে লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি —একটু ভারি স্বাস্থ্য, মাথায় ঘন থোকা-থোকা চুল, খুব ফর্সা রং, রাত্রি ন'টার অন্ধকারে তাঁর মুখখানি যেন গন্ধরাজ ফুলের মতন ফুটে আছে। এ সবই আমার এক পলকে দেখা।

গেটের বাইরে, রাস্তার উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে! যুবকটিও ভারী রূপবান, দৃঢ় স্বাস্থ্য, দীর্ঘ দেহ। প্যান্ট ও শার্ট-পরা, কিন্তু দেখলে মনে হয়, কিছু আগে গলায় টাই বাঁধা ছিল। কি করে একথা মনে হয়, তা আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমার নিশ্চিত মনে হলো বিকেল পর্যন্ত যুবকটি টাই বাঁধা অবস্থায় সুসজ্জিত ছিল, একটু আগে খুলে রেখেছে। যুবকটির দাঁড়ানোর ভঙ্গি একটু অদ্ভুত। সে গেটের ওপাশের মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে পাশ ফিরে, যদিও তার একটি হাত গেটের লোহার শিক ধরা।

তবে ওই দুজনের দাঁড়ানো বেশ ঘনিষ্ঠ ছবির মতন, মহিলা তাঁর মুখ চেপে ধরছেন গেটের ওপর, তাঁর মুখের খুব কাছেই যুবকটির হাত। এই দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি মিষ্টি দুঃসাহস আছে, রাত্রি ন'টায় অসংখ্য পথচারীর দৃষ্টিকে গ্রাহ্য নেই। সেই বাড়ির লোকেরও কারুর কোনো আপত্তি থাকলে ওরা তুচ্ছ মনে করেছে।

এ সবই আমার এক পলকের দেখা। আমি ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে হেঁটে আসছিলুম, হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়ল! এ রকম দৃশ্য ফিল্মে খুব দেখা যায়, কিন্তু রাত ন'টায় কলকাতায় দেখতে পেয়ে ভারী ভালো লাগল! কিন্তু যখন আমার

চোখে পড়েছে, তখন আমি ওদের খুবই কাছাকাছি, একটু বেশিক্ষণ ধরে দেখার জন্য গতি শ্লথ করতে পারি না, তা ছাড়া সেই মহিলার মুখের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রতাসম্মত নয়।

সুতরাং আমি ঘাড় নিচু করে খুবই নাগরিক ভঙ্গিতে, যেন আমি ওদের দেখতেই পাইনি এইভাবে—ওই জায়গাটুকু পেরিয়ে এলুম। কিন্তু আমার শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল ধনুকের ছিলার মতন টানটান, ইঁদুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম ঐটুকু সময়। আমি দুটি আশ্চর্য কথা শুনতে পেলুম। মহিলাটির গলা কান্নাবিজড়িত, মনে হয় তিনি অনেক দিন ধরে কাঁদছেন, মহিলাটি কান্নায় ভাঙা গলায় বললেন, সত্যিই তুমি পারো না?

ছেলেটি স্পষ্ট অথচ চাপা গলায় বলল, না, আমি যে বিদেশী!

তারপর আমি একা হাঁটতে হাঁটতে বহু দূর চলে গেলাম। একবারও পিছন ফিরে তাকাইনি। হয়তো, আর ইহজীবনে ঐ দুজনকে দেখব না। দেখলেও চিনতে পারব না—ওরা যদি মোটরগাড়ি চেপে হুস্ করে চলে যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে, কিংবা দেখা হয় রেলের কামরায়, কিংবা বোটানিকাল গার্ডেনের পিকনিকে দেখি ওদের হুড়োহুড়ি করতে, আমি চিনতে পারব না। কারণ, আমার চোখে ভেসে আছে ঐ অদ্ভুত দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, মহিলাটি গেটে মুখ চেপে, যুবকটি পাশ ফিরে—এবং দুটি বাক্য, সত্যিই তুমি পার না?—না, আমি যে বিদেশী!

পৃথিবীর কঠিনতম ধাঁধার মতো ঐ দুটো কথা। কী ওর মানে? দুজনেই কথা বলছিলেন বাংলায়। উচ্চারণে সামান্যতম জড়তা ছিল না, ওদেব বাঙালি না-হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তবু ছেলেটি কেন বলল, না, আমি যে বিদেশী! মহিলাটি কেঁদে কেঁদে যুবকটির কাছে কী প্রার্থনা করছিলেন? উদ্ধার? কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই বাড়ির গেট একপাল্লা খোলা ছিল, মহিলাটি অনায়াসে বাইরে আসতে পারতেন, যুবকটি যেতে পারত ভিতরে, তবু ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সমকোণে, লোকচক্ষু বা বাড়ির শাসন অবহেলা করে। মহিলাটির চোখে জল। এবং নিশ্চিত বাঙালি হয়েও ছেলেটি উদাস গলায় বলল, না, আমি যে বিদেশী!

সেই দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি ও দুটি মাত্র সংলাপে কি যেন এক গভীর দুঃখের সুর ছিল। দুঃখ মানুষকে বড়ো কাছে টানে। আমি তো আনন্দের দৃশ্যও কম দেখিনি। গিয়েছি কার্নিভালে, মেলায়, সমুদ্রতীরে। দেখেছি উচ্ছল, সুখী, মানুষ-মানুষীর মুখ। দেখেছি পার্টিতে দৃপ্ত যুবা-যুবতীর নাচ, এরোপ্লেনের সীটে দেখেছি কলহাস্যময় নবীন দম্পতি, সমুদ্রপারে খুশি-চঞ্চলা পুরুষের বাহুলগ্না নারীর এমন খলখল হাস্য শুনেছি—যার কাছে সমুদ্রের গর্জনও ম্লান হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের অধিকাংশ মুখ মনে পড়ে না। কিন্তু চকিতে শোনা দু-একটা দীর্ঘশ্বাস বা চাপা কান্না—সেই সব মুখ বা ভঙ্গি কিছুতে ভুলতে পারি না। খুব জানতে ইচ্ছে করে, তাদের গল্পটা কী। দুঃখের মধ্যে যেন একটা অফুরন্ত গল্প সব সময়েই রহস্যময় বহু বিচিত্র, আদি অন্তহীন।

আর একটা দৃশ্য মনে পড়ে। এক সময় আমার খুব মাথা ধরতো সন্ধের দিকে। ভেবেছিলাম, এবার বুঝি চশমা নিতে হবে। কিন্তু তখনো আমার দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, মাথা ধরা অবস্থাতেও এক মাইল দূরে কোনো শাড়ির আভাস দেখতে পেলে বলে দিতে পারতুম, মেয়েটির বয়েস কত। সুতরাং অনেকে বললে, চোখের অসুখ ছাড়াও অন্য কারণে মাথা ধরতে পারে, ডাক্তার দেখাও।

ডাক্তার জাতিকে আমি সাধারণত এড়িয়ে চলি। কারণ সাধারণভাবে আমার ধারণা ছিল, ডাক্তারদের হৃদয় নেই।

যাই হোক, ডাক্তারদের কাছে যেতে হলে খুব বড়ো ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ভালো—এই ভেবে, কলকাতার একটি বড়ো হাসপাতালের একজন বিখ্যাত ডাক্তার সপ্তাহে একদিন আউটডোরে বসেন খোঁজ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তখন প্রায় দুপুর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তারের ঘরে আমার ডাক পড়ল।

ঘরে ঢুকেই আমি বুঝতে পারলুম, এখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। কি যেন একটা নাটক এখানে অনুষ্ঠিত হবে এখুনি। ডাক্তারটি প্রায়-প্রৌঢ়, কিন্তু সুকুমার মুখ, টেবিলে বসে কী যেন লিখছেন। আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে, সেও ডাক্তার, কেননা বুকে স্টেথস্কোপ ঝোলানো, এক পাশে দাঁড়িয়ে।

এই দৃশ্যের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই, কিন্তু সেই দুজন নারী-পুরুষের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এখানে একটা গভীর নাটক আছে। মেয়ে-ডাক্তারটি অত্যন্ত সুন্দরী, তেজী চেহারা, কিন্তু কী অস্বাভাবিক বিষণ্ণ মুখ! ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, দু' চোখে যেন পাতলা জলের পর্দা, এমন দীর্ণ কাতর মুখ আমি বোধহয় কখনো দেখিনি। আমার বুকের মধ্যে নীরব তীক্ষ্ণ আর্তনাদ জেগে উঠল, ইচ্ছে হলো আমি মেয়েটিকে বলি, কী তোমার দুঃখ? এমন কঠিন দুঃখও মানুষ পায়?

ডাক্তারের মুখ রেখাহীন, গম্ভীর। টেবিল থেকে চোখ তুলে আমাকে বললেন, বলুন?

আমি একটিমাত্র বাক্যে আমার রোগের কথা জানালুম। কিন্তু, তখন আর আমার কোনো কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, ইচ্ছে ছিল না চিকিৎসার। বরং ইচ্ছে করছিল, তখুনি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি যেন একজন দর্শক, হঠাৎ

ভুল করে নাটকের মাঝখানে মঞ্চের ওপর উঠে পড়েছি, আমার উপস্থিতি যেন আমারই লজ্জা।

ডাক্তার কড়িকাঠকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ব্লাড পেসারটা দেখা দরকার।

মেয়ে ডাক্তারটি আমাকে একটি অয়েল ক্লথ মোড়া বিছানা দেখিয়ে খুব আস্তে বললেন, শুয়ে পড়ুন। আমি নির্দেশ মান্য করলুম, মেয়েটি আমার বাহুতে কাপড়ের পাট জড়াতে লাগলেন। আমি শুধু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কি ক্লান্ত, অলসভাবে তিনি আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়াচ্ছেন, যেন, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর হাত থেকে যন্ত্রটা মাটিতে পড়ে যেতে পারে, যে-কোনো মুহূর্তে দু'হাতে মুখ চেপে তিনি কেঁদে উঠতে পারেন। তাই তাঁর করা উচিত।

আমি মনে মনে বললুম, কী দরকাব তোমার আমাকে দেখার, তুমি যাও, কোনো নির্জন প্রান্তরে গিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে মন হালকা করে এসো।

এক সময় পুরুষ প্রৌঢ় ডাক্তারটি হঠাৎ বললেন, বেবা, যদি তোমার শরীর খারাপ লাগে, তা হলে আমিই ব্লাড পেসারটা দেখে নিচ্ছি।

মেয়েটি মুখ না ফিরিয়েই স্পষ্ট গলায় বললেন, না, আমার শরীর খুব ভালো আছে।

ওরা ডাক্তার, ওরা হৃদয়হীন, ওরা শরীর ছাড়া অন্য কথা জানে না। ওরা মন খারাপের কথা জিজ্ঞেস করে না, জানতেও চায় না, ওরা শুধু জানে শরীর ভালো আছে, না খারাপ আছে। শবীব, শরীর, হাসপাতালে শুধু শরীরেব গন্ধ।

কোনো ওষুধ না খেয়েই তিন দিন বাদে আমার মাথাধবা সম্পূর্ণ সেরে যায়। কারণ, আমি খবরের কাগজে পড়লুম সেই মেয়ে ডাক্তারটি আত্মহত্যা করেছে। কারুকে দায়ী করেনি, সে নিজে একা-একা চুপ করে মবে গেছে। কিন্তু, তাকে আমি কেন যে দেখেছিলাম! মেয়েটি মরে গেল, কিন্তু তার সেই বিষণ্ণ মুখখানা চিরকালের জন্য ঢুকিয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে!

২১

এক-একটা দিন আসে একেবারে অন্যরকম। সেদিন সমস্ত নিয়মকানুন উল্টে-পাল্টে যায়। সেই সব হঠাৎ-আসা দিনগুলোর জন্যই মানুষের প্রতি বিশ্বাস, আশা, সমবেদনা এইসব ভালো ভালো জিনিসগুলো টিমটিম করে টিকে আছে।

দিন চারেকের জন্য একটা মফস্বল শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আজকাল বিশেষ কিছু আশা করি না বলে তেমনভাবে বঞ্চিতও হই না। সুতরাং বেড়াতে

গিয়ে যেটুকু ভালো লাগা উচিত, সেটুকু ঠিকই ছিল।

ফেরার ট্রেন রাত সাড়ে দশটায়, সেটা মিস করলুম, সেই প্রথম দুর্ঘটনা। অথচ পরদিন কলকাতায় ফিরতেই হবে।

পরের ট্রেন ভোর পাঁচটায়, সেটা ধরতেই হবে। অ্যালার্ম ঘড়ি এবং মাত্র একদিনের আলাপ হওয়া ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে রাত চারটেয় উঠে আবার স্টেশনে এলুম। এবার আমার দেরি হয়নি, ট্রেনের দেরি হচ্ছে। এই সব ব্যাপারে বেশ রাগ হয়—গত রাত্রে সাড়ে দশটার ট্রেন, আমি মাত্র দেড় মিনিট আসতে দেরি করেছিলুম বলে আমায় ফেলে রেখে চলে গেল, এমনই তার ব্যস্ততা। অথচ আজ যে ট্রেন নিজেই আসতে দেরি করছে—তবু আমি তাকে ফেলে চলে যেতে পারব না, আমাকে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতেই হবে!

তার ওপর অসম্ভব শীত—কোট, কম্ফর্টার ভেদ করে ঢুকছে শীতের সূচ, একটা কথা বলতে গেলেই সোরি মিঞার টপ্পার মতন গলা কাঁপছে।

খুবই ছোট্ট স্টেশন, কোনো আরামপ্রদ ঘেরা বিশ্রামঘর নেই, দু-পাশ খোলা একটা জায়গার নাম ওয়েটিং রুম, বারোয়ারি রাস্তার মতন সেখান দিয়ে অবিরাম বাতাসের যাতায়াত চলছে। বিশেষ কোনো লোক নেই, কিছু আদিবাসী ঐ শীতের মধ্যেও মেঝেতে ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। একটা কুকুর একজনের কম্বল ফাঁক করে সেখানে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি ছাড়া আর একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি—কাউন্টারের রেলবাবুটি। যেন সমস্ত দোষটাই তার—এইভাবে তার দিকে রাগের চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলুম। গরম ঘরের মধ্যে আরামে বসে লোকটি আমার শীতকাতর অবস্থাটা দেখে মজা পাচ্ছে!

হঠাৎ লোকটি জানলা থেকে সরে গেল, একটু বাদে দেখলুম বাইরে। আমার কাছাকাছি এসে লোকটি বলল, ওরেঃ বাপ, কী ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে আজ। যাবার আগে শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ট্রেন আর কত লেট করবে?

—কী জানি, বলতে পারছি না। আগের স্টেশনেই তো এখনো রীচ করেনি। লোকটা উদাসীনভাবে হাত-ঘড়ি দেখে আবার বলল, উঃ, কী শীত, কী শীত। এক কাজ করুন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাবেন? আসুন, অফিস-ঘরে এসে বসুন!

এবার আমার অবাক হবার পালা। রেলের যে-সব কর্মচারী রাত্রিবেলা জেগে থেকে কর্মপরায়ণতা দেখায়, তাদের অনেকেই যে আসলে ঘুষখোর হয়—এ সম্পর্কে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। ঐ লোকটিকেও আমি সেই চোখেই দেখছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ঘরে বসতে বলার নিমন্ত্রণ? তাছাড়া আমার ফার্স্ট

ক্লাসের টিকিটও নয়, থার্ড ক্লাস, সুতরাং অতিরিক্ত খাতির দেখাবার কোনোই কারণ নেই। মাটিতে শোওয়া লোকগুলিকে দেখে লোকটি বলল, মাটির মধ্যে কি করে এরা শুয়ে আছে, ভগবানই জানে! এই ঠাণ্ডায় মানুষ বাঁচে? এজন্যই তো এদের প্রায় সবকটা প্লুরিসিতে ভোগে।

লোকটি নিচু হয়ে হাত দিয়ে কম্বল মোড়া এক-একটি মূর্তিকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে বলল, এই, ওঠ, চল, অফিস-ঘরে চল!

সবাই মিলে ঘরে বসলুম, দরজা-জানলা বন্ধ করার ফলে বেশ আরাম লাগতে লাগল। ঘরের মধ্যে চা তৈরি করার বন্দোবস্ত ছিল। লোকটি নিজের হাতে চা তৈরি করে সকলকে খাওয়ালেন, সাঁওতাল কুলিগুলো সমেত। কৃতজ্ঞতায় আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। লোকটির ব্যবহার এমনি যেন এ-সবগুলো খুবই স্বাভাবিক—এর জন্য তার কোনো ধন্যবাদ প্রাপ্য নেই। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটি যেন রেল কোম্পানির প্রহ্লাদ। পরে আমার আবার মনে হলো—হয়তো এরকম ভদ্রলোক আরো অনেক আছেন, কিন্তু সময়মতো আমাদের চোখে পড়ে না—শুধু খাবাপ, ঘুষখোর লোকগুলির সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হতে হয়।

দিনটা শুরু হলো এইভাবে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সেদিন আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ট্রেন এল পয়তাল্লিশ মিনিট লেট করে এবং বিষম ভিড়। কিন্তু ওঠা মাত্র জায়গা পেয়ে গেলুম। কারুর সঙ্গে ঝগড়া কিংবা ঠেলাঠেলি করতে হলো না, দু-তিন জন যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিন, আপনারা বসুন, আমরা সারারাত আরামে বসে এসেছি।

আমিই তখন অপ্রস্তুতভাবে বললুম, না না, আপনারা জায়গা ছাড়বেন, মানে, দাঁড়িয়ে যাবেন কেন? বসুন না, এরই মধ্যে...

যুবকেরা বলল, না, না, আমরা এমনিই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য-ওঠা দেখব।

হঠাৎ কি রাতারাতি সব কিছু বদলে গেল? কোথায় আছি? ভারতবর্ষে না স্বর্গে? বসে বসে এই সব ভাবছিলুম, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের স্পীড কমে এল এবং অবিলম্বে থামল মাঠের মধ্যে। কোথাও স্টেশনের চিহ্ন নেই, তবু ট্রেন থামল কেন?

দরজার কাছে যুবকরা চেচিয়ে উঠল, এই বিমল তুই ঐ গেটে যা, কেউ চেন টানছে, দ্যাখ, কোন কামরা দিয়ে নামে—আজ ধরব শালাদের—

আমি নিশ্চিত হলুম। এই তো ভারতবর্ষে আছি, স্মাগলাররা ঘন ঘন চেন টেনে গাড়ি থামাবে, তাদের কেউ থামাতে পারবে না—

—ঐ যে একজন নামছে, ঐ যে, ধর শালাকে—

যুবকেরা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে নেমে গেল। আমিও উঁকি মারলুম। একজন খাকি পোশাক-পরা লোক একটা বড়ো বস্তা ঘাড়ে করে রেল লাইন পার হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। যুবকেরা গিয়ে তাকে চেপে ধরেছে, চেঁচিয়ে বলছে, গার্ড সাহেবকে ডাক, কোথায় গার্ড সাহেব—আজ এ ব্যাটার পঞ্চাশ টাকা ফাইন করতে হবে।

দেখা গেল পলাতক আসামীটি স্মাগলার মোটেই না, বরং তার উল্টো। রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্সের লোক, ডিউটির শেষে বাড়ির কাছে নামবার জন্য চেন টেনেছে। ততক্ষণে সেখানে বিরাট ভিড়, বিরক্ত যাত্রীরা মন্তব্য করছে, রেল তোমার বাবার সম্পত্তি? চলো আজ তোমার নামে রিপোর্ট হবে—যেখানে সেখানে চেন টানা? আর. পি. এফ. হয়ে মাথা কিনেছ? গার্ড সাহেব একপাশে দাঁড়িয়ে, তিনিও চান লোকটি ফাইন দিক অথবা পুলিসের হাতে ধরা পড়ুক। লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে দোষ স্বীকার করে বলল, তার কাছে ফাইন দেবার টাকা নেই এবং পুলিসে ধরালে তার চাকরি যাবে।

এরপর যে-ঘটনাটা ঘটল তাকে সত্যিকারের গণতন্ত্রের একটি সার্থক উদাহরণ বলা যায়। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী কামরার দরজার জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, অনেকে নেমে এসেছে নিচে—তাদের সমক্ষে লোকটির বিচার হলো। লোকটি দোষ করেছে ঠিকই—কিন্তু সেই দোষে ওর চাকরি যাক—তা কেউ চায় না। কিন্তু ওকে বেকসুর খালাস দেওয়াও চলে না। সুতরাং ঠিক হলো, লোকটি কান ধরে পঞ্চাশবার ওঠ-বোস করবে সবার সামনে, যাতে আর কখনো যেন বিনা কারণে চেন টানবার সাহস কারুর না হয়। পঞ্চাশ টাকা জরিমানার বদলে পঞ্চাশ বার কান ধরে ওঠ-বোস। হাজার হাজার যাত্রী উল্লাসে সমর্থন জানিয়ে লোকটির প্রতিবারের ওঠা-বসা গুণতে লাগল—ছয়, সাত...তেইশ, চব্বিশ...

মনটা আমার শান্তিতে ভরে গেল। এইভাবে যদি ভারতবর্ষের সব সমস্যার সমাধান করা যেত। পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া আছে।

কিন্তু আমার জন্য আরো চমক অপেক্ষা করছিল। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ট্রেন বদল করার জন্য আমি প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিলুম। এই সময় একটা ছোট ভিড় চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলুম।

একটি হিন্দুস্থানী যুবতী হাপুস নয়নে কাঁদছে। বছর তিরিশেক বয়েস, লাল ফুল-ছাপা শাড়িপরা শক্ত চেহারার নারী, পায়ে রুপোর মল, কিন্তু কাঁদছে একেবারে দীনহীন অবলার মতন। তাকে ঘিরে কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ—দ্বিতীয় দেয়ালটি কৌতূহলী জনতার।

এখানেও আর. পি. এফ.! এরাই যত গণ্ডগোলের মূল দেখছি! ব্যাপারটা

জানা গেল, ঐ নারীটি দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে দুর্গাপুরে আসছিল কাজ খুঁজতে, কিন্তু যে পুটুলীর মধ্যে তার যথাসর্বস্ব ছিল—সেটা ট্রেন থেকে চুরি হয়ে গেছে। তার যথাসর্বস্ব মানে দু'খানা শাড়ি, তেরটা টাকা, একটা কম্বল আর একটি ঘটি। আর. পি. এফ.-এর লোকরা চোরাই চাল খুঁজতে ওকে ধরতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছে। মেয়েটির কান্না কিছুতেই থামে না।

রেলের একজন টিকিট চে''রও ভিড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, ও কি আর পাওয়া যাবে? যত চোরের রাজত্ব এ লাইনে। এই, এই নে—আজকের দিনটা চালা--! চেকারবাবু নিজের পকেটে যা খুচরো পয়সা ছিল দিয়ে দিল মেয়েটিকে। দেখাদেখি আরেকজন। আমি স্তম্ভিত। হঠাৎ কি কাল শেষ রাত্রে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ শুরু হলো? টিকিট চেকাররা চিরকাল হাত বাড়িয়ে ঘুষের টাকা নিতেই অভ্যস্ত। তারাও যে কখনো নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে বিনা কারণে অন্যকে দেয়—এ রকম কখনো দেখিনি, শুনিও নি! আমারও কিছু একটা করা উচিত বলে আমি পকেটে হাত দিলুম।

জনতার অনেকেই মেয়েটিকে চাদা দিতে লাগল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। মেয়েটা নাচ দেখাচ্ছে না, ভেলকি দেখাচ্ছে না, শুধু কাঁদছে—তার জন্যই সাহায্য!

এই সময় আর একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার প্রৌঢ়া মহিলা—দুর্গা প্রতিমার মতন আয়ত প্রশান্ত তাঁর মুখ—তিনি এসে বললেন, আহা, মেয়েটি কাঁদছে কেন? সব চুরি হয়ে গেছে? দুর্গাপুরে এসেছে কেন?—কাজ খুঁজতে?—ঠিক আছে, এই, তুই চল আমার বাড়িতে থাকবি। খাবি, কাজ করবি। যদি পছন্দ না হয় অন্য জায়গায় পরে কাজ খুঁজে নিস—যে কদিন না পাস আমার বাড়িতে...আয় কাঁদিস না, আয়—

একটু আগে আমি একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। সেটা না পড়েই ট্রেন লাইনে ফেলে দিলাম। আজ সকালে এ পর্যন্ত কোথাও কোনো অশান্তি নেই, অবিচার নেই, মানুষে মানুষে হিংসা নেই—বড়ো প্রীতিময় আজকের এই সকালবেলা। একমাত্র খবরের কাগজেই দেখতে পাব যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঈর্ষা-কোন্দল, লোভ আর জোচ্চুরির কাহিনী। যাক, আজ আর কাগজ পড়ব না—মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস ফিরে আসুক।

একটা বিখ্যাত কবিতার কয়েক লাইন বার বার মনে পড়তে লাগল: পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু/দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু, পরিজন পড়ে আছে/পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

২২

আমাদের বাড়ির সামনে খানিকটা গাছপালায় ভরা জমি পড়ে আছে। জমিই বললুম, গাছপালা সত্ত্বেও তাকে বাগান বলা যায় না। কয়েকটি এলোমেলো বড়ো বড়ো রকমারি গাছ, বাকি জায়গাটা জুড়ে কচু-ঘেঁচু-এরণ্ড'র আগাছা।

ফ্ল্যাট বাড়ি তো, তাই কেউই আগাছা পরিষ্কার করে বাগান করেনি। চারপাশের দেয়াল ভাঙা বলে কিচেন গার্ডেনিং করার চেষ্টাও হয়নি।

জানলা দিয়ে তাকালে এখন চোখে পড়ে, আগাছাগুলো ক্রমশ শুকিয়ে দড়ির মতন হয়ে আছে। অন্যান্য আসল গাছের চেয়েও আগাছার রং বেশি গাঢ় দগদগে সবুজ থাকে, এখন সেগুলো বিবর্ণ চকলেট রঙের, কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বেশিদিন বৃষ্টি না পড়লেই ওরা মরে যায়। বুঝতে পারলুম, শীত আসার দেরি নেই।

আঃ, শীত আসছে, ভাবলেই এত ভালো লাগে। এই কলকাতা শহরে শীতকালই তো একমাত্র সুখের সময়। শীতকালে ট্রাফিক জাম হয় না, শীতকালে আন্দোলনও খুব কম হয়, শীতকালে রাগ কম হয়, অনেক বিচ্ছিন্ন প্রেমের পুনর্মিলন হয়ে যায়।

আঃ, শীতকাল আসছে ভাবলেই এত ভালো লাগে! শীতকাল হচ্ছে ফুলকপির সময়, টাটকা মাছের সময়, ছেলেবেলায় খেজুর রস খাবার স্মৃতি অনুভবের সময় (বড়ো বয়সে খেজুর রস খেয়ে দেখেছি, যাচ্ছেতাই লাগে। কিন্তু ছেলেবেলায় খেজুর রস খেয়ে যে কি খুশি হতুম সেই কথা মনে পড়লে আনন্দে মনটা ভরে ওঠে) শীতকালে কোথাও পচা বা নোংরা জিনিস থাকে না, ধুলো থাকে না, শীতকালে শুধু আগাছা মরে যায়—আর সব কিছু সজীব হয়ে ওঠে।

সত্যি, আমাদের বাড়ির মাঠে যে-কটা বড়ো বড়ো গাছ সেগুলো সবই চিরহরিৎ, পাতা খসে না। আম-পাম-জাম, বেল-নারকোল-কুল-নিম, এদের কারুর পাতা ঝরে না। শুধু আগাছাগুলো মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ভালোই।

শীতকাল কে বলেছে বিবর্ণ? শীতকালই তো রঙের সময়! আমরা বাঙালিরা পোশাকে সাধারণত বেশি রং পছন্দ করি না, তাই সারা বছর সাদা বা সাদার কাছাকাছি হাল্কা রং। কিন্তু শীতকালের গরম জামায় রঙের খেলা, শীতকালে লাল সোয়েটার, কালো শার্ট বা নীল আলোয়ানকে কেউ বলবে না ক্যাটকেঁটে। গরম জামাকাপড়গুলো এবার আস্তে আস্তে নামাতে হবে। কোটটা কাচানো আছে তো? লন্ড্রি থেকে গতবছর কাচতে দেওয়া শালটা আনা হয়েছে কি?

দুপুরের দিকে এক-একদিন লোভী ইচ্ছে হয়, আজ স্নান না করলে হয় না? বুঝতে পারি শীত এসে গেল। নাঃ, এর মধ্যেই স্নান বাদ দিলে লোকে যা-তা

কুঁড়ে বলবে, আর কয়েক সপ্তাহ্ যাক, তারপরেই মাঝে মাঝে স্নান বাদ দিয়ে মৌজ করতে হবে। ছেলেবেলায় পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, কিছুতেই স্নান করতে ইচ্ছে করত না, তখন জলের মধ্যে গামছাটা ছুঁড়ে দিতুম, আস্তে আস্তে ডুবত, যখন দেখতুম আর উপায় নেই, তখন ঝাঁপিয়ে পড়তেই হতো। এখন সে-সব ঝঞ্ঝাট নেই, বাথরুমে ঢুকে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে এলেই হলো!

আসন্ন শীতের আমেজটা ক'দিন ধরেই উপভোগ করছিলুম। শীত আসছে, শুধু এই জেনেই মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠছে। শীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কি কি গান আছে মনে করার চেষ্টা করে গুনগুন করে সুর ভাজছি। 'শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে...শিউলি ফোটা আ, আ, ফুরোলো রে ফুরোলো'...রবীন্দ্রনাথের শীতকালের গানগুলোয় যেন একটু দুঃখ-দুঃখ। খালি বসন্তের জয়। কিন্তু শীতকালে দুঃখের কি আছে? শীতকালই তো আনন্দের সময়—ভালো খাওয়া, ভালো ঘুম, ভালো পোশাক, ভালো প্রেম। বসন্তে কি আছে কলকাতায়? কিচ্ছু নেই, শুধু চিড়বিড়ে রোদ্দুর।

একটু বেশি রাত্রে বাসে আসতে আসতে ঠাণ্ডা হাওয়া ভোগ করছিলুম। একে তো বসার জায়গা পেয়েছি, তা ছাড়া ঠাণ্ডা হাওয়া—এমন সৌভাগ্য এক বছর হয়নি। পাশে বন্ধু ছিল, সে হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা, ওরা শীতকালে কোথায় যায় বলত?

আমি অন্যমনস্কভাবে বললুম, কারা?

—ঐ যে দ্যাখ না, ঐ যারা শুয়ে থাকে?

আমি জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলুম। রাস্তার ওপর যে-কটা বাড়ির গাড়িবারান্দা আছে (গাড়িবারান্দা বলে কেন? ফুটপাতের ওপর বারান্দা, তার তলায় কি গাড়ি থাকে?) সবগুলো বারান্দার নীচে মানুষ শুয়ে আছে। যেন কখনো দেখিনি, এই ভঙ্গিতে আমি উদগ্রীবভাবে লক্ষ করে দেখে বললুম, কোথায় আর যাবে? কাছেই থাকবে!

বন্ধু বলল, ভ্যাট! শীতকালে কাউকে রাস্তায় শুতে দেখেছিস?

—রাস্তায় শোবে না তো যাবে কোথায়?

—যা যাঃ! আমরা ঘরে একটা জানলা খুলে পর্যন্ত শুতে পারি না শীতকালে, আর ওরা রাস্তায় শোবে, চালাকি পেয়েছিস?

—ঘরের মধ্যে বেশি শীত, রাস্তায় অতটা শীত করে না, সারাদিন রোদ্দুরে তেতে থাকে তো!

বন্ধু বেশ রেগে উঠে বলল, বাজে বকবক করিস নি! এমন ভাবে বলছিস,

যেন তুই নিজে কত রাস্তায় শুয়েছিস! রাস্তাটা না হয় তেতে থাকে, আর যে কনকনে উত্তুরে হাওয়া দেয়—

—কে জানে, তখন ওরা কোথায় থাকে!

—তুই মনে করে দ্যাখ, গত শীতকালে কাউকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেছিস?

আমি মনে করার চেষ্টা করলুম। ঠিক মনে পড়ল না। তবে মনে হচ্ছে যেন শীতকালের রাত্রে ফাঁকাই থাকে, ফুটপাথে কোনো বাধা থাকে না। যাক, ওকথা ভাবতে ভালো লাগছে না এখন।

বন্ধুটি তবু চিড়বিড় করতে লাগল, এ তো বেশ একটা ধাঁধা দেখছি। শুনেছি, কলকাতা শহরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোকের কোনো ঘর-বাড়ি নেই, তারা স্রেফ রাস্তায় শোয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে শীতকালে কোথায় ঘর-বাড়ি পায়! শীতকালে কোথায় উপে যায়? এ তো একটা বিরাট ধাঁধা দেখছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এর মধ্যে ধাঁধার কি আছে? এরা গরমকালে রাস্তায় শোয়, আবার পরের গরমে রাস্তায় শোবে, মাঝখানের শীতকালটা শুধু অদৃশ্য হয়ে থাকে। আমাদের বাড়ির মাঠের আগাছাগুলো শীতকালে সব মরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আবার পরের বর্ষায় দেখি মাঠভর্তি আগাছা! আগাছার তো আর কেউ চাষ করে না। আসলে আগের বছরের আগাছাগুলোই পরের বছর আবার ফিরে আসে। মাঝখানের সময়টা অদৃশ্য থাকে।

বন্ধুটি একটু গোঁড়া ধরনের—হাসি ঠাট্টা বিশেষ পছন্দ করে না, সে বলল, গাছগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় না, ওদের বীজ লুকোনো থাকে মাটিতে, পরের বছর আবার তাই থেকে গাছ হয়।

আমি তখনো হাসি বজায় রেখে বললুম, তা হলে এ লোকগুলোও রাস্তায় বীজ রেখে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে।

—তুই যে কতদূর নির্বোধ, তুই যখন বেশি কথা বলিস তখনই বেশি করে বোঝা যায়।

—এ কথাটা তোর পছন্দ হলো না? আচ্ছা, তা হলে যাযাবর পাখির মতন ওরা কোনো গরম গনগনে দেশে চলে যায়, এই সময়।

—কোথায়?

—আমি কি জানি! তাহলে তুই-ই বল, ওরা কোথায় যায়?

—আমি জানি না বলেই তোকে জিজ্ঞেস করছিলুম।

—তাহলে যে-জিনিসটা আমিও জানি না, তুইও জানিস না, তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার কি? একেই বলে কাকদন্ত গবেষণা। কে কোথায় শোয়

তা নিয়ে ভেবে আমাদের সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

শীতকাল হচ্ছে আনন্দের সময়, এই শীতে আমরা আনন্দ করব। চল, এই শীতে পুরী বেড়াতে যাবি?

২৩

বেচু রক্ষিত নামে একজন লোক কেষ্টনগর থেকে কলকাতায় আসছিলেন তাঁর ভগ্নীপতির বাড়িতে। ট্রেনে ওঠবার আগে চার টাকার সরপুরিয়া-সরভাজা কিনে নিয়েছেন। দিদি জামাইবাবুর জন্য কলকাতায় তখন দুধ-ক্ষীরের জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, তাই কেষ্টনগরের নামকরা মিষ্টি নিয়ে চলেছেন ওদের খুশি করতে।

ব্যাপারটার শুরু এইখান থেকে। বেচু রক্ষিত মিষ্টির হাঁড়িটা বাঙ্কের ওপর সুটকেশ-বিছানার পাশে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছেন। এক ঘুমে কলকাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ির। না, কেউ চুরি করেনি, কেউ খোলেও নি! কিন্তু হাঁড়িটার ওপর দুটো নীল রঙের ডুমো-ডুমো মাছি বসে আছে। ওরা সেই কেষ্টনগর থেকেই হাঁড়ির মধ্যে রসের খোঁজ পেয়ে হাঁড়ির গায়ে লেগে আছে। বিরক্ত হয়ে বেচু রক্ষিত হাতের ঝাপটায় মাছি দুটোকে তাড়িয়ে বললেন, যাঃ যাঃ। মাছি দুটো একটু ভন ভন করে উড়ল আশপাশে, তার পর হাতের ঝাপটার ভয়ে দূরে দূরে রইল।

গাড়ি থেকে নেমে, কাঁধালে সতরঞ্চি মোড়া বেডিং, বা-হাতে টিনের সুটকেশ ও ডানহাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বেচু রক্ষিত শেয়ালদা স্টেশন থেকে এবং আমাদের এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টনগরের সেই নীল ডুমো মাছি দুটো ভনভন করে ওড়াউড়ি শুরু করে পরস্পরকে বলল, এ আবার কোথায় এলুম রে? চল, ভালো করে আগে জায়গাটা দেখে নেওয়া যাক। এই বলে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। মাছি দুটি যুবক-যুবতী। যুবক মাছিটি একটু চালিয়াৎ গোছের, সে বলল, বুঝেছি, এ জায়গাটার নাম নবদ্বীপ। যুবতী মাছিনী বলল, কি করে বুঝলে?

—একবার নবদ্বীপের এক মাছিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল, ওঃ, নবদ্বীপে একেবারে...

—বুঝেছি, সেই যে মাছিনীটাকে পেয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কয়েকদিন...

—আর তুমি বুঝি তখন...

—থাক, আর ভ্যানভ্যান করতে হবে না।

যাই হোক, ওরা দুজনে উঁচু থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেলল, ওরা কলকাতা শহরে এসেছে। কেষ্টনগরের আসল দুধ-ক্ষীর খাওয়া মাছি তো, বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কলকাতা শহরকে চিনতে পেরে ওরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মাছি মাছিনীকে বলল, আর ঝগড়া করিসনি। আজ জীবনটা সার্থক হলো। কলকাতা শহরের কত নাম শুনেছি, কোনোদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলুম। এখানে আসতে পারব? কেষ্টনগরের মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে, এখানে ওসব মিষ্টি-ফিষ্টির পাট নেই, এখানে খুব ভালো ভালো নোংরা, আস্তাকুঁড় আর জঞ্জাল আছে।

মাছিনী বলল, দ্যাখো না নীচে, কত মাছি গিসগিস করছে। কত দেশ থেকে মাছি আসে এখানে—দ্যাখো, রাস্তাঘাট একেবারে ভরা।

কিন্তু নীচে নেমে এসে দেখল, একটাও মাছি নেই, সব মানুষ। মাছি দুটো খুব মুস্কিলে পড়ল, সারা শহরে আর একটাও মাছি নেই, এমনকি মশা কিংবা পিঁপড়ে—এই সব ছোট জাতের প্রাণীও নেই। সব মানুষ। কলকাতার আকাশে মাত্র এই দুটো মাছি, অনেক লোক ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটা বাচ্চা ছেলে বলল, বাবা ও দুটো কি চড়ুই পাখির বাচ্চা?

বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, না, ওদের বলে মাছি। মফঃস্বল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে বোধহয়। এই নিয়ে কাগজে একটা চিঠি লিখতে হবে তো।

সব কটা রাস্তা ধপধপে ঝকঝকে, কোথাও একছিটে ময়লা নেই, কোথাও জঞ্জাল জমে নেই, মাছি দুটো পড়ল মহা মুস্কিলে। ঝাড়ুদারেরা অনবরত রাস্তা সাফ করছে, ধুয়ে দিচ্ছে; নোংরা জমাবার কোনো সুযোগই নেই। এ কি আর কেষ্টনগর, ময়রার দোকানের ভাঙা ভাঁড়গুলোতে যা রস জমে থাকে তাতেই কত মাছির সংসার চলে যায়। ঝাড়ুদাররা দিনে মাত্র দুবার ঝাঁট দেয় কি না-দেয়। আর এ কলকাতা শহর, এখানে প্রত্যেক দোকানে কাচের বাক্স দিয়ে জিনিসপত্র ঢাকা, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা মুখ বন্ধ টিনের বাক্সের মধ্যে ময়লা জমা রাখে, মেথররা অনবরত এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাছি মাছিনীকে বলল, শেষকালে কি এখানে এসে না খেয়ে মরব নাকি?

মাছিনী বলল, চলো না, মাছের বাজারে যাই, সেখানে তো মাছের কানকো নাড়িভুঁড়ি ফেলবেই?

ঘুরতে ঘুরতে এল মাছের বাজারে। মাছের বাজার ধোয়া সাফ, কিছু নেই, খুব সকালবেলা দু'চার রকম মাছ নাকি ওঠে, দেখতে দেখতে সেগুলা সাফ হয়ে যায়, অনেক লোক মাছের চুবড়ি পোওয়া জলও কেনে পয়সা দিয়ে—সুতরাং একটু বেলা হলে মাছের বাজারে আঁশটে গন্ধটুকুও থাকে না। এখন মাছওলা আর মেছুনী

বসে বসে কীর্তন গাইছে খোল করতাল বাজিয়ে। নিরাশ মাছিনী সঙ্গী মাছিকে বলল, এ কোথায় এলুম গো! এ কি শহরের ছিরি? একটুও নোংরা নেই—একে শহর না বলে তো মরুভূমি বললেই হয়। আম-জামের সময় হলে রাস্তায় অন্তত দু'একটা আমেব খোসা ঠিকই পড়ে থাকত।

খিদে পেয়ে মাছির শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, তার গলার আওয়াজ ভনভনের বদলে পিনপিন, সে বলল, এ শহরকে কিছু বিশ্বাস নাই। তাও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে। আমের সময় না হোক, কলার তো সময়! রাস্তায় একটাও কলার খোসা দেখলি?

—সত্যিই! এ শহরের লোকেরা কলা খায় না নাকি?

—খাবে না কেন? বোধহয় খোসাশুদ্ধ খায়।

—মাছিদের জন্য একটু দয়ামায়াও নেই?

ঘুরতে ঘুরতে এল একটা বিরাট বাড়ির সামনে, যাকে বলে রাইটার্স বিল্ডিং! মাছি মাছিনী একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, ভালো ভালো ময়লার বদলে ওরা এখন থুতু-কফ খেতেও রাজি। সেখানে গিয়েও ওরা অবাক।

মাছ মাছিনীকে বলল, হ্যাঁরে, কলকাতার বদলে কি আমরা ভুল করে বিলেতে চলে এলুম? মাছিনী বলল, সত্যি, মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুরও হয়।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোথাও একছিটে ময়লা নেই, দেয়ালে পানের পিক নেই, সিঁড়ির পাশে সিক্নি নেই, আলুর দমের ঝোল মাখানো একটি শালপাতাও নেই পর্যন্ত। ঝকঝকে তকতকে সব কিছু, লোকগুলো নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে উঠে থুতুটুকু ফেলার জন্য বারান্দায় গিয়ে থুক না করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে, আবার বেরিয়ে এসে সযত্নে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরা কি মানুষ? মানুষ এমন হৃদয়হীন হয়?

মাছি বলল, চল, এখানকার মানুষেরা কিছুতেই ময়লা থাকতে দেবে না, বুঝেছি। দেখি কোথায় এমন জায়গা আছে কি না—সেখানে মানুষ নেই, সেখানে যদি আপনি আপনি ময়লা-টয়লা কিছু থাকে।

কিন্তু কলকাতার লোক এমন বোকা নয় যে, ফাঁকা জায়গা রাখতে দেবে। কোথায় মানুষ নেই? মাঝে মাঝে পার্ক-ময়দান—তাও মানুষ দখল করে রেখেছে, সব জায়গা মানুষ বসে বসে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ কিছু নোংরা না করে ফেলে।

নাঃ, মাছি দুটো ভাবল, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। এবার জন্তু-জানোয়ারের খোঁজ করা যাক। হ্যাঁরে, এ শহরে কি বেড়ালছানা মরে না? কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে না? তাদের মরা দেহগুলো কোথায় যায়? রাস্তায় একটাও তো নেই! মোষের গাড়ির মোষের কাঁধে ঘা পর্যন্ত নেই, ব্যাপার কি? মাছি মাছিনীকে বললে, বুঝলি,

এ সবই আমাদের না খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র!

মাছিনী বলল, চল, প্রাণ থাকতে এ শহর থেকে পালাই! আমাদের কেষ্টনগর এর থেকে ঢের ভালো ছিল।

—এই জন্যই এ শহরে মিষ্টি বন্ধ করেছে, বুঝলি! যাতে আর কোনো জায়গা থেকে মাছি না আসে! মিষ্টির গন্ধ পেলে দেশ-বিদেশ থেকে মাছি তো আসতই!

—মিষ্টি কে চাইছে? একটু পচা জঞ্জালও রাখতে নেই আমাদের জন্য?

চারপাশের এত বড়ো বড়ো বাড়ি, মাঝখানে একটু ফাঁকা মতন জায়গা। ভালো করে ওরা লক্ষ করে দেখল, ঠিক ফাঁকা নয়, ছোট ছোট ঘরের মতন। মাছিনী আহ্লাদে বলল, চল, ঐখানে যাই, ঐ ছোট ছোট ঘরগুলো নিশ্চয়ই মানুষের নয়, ওখানে জন্তুরা থাকে। জন্তুরা তো নিজেদের ময়লা লুকোতে পারবে না।

ওপর থেকে ওরা নীচে নেমে এল আবার। কোথায় জন্তু জানোয়ার? একটা বস্তি—এখানেও মানুষ। আর কি আদর্শ বস্তির আদর্শ মানুষ। পরিষ্কার নিকানো ঘরগুলো, অনেক ঘরের সামনে আবার আল্পনা দেওয়া, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, নর্দমা দিয়ে যে জল বইছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার। ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত নাকের সিক্নি ফেলে রাস্তা নোংরা করার বদলে নিজের সিক্নি নিজেই খেয়ে ফেলছে।

—মাছিনী, আজ আর বাঁচার আশা নেই।

—এই নাকি কলকাতা? এ শহরের এত নাম-ডাক? দূর দূর।

—গুজব! মাছি-সমাজ যে বলে কলকাতা একেবারে স্বর্গের মতন, যেখানে সেখানে ময়লা-নোংরা ছড়ানো—এবার বুঝলি তো, সব গুজব। কলকাতা না দেখেই কলকাতা সম্বন্ধে যত গল্প! বিলেত না গিয়েই বিলেত-ফেরৎ।

বিকেলের দিকে মাছি দুটো একেবারে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং নগরপালের ঘরে গিয়ে তার নাকের সামনে ভনভন করতে লাগল। নগরপাল আৎকে উঠে বললেন, কি? আমার শহরে মাছি? তাজ্জব কাণ্ড। কে কোথায় আছিস?

একদল লোক ছুটে এল, সবাই মিলে তাড়া করতে লাগল, মাছি দুটোকে। কোথা থেকে দুটো উটকো মাছি শহরে ঢুকে পড়েছে, এই নিয়ে কলকাতার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। কাল না এ খবর কাগজে বেরিয়ে যায়। মারো মারো!

মাছি দুটো কিন্তু ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেল না। নগরপালের কাছাকাছি উড়তে লাগল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওরা একেবারে মুমূর্ষ, সারাদিন কোথাও একটু বসারও জায়গা পায়নি, গায়ের সেই চিক্কণ নীল রং মলিন হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না, ওরা মরিয়া হয়ে নগরপালের মুখের সামনে ঘুরে ঘুরে কাতরভাবে অভিযোগ জানাতে লাগল, অন্যায়। এ আপনার অন্যায়, বিদেশ-বিভুঁই থেকে দু-

একটা পোকা মাছি এখানে বেড়াতে এলে—তাদের জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থাই রাখেননি? শহরে কোনো একটা জায়গায় অন্তত একটুখানি ময়লা তাদের জন্য রাখা উচিত ছিল! সারা শহর ঘুরে দেখলুম, কোথাও এক ছিটেও ময়লা নেই। এ আপনার অন্যায় নয়? আমাদের মেরে ফেলতে চান? এ রকম করলে কলকাতায় বেড়াতে আসব কি করে, অ্যাঁ? আমরা আর কতখানি খাব, অন্তত এক রত্তি ময়লাও যদি রাখতেন—

২৪

মাঝে মাঝে মনে হয় না, কেউ বুঝি নাম ধরে ডেকে উঠল? খুব ভিড়ের রাস্তা, ট্রাম-বাস রিক্সা-লোকজন, এই সব মিলিয়ে একটা শব্দ, এবং এই শব্দকে ছাড়িয়েও আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ডেকে ওঠে আপনার নাম, আপনার নাম যাই হোক না, শ্যামল বা শ্যামলী, অরুণ বা অরুণা, মাধব বা মাধবী, চিন্ময় বা চিন্ময়ী। কখনো এমন শোনেননি, খুব হনহন করে হেঁটে যাবার সময়, অন্যমনস্ক, এমন সময় আপনার নাম ধরে সেই তীক্ষ্ণ ডাক? আমি শুনেছি অনেকবার, থমকে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্ত মুখে তাকিয়ে এধার-ও ধার দেখেছি, কেউ না, কেউ আমায় ডাকেনি, সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত।

কখনো কখনো দেখেছি, সত্যিই কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। কাছেই একজন মানুষ ব্যাকুলভাবে ডাকছে, নীলু! নীলু! লোকটি অচেনা কিন্তু আমার আমেদাবাদের কাকা, ছেলেবেলার জ্যেঠামশাই, বিলেত-ফেরৎ মামা, কারখানার মজুর পিসতুতো ভাইরাও তো আমার অচেনা, সুতরাং আমি হতচকিতভাবে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী? আমায় খুঁজছেন? লোকটি ভ্রুক্ষেপও করে না, তাকায় না পর্যন্ত আমার দিকে, তবু ডাকতে থাকে, নীলু! নীলু! তখন দেখতে পাই দূর থেকে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার একটি লোক—নীলু নাম যাকে একেবারেই মানায় না—হাসতে হাসতে আসছে। তারপর ওরা আমাকে অগ্রাহ্য করে, কাঁধ ধরাধরি করে চলে যায়। আমার কী দোষ?

বাস ধরার জন্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়। কোনো কথা না বলে অতিশয় পরিচিত ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে নমস্কার করলেন। লোকটিকে বিন্দুমাত্র চিনি না, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ দুহাত তুলে ওঁকেও প্রতি-নমস্কার করলুম। লোকটি নমস্কার শেষ করে তখন আমার

দিকে কটমট করে তাকিয়েছেন। আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, অসভ্য! ধর্মশিষ্টাচার একেবারে দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে!

লোকটি কি পাগল? কি দোষ করলুম আমি?

ঘাড় ঘুরিয়ে কারণটা বুঝতে পারলুম। আমার পিছনেই একটা ছোট কালীমন্দির। লোকটি আমায় নমস্কার করেনি, মূর্তিকে প্রণাম করেছেন। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আমি লোকটিকে না-হয় না-জেনেই, প্রতি-নমস্কার করলুম, সেটা হয়ে গেল অশিষ্টাচার? ঐ পাথরের মূর্তি কোনোদিন ওকে প্রতি-নমস্কার করবে?

এই রকম অনবরতই ভুল ডাক আর ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়।

সন্ধের শো-তে সিনেমা দেখব, বন্ধুর জন্য দাঁড়িয়েছিলাম একটা বিদেশী ছবির হলের সামনে। টিকিট নিয়ে দাড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ, বন্ধুর দেখা নেই, শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল, সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল, শুধু আমি আর ও-পাশে একটি মেয়ে দাড়িয়ে। মেয়েটির মুখ-চোখে অস্থিরতা, ওরও বন্ধু আসেনি? আমার বন্ধুও আসেনি। ওর বন্ধুও আসেনি।

সন্ধে গাঢ় হয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি যেন ক্রমশ করুণ হয়ে আসতে লাগল। আমার কাছে তো দুটো টিকিট, এমনকি হয় না, আমরা দুজনেই একসঙ্গে সন্ধেটা কাটালুম সিনেমা দেখে? দুজনের সাময়িক শূন্যতা যদি সাময়িকভাবে ভরানো যায়? এই রকম বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা বিখ্যাত গল্প আছে। আমি মনকে বললুম সাবধান! গল্প কখনো অনুসরণ করতে গেলে মেলে না। জীবন অনুযায়ী গল্প হয়, কিন্তু গল্প অনুযায়ী জীবন হয় না আর।

তবু একটা কৌতূহল ছুঁক ছুঁক করছিল। দেখাই যাক না, হয়তো অন্যরকম একটা গল্পও হয়ে যেতে পাবে। আমি মেয়েটির দিকে তাকালুম, রাস্তার ধারের দিকে অল্প ছায়ার মধ্যে দাড়িয়ে, চোখ দুটি যেন ব্যাকুল হয়ে ঘুরছে চারদিকে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই, গল্পের নায়কদের মতন আমি অমন সহজে অচেনা মেয়ের সঙ্গে যে কথাই বলতে পাবি না।

এখনো সময় আছে, এখনো ইচ্ছে করলে ইন্টারভেলের আগে ঢুকে পড়ে ফিল্মটা দেখা যায়। আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আলতোভাবে হাসলুম। হাসিটা অনেকটা সেই কালীমূর্তিকে নমস্কার করার মতন। মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসেছি বলা যায়, অথবা মেয়েটিকে ছাড়িয়ে পিছনের রাস্তায় এই মাত্র যে লোকটি পা পিছলে পড়ে গেল, তাকে দেখেও হেসে থাকতে পারি। উত্তরে, আমার হাসির চেয়েও একটু বড়ো আকারের হাসি হাসল মেয়েটি। আমি

আগেই দেখে নিয়েছি, আমার পিছনে দেয়াল ছাড়া কিছু নেই। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সন্ধেবেলায় একা মেয়ে হাসবে কেন?

তবু আমি কথা বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। একটু দাঁড়িয়ে রইলুম। একবার মনে হলো, মেয়েটির হাসিটা কি বিদ্রূপের? মেয়েটি আবার অল্প হাসির আভাস দিল, এ হাসি যেন দুঃখের! তখনই আমার মনে হলো টিকিট বিক্রি করা কিংবা একা সিনেমা দেখা বা রাগ করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেয়ে, এই দুজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখাই তো সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক। আমি মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং নির্ভীক ও জড়তাবিহীন স্বরে বললুম, আপনারও... আসেনি বুঝি?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে আবার হাসল। এবার হাসিতে দুঃখ নেই। আমি বললুম, দেখুন, আমার কাছে দুটো টিকিট আছে, আপনি দেখবেন? মেয়েটি এবার ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, কত দেবেন?

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। শুনেছিলাম যেন, ও বলল, কত নেবেন? ভেবেছিলাম, আরেঃ! ও কি ভাবছে, আমি টিকিট নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করছি? সুতরাং ব্যস্ত হয়ে বললুম, না, না, আপনাকে দাম দিতে হবে না। এমনিই আমার সঙ্গে যদি আপনার সিনেমা দেখতে আপত্তি না থাকে— তবে, একসঙ্গে—

—কত দেবেন? আগে থেকে কথা হয়ে যাক্!

আমি এবারও বুঝতে পারিনি। অবাক হয়ে বললাম, কতোয় দেব? না, না. আপনাকে দাম দিতে হবে না।

মেয়েটির গলা এবার চাপা ও কর্কশ। তীব্র ভাবে বলল, ন্যাকা নাকি? বিনে পয়সায় পিরীত? শুধু বায়স্কোপ দেখিয়েই...আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরে বিস্বাদ মুখে চকিতে দূরে গেলাম। ভয়ে ফিরে তাকাইনি। হলো না. একটা গল্প পর্যন্ত হলো না! এ তো সাধারণ ঘটনা। ভুল দুজনের দেখা হয়ে গেল আবার।

এই রকম ভুল দেখা যে কতবার অসংখ্যবার হয় আমার। শুধু আমিই ভুল করি না, অন্যরাও ভুল করে। রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি, পিছন থেকে আচমকা কাঁধের ওপর বিরাট চাপড় দিয়ে একজন বলল, কী রে হরিপদ! আমি মুখ ফেরাতেই লোকটা দায়সারা গোছের ভাব করে বলল, ও, বুঝতে পারিনি মাপ করবেন! আমি অত্যন্ত চটে গিয়ে বললুম, আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই! ঐ রকম বিচ্ছিরি নাম আমার হতে পরে? লোকটি লজ্জিত না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, হরিপদকে দেখতে আপনার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর।

আমি বললুম, চুলোয় যাক। সুন্দর হোক বা কুচ্ছিৎ হোক. আমি হরিপদ নই, হরিপদ হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, আপনি না দেখে শুনে আমাকে অত

জোরে মারলেন কেন? লোকটি আমার মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়ে বলল, অত তেজ দেখাচ্ছেন কি? ভদ্রতা জানেন না—

যেন হরিপদ না হওয়াটা আমারই দোষ! হরিপদ না হবার জন্য আমাকে এবার মার খেতে হবে। ওঃ!

রাস্তার মোড়ে একদিন সকালবেলা দেখি খুব ভিড়, দু-তিনটে পুলিশের গাড়ি! নাক ভর্তি কৌতূহল নিয়ে আমি ভিড়ের মধ্যে নাক গলালুম। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দুটো কুকুর। শুনলুম, রোমহর্ষক কাণ্ড। সামনের বাড়িতে গত রাত্রে জোড়া খুন হয়ে গেছে। অপরাধীকে ধরা যায়নি, কিন্তু অপরাধীর এক পাটি জুতো পাওয়া গেছে। ঐ পুলিশ কুকুর লাকি-মিতাকে জুতোর গন্ধ শুকিয়ে আসামীর সন্ধানে ছোটানো হবে।

শুনেই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে আমি একটি চলন্ত বাসে উঠে পড়লুম। বলা যায় না, আমার যা ভুলের ভাগ্য কুকুর দুটো ফস করে এসে হয়তো আমাকেই ধরত!

২৫

শুনেছিলুম, তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছেই কোথাও থাকেন। ঠিক বাড়ির নম্বরটা জানি না। বাড়ি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বছর তিনেক আগে এক দুপুরবেলা আমি ট্রাম থেকে ঠনঠনের সামনে নেমে পড়েছিলাম। একটু ভয় ভয় করছিল, কি জানি কেমন লোক, আমি বিরক্ত করতে এসেছি বলে যদি ধমকে ওঠেন। যাই হোক, আজ দেখা না করে আর ফিরছি না।

কালীবাড়ির রকে একজন লোক বসে আছে, এমন চেহারা যে বয়েস বোঝার কোনো উপায় নেই। লোকটির মুখে কাঁচা-পাকা মুড়ি-মিছরি ধরনের দাড়ি—কিন্তু মাথার চুল কুচকুচে কালো। আমি একটুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ পাড়ায় শিবরাম চক্রবর্তী কোথায় থাকেন, বলতে পারেন?

লোকটি প্রথমেই আমার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করল। হয়তো আমার লেখা উচিত ছিল, 'করলেন', কিন্তু লোকটির ব্যবহার এমন যাচ্ছেতাই যে এসব লোককে কিছুতেই আপনি বলা যায় না। ওরকম কুটিলভাবে আমার পা-থেকে মাথা পর্যন্ত দেখার দরকারটা কি? লোকটির গলার আওয়াজ কাক ডাকার মতন, জিজ্ঞেস করল, কে থাকে? কি নাম?

আমি সন্ত্রমপূর্ণ গলায় পুনরায় বললুম, আজ্ঞে, শিবরাম চক্রবর্তী। দয়া করে যদি—

—বাড়ির নম্বর কত?

—আজ্ঞে, বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানি না। সেই জন্যই তো—

—বাড়ির ঠিকানা জান না, কলকাতা শহরে লোক খুঁজতে এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমায়?

—কেউ না। উনি বিখ্যাত লোক, তাই আমি ভেবেছিলাম—

লোকটি হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিখ্যাত লোক এপাড়ায়?

তারপর সে ঠোঁট দুটি পুরো ফাঁক করল। অর্থাৎ হাসি। বললে, এ পাড়ায় বিখ্যাত লোক দুজনই আছে, আমি আর কাশীরাম ভটচার্যি। আমায় তো চেনোই দেখছি, কাশীরাম ভটচার্যির নাম শুনেছ? প্রখ্যাত জ্যোতিষী, সম্পর্কে আমার আপন ভগ্নিপোত, তুমি বোধহয় তাকেই—

আমি বললুম, আমি আপনার ভগ্নীপতির কখনো নাম শুনিনি বটে, কিন্তু উনি নিশ্চয়ই খুব বিখ্যাত। তবে আমি ওনাকে খুঁজতে আসিনি। আমি খুঁজছি শিবরাম চক্রবর্তীকে।

—তবে যে বললে বিখ্যাত লোককে খুঁজছ? সে লোকটা কিসে বিখ্যাত?

—উনি একজন লেখক। আমাদের শ্রদ্ধেয়—

—লেখক! কি লেখে?

—প্রধানত হাসির গল্পই লেখেন। তা ছাড়া, আগে—

—হাসির গল্প? চালাকি পেয়েছ?

লোকটি এবার বেশ ক্রুদ্ধ। সোজা হয়ে বসে বলল, হাসির গল্পে আবার লেখার কি আছে হে? ওসব মানুষে লেখে? হে-হে-হে-হে, যত ইচ্ছে হাসো না, যখন খুশি, এর মধ্যে আবার লেখাপড়ার কথা কি? লেখে লোকে ধম্মোকম্মো, সদা সত্য কথা বলিবে, কি করে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হয়—এইসব নিয়ে। তুমি এসেছ হাসির গল্পো চালাতে? আমার সঙ্গে ফাজলামি-এয়ার্কি?

ইতিমধ্যে তিন-চারজন কৌতূহলী লোক জমে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? পকেটমার না জুতোচোর? আজকাল কালীবাড়িতে এমন জুতোচোরের উপদ্রব হয়েছে। আরেকজন বলল, পকেটমার নয় তো?

মূল লোকটি খেঁকিয়ে উঠে বলল, ছোকরাকে দেখছি তখন থেকে এখানে ঘুরঘুর করছে। বাবুরাম চক্রবর্তী না কাকে খোঁজার ছুতো—

আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, বাবুরাম না, শিবরাম।

—ও নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে? আপনারাই বলুন। আমি তিরিশ বছর এ-পাড়ায় আছি, আমি জানি না।

জনতা বলল, ঐ তো কাশীরামবাবু আসছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না!

বেশ টের পেলুম, লোকে আমায় ঘিরে ধরেছে। দৌড়ে পালাতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা। কাশীরামবাবুর চেহারা রোগা-চিমশে ধরনের, কপালে ফোঁটা-তিলক। দেখে আরো ভয় হলো। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খুব বেশি রোগা লোকেরা কিছুতেই সরল কথা বোঝে না। সব সময়েই তাদের জেরা করার টেণ্ডেন্সি। ইনিও এসে বৃত্তান্ত শুনে সহাস্যে বললেন, আগে বলো তো বাপু, এ-পাড়ার সেই লোকটির সঙ্গে তোমার কি দরকার?

সর্বনাশ, এ কথা আগে তো একবারও ভাবিনি। দরকার তো কিছু নেই! আমি আমতা আমতা করে বললুম, না, মানে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে—

জনতা গর্জন করে উঠল, অ্যাঁ, দেখতে? একজন জলজ্যান্ত মানুষকে শুধু চোখের দেখা দেখতে? স্পাই। স্পাই!

কাশীরামবাবুই দয়ালুভাবে বললেন, আহা-হা, আগেই মারধোর শুরু করো না! আগে দেখা যাক, সত্যিই ও নামের কোনো লোক এ পাড়ায় থাকে কিনা! যদি এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে কোথাও সে থাকে, আমি গুণে বলে দেব!

ফতুয়ার পকেট থেকে খড়ি বার করে তিনি মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলেন। গোটাকয়েক চৌখুপ্পি আর ঢ্যাড়া। চক্রবর্তী তা হলে তোমার হলো গিয়ে অমুক গোত্র, নামের প্রথমে যদি তালব্য শ থাকে—। আমি তখন দরজা জানালা বন্ধ ঘরের মধ্যে বেড়ালের মতন আটকে পড়েছি। ভাবছি এবার আঁচড়ানো কামড়ানো শুরু করব কি না, নাকি কেঁদে কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দেব!

খানিক বাদে চোখ খুলে কাশীরাম জ্যোতিষার্ণব বললেন—তেমনি হাসি হাসি মুখে, নাঃ, ও নামে কোনো লোক থাকতে পারে না। সর্বৈব বাজে কথা। এ পাড়ায় কেন, কোথাও নেই।

আমি বললুম, তা হলে মন্টুর মাস্টার কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে—এগুলো কে লিখেছে? নাকি আপনি বলতে চান, এরকম কোনো বইও নেই?

এমন সময় একটি শৌখিন চেহারার যুবা, ফর্সা, সুদর্শন, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ধপধপে আদ্দির পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম-ভিড়ের মধ্যে থেকে এসে আলতোভাবে আমার কাঁধ ছুঁয়ে বললে, আহা, ওকে ছেড়ে দিন! ও আমাকে খুঁজছে।

আমার চেয়েও কাশীরামের বিস্ময় বেশি। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, আপনিই? তা চক্রবর্তী আপনার উপাধি না খেতাব? রাঢ়ী না বারেন্দ্র? খড়দা

মেল না ফুললে মেল? ওঃ! তাই বলুন, এই জন্য আমার গণনা একটুর জন্য মেলেনি!

বলেই কাশীরাম ভিড়ের মধ্যে সুট করে মিশে গেলেন। যুবকটি আমার হাত ধরে ফাঁকায় নিয়ে এসে সস্নেহে বললেন, এবার বলো!—আমার বুকের ধড়ফড় তখনো কমেনি। ঢোঁক গিয়ে বললাম, আপনাব এত বয়স কম? আমি ভেবেছিলাম একবারে অন্যরকম!

যুবকটি বললেন,

অন্যরকম অন্য-বেশি
বেশির কম, কমবয়েসি।

বুঝলে?

অথবা বলতে পার, বয়সের ভয়েসে কখনো বেশি Boyish, কখনো বায়সের মতন Raw, কখনো ভঁইসের মতন...

আমি বললুম, সত্যিই যদি আপনার কম বয়স হয়, তবে আমাকে 'তুমি' বলবেন না। আমিও রোজ রোজ দাড়ি কামাই।

—রোজ রেজারে দাড়ি কামাও? না, দাড়ি কামিয়ে রোজের রুজি রোজগার করো? তোমার চেহারাখানা তো দেখলে মনে হয়, চেয়ার-হারা, দাঁড়িযে দাড়ি কামানোই...

—একটু আস্তে আস্তে বলুন না, আমি লিখে নিই। অত তাড়াতাড়ি বলছেন, একটু মাঝে মাঝে দাঁড়ি কমাও না বসালে—

—বেশ, বেশ, শিখে গেছো দেখছি। তোমারও হবে। চালিয়ে যাও। পেছন থেকে রুক্ষ গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, এই পল্টু। পল্টু!

এক ঝলক তাকিয়ে দেখি একজন বেঁটে কালো গুণ্ডা চেহাবার লোক আমাদেরই দিকে তাকিয়ে ডাকছেন। যুবক শিবরাম চক্রবর্তীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার নাম যে পল্টু নয়, সেটা অন্তত আমি ভালো রকমই জানি। আবার পল্টু পল্টু ডাক শুনে আমি ওঁকে বললুম, আপনাকে ডাকছেন বোধহয়। আপনার ডাকনাম পল্টু বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আপনি শিবরাম নন। শিবরামের ডাক নাম কখনো পল্টু হতে পারে না!

পিছন থেকে সেই লোকটি এসে বলল, ও বুঝি তোমায় বলেছে ও শিবরাম। ব্যাটা মহা জোচ্চোর! শিবরাম হচ্ছি আসলে আমি। আমার নাম শিবরাম সেন। —একথা বলেই লোকটার কি হাসি।

আমি বললুম, কিন্তু আমি তো শিবরাম চক্রবর্তীকে খুঁজছি। সেন তো না!

—ঐ হলো। আমিই আস্তে আস্তে চক্রবর্তী হয়ে উঠব। শুনবে? আমি মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ির তক্তায় শুয়ে শুক্তো খাই। স্ত্রীকে দিয়ে জামাটা ইস্তিরি করিয়ে নিয়ে মিস্তিরি খুঁজতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে চটির সঙ্গে চটাচটি হয়ে—

প্রাগুক্ত যুবক বললেন, ধুৎ। বাজে! ওসব মুখস্থ। কেন ছেলেটাকে শুধু শুধু ঠকাচ্ছো? আমার মতন বানান নিয়ে বানানোর ক্ষমতা আছে তোমার? এসো না কমপিটিশান হয়ে যাক্।

—কমপিটিশানে কে জাজ হবে?

—কেন, এই ছেলেটি!

—উঃ, ও যদি কারুকে কম পিটি, কারুকে বেশি পিটি করে?

—আচ্ছা ঐ তো বড়দা আসছেন, বড়দাকে জাজ করা যাক।

একজন সৌম্য চেহারার প্রৌঢ় আসছিলেন। বিশাল দেহ, মাথাভর্তি চকচকে টাক, সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি। মনে হয় কোনো রিটায়ার-করা জমিদার বিকালের ভ্রমণে বেরিয়েছেন। লোক দুটো ওর কাছে গিয়ে বললে, বড়দা আপনি বিচার করে বলুন তো, আমাদের মধ্যে কে সত্যিকারের শিবরাম?

প্রশস্ত হাস্যে সেই প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে খুশি হলাম। পাঠকদের দেখা পাওয়াই তো আমাদের সৌভাগ্য! তুমি পাঠক আর এ দুটো হচ্ছে ঠক! এই দুটোর কথায় কোনো কান দিও না। ওরা হচ্ছে রাম শিব, আমিই হচ্ছি আসল শিবরাম। শিবরামের Soul—আর কারুর কথায় বিশ্বাস করো না, আমার কোনো ব্রাঞ্চ অফিস নেই।

লোক দুটোর একজন বলল, ইঃ, শোল না শুকতলা? আরেকজন বলল, বড়দা, একি হচ্ছে? এ আপনার অন্যায়!

রহস্যময়ভাবে প্রৌঢ় বললেন, আমিই যে আসল শিবরাম, তোরা এতদিন জানতে পেরেছিলি? অবশ্য, এখন আমি প্রমাণ দিতে গেলে তোদের কাছে হেরেও যেতে পারি। জানিস তো, বার্নার্ড শ-এর মতো গদ্য কে লিখতে পারে এই নিয়ে একবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। স্বয়ং বার্নার্ড শ-ও তাতে ছদ্মনামে লেখা পাঠিয়ে পেয়েছিলেন মোটে তৃতীয় পুরস্কার। তেমনি, তোদের কাছে আমি হেরে গেলেও—

যুবাটি বলল, আপনার চালের ব্যাবসা, আপনি লাকি ম্যান, তা বলে চালাকি করছেন এখানে? আপনি যদি শিবরাম চক্রবর্তী হন তো, আপনার চুল কোথায়? শৈল চক্রবর্তীর সব ছবিতে আছে, কপালের কাছে এক গোছা চুল এসে পড়েছে, এই দেখুন না, আমার মতন—

প্রৌঢ় হঠাৎ চুপসে গিয়ে বললেন, ওসব আগেকার ছবি। আগে যখন আমার চুল ছিল—

—বাজে কথা! কুড়ি বছর ধরে আপনাকে দেখেছি এইরকম গোল আলু মতন মাথা, জন্মো থেকে আপনার টাকালু!

এর পর সেই তিনজন লোক শিবরামত্ব নিয়ে মহা ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর দৌড়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লুম।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তারপরও আমার কোনোদিন দেখা হয়নি। দেখা হবেও না জানি। আমার ধারণা শিবরাম চক্রবর্তী নামে কোনো লোক নেই। শিবরাম চক্রবর্তী আসলে অনেকগুলো লোক। কিংবা সব মানুষেরই মনের মধ্যে যে একটি করে ছেলেমানুষ লুকিয়ে থাকে—তারই সার্বজনীন নাম শিবরাম চক্রবর্তী।

২৬

আমি ভেবেছিলাম এসব গল্পগুলো আর আজকাল সত্যি হয় না। সেই যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক সারা জীবন কাজ করার পর রিটায়ার করে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কিংবা গ্র্যাচুইটির টাকা নিয়ে ফিরছেন, বাড়ি পৌঁছবার আগেই সব টাকাটা পকেটমার হয়ে গেল। সারা জীবনের সঞ্চয় শেষ করে সামনে শুধু ধূ ধূ শূন্যতা। শুধু গল্পে নয়, খবরের কাগজে এ-রকম খবর পড়েছি যে, মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে যথাসর্বস্ব টাকা তুলে নিয়ে ফিরছেন কোনো স্নেহময় পিতা, মাঝপথে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল সব টাকা। হয়তো তখন সানাইয়ের অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে, বর্ষীয়সী মহিলারা পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া শেষ করেছেন, নিমন্ত্রণের চিঠি সব বিলি করা হয়েছে, জামাইয়ের জুতোর মাপ পর্যন্ত নেওয়া বাকি নেই, এমন সময় সেই আসন্ন উৎসব-বাড়িতে শ্মশানযাত্রীর মতো ফিরে এলেন হৃতসর্বস্ব মেয়ের বাবা। এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

শুধু গল্পে নয়, খবরের কাগজেও এ রকম খবর পড়েছি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এখন আর এসব হয় না। এখন টাকার দাম একদল মানুষের কাছে খোলামকুচি হলেও আরেক দলের কাছে—যাদের হারায়—একেবারে বুকের মণি। এখন প্রাণ হারায় কিন্তু টাকা হারায় না আর।

আমার প্রতিবেশী অপূর্ববাবুর স্ত্রী সন্ধেবেলা নিজের ষোলো বছরের মেয়ে আর তিনটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে জামাকাপড় কিনতে বেরিয়েছিলেন। অপূর্ববাবু লোকটি একটু অলস প্রকৃতির এবং অলস লোকদের যা প্রধান বিলাসিতা—উনি প্রায়ই আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে আসেন। কথায় কথায় প্রায়ই

বলেন, আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম, তা হলে এদেশের—ইত্যাদি। ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার হাই ওঠে, বিছানায় এলিয়ে পড়ি, তবু যে ওকে চলে যেতে বলতে পারি না, তার কারণ শুধুই আমার ভদ্রতাবোধ নয়, অপূর্ববাবু লোকটি নিরীহ এবং সরল এবং অসৎ নন—এবং শুধু এই কটা গুণই আজকাল এমন দুর্লভ যে, এই রকম কোনো মানুষ দেখলে তার অন্যান্য দোষ ক্ষমা করা যায়।

রাত দশটার সময় অপূর্ববাবুর বিধবা বোন এসে বললেন, হ্যাঁরে, বউমারা যে এখনো ফিরল না? একটু দ্যাখ—

অপূর্ববাবু আলস্যের ভঙ্গি করে বললেন, যাবে আর কোথায়? মেয়েছেলেদের কেনাকাটা কি আর সহজে শেষ হয়।

—কিন্তু ছ'টার সময় বেরিয়েছে, এখন দশটা বাজল।

—পঞ্চাশটা দোকানে ঘুরবে, তবে তো কিনবে? ওই জন্যই তো আমি সঙ্গে যাই না!

এগারোটা বাজল, তখনো অপূর্ববাবুর স্ত্রীর দেখা নেই। শহরের এই উপকণ্ঠে এগারোটা অনেক রাত, শেষ বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমিই বললুম, মশাই, একটু খোঁজখবর করুন, এত রাত হয়ে গেল। অপূর্ববাবু হাসতে হাসতে বললেন, কোথায় খোঁজ করব বলুন? কোন দোকানে গেছে, আমি কি আর জানি? বোধহয় আজ একটু ট্যাকসি করে আসার শখ হয়েছে।

সাড়ে এগারোটা আন্দাজ অপূর্ববাবুর চেহারা কিন্তু একেবারে বদলে গেল। অলস লোকদের যা স্বভাব, হঠাৎ এক সময় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চোখ-মুখ শুকনো করে অপূর্ববাবু বললেন, কী সর্বনাশের কথা বলুন তো! এখন আমি কি করি? কলকাতা শহর চোর-গুণ্ডায় ঠাসা, ওর কাছে যে আমার যথাসর্বস্ব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যথাসর্বস্ব মানে কত টাকা? অপূর্ববাবু একটি আধা-সরকারি অফিসে সামান্য চাকরি করেন। বোনাস নেই, ঘুষ নেই, শুধু মাইনের টাকা। পুজোর বাজারের ভিড় এড়াবার জন্য আগেই অফিস থেকে এক মাসের বেসিক পে ১৮০ টাকা এনেছেন, সেই সঙ্গে যাবতীয় গুপ্ত সঞ্চয় যোগ করে ওর স্ত্রী ২৪০ টাকা নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছেন।

আমি বললাম, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না তো?

—না, আমার মেয়ে সঙ্গে আছে, সে রোজ কলেজ যায়, সে সব রাস্তা চেনে। এখন আমি কি করি? থানায় যাব? হাসপাতাল—

অপূর্ববাবু খুবই অসহায় হয়ে পড়েছেন দেখে আমি বললুম, চলুন, বেরিয়ে দেখা যাক।

শহরের উপকণ্ঠের মহিলাদের কোনো বিশেষ জিনিসপত্র কেনার সময়

শহরের হৃৎপিণ্ডের প্রধান দোকানগুলোতে যাবার ঝোঁক হয়। অবশ্য নিউ মার্কেট পর্যন্ত যাবার দৌড় ওদের নেই। সুতরাং কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে অনুমান করা যায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশি খুঁজতে হলো না। রাত বারোটায় রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে গেছে, দোকানপাট বন্ধ। কলেজ স্ট্রিট বাজারের কাছে একটা জায়গায় খুব ভিড়। ট্যাকসি থেকে নেমে উঁকি দিতেই দেখতে পাওয়া গেল একটা বন্ধ কাপড়ের দোকানের সিঁড়িতে অপূর্ববাবুর স্ত্রী অনড় হয়ে বসে আছেন, চোখে দৃষ্টি শূন্য, বাচ্চা ছেলেগুলো কান্নাকাটি জুড়েছে, ষোল বছরের মেয়েটি মাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভিড়ের মুখে মুখে প্রচুর সমবেদনা ও কৌতূহল।

ঘটনাটা জানতে পারা গেল। বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরে এক দোকানে সব পছন্দ হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বসে, অপূর্ববাবুর স্ত্রী একে একে পছন্দ করেছেন, ওঁর বিবাহিত মেয়ে-জামাইয়ের জন্য শাড়ি আর পাঞ্জাবি, কুমারী মেয়েটির জন্য একটা হাল ফ্যাশনের শাড়ি (এইটাই সবচেয়ে দামী), বিধবা ননদের জন্য থান, বাচ্চাদের প্যান্ট-শার্ট, স্বামীর জন্য তাঁতের ধুতি। নিজের জন্য কিছু আর টাকায় কুলোয়নি যদিও। দাম দেবার সময় দেখলেন, পাশে ওঁর হাত-ব্যাগটা নেই। নেই ? নেই! নেই! নেই!

আর সব আছে, দোকানের ঝলমলে আলো, রং-বেরঙের শাড়ির বাহার, অসংখ্য ক্রেতার মুখের হাসি-খুশি, সবই ঠিকঠাক আছে. শুধু নেই অপূর্ববাবুর স্ত্রীর হাত-ব্যাগ। একটা কালো ধুমসো মতো লোক গা ঘেঁষে ছিল না ? সেও নেই। সে কি কোনো জিনিস কিনেছে ? কেনেনি। সে শুধু চুরি করতেই এসেছিল।

গোলাপী-রাঙা শাড়িখানা মেয়ের গায়ের ওপর মেলে ধরে উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁরে খুকি, এই রংটা তোকে খুব মানিয়েছে। মানাবে না, দামও তো কম নয়! ছেলেদের পোশাকে লেগেছিল ওঁর স্নেহ-মাখানো হাত, স্বামীর ধুতির ওপর দৃষ্টি পড়েছিল চাপা প্রেমের, ননদের থানের গায় লেগেছিল ভক্তি— সবগুলোই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল— সেগুলো সবই আবার ফিরে গেল গাদার মধ্যে। অপূর্ববাবুর স্ত্রী দোকানের মধ্যে পাথরের মতন বসে রইলেন।

দোকানের কর্মচারীরা একেবারে নৃশংস নয়। তাদেরও প্রায় চোখে জল এসেছিল, এমনকি তারা কাপড়গুলো সব ধারেও দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর একটিও কথা বলেননি। দোকান বন্ধ না করলে পুলিশে ধরে, তাই ওরা বাধ্য হয়েই ওকে জোর করে বার করে দিয়েছে। সিঁড়িতে সেই থেকে বসে আছেন অপূর্ববাবুর স্ত্রী।

অপূর্ববাবু ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে বললেন, ওগো শুনছ ? শুনছ ? কী

সর্বনাশ। তুমি ওরকম করে বসে আছ কেন? টাকা গেছে গেছে, তুমি বাড়ি চলো! ওঁর স্ত্রী একবার চোখ তুলে তাকালেন। তারপর ঢলে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে।

২৪০ টাকা কি আর এমন, একে যথাসর্বস্ব বলা যায় না। অপূর্ববাবুর স্ত্রী দু-একদিন বাদেই আঘাত সামলে উঠলেন। অপূর্ববাবুর কি আর এমন ক্ষতি হলো? এতে উনি ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়েও মরবেন না, বা জামাকাপড়ের অভাবে একেবারে উলঙ্গ হয়েও থাকতে হবে না। কি আর হবে, বেঁচে ঠিকই থাকবেন। বড়োজোর, পুজোর মধ্যে ওর ছেলেমেয়েরা নতুন জামা না পরার লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুবে না। অপূর্ববাবুর মামার বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়— সেখানে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া হবে না। ওঁর বিধবা দিদি কপাল চাপড়ে বলবে, আমার ভাগ্যটাই চিরকাল এমন—। বেশি কিছু ক্ষতি নয়, বেঁচে ঠিকই থাকবেন। যা হারালেন, তা হলো আনন্দ, পুজোর কয়েকটা দিনের আনন্দ হারালেন।

যে-লোকটা টাকা চুরি করল, সে ২৪০ টাকায় কি পাবে? বেশি কিছু না, খানিকটা আনন্দ। অপূর্ববাবুর পরিবারের আনন্দ চুরি করে সে নিজে আনন্দ করবে। ওই দীর্ঘশ্বাস-মিশ্রিত টাকা নিয়ে লোকটা হয়তো মদ-টদ খাবে, জুয়া খেলবে, স্ত্রীলোক নিয়ে ফূর্তি করবে। খানিকটা আনন্দ। যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা চুরি করে, তাদের মতোই, ওই লোকটাও ভোগ করবে আনন্দ—খানিকটা শান্তিহীন, রুক্ষ আনন্দ।

২৭

চৌবাচ্চার জলের প্যাঁচটা খারাপ হয়ে গেছে, যতই ঘোরাই কিছুতে বন্ধ হয় না। চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে জল ছাপিয়ে উঠছে, বাথরুম ভেসে যাচ্ছে জলে। অনেক টানাটানি ধাক্কাধাক্কি করেও কলটা বন্ধ করতে না পেরে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বিরক্তির পর দুঃখবোধ।

অত জল উপচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। জলের অপচয় দেখে সত্যি কষ্ট হয়। নদীনালার দেশের ছেলে, বালক বয়েস থেকে একটা জিনিসই অপর্যাপ্ত দেখছি, তা হচ্ছে জল। আজ সেই জলের অপব্যয় দেখে মন খারাপ লাগছে ভেবেও আরেকবার মন খারাপ হলো। ভাঙা, নষ্ট করা, ছড়ানো-ছেটানো, অপব্যয়—এগুলো মানুষের আদি স্বভাব। এখন কিছুই আর অপব্যয় করার মতন বেশি নেই, জলও বেশি নষ্ট করতে কষ্ট হয়।

কষ্ট হচ্ছিল, কারণ বারবার বিহারের খরা অঞ্চলের কথা মনে পড়ছিল। সেখানে একে খাদ্যাভাব, তার ওপর জলের অভাব, পুকুর কুয়ো টিউবওয়েল শুকিয়ে এসেছে—হাজার গ্রামে মানুষের স্নান-কাপড় কাচা তো দূরের কথা, খাবার জল খাচ্ছে মেপে মেপে। যাদের বাড়িতে কুয়ো এখনো শুকোয়নি, তারা লাঠিসোটা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে—যেন অন্য কেউ এসে জল না চুরি করে। জয়প্রকাশ নারায়ণ আপ্রাণ ছোটাছুটি করছেন নতুন গভীর কূপ খোঁড়ার টাকা সংগ্রহের জন্য।

কিন্তু এখানে বসে আমি মন খারাপ করেই বা কি করব। আমার বাড়িতে জল চৌবাচ্চা ছাপিয়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, আর বিহারের লোকেরা তৃষ্ণার্ত—কিন্তু তা বলে তো আমার বাড়ির জল বিহারে পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং বাথরুমের জল নষ্ট হতে দিয়েই আমি ঘরে ফিরে এলুম। দেখা যাক, এরপর কতদিনে কলের মিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া যায়।

ঘরে ফিরে এসে, কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে হলো, কলকাতা থেকে জল পাঠাতে পারি না ঠিকই, কিন্তু কুয়ো খোঁড়ার জন্য কিছু টাকা পাঠাতে পারি অনায়াসেই। সেটা করলেও অনেকটা গ্লানিমুক্ত হওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পকেটে হাত দিলুম।

কিন্তু মহৎ কাজে সব সময়ই অনেক বাধা। পকেটে কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। দেরাজ-টেরাজ ঘাটাঘাটি করলুম, সেখানেও কিছু নেই! কিছু টাকা ধার করলে হয় কিন্তু ধার চাইব ভেবে যে-বন্ধুর কথাই ভাবি—অমনি শিউরে উঠি, সকলের কাছেই 'কাল ফেরৎ দেব' বলে বহু টাকা ধার হয়ে আছে। তাদের সঙ্গে দেখা করাই বিপজ্জনক। ইস, কোনো একটা ভালো কাজের কথা মাথায় এলেই—হাজার রকমের বাধা আসে। এই সময় কী আমার অনেক টাকা থাকা উচিত ছিল না?

কোনো ব্যাপারে হতাশা এলেই আমার চেয়ার ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। আর, শুয়ে পড়লেই আমার মাথায় নানা রকম পরিকল্পনা আসে। শুয়ে শুয়ে ভাবলুম, একা সামান্য কিছু টাকা না-পাঠিয়ে—কয়েক জনের কাছ থেকে কিছু চাঁদা তুলে এক সঙ্গে টাকা পাঠালে কেমন হয়? কয়েক জনের নাম ভাবলুম—যাদের কাছে চাঁদা চাওয়া যায়। তারপরই মনে হলো চাঁদা যখন চাওয়াই হচ্ছে তখন ব্যাপারটা আরো বড়ো করা যেতে পারে।

মাথায় পরিকল্পনা এল, বাংলাদেশের লেখকদের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব টাকা তুলে বিহারে পাঠানো যেতে পারে—সেই টাকায় যদি একটি বা দুটি কুয়োও খোঁড়া হয়, তাও যথেষ্ট। কী-রকম ভাবে চাঁদা চাইব সঙ্গে সঙ্গে ভেবে ফেললুম। খবরের কাগজে আবেদন জানানো, বাংলা দেশের সমস্ত লেখকদের কোনো একটা

জায়গায় মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাতে। আর একটা দিনে মিটিং ডাকা হবে—সে মিটিং কোনো ভাড়া-করা হলঘরে কিংবা ময়দানে নয়, কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগরের মূর্তির কাছে এক বিকেলবেলা সেখানে জমায়েত হবেন সব লেখকরা, তারপর সবাই মিলে গান গাইতে গাইতে ঘুরব কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়—ওখানেই তো সমস্ত বইয়ের দোকান আর প্রকাশভবন, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সব দোকানে দোকানে ঘুরে টাকা চাওয়া হবে, তারপর জমা-করা সব টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে জয়প্রকাশ নারায়ণকে।

নিজের পরিকল্পনায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম। চমৎকার পরিকল্পনা, লেখকরা নিশ্চয়ই রাজি হবেন, হবেন না? বাংলা দেশের লেখকরা খুবই অনুভূতিপরায়ণ, তাঁরা ভিয়েৎনামের যুদ্ধের প্রতিবাদেও মিটিং করেন, চাঁদা তোলেন, আর প্রতিবেশী বিহারের ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত লোকদের জন্য অনুভব করবেন না? তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম।

প্রথমেই একজন পরিচিত লেখকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে সোৎসাহে আমার পরিকল্পনা ব্যক্ত করলুম। তিনি মুখ শুকনো করে বললেন, ব্যাপারটা তো খুবই ভালো, কিন্তু তুমি খবর্দার ওসবের মধ্যে যেও না।

জিজ্ঞেস করলুম—কেন?

—তুমি মানিঅর্ডারে টাকা পাঠাতে বলবে, চাঁদা তুলবে—এর জন্য হয়তো পুলিশ তোমাকে টানাটানি করবে। তা যদি নাও করে, অনেকে নিশ্চিত বলবে, তুমি ওর থেকে কিছু টাকা চুরি করেছ, বলবেই। যে-কোনো চাঁদা তোলার ব্যাপারে একজন-না-একজন চোর হয়ই লোকের কাছে। তুমি ঐ বদনাম নিতে যাবে কেন? তোমাকে বন্ধুভাবে বলছি, তুমি ওসবের মধ্যে যেও না। অন্য কেউ ইচ্ছে হয় করুক।

শুনে আমি কিছুটা বিচলিত বোধ করলেও নিরস্ত হলুম না। ভাবলুম, তিনি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে নিরাশ করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং, আর-একজন অল্প চেনা লেখককে পথে দেখতে পেয়ে সব খুলে বললুম। তিনি মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তারপর চোখ সরু করে বললেন, কি ব্যাপার?

আমি অবাক হয়ে বললুম, মানে, বিহারের দুর্দশার কথা নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন—

তিনি বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ আর্ত নিপীড়িত জনগণের দুঃখে তোমার প্রাণ যে কেঁদে উঠল! কী ব্যাপার?

—আজ্ঞে না, প্রাণ ঠিক কাঁদেনি। এমনই সাধারণ দায়িত্ববোধ।

—বুঝেছি! এই ফাঁকে নিজে নাম করে নিতে চাও। কাগজে নাম বেরুবে সেই লোভ! লেখকদের সমাবেশ হবে সেই লোভে। লেখকদের সমাবেশ হবে—সেটা তুমি অর্গানাইজ করবে কেন? লেখকদের দলে ভিড়ে তুমিও লেখক হতে

চাও, না? তুমি কি লেখ? ঐ সব টুকরো-টুকরো আজেবাজে লিখলেই লেখক হওয়া যায়, অ্যাঁ? খুব লেখক হবার শখ!

এসব একেবারে আঁতে ঘা দিয়ে কথা। এবার আমি সত্যিই নিরাশ হয়ে পড়লুম। ইচ্ছে হলো, তক্ষুনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। যত রাগ হলো আমার বাড়ির চৌবাচ্চার কলটার ওপর। ওটা খারাপ হয়েছিল বলেই তো এসব ঝঞ্ঝাটের কথা মনে পড়ল।

সন্ধেবেলা আরেকজন পরিচিত লেখকের সঙ্গে দেখা। তিনি নিজে থেকেই সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে মুখ শুকনো কেন? মন খারাপ নাকি? কেন?

আমি উত্তর দিতে পারলুম না, চুপ করে রইলুম। কারণ, তখন সত্যিই আমি বুঝতে পারছিলুম না, আমার মন খারাপের আসল কারণ কি সত্যিই বিহারের খরা-পীড়িত লোকদের দুর্দশা, না আমার পরিকল্পনা সার্থক হলো না, সেই জন্য। হয়তো সত্যিই নিজের নাম জাহির করার উদ্দেশ্যই আমার ছিল।

কিন্তু সেই তৃতীয় লেখকটি প্রশ্ন করে সব কথা শুনলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, এই ব্যাপার? আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।

তিনি সোজা আমাকে নিয়ে এলেন গঙ্গার পাড়ে। অন্ধকার হয়ে এসেছে, গঙ্গায় চকচক করছে জল, চারপাশে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। আমি বললুম, এখানে নিয়ে এলেন কেন?

—ঐ নদীর দিকে একটু তাকিয়ে থাকো, মন ভালো হবে। তারপর তোমাকে আর-একটা জিনিস দেখাব।

—মন ভালো হবার দরকার নেই। সেই আরেকটা জিনিসই দেখান।

গঙ্গার পাড় ধরেই কিছুদূর হেঁটে এলাম। এক জায়গায় প্রায় শ-দুয়েক নারী-পুরুষ গোল হয়ে ঘিরে বসে গান করছে। তিনি বললেন, গান শুনবে? ওদের গান শোনো—বেশ গায় ওরা—!

আমি যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বললুম, এই গান শোনাতে এত দূর নিয়ে এলেন? আপনি যে এতবড়ো সঙ্গীত রসিক, তাও তো জানতুম না!

—শুনে দেখোই না ওদের গান! বেশ লাগবে।...ওসব জিনিস সংগঠন করা সবার কাজ নয়। তোমার আমার কাজ নয় চাঁদা তোলা। লোকের কথা গায় মাখলে কি আর পাবলিক ওয়ার্ক করা যায়? ও চেষ্টা করাই তোমার ভুল হয়েছে। তার চেয়ে এদের দ্যাখো। আমি কাল হঠাৎ এসে ওদের দেখেছি এখানে—

—ওরা কারা?

—তুমি যাদের কথা ভাবছিলে—বিহারের খরা অঞ্চলের লোক।

—তাই নাকি? আপনি কি ক'রে জানলেন?

—আমি কাল ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। দ্বারভাঙ্গা জেলার একটি গ্রামের প্রায় সব কজন লোকই খাদ্য পানীয় না-পেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।

আমি লোকগুলোর দিকে এবার তাকিয়ে দেখলুম। শিশু-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ মিলিয়ে একটা গোটা গ্রামের সব লোক—দেখলে মনে হয় চাষী শ্রেণী। সারাদিন ওরা ভিক্ষে করে, রাত কাটায় গঙ্গার ধারে—পারিবারিক বন্ধন থেকে সবকিছুই এখানে বজায় আছে। মাঝখানে কয়েকটা বিরাট বিরাট মাটির হাঁড়িতে খিচুড়ি ফুটছে, আর ওরা নিশ্চিন্ত ভাবে গান গাইছে। কলকাতা শহর ওদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছে।

একবার চড়াৎ করে মনে পড়ল, ইস, এই সব লোকই এসে কলকাতার ভিড় বাড়াচ্ছে, কলকাতাকে নোংরা করছে—কোনো মানে হয় না। পরক্ষণেই ভাবলুম, কী স্বার্থপর আমি! একটু আগে বিহারের আর্তদের দুঃখে অভিভূত হয়েছিলুম, এখন তাদেরই একদল কলকাতায় আশ্রয় পেয়েছে বলে খুশি হতে পারছি না! তারপর ও চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে, ওদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করলুম।

সরল, এক-রঙা সব লোক, দেহাতি ভাষার সব কথা বুঝতে পারি না। এটুকু বুঝলুম, ওরা কখনো আগে ভিক্ষা করেনি, এবার আর উপায় ছিল না। গ্রামকে গ্রাম শুকিয়ে মরতে হতো, তাই দল বেঁধে চলে এসেছে কলকাতায়। সারাদিন ভিক্ষে করার পর এখানে এসে আবার জড়ো হয়, ভিক্ষের চাল একসঙ্গে করে খিচুড়ি ফোটায়, তারপর একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানেই গঙ্গার ধারে ঘুমিয়ে পড়ে। বৃষ্টিপাত শুরু হলে আবার ফিরে যাবে নিজের গ্রামে।

বেশ খিচুড়ির গন্ধ বেরিয়েছে, ছাপ ছাপ কাপড়-পরা দুটো জোয়ান চেহারার যুবতী মেয়ে কাঠের টুকরো দিয়ে হাতা বানিয়ে খিচুড়ি ঘুটছে। সেই রান্নার গন্ধে হঠাৎ আমার খিদে জেগে উঠল।

ওদের দলের এক বুড়ো আমাদের জিজ্ঞেস করল, বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ? আমরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে বুড়োটি অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, বাবু, আমাদের খাবার একটু প্রসাদ করবেন? দয়া করে যদি—

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, না না সেকি! বুড়োটি বলল, তারা সবাই নিচু জাত, গঙ্গা মাইজির পাড়ে বসে খাবার খেতে হলে প্রথমে ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ না করে তারা তো খেতে পারে না, তাহলে পারমাত্মা সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং আমরা যদি দয়া করে—

সঙ্গের লেখকটি বললেন, অত আপত্তি করছ কেন? রাজি হয়ে যাও না। গরম গরম খিচুড়ি মন্দ লাগবে না। খাওয়ার পর বোকার মতন তুমি আবার যেন ওদের পয়সা দিয়ে অপমান করতে যেও না।

গঙ্গাজল ছিটিয়ে শালপাতা বিছিয়ে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হলো।

ভক্তিভরে পরিবেশন করল মেয়েরা। পাঁচ রকমের চাল-ডাল, সেই সঙ্গে ভিক্ষে পাওয়া আলু বেগুন যা পেয়েছে—সবই সেদ্ধ দিয়েছে। অপূর্ব স্বাদ, অমন সুন্দর খিচুড়ি বহুদিন খাইনি। খুব তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেয়ে উঠলুম।

বিহারের খরাপীড়িত লোকদের সাহায্য করব ভেবেছিলুম, উল্টে তারাই আমার এক রাত্তিরের খাওয়া জুটিয়ে দিল।

২৮

নদী কোথা থেকে আসছে—এর উত্তর তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন, নদী আসে মহাদেবের জটা থেকে। কথাটা সত্যি কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য আমি নিজেও অনেক নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?' কুলকুল কলধ্বনির মধ্যে আমিও সেই একই উত্তর শুনেছি, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

নদীর পাড়ে বসে আমি আর একটি প্রশ্নও করেছি, যখনই যেখানে নদী দেখেছি, আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে সেই প্রশ্ন, নদী তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

এর উত্তর পেতে আমার দেরি হয়েছে। সকালে, সন্ধ্যায়, একা বা দলবলের সঙ্গে শহরে বা নির্জন প্রান্তরে যেখানেই আমি নদী দেখেছি, খুব গোপনভাবে জিজ্ঞেস করেছি, নদী তুমি কোথায় যাচ্ছ ? কখনো এই উত্তর শুনিনি, 'সমুদ্রে'। না, নদী আমাকে কোনোদিন কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে বলেনি, আমি সমুদ্রে যাচ্ছি। অথচ জানি তো, নদী সমুদ্রেই যায়, আর কোথাও তার যাবার উপায় নেই, তবু নদী কখনো নিজের মুখে সে-কথা বলে না।

মানুষও তো যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে, কিন্তু মানুষ কি সে-কথা বলে ? রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ হনহন করে হেঁটে চলেছে, যদি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, কি, কোথায় চলেছেন ? তিনি কি উত্তর দেবেন, মৃত্যুর দিকে ? অথচ, সেইটাই তো সত্যি উত্তর। কিন্তু কোথায় চলেছেন, একথা জিজ্ঞেস করলে, সব মানুষেরই অন্তর্নিহিত একটিই উত্তর: আর একজন মানুষকে খুঁজতে।

সবাই সারাজীবন আরেকজন মানুষকে খুঁজছে—সে খোজাই বোধহয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ায় না।

নদীও যায় সমুদ্রের দিকে, কিন্তু সে-কথা বোধহয় তার মনে থাকে না, সেও বোধহয় আর একটি নদীকে খোঁজে। পৃথিবীতে এমন একটিও নদী আছে কি, যে পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে একা-একা সোজা গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে ? ভূগোলে

এমন কথা কখনো পড়িনি। এরকম চিরকুমারী, ব্রহ্মচারিণী নদী বোধহয় পৃথিবীতে একটাও নেই। সব নদীই আর একটি নদীকে খোঁজে, সমুদ্রে যাবার আগে।

যাই হোক, নদী আর মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলা আর সস্তা তুলনাটা বেশি টেনে লাভ নেই। মানুষের কথা থাক, আমি শুধু নদীর কথাই বলি।

জগদীশচন্দ্র নদীর ভাষা বুঝতেন, আমার তো সে ক্ষমতা নেই। আমি নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? নদীর জলে তখন অস্পষ্ট কোলাহল, তরঙ্গের বিভঙ্গ, যেন নদীর মধ্যে তখন খুব একটা হাসাহাসি পড়ে গেছে, পিকনিকে মেয়েদের মতন তরল ইয়ার্কিতে আসল কথা গোপন করার চেষ্টা। বুঝতে পেরেছি, নদী আমায় উত্তর জানাতে চায় না, কিন্তু তার ছটফটানি দেখলে বুঝতে পারা যায়, সে অন্য নদীকে খুঁজতে যাচ্ছে।

এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম আমি বার ছয়েক দেখেছি, কলকাতার কাছেই ত্রিবেণীও আমার দেখা, আরো অনেক নদীর মিলনকেন্দ্র দেখার স্মৃতি আমার আছে, তবু, কোথাও কোনো নদী দেখলেই এখনো আমার মনে হয়—কোথায় সে অন্য নদীর সঙ্গে মিশেছে—একবার দেখে আসি। জগদীশচন্দ্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গঙ্গোত্রীর অভিমুখে গিয়েছিলেন, আমিও একবার দুই নদীর মিলনকেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলুম। জগদীশচন্দ্রের তুলনায় আমার প্রতিভা যত ছোট, ভাগীরথীর তুলনায় সেই নদীও তেমনি ছোট।

বোগা ছির্‌ছিরে নদী, নাম হারাং। সাওতাল পরগণায় নামুচক গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর সাঁওতালি নাম হারাং, বাংলায় হারান বলতে ইচ্ছে হয় আমাদের, এমনই করুণ, অভিমানী, হারিয়ে যাবার মতন চেহারা তার। হারান নাম হলে অবশ্য আর নদী থাকে না, বলতে হয় নদ, কিন্তু নদ কথাটা আমার পছন্দ নয়, বিশ্রী শুনতে। মেয়ে-পুরুষ যাই হোক, সব নদীই নদী, যেমন সব পাখিই পাখি, পুরুষ পাখিদের তো আমরা পাখ বলি না।

সেই হারাং নদীর পাশে ডাকবাংলো, সেখানে কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন শহুরে বাবু ও বিবি। আমাদের পরনে চোঙা প্যাণ্ট, হাতে ট্রানজিস্টার, মহিলা দু'জনের হ্রস্ব জামার ফাঁক দিয়ে বহু বাতাস ঢুকতে পারে —অর্থাৎ পোশাকের মধ্যে অনেক জানলা-দরজা, ঠোঁট ও পায়ের নখ লাল, অদূরে দাঁড়ানো জিপ গাড়ি। আমাদের সরু-মোটা গলা ও ট্রানজিস্টারের কর্কশ নিনাদে সেই নির্জন নদীতীর গমগমে হয়ে উঠেছিল, প্রতি সকালবেলা এক-চতুর্থ ডজন মুরগি কিনে এনে মহোল্লাসে হত্যা করা হচ্ছে, খোঁজ করা হচ্ছে মহুয়ার, হিন্দী ফিলমের নায়কের মতন প্যান্টের পা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে আমরা যখন তখন নদী পেরিয়ে যাচ্ছি।

মহিলা দু'জন বলেছিলেন মাগো, কি বিশ্রী নদীটা, দেখলে বমি আসে! আর কোনো ডাকবাংলো পাওয়া গেল না?

সত্যি, সে নদী দেখে মুগ্ধ হওয়া যায় না। অনেক উদ্যোগ আয়োজন করে খাড়া পাড় বেশ নেমে গেছে বটে—কিন্তু পরিসর আট-দশ ফুট মাত্র এবং হরে-দরে হাঁটুজল। চারপাশে এবড়োখেবড়ো পাথর ছড়ানো, জলের রং অপরিষ্কার, যেন নদী নয়, জঙ্গলের খোলা ড্রেন।

সে নদীর একমাত্র গুণ, রাত্রিবেলা অস্পষ্ট আলোয় যখন চতুর্দিক ঝাপসা—তখন শুধু হারাং নদীর জল চকচক করে, শোনা যায় অস্পষ্ট ছলছল শব্দ। সেইটুকু মাত্র গুণের জন্যই আমরা সন্ধ্যাবলা হারাং নদীর পাড়ে পাথরের চাঁই-এর ওপর বসতুম। খোলা গলায় বেসুরো গানের পরিহাস রসিকতা হতো। ওগো, নদী আপন বেগে পাগলপারা—এই গানও কেউ গেয়েছিল।

ডাকবাংলোর কীপারের নাম লেট্টু। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, লেট্টু, এ নদীটা কোথা থেকে আসছে রে?

লেট্টু কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দেয়, আসেনি তো। এ নদী তো এখানেই ছিল! ই হারাং নদী বটে!

শুনে আমাদের দলের কেউ কেউ হাসে। অনুমান করা যায়, হারাং নদী কাছেই কোনো পাহাড়ী জলপ্রপাত থেকে এসেছে। কিন্তু নদীটা গেছে কোনদিকে? সমুদ্রে নিশ্চয়ই নয়, এ নদীর চৌদ্দ পুরুষেও কেউ সাগর দর্শন করতে পারবে না। লেট্টুকে আবার জিজ্ঞেস করলুম, প্রশ্নটার গুরুত্ব আনবার জন্য হিন্দীতে, লেট্টু ই নদী ইধার কিৎনা দুরতক গিয়া? লেট্টু হিন্দী জানে না, তাচ্ছিলোর ভঙ্গি করে, উও জঙ্গলের মধ্যে কুথাও হারিয়ে গিয়েছে হবেক।

এবারেও আমাদের দলের মধ্যে হাস্য। কেউ বললে, বুঝলি না, হারান-ই হচ্ছে নদীটার আসল নাম। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও হঠাৎ শুকিয়ে গেছে—দূর, এ আবার নদী!

মুরগি বিক্রি করতে আসে ওসমান মিঞা, সে অনেক জানেশোনে, বুড়ো মানুষ—তার অনেক অভিজ্ঞতা, তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, হয়তো। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আমার ভরসা হয় না, আবিষ্কারের নেশায় আমায় পেয়ে বসে, মনে মনে সংকল্প করে ফেলি, নদীটা কোথায় গেছে দেখতে হবে। হঠাৎ নিশ্চয়ই শুকিয়ে যায়নি, যত ছোটই হোক, এরও তো জলে স্রোত আছে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর কারুকে কিছু না বলে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। একটা গরাণ গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়েছি, জুতো পরিনি, শুধু গেঞ্জি গায়ে—খাঁটি পর্যটকের চেহারা। কিছুটা যেতেই দেখতে পেলাম,

আমাদের দলের মহিলা দু'জনের অন্যতমা হারাং নদীর খাদে নেমে বনতুলসী কিংবা ঘেঁটু পুষ্পচয়নে ব্যস্ত। আমাকে দেখে মুখ তুলে বললেন, কোথায় যাচ্ছ ? আমি বললুম, এই একটু এদিক দিয়ে ঘুরে আসছি! শ্রীমতী বললেন, আমিও যাব। বললুম, না না তোমায় যেতে হবে না।

এ কথা বলেই ভুল করেছিলুম। কেন না, মেয়েদের কোনো জিনিস বারণ করলে তারা শোনে কখনো ? সেটাতেই জেদ ধরে। সুতরাং তিনি বললেন, হ্যাঁ যাব।

আমি তবু বললুম, না, যেতে হবে না। ওরা বকাবকি করবে। তা ছাড়া আমার ফিরতে দেরি হবে।

শ্রীমতী বললেন, বেশ করব, যাব। তোমার সঙ্গে তো যাচ্ছি না, আমি আলাদা যাচ্ছি। অর্থাৎ তিনি রইলেন নদীর অন্যপাড়ে, সেই প্রাচীন রূপকথার নারী-পুরুষের মতন।

নদী কোথা থেকে আসছে—তা দেখার আমার কৌতূহল নেই; সুতরাং নদীর স্রোত যে দিকে আমরা সেই দিকে হাঁটছিলুম। ক্রমশ জঙ্গল একটু ঘন হলো নদীও একটু গভীর, নদীর পাড় দিয়ে রাস্তা নেই—এখন রুক্ষ পাথর ও আগাছার ঝোপ তা ছাড়া আর একটা অসুবিধে, গ্রাম-বালকরা তাদের সকালের কাজকর্ম নদীর ধারেই সেরে রেখে যায়—যে কোনো মুহূর্তে তাতে পা পড়ার সম্ভাবনা। ওপার থেকে শ্রীমতী চেঁচিয়ে বললেন, কি বিশ্রী জায়গা, আমার আর ভালো লাগছে না। আমি বললুম, কে তোমায় আসতে বলেছিল ? শ্রীমতী রাগতভাবে বললেন, চলো, এবার ফিরে যাই। আমি বললুম, তুমি ফিরে যাও। আমি যাব না! শ্রীমতী এবার কাঁদো কাঁদো. এতটা চলে এসেছি, এখন আমি একলা ফিরব কি করে ? আমি বললুম, তা হলে যা ইচ্ছে করো। শ্রীমতী এবার বললেন, নীলুদা, আপনি এরকম—

তখনো নদী তেমন চওড়া হয়নি, কিন্তু জল গভীর হতে শুরু করেছে। কিছু একটা দেখতে পাবার উত্তেজনা এসেছে আমার মধ্যে। আমি এগিয়ে চললুম।

শ্রীমতী একবার এপারে আসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জলে নেমে দেখলেন —শাড়ি অনেকখানি তুলতে হয়, সুতরাং নিবৃত্ত হয়ে অগত্যা আবার সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। এবং অবলীলাক্রমে মিথ্যে অভিযোগ করে বললেন, তুমি শুধু শুধু আমায় এতদূর নিয়ে এসে এখন একা ছেড়ে দিতে চাও! বেশ জোরে হাওয়া বইছে, সুতরাং আমাকে চেঁচিয়ে ওপার থেকে বলতে হলো, কী মিথ্যেবাদী! মোটেই আমি তোমাকে আনিনি, আমি একা-একা আসছিলুম, তুমি তো জোর করে আমার সঙ্গে এলে! শ্রীমতী আরো রেগে গিয়ে বললেন, মোটেই না। আমিই তো একা ফুল তুলছিলাম। তুমিই তো দেখিয়ে দেখিয়ে আমার সামনে দিয়ে

আসছিলে—উদ্দেশ্য আমায় সঙ্গে ডাকা! আমি ঠোঁট উল্টে বললুম, বয়েই গেছে আমার তোমায় ডাকতে!

ক্রমে বেশ বেলা হয়ে এল, রোদ্দুর প্রগাঢ়। ইচ্ছে হয় গা থেকে গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে। কিন্তু ওপারে মাত্র তো কয়েক হাত দূরেই শ্রীমতী, সুতরাং খালি গা হওয়া যায় না। পথে একটা ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে এলুম, একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই—এমন ছোট্ট গ্রাম, শুধু হোগলা পাতার কয়েকখানা ঘর আর কিছু মুরগি-ছাগল ও উলঙ্গ শিশু। আবার জঙ্গল। দুপুরের কাছাকাছি আমি সেই অভীষ্ট অঞ্চলে পৌঁছুলাম।

লাট্টুর মতো দেখতে একটা ছোট্ট টিলা, ভেড়ার লোমের মতন তার গায় ছোট ছোট আশসেওড়ার জঙ্গল, তার মাঝখান দিয়ে বিনা নোটিশে নেমে এসেছে আর-একটা নদী, একটু পুরুষ ধরনের বলশালী নদী, পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে তার জলে সাদা ফেনা পর্যন্ত ওঠে। সেই নাম-না-জানা নদীতে মিশেছে আমাদের হারাং।

এখানেই হারাং-এর জন্ম সার্থক! হারাং যেখানে অন্য নদীতে মিশেছে—সেখানেও তারও জল স্বচ্ছ, তার জল দুলছে, ঘূর্ণীতে নেচে উঠছে—আনন্দে সেখানে সে আত্মহারা। যেন সেই জায়গাটা অবিকল একটা পেঙ্গুইন এডিশান প্রয়াগ-সঙ্গম, ঐ ছিরছিরে রোগা পটকা হারাং এখানে ঘূর্ণী ঘুরিয়ে নাচছে। আমি আবিষ্কারকের আনন্দে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শ্রীমতী বললেন, আমি ওপারে যাব, এখন তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ নেই, অনুনয়। আমি বললুম, চলে এসো! শ্রীমতী বললেন, পারছি না, তুমি এসো।

আমি পা ডুবিয়ে লাঠি বাড়িয়ে দেখলুম, জল বেশ গভীর, তাছাড়া স্রোতের টান খুব, পা স্থির রাখা যায় না। বললুম, উঁহু, যেতে পারছি না।

শ্রীমতী করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার একা ভালো লাগছে না। না, তুমি এসো। যেমন করে হোক!

আমি বললুম, একা কোথায়। এই তো এদিকে আমি রয়েছি, কতটাই-বা দূর। শ্রীমতী তবু বললেন, না, তুমি এদিকে এসো। মাঝখানে নদীটা ভালো লাগছে না। আমি বললুম, তা হলে আগেই এলে না কেন? যখন জল কম ছিল?

শ্রীমতী বললেন, আগে ইচ্ছে করেনি কিন্তু এখন আমার একা ভালো লাগছে না।

শ্রীমতী তখন সেই দুই নদীর মেশার জায়গায় জলের ঘূর্ণী ও ঢেউ ভাঙার খেলার দিকে বিষণ্ণমুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

ভোরবেলা পার্কে

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূতেরা সব গেল কোথায়?

বাংলার রূপকথা কিংবা উপকথার গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়, এই বঙ্গভূমিতে এককালে প্রচুর সংখ্যক বাঘ ছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বইতে তো বাঘের ছড়াছড়ি। বাঘ দিনদুপুরে বাড়ির উঠোনে বসে থাকে, রান্নাঘরে উঁকি মারে কিংবা রাত্তিরবেলা কম্বল চুরি করে পালায়। সেইসব বাঘ পায়েস খেতে চায়। ভয়ো হাড়ির মালা গলায় পরে। নিত্য তিরিশ দিন বাঘের দেখা না পেলে মানুষ এই রকম গল্প বানায় না। তবে বাঘগুলো নিশ্চিত নিরীহ ছিল, চাষীর ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে সেইসব বাঘের। আবার ধুরন্ধর নাপিত কিংবা জোলার হাতে জব্দ হয়েছে অনেকবার। বাঘে মানুষ খেয়েছে, উপকথার গল্পে এ-দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বলা যায়। অর্থাৎ নিরীহ ধরনের কেদো বাঘে এক সময় বাংলার পল্লী অঞ্চল গিসগিস করত, মানুষই তাদের মেরে শেষ করেছে।

এখন বাঘের বংশই শেষ হতে বসেছে। আগে বাঘের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, এখন আবার বাঘের বংশনাশের ভয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সারা পৃথিবীব্যাপী একটি 'ব্যাঘ্র বাঁচাও' আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ইউনেস্কো থেকে দয়ালু সাহেব-মেমরা পর্যন্ত ছুটে আসছেন ভারতীয় বাঘদের বাঁচাতে। সারা ভাবতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নটা না এগারোটা ব্যাঘ্র প্রকল্প। সুন্দরবনের দুর্দান্ত বাঘরাও এখন মানুযের দয়াব ওপব নির্ভরশীল।

যাই হোক মনে তো হচ্ছে, বাঘরা আরও কিছুকাল বেঁচে গেল। ডোডো পাখিদের মতন শুধু ছবির পাতায় স্থান নিতে তাদের আরও একটু দেরি আছে। কিন্তু ভূতদের কি হবে?

এই তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত শহরে-গ্রামে অসংখ্য ভূত ছিল। উপকারী ভূত, হিংসুটে ভূত, ভয়-দেখানো ভূত, ভয়-পাওয়া ভূত, খোকা ভূত, লোভী ভূত, ব্রহ্মদত্যি, শাকচুন্নী, পেত্নী, মামদো ভূত—কত রকম যে তার আর ইয়ত্তা নেই। উলঙ্গ আদিবাসীদের মতনই, পৃথিবীর ভূতরাও যে অতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ সে সম্পর্কে কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই—এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। কেন 'ভূত-বাঁচাও' প্রকল্প রচিত হবে না? ভূতরা বাঘদের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর?

পৃথিবী থেকে বাঘ শেষ হয়ে গেলে, আমার মতে প্রধান ক্ষতি হবে এই, বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প আর লেখা হবে না। অবশ্য, ব্যাঘ্র প্রকল্প রচনা হওয়ায় এখন থেকেই কেউ আর প্রকাশ্যে বাঘ শিকারের কথা জানাতে সাহস করবেন না। তেমনি, ভূতগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পৃথিবীতে আর ভূতের গল্প লেখা হবে না। এটা ভেবে আমি এখন থেকেই দুঃখিত বোধ করছি। সাহিত্যের এই চমৎকার শাখাটি বন্ধ হয়ে যাবে! এর মধ্যেই ভূতের গল্প অনেক কম লেখা হতে শুরু হয়েছে, যা লেখা হচ্ছে তাও বেশ ফিকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া কি এসব লেখা যায়?

অনেকে ভগবানে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে। আবার এমন মানুষও দেখেছি, যারা দিনের বেলা ভূত বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু রাত্তিরবেলা তাদের মতামত তেমন জোরালো থাকে না। যুক্তি বা তর্কে ভগবান বা ভূত কারুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ভগবানের দর্শন মেলে ভক্তিতে, ভূতকে মেলে ভয়ে। এবং যেহেতু ভক্তির চেয়ে ভয়ের প্রাবল্য অনেক ব্যাপক, সেই জন্যই ভূতের দর্শন পেয়েছে অনেক বেশি মানুষ। ভয়-পাওয়াটা সব সময় মোটেই খারাপ জিনিস নয়। ছমছমে ভয়ে বেশ একটা মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়, রক্ত-চলাচল হয় দ্রুত, বুকের মধ্যে টিপটিপ আওয়াজ, পেছন দিকে তাকাতেও সংশয়—যে এর স্বাদ পায়নি, সে এর মর্ম বুঝবে কি!

ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করার একটা অপ্রত্যক্ষ উপায়ও আছে। খ্রিষ্টান মতে, যীশুখ্রিষ্টের শরণ যে নেয় না, তার স্বর্গে স্থান নেই। অর্থাৎ যীশুখ্রিষ্টের জন্মের আগে হাজার হাজার বছর ধরে যেসব মানুষ মরেছে, তারা কেউ স্বর্গে যেতে পারেনি, তারা লিমবো নামে একটা জায়গায় রয়েছে। এই লিমবোকে একটি সুবৃহৎ ভূত কলোনী ছাড়া আর কি বলা যায়। ইসলামী শাস্ত্রেও আছে মানুষের মৃত্যুর পর স্বর্গের ফেরেস্তা তার রুহ কবজ করতে আসেন। এখানেও আছে পুণ্যাত্মার জন্য স্বর্গ, পাপীদের জন্য নরক। হিন্দুধর্মেও আছে স্বর্গ-নরক। পুণ্যাত্মাদের থেকে পাপীদের সংখ্যা যে চিরকালই বেশি, এ বিষয়ে আশা করি, কারুর কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। সেই হিসেবে, স্বর্গে এখনো পপুলেশন এক্সপ্লোশান না হলেও নরকে এই তিন ধর্মের এত কোটি কোটি লোকের জায়গা হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার না? নরক ঠেলে তারা পৃথিবীতে তো আসতেই পারে। এই তিন ধর্মেরই বিশ্বাস, মানুষের মৃত্যুর পরেও তার আত্মা নামে একটা ব্যাপার থাকে এবং সেই বস্তুটি অবিনাশী। এত আত্মার ঠাঁই হচ্ছে কোথায়। হিন্দু ছাড়া আর কেউ পুনর্জন্ম মানে না। তবে, পুনর্জন্মের মাঝখানে কিছুদিন অনেক আত্মা বেলগাছে বা অশত্থগাছের মগডালে বসে কিছুদিন ভূতগিরি করে যায়। আবার এক শ্রেণীর

হিন্দুর ধারণা গয়ায় পিণ্ডি না দিলে কোনো আত্মারই মুক্তি নেই। সুতরাং যতদিন পিণ্ডি দেওয়া না হচ্ছে কিংবা যাদের দেওয়াই হচ্ছে না, তাদের তো ভূত হয়ে থাকার ন্যায্য অধিকার আছেই।

তা ছাড়া ভূতের অস্তিত্ব একেবারে প্রমাণ করে দিয়েছেন স্বর্গত পরশুরাম তাঁর বিখ্যাত গল্প মহেশের মহাযাত্রায়। যেখানে অবিশ্বাসী মহেশ তার মৃত্যুর পর গঙ্গাযাত্রার সময়ে খাটিয়ার ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে বলেছিল, আছে, আছে, সব আছে।

আমরা অবশ্য সাহেব ভূত, ব্রহ্মদৈত্য (ব্রাহ্মণ ভূত) বা মামদো ভূত (মুসলমান ভূত)-এর প্রচুর সত্যি গল্প শুনেছি। আমি অবশ্য নিজের চোখে কোনো ভূত দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারিনি এ পর্যন্ত, কিন্তু ছেলেবেলায় ভূতুড়ে বাড়ি দেখেছি প্রচুর।

বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও কলকাতায় প্রচুর ভূতুড়ে বাড়ি ছিল। শৈশবকালে আমরা উত্তর কলকাতায় যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, সেই বাড়ির ছাতেই রাত্তিরবেলা ওঠা ছিল বারণ। মাঝরাত্রে সে বাড়ির ছাদে দুমদুম শব্দ হতো। সেই বাড়ির একটি বিবাহিতা মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল কয়েক বছর আগে। সে মাঝে মাঝে চিলছাতে এসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত। কতজন তাকে দেখে মূর্ছা গেছে। মৃত্যুর আগে মেয়েটি খুব রূপসী ছিল, স্বামীর অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বলেই বোধহয় তার গলাটা খুব লম্বা হয়ে যায়—চিলছাতে বসেই সে এক-একদিন মুখ ঝুঁকিয়ে এনেছে সিঁড়ির কাছে।

সে বাড়িতে আমাদের বেশি দিন থাকা হয়নি। এর পরে যে পাড়ায় উঠে গিয়েছিলাম সে পাড়ায় একটি অতি জমকালো ভূতের বাড়ি ছিল। বিরাট তিনতলা বাড়ি, সামনে বাগান, কিন্তু সেখানে দিনের বেলাতেও কেউ ঢুকত না। বিশেষ বিশেষ রাত্রে সেই অন্ধকার ভূতুড়ে বাড়ির তিনতলার ঘরগুলো থেকে বিশ্রী আওয়াজ ভেসে আসত, ঝপাঝপ করে খুলে যেত জানলা-দরজা, আলো জ্বলত আর নিভত। আর কাঁচা মাংস ও হাড় সেই বাড়ি থেকে ভূতেরা ছুঁড়ে ফেলত চতুর্দিকে। মালিক সেই বাড়ি বিক্রির অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিক্রি তো দূরের কথা, সে বাড়ি ভাড়াও হয়নি কোনো দিন। কালীসাধক অসমসাহসী গগনবাবু একদিন সে বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েছিলেন, শেষ রাত্রে তিনি বাপরে মারে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটি পেত্নী নাকি সুন্দরী মেয়ে সেজে এসে তাঁর পায়ের আঙুল কামড়ে ধরেছিল। একেবারে কচ্ছপের মতন কামড়, মাংস তুলে নিয়েছে।

তারপর দেখেছি আমাদের স্কুলের বিপিনবাবু স্যারকে। তাঁর সারা গায়ে ছিল

ফালা-ফালা দাগ। একদিন জামা খুলে দেখিয়েছিলেন আমাদের। কাহিনীও শুনেছিলাম। ছেলেবেলায়, বিপিনবাবু স্যারের নাম যখন বিপিন, বোর্ডিং-এ থেকে পড়তেন, সেই সময় বোর্ডিং-এর একটি ছাত্র অজয়ের সঙ্গে তাঁর খুব ঝগড়া হয়। বিপিনের খুব গায়ে জোর, সে মারধোর দেয় অজয়কে। হেরে-যাওয়া অজয় শাসিয়েছিল, আচ্ছা দেখিস, একদিন ঠিক শোধ নেবো।

কয়েক মাস বাদে গরমের ছুটিতে অনেক ছেলেই বোর্ডিং ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে। যাদের যাবার জায়গা নেই কোথাও, তারাই থেকে গেছে, সেইরকম চারজনের মধ্যে রয়েছে অজয় আর বিপিন। হঠাৎ এক রাত্রির কলেরায় মারা গেল অজয়। দারুণ বৃষ্টি-বাদল দুর্যোগ, কিন্তু ব্রাহ্মণের মড়া বাসি করতে নেই বলে অন্য তিন বন্ধু নিয়ে গেল তাকে পোড়াতে। গ্রামের শ্মশান, বৃষ্টির দিনে একেবারে ফাঁকা। কাঠ-ফাট যোগাড় করে চিতা জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল কেউ দেশলাই আনেনি। তিন মাইল দূর থেকে দেশলাই আনতে হবে--কেউ একা থাকতে চায় না। কেউ একা যেতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অসমসাহসী বিপিন একাই বসে রইল মড়া ছুঁয়ে।

অন্য বন্ধুরা একটু দূরে যাওয়া মাত্রই পটপট করে দড়ি ছিঁড়ে উঠে বসল অজয়। এখন তার গায়ে দারুণ শক্তি। সে হিংস্রভাবে বলল, তবে রেঁ বিপিন! বিপিন তাকে জোর করে চেপে ধরে রইল, আর অজয়ের মড়া ধারালো নখ দিয়ে চিরে দিতে লাগল তার সারা গা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ঘাড়...

এই কাহিনী শোনার পর বিপিন স্যারকে দেখলেই ভয় পেতাম আমরা। ভূতের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছে, তাকে দেখলেও ঠিক যেন বীর মনে হয় না।

এরকম গল্প ছড়ানো ছিল অজস্র। কলকাতায় বহু বড়ো বাড়িতে ছিল এরকম ভূতের আড্ডা। শহরতলি, এমনকি প্রত্যেক গ্রামেই একটা-না-একটা ভূতুড়ে বাড়ি ছিল। কত অন্ধকার জলসাঘর রাত দুপুরে আলোয় ঝলমল করে উঠত, শোনা যেত বাঈজীদের পায়ের আওয়াজ, কত অতৃপ্ত জমিদারের মৃত আত্মা আবার মদ্যপান করতে আসত সেখানে। কত কলাগাছের পাশে ঘোমটা পরা সুন্দরীর সাজে দাঁড়িয়ে থাকত পেত্নীরা। কত বেলগাছের ডালে বিশাল স্তনমণ্ডিতা শাকচুন্নীরা বসে বসে পা দোলাত। আর প্রতি অমাবস্যায় রাত্রে তুফান মেল এলেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বারবার আত্মহত্যা করতে ছুটে যেত এক নির্যাতিতা বধূ।

তখন কলকাতায় যেমন ছিল 'টু লেট' ঝোলানো বাড়ি, সেই রকমই ছিল বহু ভূতের বাড়ি। গত শতাব্দীতে একটি বাড়ির মালিকানার প্রশ্নে ভূতের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত উঠেছিল হাইকোর্টে। একবার ভূতুড়ে নাম রটে গেলে, সে বাড়ি জলের দামেও বিক্রি হতো না।

একটা মোটামুটি হিসেব এখানে জানাচ্ছি। উনিশশো আঠারো সালে

কলকাতায় খালি বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩২৫টি, তার মধ্যে ভূতের বাড়ি নব্বইটি, ১৯৩০ সালে খালি বাড়ি ২৪৪টি, ভূতের বাড়ি পঁচানব্বই, ১৯৪১ সালে খালি বাড়ি ১৪০০০, ভূতের বাড়ি ছিল দুশো বাইশ। ১৯৫৪ সালে খালি বাড়ি মাত্র ১২টি, ভূতের বাড়ি একটিও না! আচমকা যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন, এই পরিসংখ্যান আমি পেলাম কোথায় কিংবা এই পরিসংখ্যান সত্য কিনা, তবে তাঁদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মিথ্যা তিনরকম, লাই, ড্যাম লাই এবং স্ট্যাটিসটিকস।

অনেকের ধারণা, বিজলি বাতিই বুঝি ভূতদের তাড়িয়েছে। এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। কলকাতা শহরে ভূতদের বাস্তুহারা করেছে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা। এই রিফিউজিরাই পিলপিল করে এসে এখানে একটাও বাড়ি খালি রাখেনি, ভূতের বাড়ি গ্রাহ্য করেনি, খালি বাড়ি দেখলেই জবরদখল করেছে। বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়িগুলো এখন বাঙাল ভূতদের অধীনে। আমার মতন বাঙাল এবং রেফিউজিরাই যে কলকাতার বহু সমস্যার জন্য দায়ী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরা সুন্দর কলকাতাকে নষ্ট করেছে, ভিড়ে ভিড়াক্কার করেছে, রাস্তাঘাট নোংরা করেছে। আর এই রেফিউজিদের আগমনের জন্য যারা দায়ী, ভারত ভেঙে ভাগ করেছিল যেসব বুড়ো খোকারা, তারাও কবে মরে ভূত হয়ে গেছে! এখন আর নতুন ভূত পাওয়া যাচ্ছে কোথায়!

মানুষ কোথায় কোথায় হেরে যায়

আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, দেবেনদা একজন প্রচণ্ড নাস্তিক। নাস্তিকতা জিনিসটা যদিও পৃথিবীতে অনেক পুরোনো তবু অনেকেই এখনো প্রকাশ্যে কোনো নাস্তিককে দেখে চমকে যায়। দেবেনদা এই জন্যই অনেকের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। দেবেনদার লম্বা-চওড়া চেহারা, উন্নত ঘাড় এবং গমগমে কণ্ঠস্বর। নাস্তিকতার কথা তিনি সরবে ঘোষণা করতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো একজন সাহসী লোক। যদিও নাস্তিকরাই বেশি সাহসী হবে এমন কোনো কথা নেই, সন্ন্যাসীরাও সাহসী হতে পারে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস—যে কোনো গোঁড়ামিই মানুষকে একরোখা করে দেয়।

যাই হোক, অবিশ্বাসকে অবলম্বন করেই, দেবেনদা সুখী ছিলেন। তিনি ভূত বা ভগবান, যাগ-যজ্ঞ, পুজো-মানত, হোমিওপ্যাথি ওষুধ, তেরো নম্বর সংখ্যা ইত্যাদি সব কিছুকেই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতেন।

দেবেনদার সঙ্গে বিয়ে হয় সুলেখাদির।

যথাসময়ে ওঁদের একটি ছেলে হলো। কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। তার নাম রাখার জন্য রামায়ণ, মহাভারত আর দু' তিনখানা অভিধান উল্টেপাল্টে দেখা হলো অনেকবার। কোনো নামই পছন্দ হয় না। দেবেনদার কড়া হুকুম, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো নামই রাখা চলবে না। আমরা অবশ্য ওকে রাজকুমার বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই নামটাই থেকে গেল।

সাড়ে তিন বছর বয়েসে রাজকুমার দোতলা থেকে একতলায় পড়ে গেল এক দুপুরে। হাত-পা কিছুই ভাঙেনি মনে হয়, রক্তটক্তও বিশেষ বেরোয়নি, কিছুক্ষণের জন্য গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। একটা ইঞ্জেকশানের পরই ছেলে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ডাক্তার বললেন, এ ছেলেকে ভগবান বাঁচিয়েছে।

এর ক'দিন পর থেকেই রাজকুমারের হাত-পায়ে খিঁচুনির মতন শুরু হয়। ঠিক যেন মৃগী রোগ। হঠাৎ হঠাৎ হাত পা থরথর করে কাঁপে, তখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, শুয়ে পড়ে।

এক বছর পরে দেখা গেল রাজকুমারের এই অসুখ দুরারোগ্য। সব ডাক্তারই হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

ছেলের চিকিৎসার জন্য তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন দেবেনদা। তাঁর পিতৃ-হৃদয় এক প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, যে-কোনো উপায়ে ছেলেকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। মাদ্রাজ পর্যন্ত ঘুরে এলেন ছেলেকে নিয়ে। কিছুতেই কিছু হলো না। তখন ঠিক করলেন আমেরিকা যাবেন। দেবেনদার অত টাকার সঙ্গতি নেই। ক্রীতদাসের মতন পরিশ্রম করে দেবেনদা টাকা রোজগার করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যেই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা নানারকম টোটকার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তারপরই এসে যায় সাধু-ফকিরদের কথা। মাঝে মাঝেই দু'একজন সাধু বা ফকিরের নামে খুব জোর গুজব ওঠে যে তারা ধন্বন্তরি, যে-কোনো অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। বারুইপুরের সেই রকম এক সাধুর নাম তখন খুব চলছিল।

এক আত্মীয়ের সঙ্গে সুলেখাদি একদিন গেলেন সেই সাধুর কাছে। সাধু সুলেখাদিকে দেখেই বললেন, কি, ছেলের জন্য চিন্তা করছিস তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাধুর দেওয়া ওষুধে সতিাই নাকি খানিকটা উপকার হলো রাজকুমারের। একটা সাড়া পড়ে গেল আত্মীয় মহলে। দেবেনদা সব শুনে ঠোঁট বেঁকালেন। আত্মীয়রা খবর আনল, সাধু বলেছেন, একদিন বাড়িতে এসে যজ্ঞ করলেই ছেলে পুরোপুরি সেরে যাবে। দেবেনদার কোনো মতামত না নিয়েই ডেকে আনা হলো

সাধুকে। বারান্দায় যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে সাধু বললেন, ছেলের বাবা কোথায়? তাকেই এসে মন্ত্র পড়তে হবে।

দেবেনদা গুম হয়ে বসে ছিলেন অন্য এক ঘরে। সুলেখাদি সেখানে গিয়ে সজল চোখে বললেন, আমার মাথার দিব্যি, তুমি আপত্তি করো না। একবারটি গিয়ে বসো, ছেলের কথা ভেবে, আমার কথা ভেবে—

দেবেনদা আর কি করবেন? যে-কোনো উপায়েই হোক, পুত্রের রোগ-মুক্তি কোন পিতা না চায়? কিংবা মায়ের প্রাণ যদি এতে সান্ত্বনা পায়, সেটাও তো কম কথা নয়। স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে দেবেনদা গিয়ে বসলেন সেই সন্ন্যাসীর সামনে। যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়েছে, তার মধ্যে চটপট করে পুড়ছে খাঁটি টিনের ঘি। সন্ন্যাসী দেবেনদার হাতে শালগ্রাম শিলা তুলে দিয়ে নানারকম শক্ত শক্ত মন্ত্র পড়াতে লাগলেন, আমরা চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। এক সময় দেখলাম, দেবেনদার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা তো করতেই পারে। প্রিয়তম পুত্রের বিপদের কথা মনে করেও আসতে পারে কান্না, অদূরেই রোরুদ্যমানা সুলেখাদি বসে ছিলেন ছেলে কোলে নিয়ে। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল, দেবেনদার চোখের জল পড়ছে পরাজয়ের গ্লানির জন্য। তিনি সংস্কারের কাছে হেরে গেলেন।

রাজকুমার আর মাত্র এক বছর বেঁচেছিল। তারপর থেকেই দেবেনদা ঘোরতর ধর্মে নিষ্ঠাবান মানুষ। তাঁর ধারণা হয়েছিল অবিশ্বাসী মন নিয়ে তিনি পূজায় বসেছিলেন বলেই ঠিক মতন ফল হয়নি।

এই ঘটনাটা একটু সবিস্তারে বললাম, কারণ এটা আমার নিজের চোখে দেখা এবং ছেলেবেলায় আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। আমরা এর পুরো তাৎপর্য তখন বুঝতে পারিনি।

পৃথিবীতে সব মানুষের না হোক, বহু সংখ্যক মানুষেরই কিছু-না-কিছু আদর্শ থাকে। তা সরব হোক বা নীরব হোক। কিন্তু খুব কমসংখ্যক মানুষই সেই আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে পারে সারা জীবন। রাস্তায় ঘাটে, সভাসমিতিতে সব সময়ই দেখা যায় এরকম নীরব বিষণ্ণ হেরে যাওয়া মানুষের মুখ। আয়নাতেও আমি এরকম একটি মুখ দেখতে পাই।

মানুষ এভারেস্টের শীর্ষে উঠেছে, চাঁদে গেছে, আরও দূরে যাবে, কিন্তু এখনো সংস্কার, ঈর্ষা, লোভ—ইত্যাদি যে জিনিসগুলিকে সে মনে মনে জানে অন্যায় বা ভুল, তবু তার কাছে বশ্যতা মানে।

অতিকায় সমস্ত প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে মানুষ এই পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করেছে বুদ্ধির জোরে। তবু শারীরিক শক্তির প্রতাপ অনেক বেশি। আপনি যত

বড়োই পণ্ডিত বা আদর্শবাদী হোন না কেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি বিশাল চেহারার লোক যদি ধমকে বলে, ‘চোপ মশাই’—তা হলে আপনার আর কিছু করার নেই।

পৃথিবীর ভাগ্য এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রে, কিন্তু এখনো সামান্য একটা ছুরি আপনার ব্যক্তিত্ব কেড়ে নিতে পারে। প্রকাশ্য রাস্তায় একটি গুণ্ডা শুধু ছুরি উঁচিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ের গলা থেকে সোনার হার কেড়ে নিচ্ছে, দর্শকরা সবাই নিশ্চুপ। বস্তুত একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ার চে[illegible] একটি শিশুর খেলনা কেড়ে নেওয়ার দৃশ্য আমাদের কাছে বেশি মর্মান্তিক। সেখানে উপস্থিত থেকেও আমরা যদি বাধা দিতে না পারি, মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই একটু ছোট হয়ে যাই। আমাদের মুখে একটা মেঘলা ছায়া পড়ে। সেখানে যারা উপস্থিত থাকে না, তা[illegible] এই ঘটনা শুনে বলে, ইস, এতগুলো মানুষ ছিল, সবাই মিলে বাধা দিতে পারল না? গ্রামের লোক কখনো সদলবলে ডাকাতদের তাড়া করে বটে, কিন্তু শহরের লোক কখনো সঙ্ঘবদ্ধ হয় না। ভিড়ের মধ্যে আলাদা থাকাই শহরের মানুষের স্বভাব।

অসুখ [illegible]বং স্ত্রী, এই দুটি ব্যাপার যে কত মানুষকে হারিয়ে দেয়, তার আর ইয়ত্তা নেই। ক্যানসার, অ্যাটম বোমা এবং জাঁদরেল স্ত্রীর কোনো প্রতিষেধক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বটে, কিন্তু অনেক সাধারণ অসুখ কিংবা নবম স্ত্রীব পাল্লায পড়ে অনেক উন্নতমনা পুরুষ হঠাৎ কি রকম বদলে যায় কেন?

জীবিকার ক্ষেত্রে, চাকরি বা ব্যাবসা যাই হোক, মানুষকে অনেক কিছু মেনে নিতে হয়।

আমি একজন মানুষকে চিনতাম, যিনি মনে কবতেন ঘুষ নেওয়া একটা অন্যায় কাজ। এই ধরনের অদ্ভুত ধারণা এখনো কারুর কারুর আছে। প্রকৃতি এঁকে নিয়ে একটু পরিহাস করার লোভ সামলাতে পারেননি। এঁকে এমন একটি অফিসে চাকরি যোগাড় করে দি[illegible]ছিলেন, যে অফিসে প্রত্যেকের পক্ষে ঘুষ নেওয়া বাধ্যতামূলক। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এরকম অফিস শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। যেহেতু আমিও হেরে-যাওয়া মানুষ, তাই অফিসটির নাম করতে পারছি না। নাম করলেই সেখানকার বহু কর্মচারী নিজেদের সততার অকাট্য প্রমাণ দিয়ে আমাকে শাসাবে। যাই হোক, ঘটনাটা এই।

ঘুষের অনেক রকম নাম আছে। আদালতের পেশকারকে লোকে রায়ের কপি আনবার জন্য যেটা দেয়, সেটা কি? বাড়িওয়ালাকে নতুন ভাড়াটে কি দেয়? এই অফিসে ঘুষের নাম ছিল পার্সেনটেজ। মিলিটারি সাপ্লাইয়ের বড়ো বড়ো বিল পাস করে দিলেই কন্ট্রাকটাররা পাঁচ বা সাড়ে সাত পার্সেন্ট কর্মচারীদের দিয়ে যেতেন চা মিষ্টি খেতে। এক লাখ টাকার সাড়ে সাত পার্সেন্ট সাড়ে সাত হাজার টাকা।

বিয়ে বাড়িতেও লোকে এত টাকার মিষ্টি খায় না। দশ-পনেরো লাখ টাকার পার্সেন্টেজ আপনারা হিসেব করে নিন। এই টাকা বিভিন্ন কর্মচারীর পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করে খামে পুরে টেবিলে টেবিলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এটা সকল কর্মচারীর সাম্য-মনোভাবের জন্য নয়। যাতে কেউ কিছু ফাঁস করে দিতে না পারে কিংবা নিজেদের নির্দোষ না ভাবতে পারে। আমাদের পরিচিত প্রতাপবাবু তবু এটাকে দোষ ভেবে ফেললেন। তখন তাঁকে বদলি করা হতে লাগল বিভিন্ন শাখা অফিসে। প্রত্যেক জায়গা থেকেই তাকে অপদার্থ বলে ফেরত পাঠানো হয। তিনি অন্য চাকরির চেষ্টা করেছেন, পাননি। তিনি মাসের পর মাস ছুটি নিয়েছেন, আত্মীয়স্বজন গঞ্জনা দিয়েছে তাঁকে। তারপর উড়ো চিঠিতে জানান হলো, তাঁকে খুন করা হবে। ব্যস, সুযোগ এসে গেল, প্রতাপবাবু পাগল হয়ে গেলেন। চিকিৎসা চলল ছ'মাস, ছেলেমেয়েরা খেতে পায় না। আধপাগলা অবস্থাতেই তাঁকে ফেরত নেওয়া হলো অফিসে। এখন সবাই খুশি। তাঁকে কোনো কাজ করতে হয় না, তবু মাইনে ও উপরি ঠিক পেয়ে যান, একজন সহকর্মী সে টাকা নিজে ওঁর বাড়িতে এসে স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান।

পরাজয় ভুলে থাকার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া সবচেয়ে সহজ উপায়। আমার এক-এক সময় মনে হয়, উনি বোধহয় ঠিক পাগল নন, সুবিধে মতন পাগল সেজে আছেন। এক-একদিন দেখতে পাই উনি বড়ো রাস্তার মোড়ে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। কেউ কথা বললেও উত্তর দেন না। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। কি অদ্ভুত বিষণ্ণ চোখ। আসল পাগল বা সেজে-থাকা পাগল যাই হোক, এরকম দুঃখিত মানুষ আমি বহুদিন দেখিনি।

গল্পের গোয়েন্দা ও বাস্তব গোয়েন্দা

ডিটেকটিভ গল্প বা পূর্ণাঙ্গ রহস্যকাহিনী শুরু হলো কবে থেকে? মারিও প্রাটজ নামে একজন নাম-করা সমালোচক, দুমদাম কথা বলা যার স্বভাব, বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট'ই আজকের সমস্ত গোয়েন্দা গল্পের উৎস। মিলটন যেমন তার কাব্যে শয়তানকে করেছেন প্রধান চরিত্র, তেমনই, তারপর থেকে বহু বইতে ডাকাত বা খুনীরা প্রাধান্য পেতে লাগল। কথাসরিৎসাগর, জাতক বা তারও আগেকার কোনো কাব্য বা পুরাণে ছোটখাটো রহস্য সমাধানের কাহিনী থাকতে পারে—কিন্তু অপরাধী চরিত্রটির ওপর এত জোর দেওয়া হয়নি কখনো।

অবশ্য এখন রহস্যকাহিনীর প্রধান আকর্ষণ গোয়েন্দা নিজেই। পাকা লেখকদের হাতে এই গোয়েন্দা চরিত্র এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে যে, পাঠকের ধারণা হয়, সত্যিই বুঝি রক্তমাংসের এরকম একজন মানুষ আছে। কোনান ডয়াল যখন একটি কাহিনীতে শার্লক হোমসের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন, তখন নাকি লণ্ডনবাসীরা শোক জানাবার জন্য কালো পোশাক পরেছিল। ডিটেকটিভদের মরতে নেই। তাদের কানের পাশ দিয়ে সব সময় গুলি বেরিয়ে যাওয়াই নিয়ম।

ছেলেবেলায় আমার ধারণা ছিল, টালিগঞ্জের একটি 'প্রাসাদোপম' অট্টালিকায় সত্যিই কিরীটি রায় নামে একজন মানুষ থাকে, যার চাকরের নাম জংলি। এমনকি, 'রোমাঞ্চ' সিরিজের একদা নায়ক প্রতুল লাহিড়ী হরি ঘোষ স্ট্রিটের একটি দোকান মিষ্টি খেতে যান—এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেখে আমি সত্যিই একদিন সেই দোকানে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলুম। এবং মনে মনে সংকল্প ছিল, কখনো বিলেত গেলে বেকার রোডে মি. ব্লেক-এর কাছে গিয়ে তাঁর সিগারেট কেসটি একবার দেখে আসতেই হবে—যে সিগারেট কেসটি বুক-পকেটে থাকলে পিস্তলের গুলিও কিছু করতে পারে না।

কিছুকাল আগে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাৎসরিক গড়ে ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে বেশি বই বিক্রি হয়েছে যেসব লেখকের, তাঁদের একটি তালিকা বেরিয়েছিল 'টাইম' সাপ্তাহিকে। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, সেই তালিকার শীর্ষে ছিলেন মিকি স্পিলেন, রহস্যকাহিনীর লেখকদের মধ্যে যিনি নিকৃষ্টতম। এর থেকেই বোঝা যাবে, সারা পৃথিবী জুড়ে রহস্যকাহিনীর পাঠক কত বেশি। এমন বহু ব্যক্তি থাকে, যারা আর কোনো বই-ই পড়ে না, ডিটেকটিভ বই ছাড়া। ট্রেনে কিংবা এরোপ্লেনে যাত্রার সময় অন্য বইয়ের বদলে ডিটেকটিভ বই সঙ্গে রাখারও যেন একটা অলিখিত নিয়ম আছে।

মিকি স্পিলেন কিংবা হাল আমলেব জেমস হেডলি চেজের লেখার মধ্যে অবশ্য মারামারি হুড়োহুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু নিছক বুদ্ধির চর্চার জন্য এক প্রকার অপরাধ-সাহিত্য ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে, এবং এতে কলম ধরেছেন অনেক পাকা লেখক।

সুঠাম, সুদর্শন, জুজুৎসু বা ঘুষোঘুষিতে ওস্তাদ গোয়েন্দা সৃষ্টি করেন সাধারণ লেখকরা। পাকা লেখকদের গোয়েন্দারা আসে বৈশিষ্ট্য নিয়ে। প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দারা ডাকাত বা খুনীর পেছনে দৌড়োয়, ধস্তাধস্তি বা গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির পব ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় হয়ে যায়। কিন্তু অবাস্তব গোয়েন্দা হিসেবে যারা অমর হয়েছে, ক্ষুরধার বুদ্ধিতে তারা মেকিয়াভেলি বা কিসিংগারকেও ছাড়িয়ে যায়। যত বুদ্ধিমান পাঠকই হোক, বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে আসার আগে কেউ

বুঝতে পারে না, ডিটেকটিভ কাকে সন্দেহ করছেন। রহস্যের মহারানী আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো একটি ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধ, যার শরীরের মধ্যে গোঁফটিই প্রধান দ্রষ্টব্য। খুনীর সঙ্গে মারামারি করা তো দূরের কথা, এরকুল পোয়ারো তার কোটের আস্তিনে সামান্য ধুলো লাগলেই বিরক্ত হন। অর্থাৎ এদিক থেকে তিনি ফাদার ব্রাউনেরই উত্তরসূরী। মিস মারপলের তুলনা কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও নেই। এক গ্রাম্য বুড়ি শুধু ঘরের মধ্যে বসে বসে যেভাবে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলে, তাতে মনে হয়, আগেকার দিন হলে ওকে নিশ্চিত ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হতো।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা। পাঁচকড়ি দে থেকে আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার—কিছুই বাদ দিই না। আমার মতে, শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ গল্প লিখেছেন ফরাসী লেখক জর্জ সিমোনোঁ—এর ডিটেকটিভকে মোটেই কোনো জমকালো নায়ক বলা চলে না। ইন্সপেকটর মেইগ্রে একজন মধ্য বয়স্ক পুলিশ অফিসার, বিবাহিত এবং এতই বাস্তবের কাছাকাছি যে মনে হয়, প্যারিসের সবাই বুঝি ওঁকে চেনে। জর্জ সিমোনোঁর লেখায় ইন্সপেকটর মেইগ্রেই প্রধান চরিত্র, খুনী বা ডাকাতরা নয়—এবং ইনি তরোয়ালের মতন ধারালো বুদ্ধিরও পরিচয় দেন না—এমনকি অনেক কাহিনীতে ইনি অপরাধীকে ধরতে ব্যর্থ হন পর্যন্ত। এই বিশাল চেহারার কোমল পুরুষটি মানুষের চোখ থেকে হৃদয় পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করেন। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে এঁর জেদ। এই জেদের জন্যই তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারের শেষ না দেখে ছাড়েন না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-প্রাপ্ত কয়েদীকে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা জানাতে যান ইনি—আর কোনো গোয়েন্দা গল্পে এ নিদর্শন নেই।

এই ধরনের সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রধান গোয়েন্দা কাহিনী রচনা হঠাৎ থেমে গেল জেমস বণ্ডের আবির্ভাবে। চালু হলো আর একটি শব্দ, ডিটেকটিভের বদলে এজেন্ট। অবশ্য ঠিক এই অর্থেই বঙ্কিমবাবু তাঁর দেবীচৌধুরানী উপন্যাসে 'গোয়েন্দা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জেমস বণ্ডের গল্পে সাঙ্ঘাতিক মারামারি, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ এবং ঘন ঘন নারীবিহার—এই তিনটি জিনিস মিশে যাওয়ায় আকর্ষণ আরও বেড়েছে। এখন ০০৭-এর অনুকরণে বাজার ভর্তি।

বাংলায় ডিটেকটিভ-সাহিত্য বেশ দীন। পাঁচকড়ি দে'র পর দীনেন্দ্রকুমার রায় বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন, যদিও সকলেই জানেন, দীনেন্দ্রকুমারের লেখাগুলি নিকৃষ্ট ইংরেজি সিরিজের অনুবাদ। তবু একটি কথা বলতেই হবে, দীনেন্দ্রকুমার তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে দেশাত্মবোধক কাজ করে গেছেন। সাহেব চোর-ডাকাতদের সম্পর্কে লিখে তিনি বেশ আনন্দ পেতেন, মাঝে মাঝেই তাঁর লেখার মধ্যে বন্ধনীতে এই রকম মন্তব্য থাকত, 'দেখো, দেখো পাঠক, প্যান্ট কোট পরিধান

করলেই মানুষ সুসভ্য হয় না। দেখো, ইংরাজের মধ্যেও কত নরপশু রহিয়াছে।'

এরপর একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ই সার্থক বয়স্ক-পাঠ্য গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন। তাঁর ব্যোমকেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সখের গোয়েন্দাদের অন্যতম, যদিও সে নিজেকে ডিটেকটিভ না বলে সত্যান্বেষী বলে এবং তাঁর স্ত্রীর নামও সত্যবতী। অবিবাহিত অবস্থায় ব্যোমকেশকে অনায়াসেই বাঙালি শার্লক হোমস বলা যেত।

রামায়ণ লেখার পর যেমন রাম জন্মেছিলেন, তেমনি ভালো ভালো গোয়েন্দা কাহিনী লিখিত হবার পরই জন্মেছে প্রাইভেট ডিটেকটিভরা। গোয়েন্দাগিরি করে জীবিকা অর্জন করে—এমন কিছু কিছু মানুষ সব দেশেই আছে, কিন্তু গল্পের নায়ক হবার কোনো যোগ্যতাই তাদের নেই। আমাদের দেশেও আছে এরকম কিছু এজেন্সি, যেখানে কাজ করে অধিকাংশ রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারেরা। এদের কাজ সাধারণত বিয়ে-ভাঙার গোপন তদন্ত কিংবা কলকারখানায় শ্রমিক অশান্তির ব্যাপারে খবরাখবর সংগ্রহ করা কিংবা ভেজাল ওষুধের কারবার ধরা। এরা প্রায় সবাই বিবাহিত, মধ্যবয়স্ক সংসারী লোক, প্রায় কেউই পকেটে বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে রাখে না, দশটা পাঁচটার মতন অফিস করে। এই বাস্তব গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ লিখলে কেউ পড়বে না!

গল্পের গোয়েন্দাদের সবাই চেনে, নাম শুনলে ট্যাকসি ড্রাইভার পর্যন্ত সেলাম দেয়, কিন্তু এইসব বাস্তব গোয়েন্দাদের কোনো খ্যাতিই নেই। এরা সাধারণ চাকুরে মানুষেরই মতন। ইদানীং অবশ্য কোনো কোনো শখের ডিটেকটিভ সুন্দরী মেয়ে-সেক্রেটারি রেখে চেম্বার সাজিয়ে বসছে কিন্তু পেরি মেজন বা শ্লিম ক্যালাহানের মতন রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার এদের জীবনে কখনো ঘটেছে বলে জানা যায়নি। বোম্বাইতে অবশ্য প্রেমকুমার কিংবা মি. বাওয়ার মতন 'ফরেন ট্রেণ্ড' ডিটেকটিভরাও কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। এদের মধ্যে প্রেমকুমারের নাম শোনা গিয়েছিল 'পাতিয়ালা শিশুহত্যা মামলায়'—পুলিশ যে কেসের নিষ্পত্তি করতে না পেরে বন্ধ করে দেবার পর ইনি রহস্যের সমাধান করেছিলেন।

শখের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ, পুলিশের কাছে এদের কোনো মূল্যই নেই। বাস্তবের কোনো সুন্দরবাবু কিংবা মি. কুটস কখনোই অসহায় হয়ে শখের গোয়েন্দাদের কাছে ছুটে যান না সাহায্য চাইতে। কোনো মামলাতেই শখের গোয়েন্দাদের আইনগত স্বীকৃতি নেই, এদের কাজ পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া মাত্র।

যারা আসল বাস্তব গোয়েন্দা, অর্থাৎ পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের লোক, তাঁরা কি গোয়েন্দা গল্প পড়েন? কয়েকজন পড়েন সময় কাটাবার জন্য। উপভোগ করেন রূপকথার মতন। বস্তুত, সত্যিকারের রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার মধ্যে

জড়িয়ে পড়েন পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের অফিসাররাই। ইদানীংকালের বিখ্যাত দেবী রায়ের কীর্তিকলাপ দেখলে ইন্সপেকটর মেইগ্রের কথাই মনে হয়।

পুলিশ অফিসারদের কীর্তিকলাপের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' এবং পঞ্চানন ঘোষালের লেখায়। নানান সময়ে আমি নিজেও অনেক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি, শুনেছি কয়েকটি কেসের ঘটনা। এঁদের কৃতিত্বের অনেকটাই নির্ভর করে টিম ওয়ার্কের ওপর। তবে, অনেক সময় এঁদের অনেকরকম চমকপ্রদ ছদ্মবেশ ধরতে হয়। কিছুকাল আগে কলকাতার এক বিখ্যাত রাজনৈতিক ডাকাত সর্দারের ওপর নজর রাখার জন্য একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার নাকি এক মাস তাঁর বাড়ির খবরের কাগজের হকার সেজে ছিলেন। এবং রাস্তার সব পাগল নাকি আসল পাগল নয়। সাধু সাবধান!

কলকাতায় কবির সংখ্যা কত

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গল্পটি নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে আছে। কলকাতার একজন বাবু গিয়েছিলেন পশ্চিমে বেড়াতে। প্রচণ্ড শীতের রাতে ঘুটঘুটি অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন ধরতে গিয়ে তিনি পড়লেন ভূতের হাতে। ভূতদের বিয়ের আসর থেকে ক্যাংলা নামে একজন ভূত পালিয়েছে। এদের সন্দেহ সেই পলাতক ভূতই সেঁধিয়েছে কলকাতার বাবুর শরীরের মধ্যে। এখন কলকাতার বাবু কি করে প্রমাণ করবেন যে তিনি ক্যাংলা নন, তিনি তিনিই? ভূতেরা কোনো যুক্তিই শোনে না। শেষ পর্যন্ত যখন কলকাতার বাবুটি বললেন যে, তিনি কবিতা লিখতে পারেন, তখন ভূতদের মন একটু টলল। কারণ ক্যাংলা সাত মরণেও কবিতার ক জানে না। কলকাতার বাবু তৎক্ষণাৎ ভূতেব মোড়লের নামে কবিতা রচনা করে ফেললেন—আর অমনি ভূতরা তাকে ছেড়ে দিল সসম্মানে।

আজকাল আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। ভালো ভালো ভূতদেরও দেখা পাওয়া যায় না। কবিতা লেখার জন্য কোনো সুবিধেই কেউ পায় না। কবিতা লেখার দোষ থাকলে চাকরি হয় না, প্রেমিকারা আড়ি করে, গুরুজনের ভুরু কুঁচকে যায়, সম্পাদকরাও ঘন ঘন নাম ভুলে যান। কবিরাও এ দেশের উপেক্ষিত আদিবাসী। কবিদের সংখ্যা যদি ভারতীয় ব্যাঘ্রের মতন ক্রমক্ষীয়মাণ হতো, তাহলেও হয়তো রাষ্ট্রসংঘ থেকে 'কবি বাঁচাও' প্রকল্প হতে পারত। কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে কবিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেড়েই চলেছে।

কবিদের কি করে চেনা যায়? সেই ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে রঙীন চাদর আর মাথাভর্তি বাবরি চুলের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। তিরিশের নিচে বয়েস অথচ ধুতি-পরা কবি এখন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মাথায় বাবরি চুল রাখে আজকাল ইংরেজি স্কুলে-পড়া মর্ডান ছেলেরা এবং লোকাল ট্রেনের চা-ওয়ালারা। কবিরা এখন আর ডবল কবি নয়। অর্থাৎ কবি-কবি চেহারা যাদের, তারা কুত্রাপি কবি নয়, বড়জোব রবীন্দ্রসংগীত গায়ক হয়। কারণ, শুনেছি, এখনো মঞ্চে বসে প্যান্ট-শার্ট পরে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করা রীতিসম্মত নয়। কবিরা ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কিংবা বলা যায়, তারা বৈরী নাগাদের মতনই আত্মগোপনকারী। যদিও এদের মতন নিরীহ প্রাণী ভূ-ভারতে নেই।

কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিদের আড্ডা আছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস, ওয়েলিংটন অঞ্চলে একটি দিশি মদের দোকান, দক্ষিণ কলকাতার একটি চা-খানা। এছাড়া যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর, দেশবন্ধু পার্ক, কয়েকটি রাস্তার মোড় এবং গঙ্গার ধারে সাধু ও গাঁজাখোরদের জটলার মধ্যেও এঁদের দেখা পাওয়া যায়। যারা সন্ধান জানে, শুধু তারাই চিনতে পারে। এই উপজাতিটির পোশাক সাধারণত প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট, সাদামাটা, বহু ব্যবহারে মলিন। এরা চুলে তেল দেয় না বলে সাধারণ লোকের মধ্যে যে একটা ধারণা আছে সেটা ভুল।

কলকাতায় কবির সংখ্যা ঠিক কত? এক পলকে বলে দেওয়া যায় ৯৮১ জন। না, কবিদের কোনো পরিসংখ্যান এখনো নেওয়া হয়নি, ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এক কবির স্নেহাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের কবিদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আমি নিজেও অবশ্য পথে পথে ঘুরে কবিদের গুণে দেখিনি। তবু আমার দেওয়া এই সংখ্যাটি নিতান্ত মনগড়াও নয়।

সদ্য-প্রকাশিত একটি বইতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট সাহিত্য পত্রিকার তালিকা বেরিয়েছে। তার মধ্যে শুধু কলকাতা থেকেই প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা ৩২৭, আমি গুণে দেখেছি। এত অবিশ্বাস্য রকমের বেশি সংখ্যক সাহিত্য পত্রিকা পৃথিবীর আর কোনো শহর থেকে প্রকাশিত হয় না। এই একটি ব্যাপারে অন্তত পৃথিবীর আর সমস্ত শহর কলকাতার অনেক পেছনে পড়ে আছে। এই হতভাগ্য শহর এই একটি ব্যাপারে বিশ্বের প্রথম।

প্রতিটি ছোট পত্রিকার সঙ্গেই একটি ছোটখাটো গোষ্ঠী থাকে—যারা ঐ পত্রিকার মূল লেখক। নিজেদের রচনা ছাপাবার প্রয়োজন না থাকলে কে আর শুধু-শুধু নিজের পয়সায় পত্রিকা বার করে! প্রতিটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যদি অন্তত

তিনজন কবিও থাকে, তাহলে ৯৮১ জন কবি তো এই শহরে হেসে খেলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু আমার ধারণা, আমি হিসেবে বেশ কম করেই ধরেছি। এই সংখ্যা অনায়াসেই দু'হাজার হতে পারে। এদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কিছুতেই কুড়ির বেশি না।

নবীন কবিদের মধ্যে বেশির ভাগই বেকার। কদাচিৎ এক-আধজন চাকরি পেয়ে গেলে বন্ধুবান্ধবদের সিগারেট ও চায়ের খরচ বহন করে। এই সব কবিদের চাকরির ক্ষেত্র খুব সীমিত। ইস্কুল মাস্টারিই অধিকাংশের ললাটলিপি। কিছু-সংখ্যক অধ্যাপক হতে পারেন। সংবাদপত্র অফিসে দেখা যায় দু'চারজনকে। বাকি সব কেরানিগিরি। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট বা উচ্চপদস্থ বাজকর্মচারী মাত্র দু'-চারজন। একজন ইঞ্জিনীয়ার ও একজন ডাক্তারেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

এরা কবিতা লেখে কেন? এই দুঃস্বপ্নের শহর, এত আবর্জনা, এত সমস্যা, এত অনাচার—এর মধ্যেও শত শত যুবক কেন এবং কিসের আশায় কবিতা লিখে চলেছে? এর উত্তর জানা সহজ নয়। কবিতা লেখার জন্য কেউ প্রতিদান আশা করে না, সেইজন্যই এদের কোনো হতাশা নেই। তবে, একটা কথা অনায়াসেই বলা যায়। এই শহরটি শুধু রাজনৈতিক ছোকরাদের—এরকম একটা ধারণা যে অনেকের মনে সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা মোটেই ঠিক নয়। এই শহরটা কবিদেরও। অনেক মধ্যরাতেই এই শহর শাসন করে চারজন যুবক, যাদের হাতে আছে কবিতার চাবুক।

কবিতার জন্য কিছুই পায় না, কিছুই চায় না ওরা—তবু একটি কবিতা রচনার পর, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কবিতা বিষয়ে আলোচনা করার সময়, এদের মুখে এক প্রকার উজ্জ্বল আলো ফুটে বেরোয়। তখন, নিভৃতে এদের ভারী সুন্দর দেখায়।

সূর্য অস্ত গেল, দক্ষিণ দিকে

চমৎকার ছবির মতন বাড়ি। দক্ষিণ দিকটা একেবারে ফাঁকা, মাঠের ওপাশে নদী। বাড়ির ডানদিকে তাকালে মেঘ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি দেখা যায়। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নায়িকা অবশ্যই তন্বী এবং রূপসী, স্নান সেরে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে, পায়ে তার লাল রঙের চটি। বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নায়ক। দু'জনে মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল নদীর কাছে। ঘাসের ওপর বসল। ক্রমশ নদীর জলে রক্তবর্ণের ছায়া পড়ে। মাথার ওপর দিয়ে সাতটি বক ঠিক মালার মতন সারবদ্ধ হয়ে উড়ে গেল। নায়িকার কপালে এসে পড়ছে চূর্ণ

অলক, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে সে একদৃষ্টে দেখছে সূর্যাস্ত, তার ঠিক সামনেই নদীর ওপরে তপনদেব বিশ্রাম নিতে চলেছেন।

এইখানে পাঠক থমকে যাবেন। লেখক তো খুব মুডের মাথায় লিখে গেছেন। কিন্তু পাঠকরা খুব হিসেবী। কোনোরকম গরমিল পাঠক সহ্য করেন না। পাঠক বললেন, বাড়ির দক্ষিণ দিকে যদি নদী হয় তবে তার ওপারে সূর্যাস্ত হয় কি করে? এটা কোন দেশের সূর্য?

লেখকের এখানে কোনো জবাবদিহি নেই। তিনি মাথার ওপর দিয়ে কটা বক উড়ে গেল তা পর্যন্ত গুণেছেন, কিন্তু কোন দিকে যে সূর্য ডোবাচ্ছেন, তা খেয়াল করেননি।

অনেক প্রখ্যাত লেখকের রচনাতেই এরকম ভুল দেখা যায়। পাঠক এই সব ছোটখাটো ভুলের সামনে হোঁচট খেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু কেন এরকম ভুল হয়? এই ভুল অজ্ঞতার নামান্তর নয়। তবে, শুধুই কি অন্যমনস্কতা?

কালি-কলম-মন, লেখে তিনজন। তিনজন না হলেও অনেক সময় দুজন তো বটেই। মাথা একরকম চিন্তা করছে, হাত লিখছে অন্যরকম—এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। কিংবা অনেক সময় মাথার মধ্যে দুটো-তিনটে চিন্তা জংশন স্টেশনের ট্রেন লাইনের মতন পরস্পরকে কাটাকুটি করে চলে যায়।

নায়ক যাবে দিল্লীতে, খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন যেই থেমেছে, এমন সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা, সাত বছরে তার চেহারা একটুও বদলায়নি। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে এই বই নিয়ে পড়তে পড়তে পাঠক তক্ষুনি মার্জিনে লিখবেন, 'লেখক নিশ্চয়ই গাঁজা খাইয়াছে।' দিল্লী যাবার জন্য ট্রেন খড়্গপুরের দিকে ধাওয়া করবে কেন? হ্যাঁ, ভুলই তো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, লেখক এরকম একটা কাঁচা ভুল করলেন কেন? তিনি কি পাঠকের চেয়েও অজ্ঞ? কিন্তু লেখককে তো নানা বিষয়ে জানতেই হয়। আসলে ব্যাপারটা বোধহয় এইরকম। তিনি লিখতে লিখতে একটা ছবি দেখতে পান। তিনি মনশ্চক্ষে দেখছেন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা, তার কপালে যে ঘাম জমেছে, সেটাও তাঁর নজর এড়ায়নি। কিন্তু স্টেশনের নাম কাহিনীর পক্ষে সেটা বর্ধমান, পাটনা বা কানপুর যে-কোনো একটাই হতে পারত, কিন্তু খড়্গপুর লিখেই তো সব গোলমাল করে ফেললেন।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে একটা বেশ মজার ভুল করেছিলেন। দিচ্ছেন প্রখর মধ্যাহ্নের বর্ণনা। সেই সময় গোরা তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে দীর্ঘতর ছায়া ফেলে চলে গেল। দুপুরবেলা দীর্ঘতর ছায়া তৈরি করা খুবই শক্ত। এখানেও মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চোখে ভেসে উঠেছিল ঐ ছবিটা, তিনি বিভোর হয়ে দেখছিলেন

গোরাকে, সময়ের হিসেব ভুলে গিয়েছিলেন।

নিন্দুকরা অবশ্য এককালে রবীন্দ্রনাথের নানারকম ত্রুটি খুঁজে বার করেছিল। 'সোনার তরী' কবিতাটি সম্পর্কে দারুণ রাগারাগি করেছিলেন ডি এল রায়। 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে'—এই সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, শ্রাবণের আকাশে মেঘের এই চাপল্য কে কবে দেখেছে? তা ছাড়া মেঘ কখনো ঘোরে না, তারা একদিক থেকে আর একদিকে যেতে পারে বড়জোর। তাছাড়া, শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটাই বা সারা হয় কি করে, তখন তো আর আই আর এইট-এর চাষ হতো না।

নাম এবং বয়েসের গোলমাল অনেকেরই হয়। হওয়া উচিত নয়, তবু হয়। নায়িকা গর্ভবতী হবার পর নানান ঘটনার ঘনঘটার পর হিসেব করে দেখা গেল দেড় বছর সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু শিশু তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। লেখককে এই পয়েণ্টে চেপে ধরলে তিনি হয়তো বলে বসতে পারেন যে মহাভারতে আছে না' এরকম? আসলে তিনি খেয়াল করেননি। ক্রিকেট খেলার মাঠে হঠাৎ রেফারি এসে ফু-র-র-র করে হুইশেল বাজিয়ে দিল, আর পাঠক রে-রে করে উঠল। কিন্তু লেখক কোনোদিন ক্রিকেট খেলা দেখেননি কিংবা আমপায়ারের কথা জানেন না, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় কি?

ভুল দু'রকমের হয। একরকম ছুটকো ভুল হয়, খেয়াল থাকে না। যার চরম উদাহরণ গল্পের মাঝপথে হঠাৎ নায়িকার নাম বদলে যাওয়া। কিংবা শীতকালে আম খাওয়ার বর্ণনা কিংবা গ্রীষ্মকালে লুচির সঙ্গে বাঁধা কপির তরকারি ছাপা অক্ষরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। অবশ্য কোলড স্টোরেজের যুগে এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এ রকম পড়েছি তার আগেকার লেখায়। সত্যজিৎ রায়ের মতন সাবধানী লেখকও লোড শেডিং-এর বর্ণনা দিয়েই তারপর কলিং বেল বাজিয়ে দিয়েছিলেন। আর এক রকম হচ্ছে, খুঁটিনাটি জ্ঞানের অভাব। পাইলট কিংবা কয়লাখনির ম্যানেজার সাধারণ বাংলা গল্প উপন্যাসের নায়ক হয় না, কারণ ওদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখকরা ভালো জানেন না।

সাহেব লেখকরা অবশ্য এই সব বিষয়ে লিখতে গেলে খুব পাকা খোঁজ-খবর নিয়ে নেয়। অথবা সৈনিক বা নাবিকরাও লেখক হয়। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এরকম ছোটখাটো ত্রুটির অভাব নেই। অনেক সময় ভুলগুলোই খুব উপভোগ্য। শেক্সপীয়ার রোমিও জুলিয়েটের প্রায় প্রথম দিকেই গদগদ প্রেমিক রোমিওর মুখে হঠাৎ বসিয়েছেন, আমরা কোথায় খেতে যাব? তার একটু আগেই তিনি বলেছেন, তখন সকাল নটা। সকাল নটায় কারুর খিদে পেলেও পেতে পারে, কিন্তু প্রেমিকদেরও কি পায়?

এ পৃথিবী কতখানি বাসযোগ্য

মাঝে মাঝে এমনিই হঠাৎ মনে হয় না, দূর ছাই, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। যাঁরা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা অবশ্য বলেন, ধূর শালা—! হয় এরকম, অকস্মাৎ জিভে একটা তেতো স্বাদ আসে, পথিবীর উদ্দেশ্যে টুপি তুলে বলতে ইচ্ছে করে, গুড বাই!

আসলে, কখনো কখনো এরকম মনে হয় বলেই বেশি করে বাঁচতে ইচ্ছে করে। বেঁচে থাকার জন্যই সব মানুষ পাগল। রাস্তায়-ঘাটে দোকানে-বাজারে তাকালেই দেখা যাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কি বিপুল হুড়োহুড়ি।

ছিপছিপে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন মানুষ। সন্ধে নেমে এসেছে তাড়াতাড়ি, ফুটবল সদ্য শেষ হয়েছে বলে ট্রামে-বাসে অসম্ভব ভিড়, ট্যাক্সিগুলি অহংকারী। লোকটির চটিতে কাদা ছেটকায়, তার ওপর একটি চলন্ত গাড়ি আরও কাদার বাটিক ডিজাইন উপহার দিয়ে গেল। এই অবস্থাতেও একজন ক্লান্ত মানুষ বাড়ি ফিরছে। তার বাসভূমির এলাকায় ঘোর অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে পা আর উঠতে চায় না। সপ্তাহের শেষ দিন, অর্থাৎ বাড়িতে চায়ের চিনি নেই। সামনের দীর্ঘ সন্ধেটা কাটাবার মতন কোনো আনন্দের উপকরণ তার জানা নেই। অন্ধকারে তার মুখটা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তবু এই লোকটিই একটু পরে পকেট থেকে খুচরো পয়সাগুলো বার করে তার মধ্য থেকে সিকি আধুলিগুলো বেছে নিয়ে একটা মাটির ভাঁড়ে জমাবে।

পৃথিবীর চেয়ে আর কোনো ভালো জায়গা আমরা আজ পর্যন্ত চোখে দেখি নি। খারাপ জায়গাও না। সেই জন্যই স্বর্গ আর নরকের মতন দুটো ব্যাপার আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়েছে। তুলনা না করতে পারলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না। পৃথিবীতেও অবশ্য অনেক সময় নরক গুলজার হয় বটে, কিন্তু অন্যের চোখের আড়ালে শুধুমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া আর কেউ স্বর্গ রচনা করতে পেরেছে বলে জানা যায় না।

সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে যে ব্যক্তি মধ্যমগ্রাম বা সাঁতরাগাছিতে এক টুকরো জমি কিনে পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল গেঁথে একটা ছোট বাড়ি বানাচ্ছে, তার কখনো আপসোস হতে পারে অবশ্য যে, বালিগঞ্জ পাড়ায় একটা বাড়ি আর এ জীবন হলো না। আবার সে এ-ভেবেও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে, শহরের ঐ ঘিঞ্জির চেয়ে এই ফাঁকা জায়গা অনেক ভালো, এখানে বাতাস কত স্বাস্থ্যকর, টাটকা শাক সব্জি—। কলকাতায় অফিসে বসে তিনি সহকর্মীদের কাছে চাপা গর্বের সঙ্গে বলেন, আরে মশাই, ইলেকট্রিক ট্রেনে চাপলে মাত্র পঁচিশ মিনিটের জার্নি, একবার

গিয়ে পৌঁছোতে পারলেই যা আরাম—। কিন্তু যেদিন হাওড়া কিংবা শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ঘন্টার পর ঘন্টা বন্ধ থাকে, অসহ্য গরম, ঘাম, লোকজনের ঠেলাঠেলি, চিৎকার—তখন তার মুখ-চোখে ফুটে ওঠে একটা হিংস্র ভাব। তার মনে হয়, এ পৃথিবীতে মানুষই মানুষকে ঠিক মতন বাঁচতে দিচ্ছে না।

প্রত্যেকবার গ্রীষ্মকালে আমার একটা কথা মনে হয়, এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ভালো জায়গাগুলো সাহেবরা নিয়ে নিয়েছে। কি সুন্দর সব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বরফ-পড়া দেশ, ওদেশের প্রত্যেকটি মানুষ, এমনকি গরু-ভেড়াও আমাদের থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান হয়। ঠাণ্ডার সময় মানুষের কাজ করার শক্তি অনেক বেশি বাড়ে। শোনা যায় মধ্য এসিয়া থেকে আর্যদের একটি শাখা নাকি চলে আসে ভারতের দিকে; অন্য দু'একটি শাখা যায় ইউরোপে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে অদূরদর্শী কিংবা বোকা আর্যদের শাখাটিই এসেছে ভারতে, অন্যরা কি চমৎকার চমৎকার জায়গাগুলো পেয়ে গেছে। ভারত যখন সভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল, তখনো নাকি পাশ্চাত্য জুড়ে অন্ধকার। কিন্তু ওদের বুদ্ধি একটু দেরিতে খুললেও এখন কি তুলকালাম কাণ্ড সব করছে! রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটা প্রস্তাব তোলা যায় না, প্রতি একশো বছর অন্তর উত্তর গোলার্ধের সব মানুষকে চলে আসতে হবে দক্ষিণ গোলার্ধে, এবং এরা যাবে ওদিকে। একটা বদলাবদলি হোক।

এই সঙ্গে আবার আর একটা কথাও আসে। শীতপ্রধান দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। একবার একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ পেয়েছিল, ফিনল্যাণ্ডের লোকরাই গড়ে বেশি আত্মহত্যা করে। অথচ, সে দেশে একটাও না খেতে পাওয়া গরীব নেই। যেসব দেশকে আমরা আমাদের তুলনাতে অনেক বেশি আরামদায়ক মনে করি, সেসব দেশের মানুষেও আত্মহত্যা করতে চায় কেন? এদিকে, খরা-বিধ্বস্ত বিহারের পালামৌ জেলায় গিয়ে দেখেছিলাম, এক কলসী জলের জন্য দীর্ঘ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালসার নারী পুরুষ, লঙ্গরখানায় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত উৎসুক মুখ। কিন্তু এদের মধ্যে একজনও মৃত্যুর আগে নিজে থেকে মরতে চায়নি। একেই মহামায়া না কি যেন বলে।

সমুদ্র, পাহাড় কিংবা বিশাল কোনো নদীর সামনে হঠাৎ দাঁড়ালে মনটা নিজের শরীরের আয়তনের চেয়েও বড়ো হয়ে যায়। আজ নিজের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মনে হয়, সুন্দর এই পৃথিবী। আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, আমি ধন্য। —এই 'আমি' কিন্তু নিতান্তই শহুরে। শৌখিন মানুষ। ওই সব জায়গা শুধু বেড়াতে যাবার জন্য। বছরে একবার দু'বার গেলে বেশ ভালো লাগে এবং হোটেল-টোটেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। ওখানে যারা বাস করে তারা দুঃখী মানুষ। নদীর তীরে যাদের বাস, তাদের ভাবনা বারো মাস। সমুদ্রে বা পাহাড়ে যাদের জীবিকা,

তারা এ দেশের দরিদ্রতম মানুষ। দার্জিলিং-এ ফুটফুটে যুবতী পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় একটি ফেট্টি বেঁধে দু'মণ তিনমণ মাল এক সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়। আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাই স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে, আর পাহাড়ীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচ্ছন্ন টিবি রুগী।

নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার তুলনায় একজন সাধারণ সওদাগরি হৌসের অফিসারও এখন অনেক আরামে থাকেন। কারণ গ্রীষ্মকালে সিরাজউদ্দৌল্লা শুধু টানা পাখার বাতাস খেতেন, আর অফিসারটি থাকেন এয়ার কনডিশনড ঘরে। ভ্রমণ করার সময় নবাবকে যেতে হতো পাল্কিতে (মোটেই আরামদায়ক নয়), ইনি যান ঝাঁকুনিহীন মোটর গাড়িতে। অভিযানে বেরুলে নবাবকে থাকতে হতো তাঁবুতে, ইনি বিভিন্ন শহরে অভিযানে বেরিয়ে সব সময়েই ওঠেন পাঁচ-তারা মার্কা হোটেলে। তাহলে কি আগেকার দিনের চেয়ে আমরা এখন অনেক ভালো আছি? কবি যদিও বলেছেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর'—কিন্তু এসব কবিদের পাগলামি। জঙ্গলের জীবন আমরা এখন কেউই আর পছন্দ করব না। বিশেষত মেয়েরা, কারণ ওখানে বাথরুম নেই।

আরামদায়ক জীবনের সঙ্গে তবু ভালো থাকা মেলে না। আমাদের দেশে কত ভালো ভালো ছাত্র বিদেশে গিয়ে সেখানেই থেকে যায়। ভালো চাকরি পায়, পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাড়ি, নিজস্ব গাড়ি, কোনো খাবারে ভেজাল নেই, ঘরের মধ্যে শীতে গরম ও গরমে ঠাণ্ডা থাকার ব্যবস্থা, রেফ্রিজারেটার, টিভি, ফিল্ম প্রজেক্টার, ক্যামেরা ইত্যাদি হাবিজাবি খেলনারও অন্ত নেই। স্বাস্থ্য ইনসিওর করা আছে। ব্যাংকে টাকা জমছে—তবু কেন এক-একজন দীর্ঘশ্বাস ভরা চিঠি লেখে? কবে ফিরব, কবে ফিরব, এই ব্যাকুল সুর শোনা যায়। দশ-বারো বছর থাকার পরেও এই সঙ্কল্প থেকেই যায়। একদিন না একদিন ঠিক ফিরবই দেশে। দেশ মানে কি? এই পৃথিবীরই তো এক টুকরো জায়গা—খানিকটা ভাবালুতা ছাড়া তার আর আলাদা মূল্য কী আছে? পাশ্চাত্যের এইসব নকল স্বর্গ ছেড়ে এই দারিদ্র্য, শঠতা, তঞ্চকতা, মিথ্যে ও ভেজালে ভর্তি এই পুরোনো জর্জর দেশে ফিরে কি লাভ? তবু মানুষ চাইছে যখন, তাতে মনে হয়, ঐ ভাবালুতাই বেঁচে থাকার জারক রস।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানিতেও দেখা গেছে, ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করে মানুষ সিনেমা দেখতে গেছে। ভিয়েৎনামেও প্রণয় ও বিবাহের সংখ্যা কখনো কমেনি। যে-কোনো অবস্থাকেই অস্বীকার করার একটা স্পৃহা আছে মানুষের মধ্যে। সারাদিন পরিশ্রম করার পর সন্ধের সময় গঙ্গার ঘাটে যখন একজন কুলি স্নান করে তখন সে দৃশ্য দেখবার মতো। কি অসীম ভালোবাসায় সে তার শরীরটাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে। সে দুনিয়ার কোনো খবরই রাখে না। তার কাছে তার

শরীরটাই পৃথিবী। আর যারা এই দুনিয়ার খবর রাখে, তারা অনেক সময়ই পৃথিবীর ওপর বিরক্ত হয়। দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা, একথা এদিকে ওদিকে প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের মনে থাকে না, এই প্রাকৃতিক পৃথিবী মানুষের দখলে আসার পর বিশেষ কিছু বদলায়নি। বদলেছে শুধু মানুষ, ভালো আর মন্দের তারাই বিধাতা।

আবার এক-একদিন সন্ধেবেলা ফুরফুর হাওয়া দেয়, সব আলো ঠিকঠাক জ্বলে, চায়ে চিনি থাকে, বর্ষার সময়ে মনে হয় চাষীরা আজ আনন্দিত, মেয়েরা বেশি রূপসী হয়ে ওঠে, কেউ পুরোনো ঋণ শোধ করে যায়—আর আজই মনে হয়, আঃ, কি চমৎকার এই বেঁচে থাকা। টাটকা বাদাম ভাজা খেতে খেতেও মনে হয়, এরকম ভালো বাদাম আর আগে দেখিনি।

বিতৃষ্ণার থেকেও এখনো বিস্ময় অনেক বেশি এই পৃথিবীতে। মনের মেঘ ক্ষণে ক্ষণে কেটে যায়, মনে হয়, সামনেই এমন কিছু নতুন ঘটনা আছে, যা জ্যোতিষীরাও জানে না। আর যাই হোক, জীবন তো একটাই। পুরোপুরি দেখে যেতে হবে।

মানুষের কতরকম মুখোশ

রথের মেলায় বাবার হাত ধরে ঘুরছে একটি বাচ্চা ছেলে। সে কিছু একটা জিনিস কিনবে। এক সময় সে একটা মুখোশের দোকান দেখতে পেয়ে বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে এল সেখানে। সে মুখোশই কিনতে চায়। তার বাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই। তবু বললেন, আচ্ছা কেনো একটা ছোট দেখে।

সেখানে মুখোশ আছে নানা রকমের। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু করে ভূত-প্রেত, সান্টা ক্লস, জমিদারবাবু, বোকা চাকর ইত্যাদি অনেক কিছুই। কোন মুখোশটা যে কিনবে, ছেলেটি তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। মহা উৎসাহভরে সে একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐটা নেবো, ঐটা নেবো। দোকানদার সেটা নামাতেই সে আবার আর একটা দেখতে চায়। তার বাবা একটু একটু বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি একটা ছোটখাটো সুন্দর মুখোশ দেখিয়ে বললেন, 'ঐটা নাও না!' ছেলেটি তাতে রাজি নয়। তার মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন সবগুলোই নিতে চায়।

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, ব্যাপারটা দেখতে দেখতে আমার একটু হাসি পেল। বাবার তুলনায় ছেলেটিকেই বেশি জ্ঞানী মনে হলো। সে এর মধ্যেই বুঝতে

পেরে গেছে যে তার অনেকগুলি মুখোশ দরকার হবে।

এই ছেলেটি একদিন বড়ো হবে, আশা করছি কিছু লেখাপড়াও শিখবে এবং বাঙালির ছেলে যখন, তখন সম্ভবত চাকরিই করবে। সেই চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সে প্রথম দেখবে এমন এক ধরনের মুখোশ, যা পৃথিবীর কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। অথচ, সারা পৃথিবী জুড়েই যারা একটু মাঝারি বা বড়ো চাকরির ইন্টারভিউ নেয়, তারা সকলেই হুবহু এক রকম মুখোশ পরে থাকে। সেই মুখোশের আড়ালে তাদের আসল মুখ কেউ কখনো দেখেনি।

এ বিষয়ে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বাড়িতে যে বৃদ্ধা রান্নার কাজ করে, তার নাতির একটা কাজ দরকার। স্কুল ফাইনাল পাস করে বসে আছে ছেলেটি। যে-কোনো একটা অফিসে কোনো রকম একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য সে আমাদের বাড়িতে ইদানীং ঘোরাঘুরি করছে। আমাদের নিজেদেরই এখনো নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাবার মতন অবস্থা। তবু একদিন দুর্বলতার মুহূর্তে তাকে একশোটি টাকা দেওয়া হলো, সে একটা কিছুর ব্যবসা করুক। আলু জিনিসটা পচে না—একশো টাকার আলু পাইকারি রেটে কিনে খুচরো বাজারে বিক্রি করলেও তো দু'পাঁচ টাকা লাভ হতে পারে। ছেলেটি এক মাসেব মধ্যে সেই টাকা খরচ করে আবার এসে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। আগে সে তবু একটা জামা পরত, এখন ছেঁড়া গেঞ্জি পরে। একদিন ঘরেব মধ্যে সটান ঢুকে পড়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, দাদাবাবু, একটা চাকরি না দিলে—

আমি বিরক্তভাবে সোজা হয়ে বসলাম। গম্ভীরভাবে বললাম, দ্যাখো, তুমি এরকমভাবে বিরক্ত করতে আসো কেন? তোমার থেকে অনেক বেশি যোগ্যতা আছে এমন লাখ লাখ ছেলে আজও বেকাব। তুমি নিজের চেষ্টাতেও...

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল আয়নার দিকে। আমার মুখখানা একদম অন্য রকম হয়ে গেছে। নিজেই চিনতে পারি না! কি কঠোর নৈর্ব্যক্তিক মুখ আমার, অবিকল ইন্টারভিউ বোর্ডেব মেম্বারদের মতন। আসলে ঐ ছেলেটির সম্মুখীন হতে আমি অসহায় ও লজ্জা বোধ করছিলাম, সেটা ঢাকবার জন্যই একটা কঠোরতার মুখোশ দরকার হয়েছিল। অন্যদেরও বোধহয় তাই হয়।

আমার একজন অতি-পরিচিত অধ্যাপককে দেখেও একদিন আমি চিনতে পারিনি। কলেজ ছাড়ার বেশ কিছুদিন পর একদিন সন্ধের দিকে গঙ্গার ধারে সামান্য অন্ধকারে গাছের নিচে আমি তাঁকে দেখি। তাঁর পাশে একজন বিদেশিনী মহিলা। মহিলাটি এমনই রূপসী যে তার দিকে অন্তত তিনবার না তাকিয়ে পারা যায় না। সেই কারণেই তৃতীয়বার অধ্যাপকের দিকে আমার চোখ পড়ে। প্রথমে চিনতে

পারিনি। মনে হলো একজন অসম্ভব খুশিতে উচ্ছল যুবক—সেই প্রায়ান্ধকারেও তাঁর চোখ-মুখে ঝকঝক করছে আনন্দ। তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই আমার মনে খটকা লাগে।

অধ্যাপকেরাও মানুষ। তাঁদের প্রণয়ের অধিকার নেই, সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে হবে—এমন কথা বলা চলে না। বিদেশিনী বান্ধবীকে তিনি গঙ্গার ধারের সৌন্দর্য দেখাতে নিয়ে যাবেনই বা না কেন? কিন্তু ওঁর ক্লাসে পড়ার সময় আমরা ওঁকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি। দেখতাম একটা বিমর্ষ ভাবুক মুখ। গঙ্গার ধারে অধ্যাপককে দেখে যে আমি প্রথমে চিনতে পারিনি তার কারণ, সেই দিনই প্রথম আমি তাঁর স্বাভাবিক মুখ দেখি। সেই মুহূর্তে তিনি অধ্যাপক ছিলেন না, মুখোশটা খুলে রেখেছিলেন।

প্রত্যেকটি পুরুষমানুষই মেয়েদের সামনে, প্রত্যেকটি মেয়েই পুরুষদের সামনে একটু না একটু বদলে যায়ই। নারীর সঙ্গে নারী, পুরুষের সঙ্গে পুরুষ আলাদা ভাষায় কথা বলে, মুখের অভিব্যক্তি হয় অন্যরকম। এটাকে ঠিক মুখোশ বলা না গেলেও ব্যক্তিত্বের বদল বলা যেতে পারে হয়তো। বস্তুত, কোনো নারী বা পুরুষই যে সবসময় এক রকম থাকে না, কখনো কখনো নিজেকে বদলায় —সেই সত্যটুকুই জীবনটাকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে।

প্রতিটি পরিবারের কর্তাই তাঁর বাড়ির ব্রেকফাস্ট টেবিলে একটি ছোটখাটো হিটলার। যদি না তাঁর স্ত্রী আগে থেকেই নারী হিটলার হয়ে থাকেন। তাঁর হুকুমে সব কিছু চলবে সেখানে। তিনি কখন চা খাবেন কিংবা খবরের কাগজ পড়বেন কিংবা বাথরুমে যাবেন, সেই অনুযায়ী অন্যদের কাজকর্ম ঠিক করতে হবে। তারপর তো তিনি খেয়েদেয়ে রাস্তায় বেরুলেন। ধরা যাক, তিনি একজন সাধারণ চাকুরে। ট্রামে-বাসে যদি যেতে হয়, তাহলে সেই সময়টুকুর জন্য তিনি একজন করুণ মানুষ হয়ে যাবেন। দৈবাৎ যদি কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করেন, কি কেমন আছেন? এবং তিনি যদি হাইপোকনড্রিয়াক হন, তাহলেই শুরু করে দেবেন রোগের ফিরিস্তি। অন্য লোকের রোগের বিবরণ শুনতে কেমন লাগে? শুনছি অথচ শুনছি না। তারপর অফিসে বড়ো সাহেব কিংবা ইউনিয়নের নেতার সঙ্গে দেখা করার সময় যে-কোনো কর্মচারীই দরজার বাইরে দু'এক মুহূর্ত থামে। তখন পকেট থেকে চট করে সেই মুখোশটা বার করে পরে নিতে হয়। কেননা, বিশেষ ধরনের হাসি মুখোশ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। আবার বড়ো সাহেবকেও তাঁর বড়ো সাহেবের কাছে কিংবা মন্ত্রীদের কাছে যাবার সময় প্রয়োজন হয় ওই মুখোশটা।

একই মানুষ বাবা এবং ভাই এবং সন্তান এবং স্বামী এবং বন্ধু এবং ভৃত্য।

এই বিভিন্ন ভূমিকায় তার তো প্রায় দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত। বিখ্যাত অভিনেতারাও মঞ্চে উঠে এক সঙ্গে এতগুলো ভূমিকায় অভিনয় করতে সাহস করবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু সাধারণ মানুষ অবলীলাক্রমে তা পেরে যায়। সুবিধেমত মুখোশ সঙ্গেই থাকে। একমাত্র খাঁটি সন্ন্যাসীদেরই এতগুলি ভূমিকা থাকে না, সন্ন্যাসীরা শুধুই সন্ন্যাসী, তাদের মুখোশের প্রয়োজন নেই, সেই জন্যই বোধ হয় তাঁরা দাড়ি রাখেন।

কিছুদিন আগে একটা আন্দোলন হয়েছিল। সেই সময় তরুণ ছেলেরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে কার্ড পাঠিয়ে অনুরোধ জানাত, মুখোশ খুলে ফেলুন! মুখোশ খুলে ফেলুন!

ব্যাপারটা যে খুবই চিত্তাকর্ষক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কল্পনা করুন সেই দৃশ্য—রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পাড়ার গানের মাস্টারমশাই পর্যন্ত সবাই এক সঙ্গে খুলে ফেলেছেন সব রকম মুখোশ। মুহূর্তে বদলে গেল সব দৃশ্য, বদলে গেল এই সমাজ, কেউ কাউকে আর চিনতে পারছে না। থিয়েটারের পর মেকাপ ধোওয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতন ছলছলে চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো সেই দৃশ্য ভয়াবহ হতে পারে। কত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের আসল মুখ দেখে আমরা আঁতকে উঠব! আদিম মানবগোষ্ঠীর মতন আবার যদি আমরা পরস্পরকে দেখলেই মারামারি শুরু করি?

না, দরকার নেই মুখোশ খোলার। যা চলছে তাই চলুক।

কাজ ও ছুটির সীমানা কোথায়

ভোরবেলা অনেক পার্কে, ময়দানে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-উদ্যানে, বালীগঞ্জ লেকে অনেকেই যায় ভ্রমণ করতে। এর মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাদের অনেকগুলো ছোট ছোট দল হয়ে যায়, তাঁরা নিয়মিত এক জায়গায় এসে বসেন, এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ান।

এ রকম একটি দল, অবাঙালি, এক সকালে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন, ওরা নিজেদের মধ্যে যে-সব কথা বলছিলেন, তার মধ্যে, ভাও, টেণ্ডার, ব্যাঙ্ক রেট এইসব শব্দ কানে খটখট করে লাগে। আমি একটু চমকে যাই। স্নিগ্ধ বাতাসে একটি অপরূপ ভোর, গাছের পাতা এই বর্ষায় বেশি সবুজ, জলের ওপর হাঁসের ঝাঁক ছবির থেকেও বেশি সুন্দর। এর মধ্যে ভাও, টেণ্ডার, ব্যাঙ্ক রেট? আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হলো না। মনে হয় যেন গল্পের মতন, গল্পের ঝানু ব্যবসায়ীরাই

শুধু সব সময় এ রকম কথা বলে।

সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি সেই দলটির পেছনে পেছনে খানিক দূর গেলাম। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম ওঁদের কথা। সত্যি, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা ব্যাবসার আলোচনাই করছেন খুবই একাগ্র চিত্তে।

এক বিশেষ শ্রেণীর অন্য প্রদেশীয় ব্যবসায়ীদের আমরা ঘৃণা করি, যদিও তারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাদের মনে হয়, মানুষের রক্ত শোষণ করে টাকার স্তূপ তৈরি করাই তাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু এক এক সময় ভাবি, ওদের কি ছেলেবেলা নেই? ওদের কি ব্যক্তিগত জীবনেও ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা নেই? সবচেয়ে বড়ো কথা, দিনের কোনো সময়েই কি ওদের ছুটি নেই? সারা দিনটাই যার কাজ বা কাজের চিন্তায় কেটে যায়, তার জীবনে আনন্দের স্থান কোথায়? যে লোক অপরূপ ভোরবেলা পার্কে এসেও ব্যাবসার চিন্তা ছাড়তে পারে না, সে যত সার্থকই হোক, তাকে আমরা কৃপা করতে পারি।

শুধু অবাঙালি ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করা ভুল হবে। জাতি বিচারের প্রশ্ন ছাড়াও, মানুষের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, তারা ছুটির মর্মই বোঝে না। অফিস থেকে অনেকে মেয়ের বিয়ে, বাবার শ্রাদ্ধ কিংবা বাড়ি তৈরির জন্য ছুটি নেয়, অর্থাৎ আরো বেশি ঝামেলার কাজে জড়িয়ে পড়ে। এই সব লোকেরা অনেকেই অফিসের কাজে ফাঁকি দেয় বটে কিন্তু ছুটির সময়ের কাজে দারুণ খাটে। আবার, রিটায়ার করার পর এরা আর কোনো কাজ খুঁজে পায় না। অনেকের কাছেই আফসোস করে, সময় আর কাটে না ভাই।

ধলভূমগড়ে ব্যানার্জিদা নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উনি স্টোন চিপসের ব্যাবসা করেন। কথায় কথায় উনি আমাদের একটি পরমাশ্চর্য ঘটনা জানিয়েছিলেন। গত দু' বছরের মধ্যে উনি কোনো সিনেমা দেখেননি, কোথাও বেড়াতে যাননি, গান-বাজনা শোনেননি, বিজনেসটা দাঁড় করাবার জন্য খাটছেন। বিজনেস অবশ্য, ওঁর ভাষায় 'ভগবানের কৃপায়' দাঁড়িয়ে গেছে, ওয়াগন প্রতি পনেরো টাকা ঘুষ দিয়ে উনি দুশো ওয়াগন বুক করে ফেলেছেন। ওঁর স্ত্রী যখনই সিনেমা যাবার জন্য বায়না ধরেন, উনি চারখানা টিকিট কাটিয়ে দিয়ে বলেন, যাকে খুশি সঙ্গে নিয়ে যাও! এর পরও আপত্তি করলে, পাঁচশো, হাজার টাকা ফেলে দিয়ে বলেন, শাড়ি কেনো না, গয়না কেনো না!

লোকটির চরিত্র এতই অবিশ্বাস্য যে, একে নিয়ে গল্পও লেখা যায় না। এইসব লোক ভেবে রাখে যে, প্রচুর কাজ করে একদিন প্রচুর টাকা পয়সা করব, তারপর ছুটি নেব। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত ছুটি আর কখনো আসে না। অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও কম শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস জাতীয় রোগ

এসে যায় আগেই। তার ফলে, ভোরবেলা পার্কে ভ্রমণ এবং সেখানেও বিজনেসের আলোচনা।

রিলাক্সেশন শব্দটি অনেক অশিক্ষিত লোকও জানে, মিলখা সিং জাতীয় খেলোয়াড়রা ছাড়া। কিন্তু ছুটির সঙ্গে এই সাহেবী শব্দ বা ধারণাটির কোনো মিল নেই। বারে-রেস্তোরাঁয় এবং অন্য নানা জায়গায় এই শব্দটি নানা উচ্চারণে প্রায়ই শোনা যায়। আমরা সকলেই জানি, অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী বা সার্থক ব্যক্তি বা কর্মবীর অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী নানা পাপচক্রে লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ কিনা খুব মদ খেয়ে হৈল-হল্লা কিংবা মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি। পাপের প্রশ্ন এখানে অবান্তর—কিন্তু এইসব কাজ ঐসব মানুষ যে করে, তার যুক্তি ঐ রিলাক্সেশান। কিন্তু ঐ ব্যাপার দুটিই আসলে অত্যন্ত টেনশানের। এর মধ্যে একাকীত্ব নেই। এর মধ্যে জড়িত থাকে এমন সব সাঙ্গোপাঙ্গ কিংবা কুকাজের সঙ্গী যে তারা পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে রাখে। তারই ফল হিসেবে কখনো কখনো শোনা যায়, বোম্বাইয়ের সমুদ্রে কোনো শিল্পপতি ও তরুণীর ভাসমান মৃতদেহ।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, যে-কোনো বিভাগেই যে-সব ব্যক্তি প্রতিভাবান তারা বেশি নারীসঙ্গ কামনা করে। নারীর সাহচর্য ছাড়া প্রতিভাবানদের ক্ষমতার ঠিক বিকাশ হয় না। নানা ধরনের কর্মবীরদেরও হয়তো আমরা প্রতিভাবান বলতে পারি, কিন্তু যারা টাকা দিয়ে নারীকে কিনতে চায়, তাদের মতন দুর্ভাগা আর নেই। নারীর কমনীয়তার কাছে পুরুষের যে নিভৃত ছুটি থাকে, তার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না!

যারা খুব বেশি তাস খেলে, তারা রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তাসের স্বপ্ন দেখে। দেখবেই, এটা একটা বাঁধা ব্যাপার। সারাদিন কাজকর্মের পর অনেকেই সন্ধের পর তাস খেলতে যায়। এমন মানুষ অনেক আছে, যারা যে-কোনো একটু সময় খালি পেলেই চোখের সামনে কোনো হালকা অথবা ডিটেকটিভ বই খুলে বসে। এরা মন কিংবা মাথাকে কখনো খালি রাখতে চায় না। কোনো কাজ না থাকলেই যদি নিজের মুখোমুখি বসতে হয়! সেটা একটা ভয়ের ব্যাপার। খুব কম লোকই বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা করে।

অনেক লেখক বা শিল্পীকে দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদের দিকে চেয়ে আছে। কিংবা পা দোলাচ্ছে। আপাতত মনে হয়, এদের মতন অলস আর কেউ নেই। কিন্তু এরাও আসলে বিষম ব্যস্ত। এদের মাথার মধ্যে সব সময় পোকা ঘুরঘুর করে। কোনো চিকিৎসাতেই সেই পোকা মরে না। পোকাগুলি বেশি প্রবল হয়ে গেলে এরা পাগল হয়ে যায়। আনুপাতিক হারে লেখক শিল্পীদের মধ্যেই পাগলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পাগলামি জিনিসটা কিন্তু এক হিসেবে ভালো,

মৃত্যু ছাড়া, একমাত্র এই অবস্থাতেই পাওয়া যায় অখণ্ড অবসর।

পরীক্ষার আগে সব ছাত্রছাত্রীই ভাবে, একবার হয়ে যাক না পরীক্ষাটা, তারপর কত কি করব! কিন্তু পরীক্ষার পর ফাঁকা সময়টায় আর বিশেষ কিছুই কবার থাকে না। তখন আবার মনটা ছটফট করে। কবে কলেজ খুলবে, সেইজন্য অধীর প্রতীক্ষা। কলেজ খোলে, আবার পরীক্ষা। কলেজ-জীবন শেষ হয়ে যায়, তবু পরীক্ষার আর শেষ হয় না। এই সময় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারপর বিশ্রাম নেয়। কিন্তু বিশ্রাম আর ছুটি তো এক নয়।

ছুটি তাহলে কি? প্রত্যেকেরই একটা কিছু নিজস্ব কাজ আছে। কেউ মাঠে লাঙল চষে, কেউ অফিসে কলম পেষে। এই কাজের বাইরেও একটা পৃথিবী আছে, সেই পৃথিবীর দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া, নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই তো ছুটি। মাঠ থেকে ফিরে যে চাষী রামায়ণ গানের আসরে গিয়ে দু'দণ্ড বসে, তার ঠোঁটের হাসিটা সহজে তিক্ত হয় না। এক্ষুনি কেউ বলবেন, যে লোক দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, সে আবার রামায়ণের আসরে বসবে কি? সব সময়েই তো তার খাবারের চিন্তা! কথাটা ঠিক সত্যি নয়। কুলি কিংবা রিকশাওয়ালারা রাত জেগে মাঝে মাঝেই 'রামা হৈ' গান জুড়ে দেয় দল বেঁধে। সেই গানের সুর প্রতিবেশীদের বিরক্তি উৎপাদন ঘটায় ঠিকই, কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা ওরা যখন এই নিয়ে মেতে থাকে—তখন এক ধরনের আনন্দ পায় ঠিকই। সেই সময়টা তারা খাদ্যচিন্তা করলেও তো পারত। প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্রে একটা-না-একটা অকাজের দিক আছে, সেটা সব সময় সে নিজেই জানতে পারে না। এক সময় একজন প্রেসের ম্যানেজারকে আমি চিনতাম, যার প্রধান কাজই ছিল আমার কাছে এসে টাকার তাগাদা দেওয়া। তিনি টাকাপয়সার কথা ছাড়া আর কোনো কথাই জানতেন না। সেই জন্য ওঁকে দেখলেই আমি ভয় পেতাম, লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করতাম। একদিন এসে উনি বললেন, আমি আর দিন সাতেক আসব না, শৌলমারিতে নেতাজীকে দেখতে যাচ্ছি। আমি অবাক। ওঁকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, শৌলমারির সাধু নেতাজী হতেই পারেন না, নেতাজী হলে ইত্যাদি। উনি বললেন, যে যাই বলুন, আমি একবার নিজের চোখে দেখে আসব। গাড়ি ভাড়া সব জোটাতে না পারি, খানিকটা রাস্তা পায়ে হেঁটে যাব। চল্লিশ সালে আমি ওঁর বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, আবার এসো! তারপর উনি কোথায় চলে গেলেন। আর দেখা হলো না, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না। আমাকে শৌলমারিতে গিয়ে একবার দেখে আসতেই হবে নিজের চোখে—

অসম্ভব একটা জেদে লোকটির মুখ জ্বলজ্বল করছিল। এতদিন ওঁকে আমি

একজন নিছক প্রেস-কর্মচারী বলেই ভাবতাম। সেদিন থেকে ওঁর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মে গেল। লোকটি শুধু কর্মচারীই নয়, ওঁর মনের মধ্যে কোথাও একটা ছুটি লুকিয়ে আছে।

তখনই আমার মনে পড়েছিল রামগড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর মেঘ-ঘনিয়ে-আসা এক সন্ধ্যায় বলেছিলাম, শিগগির আবার ফিরে আসব। যাওয়া হয়নি। ভয় হয়, অন্যমনে কখন ছুটি ফুরিয়ে না যায়!

পরিচিত জগতের সীমার বাইরে

একটি রং-চঙে স্কার্টপরা যুবতী বিদেশিনী ঢুকল এসে আমাদেব ঘরে। অফিসে। ভাঙা উচ্চারণে সে একটি বাংলা নাম বলল। আমাদের এক সহকর্মীর সঙ্গে সে সিনেমা বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চায়। আমেরিকায় সে সেই সহকর্মীর একটি উপন্যাসের সত্যজিৎ রায় -কৃত চলচ্চিত্র দেখেছে, তাই এই উৎসাহ।

আমাদের সহকর্মী তাকে বললেন, বসুন!

মেয়েটি চেয়ার টেনে নিয়ে সহাস্যে বলল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার হাতে মাত্র চার মিনিট সময় আছে।

অন্য টেবিল থেকে আমরা একটু উৎসুকভাবে তাকিয়ে ছিলাম। চার মিনিটের কথা শুনে নড়েচড়ে বসলাম। আমরা কখনো কারুর সঙ্গে স্বেচ্ছায় চার মিনিটের জন্য দেখা করতে যাই না, যদি-না যাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি তিনিই সেই সময় বেঁধে দেন।

সহকর্মী বললেন, চার মিনিট। সে তো অনেক সময়।

মেয়েটি, তার হাসিটাকে বিস্ফারিত করে বলল, আমি জানি, চার মিনিটে কোনো কথাই বলা যায় না। কিন্তু কি করব আমাকে এখান থেকে বেরিয়েই সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে।

—এখান থেকে কোথায় যাবে?

—জাপান। কেন চলে যাচ্ছি, জানো? আমার ভিসা ফুরিয়ে গেছে। তোমাদের সরকার বলছে, আমি নাকি এখানে বে-আইনিভাবে আছি। কি যে সব আইনকানুন বুঝি না। কলকাতা আমার চমৎকার লাগছে, কি সুন্দর যখন-তখন বৃষ্টি, রাস্তাগুলো হঠাৎ-হঠাৎ নদী হয়ে যেতে দেখলে এত ভালো লাগে...আমি আবার আসব, যে-করেই হোক কলকাতায় আবার আসবই—

মেয়েটি চার মিনিটের বদলে সাত মিনিট থেকেছিল। তারপর প্রায় ছুটতে

ছুটতে বেরিয়ে গেল। আমাদের সহকর্মী তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে বললেন, এখন কলকাতা, রাত্তিরে জাপান, আবার হয়তো পরশু অস্ট্রেলিয়া—অদ্ভুত জাত একটা!

মেয়েটির ঐ জোর দিয়ে বলা, আবার কলকাতায় ফিরে আসব, শুনতে বেশ ভালো লেগেছিল। কেন আসতে চায় এই শহরে, এই বিশ্বনিন্দিত নরককুণ্ডে! এত বেশি নিন্দের জন্যই হয়তো কারুর কারুর বেশি আগ্রহ জাগে।

হিপি-ইনফ্লাক্স-এর পর থেকে ভ্রাম্যমাণ আমেরিকান সম্পর্কে আমাদের এখন আর তেমন আগ্রহ নেই। তবু, একটি অল্পবয়েসী মেয়েকে একা-একা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে দেখলে কিছুটা চমৎকৃত হতেই হয়। ভ্রমণের নেশা আছে বটে এই জাতটার। হিপিদের তবু একটা কারণ ছিল, ভিয়েৎনাম যুদ্ধে লড়াই করার বদলে অনেক ছেলে দেশ থেকে পালিয়ে হিপি হয়ে যেত, সঙ্গে নিয়ে আসত মেয়েবন্ধুদের। এখন ভিয়েৎনাম যুদ্ধ থেমে গেছে তবু হিপি আগমনের বিরাম নেই। চিন্তা-ভাবনাহীন ভ্রমণের নেশাটা পেয়ে বসেছে।

একথা ঠিক, টাকা থাকলেই এরকম ভ্রমণ সম্ভব। আমেরিকানদের টাকার অভাব নেই, তাই সারা পৃথিবীতে যত্রতত্র দেখা যায় তাদের। তাছাড়া, শোনা যায় বহু দেশে নানারকম আমেরিকান স্পাইতেও ছেয়ে আছে—অনেক রকম তাদের ছদ্মবেশ। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক স্পাই থাকতেই পারে। অবশ্য স্পাইদের ব্যাপারে আমি কোনো রকম বিরূপ ধারণা পোষণ করি না।

রঙীন স্কার্টপরা ঐ মেয়েটিকে দেখে আমার মনে পড়ল অন্য একটি মেয়ের কথা। অনেকদিন আগে আমি 'বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প' নামের একটি ইউনেস্কো পরিচালিত ব্যাপারে ছোট কাজ করতাম। আমাদের কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। বয়স্ক অশিক্ষিত লোকেরা যখন কথা বলে কতগুলো শব্দ তারা ব্যবহার করে, কি কি শুদ্ধ বাংলা তারা বোঝে। সেই কাজে বর্ধমানের একটা গ্রামে আমরা গেছি। কুড়ি-একুশ জনের মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল। এক দুপুরে আমরা তিনজন যুবক ঠিক করলাম, পায়ে হেঁটে দামোদর নদী পার হব।

তখনো দামোদরের বাঁধ সম্পূর্ণ হয়নি, বিশাল নদীটি প্রায় মুমূর্ষ মহাকাব্যের নায়কের মতন বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। অধিকাংশ জায়গাতেই বালি, মাঝে মাঝে জল রয়েছে, সেই জলের গভীরতা কোথায় কতটুকু আমরা জানি না। কিন্তু আমরা তিনজনেই সাঁতার জানি। শহুরে ছেলের পক্ষে এইভাবে নদী পার হওয়াই এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।

একটু বাদে দেখি আমাদের পেছনে পেছনে আমাদের দলের একটি মেয়েও আসছে, তার নাম ধরা যাক সীমা। আমরা সীমাকে বারবাব বারণ করলাম। অন্য

মেয়েরা ও সহকর্মীরা সীমাকে ফিরে যাবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করল। আমাদের অফিসার পর্যন্ত তাঁর আপত্তি জানালেন। সীমা কিছুতেই শুনবে না। সে যাবেই।

তখন নদী বেশ চওড়া ছিল, বালির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হতেই অনেক সময় লাগে, মাঝে মাঝেই কোমর জল পাচ্ছি। যে-কোনো জায়গায় ডুব জল থাকতে পারে। এই রকম একবার জলে পা দিয়ে সীমা আমাদের জানাল যে, সে সাঁতারও জানে না।

আমরা খুব ধমকালাম তাকে। সীমা হাসতে হাসতে বলল, আমার যাই হোক না, আমি তো তোমাদের বাঁচাতে বলিনি আমাকে। আমি কোনোদিন একলা-একলা কোথাও যাইনি, আমার ভীষণ ইচ্ছে করে—

সীমার বয়েস তখন উনিশ-কুড়ি, তার স্বভাবে কোনো আধো-আধো ন্যাকা ভাব ছিল না, সে পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারত। সে আমাদের জানিয়েছিল সে পায়ে হেঁটে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। সে সাইকেল নিয়েও বেরিয়ে পড়তে পারে।

সাইকেল নিয়ে অনেক ছেলেই বিদেশ ঘুরে এসেছে আগে, এখনো যাচ্ছে। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু কোনো মেয়ে, বাঙালি মেয়ে, এইভাবে পৃথিবী ঘুরতে যাবে, আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

আমরা সীমাকে উপহাস করেছিলাম।

সীমা রেগে গিয়ে বলেছিল, কেন, পারব না?

আমাদের মুখে এসে গিয়েছিল, তুমি মেয়ে, শুধু এইজন্য পারবে না।

কিন্তু এটা রূঢ় কথা, তাই ওর সামনে আর উচ্চারণ করিনি।

সীমা সেবার আমাদের সঙ্গে দামোদর পার হয়েছিল ঠিকই। একবারও আমাদের সাহায্য নেয়নি। সাঁতার না জেনেও সে বুক জলে নামতে ভয় পায় নি একটুও। ওপারে পৌঁছে বিজয়িনীর মতন সে বলেছিল, দেখো, একদিন ব্রাজিল কিংবা লিবিয়া থেকে তোমাদের কাছে ছবির পোস্টকার্ড পাঠাব।

আমাদের সেই চাকরির মেয়াদ ছিল মাত্র তিন মাসের। তারপর সবাই ছিটকে পড়লাম নানা দিকে, কারুর সঙ্গে আর কারুর দেখা হবার কথা নয়।

তবু সীমাকে আমি দেখেছিলাম, ছ'সাত বছর বাদে। মেট্রো সিনেমার সামনের ফুটপাথ থেকে কি যেন কিনছিল। সঙ্গে দুটি বাচ্চা ও রোগা চেহারার স্বামী। সীমাও যথেষ্ট রোগা হয়ে গেছে, কণ্ঠার হাড়ে লেখা আছে কয়েকটি দুঃখের অক্ষর।

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগেই সে আমাকে চিনতে পারল। আলাপ করিয়ে দিল তার স্বামীর সঙ্গে। দু'চারটি ভদ্রতাসূচক বাক্য বিনিময় হলো।

সীমাকে দেখা মাত্রই আমার মনে পড়েছিল সেই ব্রাজিল কিংবা লিবিয়া থেকে ছবির পোস্টকার্ড পাঠানোর কথা। সে রকম কিছু আমি কখনো পাইনি। সীমার বোধহয় সে কথা মনেও নেই।

সীমার বিয়ে হয়েছে যাদবপুরের দিকে। সে তার বাবা-মায়ের নটি সন্তানের একজন বলেই তার বাবা-মা হুড়োহুড়ি করে তার বিয়েটা সেরে দিয়েছেন। পুজোর ছুটিতে ঘাটশীলা বা ঐরকম কোনো জায়গা ছাড়া আর বেশি দূর তার ভ্রমণ হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমরা সীমাকে মনে মনে বলেছিলাম, তুমি পারবে না। তুমি মেয়ে বলেই পারবে না। কিন্তু এটা তো কোনো রকম অভিশাপ ছিল না। সে যেতে পারলে তো আমরা খুশিই হতাম। কেন পারল না?

এই তুলনাতেই রঙীন স্কার্টপরা বিদেশিনী যুবতীটিকে কত স্বাধীন মনে হয়। সে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে মাত্র সাত মিনিট কথা বলেই বিমানে উড়ে অন্য দেশে চলে যায়। কত জোর দিয়ে সে বলে, আবার কলকাতায় ফিরে আসব।

এই মেয়েটি সত্যই আবার কলকাতায় ফিরে এলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেইটাই স্বাভাবিক। সেইজন্যেই এত জোর দিয়ে ওরা কথা বলতে পারে। সীমার সঙ্গে এই মেয়েটির তফাত কি শুধু এইটুকুই যে এ জন্মেছে একটা অত্যন্ত ধনশালী দেশে! মানুষের জন্মটাও এতখানি মূল্যবান!

অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি আবার দুটি দৃশ্য দেখি। তিনজন বিদেশী ও বিদেশিনী কাঁধে হাত রেখে অলসভাবে হাঁটছে। প্রত্যেকের কাধে একটা করে ঝোলা, পোশাক এতই মলিন ও শতচ্ছিন্ন যে এদের বিমানযাত্রী বলে মনে হয় না। আফগানিস্তান থেকে হাঁটাপথে যারা এদেশে ঢোকে, মনে হয় সেই দলের। পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের কথাবার্তার দু'-এক টুকরো শুনতে পেলাম। ইংরেজি নয়, মনে হয় গ্রীক। অবশ্য যে কোনো অচেনা ভাষাই আমার কাছে গ্রীক।

তারপর ময়দানে আমি দেখতে পাই, একটি আট-ন' বছরের মেয়েকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছে কয়েকটি ছেলে। বাচ্চা মেয়েটি খানিকটা দূর গিয়েই সাইকেল সমেত ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে। তবুও তার কি পরিষ্কার রিনরিনে কণ্ঠের হাসি।

এই মেয়েটি দু-চার দিনের মধ্যেই সাইকেল চড়া শিখে যাবে। একে দেখে আবার সীমার কথা মনে পড়ে। সীমা সাইকেল চালাতে জানত। এই মেয়েটি যখন বড়ো হয়ে উঠবে তখন সময় অনেক বদলে যাবে নিশ্চয়ই। তখন কি এই মেয়েটি ইচ্ছে হলে একলা বা বন্ধুদের সঙ্গে যে-কোনো দেশে, যে-কোনো জায়গায় বেড়াতে

যেতে পারবে? ছোট পরিচিত জগতের সীমা ভেঙে দিয়ে এ কি বেরুতে পারবে বাইরে? সীমা নামের মেয়েটি যা পারেনি? নাকি তখনো দশ বছর পরেকার আমাদের দেশেও শুধু ধনবানরাই পাবে বিমানে চড়ে বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ? বাদবাকিরা এই পৃথিবীর কিছুই দেখবে না?

জীবনে কি হতে চেয়েছিলাম

পুরোনো অ্যালবামের পাতা ওল্টালে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়। মনে করুন, আপনারই সামনে বসে আছেন দু'-তিনজন ভদ্রলোক ও মহিলা। অ্যালবামে তাঁদেরই খুব ছেলেবেলার ছবি। একদম চেনা যায় না। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কি মিল খুঁজে পাচ্ছেন? ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় বলতে হয় বটে যে, হ্যাঁ, চোখ দুটো দেখলে চেনা যায়, কিন্তু থুতনি বা নাক। আসলে কিন্তু চিনতে পারি না আমি। এমনকি নিজের ছেলেবেলার ছবি দেখলেও চিনতে পারি না।

এক জীবনে মানুষ দু'রকম চেহারা পায়। শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত যে চেহারা, তার সঙ্গে বাকি জীবনটার কোনো মিলই নেই। আমার দৃঢ় ধারণা, প্রত্যেক মানুষই দ্বিজ। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকসনের বাল্য বয়েসের ছবি ছাপা হয়েছে বিখ্যাত সাপ্তাহিকে, তারই পাশে তাঁর এখনকার বয়েসের ছবি। দেখলে সেই পুরোনো গল্পটা মনে পড়ে যায়। একজন শিল্পী একজন দেবদূতের ছবি আঁকার জন্য একজন মডেল খুঁজছিলেন। অনেক বেছে বেছে এক অনিন্দ্যকান্তি কিশোরকে তাঁর পছন্দ হয়। সেই কিশোরের মুখচোখে স্বর্গের আভা। এর দশ-পনেরো বছর বাদে শিল্পীটি আবার শয়তানের ছবি আঁকার জন্য মডেল খুঁজতে লাগলেন। ঘুরতে লাগলেন বিভিন্ন জেলখানায়। শেষ পর্যন্ত যে কুখ্যাত অপরাধীর মুখখানা তাঁর পছন্দ হলো—সে, অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, ওই আগের কিশোরটিই।

মানুষের জীবনটা বড়ো নিষ্ঠুর রকমের করুণ। এখানে দুঃখ আছে যেমন, তেমন সুখও আছে বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে অতৃপ্তি। জীবনের মধ্যপথে এসে হঠাৎ একটা সন্ধেবেলায় মনে হয়, কিছুই যেন ঠিক মতন হলো না! এ জীবনটা অন্য রকম হবার কথা ছিল।

ছেলেবেলায় অনেক রকম স্বপ্ন থাকে। একলা-একলা একটি শিশু যখন একটা লাঠিকে তলোয়ার বানিয়ে খেলা করে, তখন দূর থেকে তাকে লক্ষ করলে একটা অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। সব শিশুই তখন 'রূপকথার রাজপুত্র', সে লড়াই করছে দৈত্য-দানব অর্থাৎ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। সে দস্যুর হাত থেকে

বিপন্না নারীকে উদ্ধার করছে। হায়, এই শিশুই বড়ো হয়ে নিজেই হয়তো অনেক নারীকে বিপন্না করে। তাকে শায়েস্তা করার জন্য এই সমাজ ব্যস্ত হয়ে থাকে। কেন এরকম হয়?

একটি ছেলে ডাক্তার হতে চেয়েছিল। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় তার বাবা মারা যায়, বিরাট সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে তার ঘাড়ে। পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয়। এখন সে একটি ওষুধ কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। তরুণ ডাক্তাররাও অনেক সময় অবজ্ঞা করে কথা বলে তার সঙ্গে। আমি নিজেই চিনি ছেলেটিকে। সে কি সবসময় দুঃখী থাকে? তা মোটেই না। সে চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, সিনেমায় গিয়ে হাসে, একসঙ্গে দুটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করে। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা, সে অন্য অনেকের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে, সামান্য ঝগড়াতেই এমন কঠোর তিক্ত ভাষা বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে, যা কল্পনাই করা যায় না! কেন তার স্বভাবের এই তিক্ততা, তা বোঝা খুব শক্ত নয়।

কলেজে আমাদের সহপাঠী ছিল শুভংকর, যে প্রায়ই আমার কাছে এক টাকা দু' টাকা ধার চাইত। যদিও জানতাম, শুভংকর খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে। একদিন জানতে পারলাম, শুভংকর দিনের পর দিন নিজের বাড়িতে কিছু খায় না, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পয়সা ধার করে শিয়ালদার কাছে শস্তা হোটেল থেকে খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরে। শুভংকর হঠাৎ একদিন জানতে পেরেছিল, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়, যখন সে খুবই ছোট, তাদের বাড়িতে কয়েক হাজার মন চাল লুকোনো ছিল। অথচ তাদেরই বাড়ির সামনে না-খেতে-পাওয়া মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। শৈশবে ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি, পরে অন্যান্যদের কথাবার্তায় জানতে পারে। এই উপলব্ধি ওর মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন ঘটায়, বাড়ির প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে যায় ওর। এখন নিজে বাড়ির খাবার না খেয়ে সেই প্রায়শ্চিত্ত করছে।

এ ভাবে বেশি দিন চলে না। কোনোক্রমে বি. এ. পাস করে শুভংকর একটা সামান্য স্কুল মাস্টারি নিয়ে চলে যায় উত্তরবঙ্গে। এটা নিছক একটা জেদের ব্যাপার। শুভংকর অন্য রকম হতে চায়। পারেনি। প্রাইভেট টিউশানির সূত্রে শুভংকরের প্রণয় হয় এক ধনী কন্যার সঙ্গে। শুভংকরের চেহারা ও আচার-আচরণ ছিল বনেদী বাড়ির মতনই, অল্পবয়েসী মেয়েটি তাকে দেখে আকৃষ্ট হয় এবং বাড়ির ঘোর অমতেই শুভংকরকে বিয়ে করে। মেয়েটি বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি গাছতলাতেও থাকতে রাজি আছি।

গাছতলায় ওরা থাকেনি। বাবা মারা যাবার পরেই শুভংকর স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে আসে কলকাতায়। আর কিছু না, আত্মীয়স্বজনরা ঠকিয়ে সম্পত্তিগুলো

নিতে চাইছে বলেই তাদের জব্দ করার জন্য মামলা ঠুকতে হয়। এবং জেতে। কারণ সে ন্যায্য উত্তরাধিকারী।

সেদিন একজন পরিচিত লোক এসে বললেন, বাজারে বেবিফুড একদম পাওয়া যাচ্ছে না। দারুণ বিপদে পড়েছি। শুভংকর রায় তো আপনার বন্ধু ছিল, ওর দোকানে পাওয়া যেতে পারে, আপনি আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন না।

বড়বাজারে শুভংকরদের এই ব্যাবসার কথা আমি জানতাম না। নাছোড়াবান্দা ভদ্রলোককে নিয়ে সেখানে যেতেই হলো। শুভংকর এখন এক হাতে দুটো আংটি পরে। শরবত খাইয়ে আপ্যায়ন করল।

সমস্ত বেবি ফুডের ব্যবসায়ীই চোরা কারবার করে কিনা সে সম্পর্কে আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। না হতেই পারে। কিন্তু দোকানে বেবি ফুড না থাকা সত্ত্বেও শুভংকর পুরোনো বন্ধুকে খাতির করার জন্য এক টিন আমাদের যোগাড় করে দিয়েছিল। কৃতজ্ঞ হবার বদলে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে ওর নামে ক্ষীণ সমালোচনা করতে থাকি।

সেই সময়েই মনে পড়ে, একটি শিশু যতদিন পয়সা গুণতে শেখে না, ততদিনই সে সত্যিকারের সরল থাকে। তাবপর স্কুলে অঙ্ক শেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘড়ির কাঁটা চেনে ও পয়সা গুণতে শিখে যায়, আর পাকা হয়ে ওঠে। এই অঙ্কই যত নষ্টের গোড়া।

ডাকাতের ছেলে অনেক সময় বড়ো ডাকাত হয়। বারবনিতার মেয়ে বারবনিতা। গায়কের ছেলে গায়ক, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তাব। পৃথিবীতে এই রকম একটা নিয়ম আছে। কিন্তু কেরানির ছেলে কি কেরানি হতে চায়? করপোরেশন অফিসে টিকে দেন যাঁরা, তাদের ছেলেমেয়েদেরও কি তারা ওই পদে চাকরির জন্য তৈবি করেন? একজন স্কুল মাস্টারের দুঃখিনী স্ত্রী তাঁব বড়ো ছেলেকে বলেছিলেন, আর যদি কোনো কাজ না পাস তাহলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাইবে লোকজনের জুতো দেখাশুনোর কাজ কববি। তবু মাস্টারিতে ঢুকিস না।

কলকাতার বড়ো বড়ো হোটেলে একটা বিকৃত বীভৎস চাকরির পদ আছে। বাথরুমের দরজার পাশে একজন লোক বসে থাকে, যার কাজ হচ্ছে বাবু ও মাতালদের দেখে সেলাম করা এবং সসম্ভ্রমে দরজাটা খুলে ধরা। অর্থাৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ লোকটি বাথরুমের ভেতরে বা বাইরে বসে থাকবে। কোনকালে ব্রিটিশরা হয়তো এ দেশের নেটিভদের দিয়ে এ রকম কাজ করিয়ে নিত। এখন স্বদেশী আমলেও সে কাজ সগৌরবে চলছে।

এ-রকম একজন লোককে দেখে আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নাম কি?

সে এমনই মিনমিন করে কথা বলে যে বোঝাই যায় না। বাবুদের সামনে স্পষ্ট করে কথা বলার অভ্যেসই ওর নেই। দু'-তিন বার জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারলাম, ওর নাম শাজাহান।

একমুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও নামে কিছু আসে যায় না, তবু শাজাহান নামটা শুনলে একটু রোমাঞ্চই হয়। ওর বাবা-মা যখন এই নাম রেখেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক শখ ও স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ঘিরে। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ওর বাড়ি ছিল উত্তরপ্রদেশের কি একটা গ্রামে। একবার বন্যায় বাড়িঘর সব ডুবে যায়। তারপর ভাসতে ভাসতে নানা ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে ঠেকেছে।

ঈষৎ ঘোরের মাথায় আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, জীবনে কি হতে চেয়েছিলে শাজাহান?

ও মাথা নীচু করে থাকে। মৃদু মৃদু হাসে। হয়তো ও জানেই না, এ ছাড়া জীবন আবার কি রকম। তবু, চাষীর ছেলে যখন, নিশ্চয়ই বাথরুমের দরজা পাহারা দেবার চাকরির কথা কখনো ভাবেনি।

সার্থক মানুষরা মারা যাবার পর খবরের কাগজে যখন তাদের জীবনী পড়ি, তখন চমৎকৃত হয়ে যাই। এঁরা সার্থকতার সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। কোথাও হিসেবের গরমিল নেই। দৈবাৎ শুধু দু'-একটি মুচির ছেলে জোসেফ স্টালিন হয় কিংবা পুলিশের ছেলে হয় বিপ্লবী। আমার চেনাজানা জগতে যাদের দেখি, তারা অনেকেই যা হতে চেয়েছিল, তা হয়নি।

আমি নিজেও কখনো লেখক হতে চাইনি। আমার ইচ্ছে ছিল নাবিক হওয়ার। কিংবা জাহাজের ডাক্তার। জল আমার বড়ো প্রিয়, সারাজীবন সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে আমি রাজি ছিলাম। তা আর হলো না। ঠিক মতন লেখকও হতে পারলাম না। সত্যিকারের সার্থক লেখা এখনো কত—কত দূরে। কোনো কোনো সন্ধেবেলার আবছা আলোয় একলা-একলা হাঁটতে হাঁটতে আমারও মনে হয়, এ জীবন অন্য রকম হবার কথা ছিল।

পুরাতন ভৃত্য

আমার ছোটমাসিদের বাড়ির চাকর হরিদাসকে নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলা যায়। সে একটি মূর্তিমান জলজ্যান্ত 'পুরাতন ভৃত্য'। হরিদাসকে নিয়ে আমার ছোটমাসিদের অভিযোগের অন্ত নেই। যেসব মানুষকে দেখলে মনে হয় বয়েসের

গাছপাথর নেই, হরিদাসের চেহারাটা সেইরকম, অর্থাৎ তার বয়েস পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে—আমরা অনেক দিন থেকেই তার একই রকমের চেহারা দেখছি। আরশোলার মতন গায়ের রং, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। মুখখানা সব সময় হাসি-হাসি। সে অলস। বোকা এবং চোর। তবু সৎ।

চোর অথচ সৎ—একথা শুনলে আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই। তার চুরির মধ্যে একটা সততা আছে। যেমন, হরিদাস রান্নাঘর থেকে মাছভাজা কিংবা দুধের কড়াই থেকে দুধ চুরি করে খায়। কিন্তু কক্ষনো টাকাপয়সা কিংবা অন্য কোনো দামী জিনিস চুরি করেনি। বহু হারানো গয়না সে খুঁজে দিয়েছে, ঘর ঝাঁট দেবার সময় খুচরো পাঁচ-দশ পয়সা পেলেও সে ছোটমাসির হাতে তুলে দেয় কিন্তু মাছ ভাজা সম্পর্কে বেড়ালের চেয়েও বেশি লোভ। এবং এ সম্পর্কে সে অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে।

দুধ চুরিটা আবার অন্য রকম। আজকাল কারোর বাড়িতেই অঢেল পরিমাণে দুধ থাকে না। সুতরাং দুধ কম পড়লে নজরে আসবেই। হরিদাসের কড়া পাহারায় ছোটমাসিদের বাড়িতে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। বেড়াল সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। দুধ চুরি করার পর ধরা পড়লেই হরিদাস সে কথা স্বীকার করতেও দ্বিধা করে না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলে যে সে সামান্য একটু দুধ ঢেলে নিয়েছে নিজের গেলাসে। অন্য বাড়ির চাকরদের মতন সে কক্ষনো দুধের কড়াই থেকেই চুমুক দিয়ে খায় না। বাবুদের দুধ সে এঁটো করে দেবে না কক্ষনো।

দুধ চুরি করিস কেন রে হারামজাদা?

এ প্রশ্নের উত্তরে সে বিগলিত হাস্যে বলে যে বছরে দু'-তিন দিন দুধ না খেলে নাকি মানুষের কুকুর-রুচি হয়ে যায়। তখন জিভটা বের করে হ্যা হ্যা করতে হয়।

কয়েকবার এই রকম করায় ছোটমাসিরা হরিদাসের জন্য বাধ্য হয়েই খানিকটা দুধ বরাদ্দ করেছেন।

মেয়েদের মাথায় মাখার গন্ধতেল চুরি করার দিকেও ঝোঁক আছে হরিদাসের। একবার আবিষ্কার করা হয়েছিল, সে একটা ছোট শিশিতে ঐ চুরি করা তেল জমিয়ে রাখে। বোধহয় ওর বৌকে পাঠাবার জন্য। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হাসাহাসির পর্যায়েই ঠেকেছিল।

কিন্তু এক এক সময় হরিদাসের ব্যবহার একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। জরুরি কাজে দোকানে কিছু কিনতে পাঠালে দেড় ঘণ্টা বাদে ফেরা। পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধানো—এছাড়া দামী-দামী জিনিসপত্র ভাঙা তো আছেই। দরকারি কাগজ বা চিঠিপত্র ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেবার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই।

প্রায়ই হরিদাসকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো সে নিজেই রাগ করে চলে যায়। বেশি বকাঝকা করলে সে বলে, আমি আজই চলে যাচ্ছি, পরের গোলামি আর করব না। দেশে গিয়ে চাষবাস করব। আমার কি তিনকূলে কেউ নেই নাকি?

আমার ছোটমাসি তখন বলেন, যাও, এক্ষুনি বিদেয় হও। আর কোনোদিন মুখ দেখতে চাই না তোমার! সেও তৎক্ষণাৎ তার জামাকাপড়ের পুঁটলিটা বগলদাবা করে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে রওনা দেয়।

কি কি কারণে হরিদাসের চাকরি যায়, তারই সামান্য একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন ছোটমাসিরা নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন, তাদের শোবার ঘরের বিছানায় হরিদাস দিব্যি শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাড়ির বাবুদের অনুপস্থিতিতে ঝি-চাকররা যতখুশি ফ্যানের হাওয়া খায়, অনেকখানি চিনি দিয়ে নিজেদের জন্য চা বানায়। বড়জোর চেয়ারে বা সোফায় বসে। তা বলে বিছানায় শোওয়াটা কি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নয়? দেখলে তো গা রি-রি করে উঠবেই।

ছোটমাসি চেঁচামেচি করে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। তক্ষুনি বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব বদলাতে হলো। এই সময় হরিদাস যদি কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইত, তাহলে ব্যাপারটা মিটে যেতে পারত। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া তার ধাতে নেই। তার উত্তরটা আরো মর্মপীড়াদায়ক।

সে মিটিমিটি হেসে বললে, বিছানা করতে করতে ঘুম এসে গিয়েছিল গো বৌদি! এরকম নরম বিছানায় তো কখনো শুইনি। কি যে আরাম জীবনে যদি একবার না বুঝলাম—

একথা শুনে ছোটমাসি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, তুমি বিদায় হও, আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না কোনোদিন—

হরিদাস তক্ষুনি তেজের সঙ্গে বলল, আমাকে তাইড়ে দেচ্ছেন! আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

কিন্তু মাঝরাত্তিরে কারুকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, ছোটমাসি বললেন, থাক, এখন গিয়ে আর গৃহস্থের অকল্যাণ করতে হবে না। কাল সকালেই তুমি বিদায় হবে।

সকালেই হরিদাস মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে বিদায় হয়ে গেল। কিন্তু পুরাতন ভৃত্যকে কখনো বিদায় করা যায় না। ও বাড়ির সকলেই জানে, হরিদাস ঠিক পনেরো-কুড়িদিন বাদে আবার ফিরে আসবে। এরকম অনেকবার হয়েছে। সে ফিরে আসার পর যখন তাকে বলা হয়েছে যে, তোমাকে এবার রাখা হবে না।

তখন সে উত্তর দিয়েছে, না রাখবেন তো না রাখবেন, তা বলে কি দুটো খেতেও দেবেন না! আমি কি না খেয়ে থাকব নাকি?

হরিদাসের একটি মাত্র গুণ সে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসে। ছোটরাও ওর ভক্ত, ও ফিরে এলে তারা খুশি হয়। সেইজন্যই ওকে আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হরিদাস ছোটদের নানা রকম গল্প বলে। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে মনে হয়। রামায়ণ মহাভারতের অনেক গল্পই তার কণ্ঠস্থ। সে নাকি এককালে যাত্রাদলে গান গাইত, যদিও কথাটা বিশ্বাস করা যায় না, কারণ তার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট খারাপ। যে-সব পরিশ্রমী মানুষ পৃথিবীতে লাঙল চালিয়ে ফসল কিংবা নদীতে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে বা মাটি কাটে বা বাড়ি বানায়—হরিদাস ঠিক সে দলের নয়। তার স্বভাবটাই অনেকটা দার্শনিক বা শিল্পীর মতন, যদিও সে-রকম কোনো যোগ্যতা তার নেই। এই এক ধরনের অদ্ভুত মানুষ থাকে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে তার বৌ ছেলেপুলে আছে। হরিদাস আগে গ্রামের যাত্রাদলের টুকিটাকি কাজ করে চালাত, তারপর শহরে এসেছে চাকরের কাজ করতে। সে নাকি একদম খিদে সহ্য করতে পারে না। বাবুদের বাড়িতে কাজ করলে আর যাই হোক, দু'বেলা পেট ভরে ভাত-রুটি অন্তত পাওয়া যায়।

হরিদাসের শেষতম কীর্তির সাক্ষী ছিলাম আমি। সেদিন ছোটমাসির বাড়িতে গেছি, বসবার ঘরে গল্প জমেছে এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে একটা কোলাহল শোনা গেল। ছোটমাসিদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেতরে গেলাম। দেখলাম, হরিদাস আর একটা কাণ্ড বাধিয়েছে। কাজের থেকে অকাজেই তার প্রতিভা ভালো খোলে।

রান্নাঘরের কলটা খারাপ বলে, বাড়ির রাঁধুনি ডেকচিতে করে চাল নিয়ে এসেছিল উঠোনের বাথরুমের কলে ধোওয়ার জন্য। ধোওয়ার পর সে ডেকচিটা বারান্দার ওপর একটুখানি রেখে কোথায় যেন গেছে। এমন সময় সেখানে হরিদাসের আবির্ভাব। তাকে বলে বলেই কাজ করানো যায় না। অথচ এখন তার নিজে থেকেই কাজ করার স্পৃহা জাগল। চাল ধোওয়ার পর ওপরে যে জলটুকু থাকে সেটা ময়লা দেখায়। হরিদাস বলল, 'এখানে আবার ডেকচিতে ময়লা জল রাখল কে,' বলেই সে ডেকচির ভেতরের সব ছুঁড়ে দিল নর্দমার দিকে।

এই বাজারে দেড় কিলো চাল নষ্ট হলে কার না রাগ হয়। বৃষ্টির মতন অবিরাম ভর্ৎসনা ও গালাগালি বর্ষিত হতে লাগল তার ওপরে। হরিদাস কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ এগোতে লাগল নর্দমার দিকে। তখন আবার সকলে হৈ-হৈ করে নিষেধ করতে লাগল। নর্দমা থেকে চাল তুলে খাবার মতন অবস্থা এখনো শহরের গৃহস্থদের হয়নি।

হরিদাস তবু একটা জন্তুর মতন হুমড়ি খেয়ে পড়ল নর্দমার ওপরে। দু'হাতে চালগুলো ভরে নিতে লাগল নিজের কোঁচড়ে।

আমিও এক ধমক দিয়ে বললাম, এই হরিদাস, ওটা কি হচ্ছে?

হরিদাস মুখ ফিরিয়ে সজল চোখে বলল, দাদাবাবু, দেশে আমার বৌ ছেলেমেয়েরা আধপেটা খেয়ে থাকে। আমি এতখানি চাল নষ্ট করলে আমার পাপ হবে গো, খুব পাপ হবে। সেই পাপে তারা নিশ্চয়ই না খেয়ে মরে যাবে।

আমরা দু'-এক মিনিট সকলে চুপ করে রইলাম। কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

ফুলেশ্বর

মনে করুন ছুটির দিনে আপনি অনেকের সঙ্গে দল বেঁধে পিকনিকে বেরিয়েছেন। বছরে এক-আধবার এরকম তো ইচ্ছে করেই। বিশেষত শীতকালে। কোথায় যাবেন? এখানে কলকাতার নাগরিকদের কথাই বলছি—যাঁরা কলকাতার বাইরে থাকেন, তাঁদের অন্যান্য অনেক সমস্যা থাকলেও এখনো জায়গাব সমস্যা হয়নি। কলকাতার মানুষ এরকম কোনো পিকনিকের কথা ভাবলেই প্রথমে মনে পড়বে বোটানিকাল গার্ডেনস বা চিড়িয়াখানার কথা। এক লক্ষ লোক একসঙ্গে ঐ দুটি জায়গার কথা ভাববে, সুতরাং ওখানে ভিড় হবে লাখো মানুষের। অত ভিড়ের মধ্যে কি পিকনিক জমে?

যারা একটু দূরে যেতে রাজি আছেন, তাঁদের মনে পড়ে ডায়মণ্ডহারবারের কথা। অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষেব একসঙ্গে মনে পড়ে। যে-কোনো ছুটির দিনেই ডায়মণ্ডহারবারে দারুণ ভিড়।

ভিড়ের শহর কলকাতার মানুষ স্বভাবতই এই সব বিশেষ দিনে একটু নিরিবিলি চায়। কিন্তু নির্জনতাই এখানে সবচেয়ে দুর্লভ সামগ্রী।

এইরকম একটা দলের সঙ্গে এবার বেরিয়েছিলাম ইংরেজি নববর্ষের দিনে। কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় যাওয়া যায়? ভিড়ের জায়গা কারুরই মনঃপূত হয় না। শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে যে-কোনো একটা জায়গায় বসে পড়া যেতে পারে বটে ; কিন্তু সেখানে আছে পানীয় জলের সমস্যা। যে-কোনো জায়গার জল কি আজকাল বিনা দ্বিধায় পান করা যায়? তাছাড়া, বড়ো রাস্তার ধারগুলি হচ্ছে স্থানীয় লোকদের বড়ো-বাথরুমের বারোয়ারি জায়গা। সকালবেলা ট্রেনে যেতে যেতে অনেকেই সে দৃশ্য দেখেছেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে হঠাৎ একটা জায়গার নাম আমার মনে পড়ল। এক সময় ফুলেশ্বর বলে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, বেশি দূরে নয়, হাওড়া জেলায়। সেখানে গঙ্গানদী বাঁক নিয়ে বিশাল চওড়া হয়েছে, নয়নাভিরাম দৃশ্য। সেই দৃশ্যের কিনারায় সেচ বিভাগের একটি চমৎকার বাংলো, বাংলোর সামনে প্রশস্ত চত্বর।

আমার মনে হলো, স্থানটি আমাদের পক্ষে আদর্শ হবে। সুন্দর প্রকৃতি এবং নিরিবিলি। প্রধান সড়ক থেকে আবার অনেকখানি সরু রাস্তা ধরে যেতে হয়। গাড়িচালকরা উৎসাহী হবেন না। ফুলেশ্বর নামে একটি রেল স্টেশনও আছে, স্টেশন থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত হাঁটা পথ। আমি দলের সকলকে সেখানে যাবার জন্য উৎসাহী করে তুললাম।

গিয়ে কি দেখলাম? সেই অগম্য স্থানটিও মানুষের ভিড়ে গমগম করছে, ঝনঝন করে বাজছে মাইক্রোফোন। অর্থাৎ সেদিন সেখানকার জনসংখ্যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ইন্দোনেশিয়ার সমান। যেদিকে চোখ যায়—সেদিকেই জ্বলছে উনুন। মুরগি কাটা হচ্ছে কিংবা পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কান্নাকাটি করছে অনেকে।

আমাদের দলের সকলেরই মন দমে গেল। কিন্তু অতদূরে একবার পৌঁছে আবার তক্ষুনি ফিরে আসা যায় না। অনেক চেষ্টা করে খানিকটা জায়গা খুঁজে বার করতেই হলো। আমি বহু বছর দুর্গাপূজার সময় কলকাতায় থাকিনি—সুতরাং কোনো বারোয়ারি উৎসবের স্বাদ এখানেই অনেকদিন বাদে টের পেলাম। বারোয়ারি পিকনিক।

সুন্দর সুন্দর জায়গা চিনে নেবার চোখ ছিল সাহেবদের। আমাদের দেশের অধিকাংশ শৈলনগরীই যেমন সাহেবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এছাড়াও নানা জায়গায় যে-সব ডাকবাংলো দেখে এমন আমরা মোহিত হই সেগুলিও অধিকাংশই সাহেবী আমলে তৈরি। আমি ঠিক জানি না, ফুলেশ্বরের ঐ ডাকবাংলোর জন্য স্থান নির্বাচনও সাহেবী আমলেই হয়েছে কিনা। সাহেবরা অবশ্য স্বার্থপরের মতন ঐ সব সুন্দর জায়গা প্রায় নিজেদের ব্যবহারের জন্যই সুরক্ষিত রাখত। এখন বারোয়ারি আমলে আমরা সেগুলো নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি।

নিরিবিলি জায়গার যখন অভাব, তখন সুদৃশ্য জায়গাগুলিতে তো ভিড় হবেই। যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। কিন্তু অচেনা মানুষ হলেই যেন আমরা প্রথম থেকেই পরস্পরকে অপছন্দ করা শুরু করি।

তরুণ বয়েসী ছেলেদের হুল্লোড় দেখতে আমার ভালো লাগে। পিকনিকে গিয়ে অনেকেই কিছুটা মুক্ত হয়। রস-রসিকতার ছড়াছড়ি একটু বেশি মাত্রায়

হলেও আপত্তি করার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু আমাদের রসিকতাজ্ঞান আজকাল নিছক গালাগালিতে পর্যবসিত হয়েছে। এতগুলি উচ্ছল প্রাণের মাঝখানে এসে আশা করেছিলাম কিছু নতুন রসিকতা শুনতে পাব, কান পেতে ছিলাম। কানে এল কিছু কাঁচা গালাগালি—একটাও নতুন নয়, সবই আগে শোনা। এমনকি ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেছে পর্যন্ত।

আর একটা ব্যাপার সত্যিই ভারী অদ্ভুত। দুর্গাপুজো কালীপুজোয় মাইকের উৎপাত নিয়ে অনেকে অনেককিছু বলেছেন। কিন্তু পিকনিকেও যে মাইক বাজানো হয় তা আমার ধারণাই ছিল না। ফুলেশ্বরের পিকনিক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো মজার। মাঠের দু'পাশ থেকে দুই মাইক্রোফোনে তারস্বরে গানের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে—দুটি আলাদা গান, তার ফলে কোনো গানেরই সুর বা কথা কিছুই বোঝার উপায় নেই। শোনা যাচ্ছে শুধু একটা বিকট শব্দ।

চিন্তা করতে লাগলুম, এখানে গান বাজাবার কারণটা কি হতে পারে? সঙ্গীতপ্রীতি? সঙ্গীত সম্পর্কে যার সামান্য আগ্রহ আছে, তার পক্ষে ঐ বিকট আওয়াজ এক মিনিটও সহ্য করা সম্ভব নয়। পিকনিকে এসে একটু গান বাজনা হলে সকলেরই ভালো লাগে। দলবল মিলে কোরাস গাইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? এরকম একটা রেওয়াজ কি আগে ছিল না? পিকনিক ক্ষেত্র তো সঙ্গীত সম্মেলন নয়, সেখানে একটু ভুল সুরে, একটু বেসুরো গলায় গানও মানিয়ে যায়। ঐ বিরাট জনসমাগমে একটি দলকেও দেখলাম না, যাঁরা নিজেরা মিলেমিশে গান গাইছেন।

বোঝা গেল, দুটি আলাদা পিকনিক দল মাইক্রোফোন ও রেকর্ড সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। নিজেদের কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি তাদের আস্থা নেই। লতা মুঙ্গেশকার, রফি কিংবা আশা ভোঁসলে প্রমখের গান না শুনলে তাদের তৃপ্তি হবে না। সুতরাং পিকনিকের বাজেট ঠিক করার সময় চাল, মুরগি, আলু-বেগুনের সঙ্গে সঙ্গে মাইক ভাড়াও ধবা হয়েছিল। এ পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল। কিন্তু তারপর পিকনিক স্পটে এসে যখন দেখা গেল, দু'দল এরকম দুটি মাইক এনেছে--তখন একদল নিজেদেরটা বন্ধ রেখে অন্যদলের গানটা শুনলেই বা ক্ষতি ছিল কি? দু'দলেরই হিন্দী গান ছাড়া অন্য কিছু নেই। সুতরাং রুচির অমিল হবারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দু'দল মিলেমিশে রেকর্ডগুলো বদলাবদলি করে বাজালে ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু অচেনা দল মানেই যেন পরস্পরের শত্রু। সুতরাং একশো গজের মধ্যে দুটি মুখোমুখি মাইক্রোফোনে বিকট নিনাদ। মুখ দেখে মনে হলো না, কারুর কোনো অসুবিধা হচ্ছে, ঐ আওয়াজেই যেন তাদের সঙ্গীত-পিপাসা মিটে যাচ্ছে। এর পরের পিকনিকে ওরা তিনটে ধোপার গাধা ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখ

দিয়ে অনবরত আওয়াজ বার করলে অনেক কম খরচে হয়ে যাবে, গানের ব্যাপারটাও ঠিক থাকবে।

একটি মাত্র টিউবওয়েল, সেখান থেকেই খাবার জল নেওয়া ও মুখ ধোওয়া। ভিড় তো হবেই। সর্বক্ষণ ভিড়। ছেলেরা হৈ-হৈ করে সেখানে জল ভরছে কিংবা মুখ ধুচ্ছে। গুটিকয়েক মেয়ে একদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। তাদের হাতের এঁটো শুকিয়ে আসছে। মেয়েদের দেখলে একটু জায়গা ছেড়ে দেবার একটা যেন নিয়ম এককালে ছিল মনে পড়ছে। এখন স্পষ্টতই সে নিয়ম উঠে গেছে। মেয়েরা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বেশিক্ষণ তাদের উদ্দেশ্যে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা যায়। মেয়েদের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করার বদলে তাদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা কিন্তু কেউই করে না। একজন ছেলেও তো কোনো অচেনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল না, আসুন, আপনি হাত ধুয়ে নিন না, আমি পাম্প করে দিচ্ছি। জল পাম্প করে দিতে দিতে সে অনায়াসেই প্রশ্ন করতে পারত, আপনি কোথা থেকে আসছেন। আপনার নাম কি? এইসব সরল প্রশ্নে ভূ-ভারতে কেউ কখনো আপত্তি জানায়নি। অচেনা মেয়ের সঙ্গে সামনাসামনি দু'চারটি কথা বলার বদলে পিছন থেকে দু'একটা কু-বাক্য ছুঁড়ে দেওয়ার আনন্দ যে কি করে বেশি হয় তা বোঝার সাধ্য আমার নেই। আমি সত্যিই বারোয়ারি উৎসবের নিয়ম জানি না।

গোপন কথা

আমার একটা গোপন কথা আছে, সেটা কাকে বলব? সেই মানুষটাকে খুঁজে পাওয়াই সব চেয়ে শক্ত।

পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার কোনো গোপন কথা কিংবা খুব গোপন কোনো সমস্যা নেই? এই গোপনীয়তার ভার মানুষ কিছুতেই একা বইতে পারে না। কারুকে না কারুকে বলতেই হয়। বুকের মধ্যে অসহ্য ভার হয়ে থাকে—অন্য একজন কারুর কাছে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তার মুক্তি নেই।

আগেকার দিনে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরঘরে কাটাতেন, তার কারণ কি শুধু ভক্তি? বর্ষীয়সী বৃদ্ধারা সমাজের অবধারিত নিয়মে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, তাঁদেরও তো গোপন কথা থাকে। শেষ পর্যন্ত পাথরের ঠাকুরের সামনেই সেই গোপনীয়তার মুক্তি। 'ঠাকুর তুমি তো জানো আমার মনের কথা'—এই যে আকুল আবেদন, এর পেছনে অনুচ্চারিত থাকে সেই দুঃখ—আমাকে কেউ বুঝলো না—যারা আমার চার পাশে বেঁচে আছে, তারা আমার মনের কথা

বোঝবারও চেষ্টা করে না।

সন্ন্যাসী কিংবা গুরুঠাকুরদের কাছে ভিড় করারও কারণ তাই। ঐ সন্ন্যাসী কিংবা গুরু একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যিনি পরের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবারই ব্রত নিয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়েই সব কিছু উজাড় করে ফেলা যায়। সেই জন্যই যে গুরু ভক্ত বা ভক্তিমতীদের মনের কথা যত তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেন, তিনি তত জনপ্রিয়।

শিষ্য ঘরে ঢোকা মাত্রই গুরু যদি বলেন, কি রে, তোর মনে এত চিন্তা কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে! তক্ষুনি শিষ্যর মনে হয় গুরু অন্তর্যামী। আর কেউ তো আমার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, আর কেউ তো আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝে না আমার মনের মধ্যে ঝড় বইছে! চোখে জল এসে যায় এই জন্য।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলে যে মানুষের অধিকাংশ অসুখই মানসিক। পেটের অসুখ থেকে শুরু করে অনেক চর্মরোগ পর্যন্ত স্রেফ মানসিক অশান্তির জন্যই হয়। থ্রমবসিস ইত্যাদিও তো অতিরিক্ত চিন্তার ফল। কোনো দিন যদি শোনা যায় যে, ক্যানসার রোগও মানসিক যন্ত্রণারই কু-ফসল—তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ডাক্তারদের কাছে যাবার পর আমাদের অনেক অসুখ সেরে যায়। তার কতটা ওষুধ খাবার জন্য আর কতটা যে ডাক্তারের কাছে সব কিছু খুলে বলার পর ভিতরের অবরুদ্ধ বাষ্পের মুক্তির জন্য তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে অনেক সময়ই দেখা গেছে অনেক সহৃদয় ডাক্তারের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করার পর, তাঁর দেওয়া ওষুধটির প্রথম দাগ খেয়েই উপকার হতে শুরু করেছে।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের কৃতিত্ব এই ক্ষেত্রে আরো বেশি। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বিজ্ঞানের দিকটা আজও আমাদের অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে সব হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেন—তাঁরা রোগীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করেন। আপনার কোন গ্রামে জন্ম, সেই গ্রামের উত্তর কোণে একটা শিমুল গাছ ছিল কি না, সেই শিমুল গাছে শকুনের বাসা ছিল কি না —এই রকম প্রশ্নও করা হয় বলে অনেকে ঠাট্টা ইয়ারকি করে থাকেন। কিন্তু এই উপলক্ষে রোগী তার যত কিছু বলার আছে, সবই খুলে বলার মতন একজন লোককে অন্তত পায়।

যাদের অসুখের বাতিক আছে, যারা অনবরত অসুখের কথা বললে অন্যরা বিরক্ত হয়, তাদের কথা যে ডাক্তারেরা ধৈর্য ধরে শোনেন, যত আজেবাজে

উপসর্গের কথাও ধৈর্য ধরে শোনেন, তিনিই ওর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

উকিল-ব্যারিস্টারদের কাছেও অনেকে গোপন কথা খুলে বলতে পারেন বটে। মামলার কারণে বলতেই হয়। কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে টাকাপয়সার সম্পর্কটা বড়ো বেশি প্রকট বলেই এখানে সান্ত্বনা একটু কম। তা ছাড়া, এ কথাও মনে হয়, উকিলরা বেশি টাকা পেলে প্রতিপক্ষের কথাও এ-রকমভাবেই শুনতেন —সুতরাং উনি ঠিক আমারই প্রতি সমব্যথী নন। ডাক্তার বা সাধু-সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে এই প্রতিপক্ষের ব্যাপারটা নেই।

প্রেম জিনিসটা কি? অনেকেই এই প্রশ্ন করেন। বিশেষত যাঁরা প্রেমে পড়েন নি। তাঁরা অহরহই অন্যকে জিজ্ঞেস করে থাকেন, আচ্ছা, তোমরা যে এত প্রেম প্রেম করো—প্রেম জিনিসটা আসলে কি তা বলতে পার?

এ পর্যন্ত ব্রহ্ম এবং প্রেম—এই দুটি জিনিসের সঠিক কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি। রামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্ম অনুদ্দিষ্ট। আর কবি-সাহিত্যিকরা বার বাব বলে গেছেন, যে কখনো প্রেমে পড়েনি, সে কখনো প্রেমের স্বাদ বুঝবে না।

তবু, প্রেম ব্যাপারটার খুব প্রাথমিক একটি শর্তের কথা বলা যেতে পারে। যাকে সমস্ত গোপন কথা খুলে বলা যেতে পারে—তার সঙ্গেই সত্যিকারের প্রেম হতে পারে। আমরা অনেক সময় বাইরে থেকে দেখি যে প্রেমিক-প্রেমিকারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কি সব মাথামুণ্ডহীন কথা যে বলে যাচ্ছে, তার ঠিক নেই। ঐ সব আবোল-তাবোল কথা বলেও আনন্দ পাচ্ছে বলেই তো ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেমের সঙ্গে শরীরেরও একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু মাসের পর মাস প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের সঙ্গে দেখা নেই—শরীরের কাছে নেই শরীর, তবু তো হাজার-হাজার চিঠি-বিনিময় হয়। এক হাজার মাইল দূর থেকেও হঠাৎ মনে হয় একবার টেলিফোনে কথা বলতে।

সুতরাং মনে হতে পারে, মানুষের সব গোপন কথা বলা যেতে পারে একমাত্র প্রেমিককেই। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের সম্পর্কেই যদি কোনো গোপন কথা থাকে? এ-রকম কি থাকে না? ভালোবাসার দুঃখ অনেক। একজন মানুষ তার প্রেমিকাকে আর সব কথাই খুলে বলতে পারে—কিন্তু যদি প্রেমিকা সম্পর্কেই কোনো ঈর্ষা বা ভয়ের ব্যাপার থাকে কখনো—সেটা কিছুতেই বলতে পারে না। একটু স্থূল স্বভাবের লোকরা অবশ্য ঐসব কথা নিয়েও ঝগড়া করে। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কোনো মানুষ, অর্থাৎ খাঁটি কোনো প্রেমিক পারে না কারুকেই বলতে, তার গোপন কথা বলার জন্য আর কেউ নেই। সেই সময় তার মতন নিঃসঙ্গ, তার মতন দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে আর একজনও পাওয়া যাবে না।

ভোরের স্টেশন

ঘুম ভাঙার পর ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, ভোর হয়ে এসেছে এবং একটা স্টেশনে ট্রেন থেমে আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, ট্রেনটা এখানে থেমে আছে অনেকক্ষণ। এই ছোট স্টেশনে মেল ট্রেন থামারই কথা ছিল না। কিন্তু ট্রেনের একটা আলাদা জীবন আছে, ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে, কখন সে চলবে বা থামবে, তা সে নিজেই ঠিক করবে। সব সময় যে রুটিন মেনে চলতেই হবে, তার কোনো মানে নেই।

কাছাকাছি কোনো চা-ওয়ালা দেখতে পেলাম না। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই চায়ের কথা মনে পড়ে। এবং চা না খেয়ে দিনের প্রথম সিগারেটটি আমি ধরাতে পারি না। কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে আমি আড়মোড়া ভাঙলাম।

মেল ট্রেনটির চেহারা খুব গম্ভীর মনে হলো। যেন তার খুব মন খারাপ। এখন তার দৌড়োদৌড়ি করার একটুও ইচ্ছে নেই। তাতে অবশ্য আমার কিছুই যায় আসে না, আমার কোনো ব্যস্ততা নেই পৌঁছোবার। সারা জীবন আমি কখনোই কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার জন্য ব্যস্ততা অনুভব করিনি, যাত্রাপথটাই আমার কাছে বেশি উপভোগ্য। যারা সবসময়ই কোথাও-না-কোথাও পৌঁছোবার জন্য সদা ব্যস্ত তারাই আসলে মৃত্যুকে বেশি ভয় পায়।

আমি স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালাম। দূরপাল্লার রেলযাত্রায় এই রকম ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে প্রায় প্রতিবারই এক-একটা এই রকম আশ্চর্য সুন্দর ছোট্ট স্টেশন দেখতে পাই। নাম-না-জানা স্টেশন, চারপাশে শ্বাসরোধকারী দৃশ্য। প্ল্যাটফর্মটা আগাগোড়া সিমেন্টে বাঁধানো নয়, দু'ধারের দিকে পাথর আর মাঝখানে সুরকি ঢালা। স্টেশন মাস্টারের ঘরটিও পাথরের। কাছাকাছি আর বাড়িঘর নেই। অদূরেই পাহাড়। প্রায় স্টেশনের গা থেকেই সিঁড়ির মতন থাকে-থাকে পাহাড়ের সারি উঠে গেছে।

চায়ের জন্য এদিক-ওদিক তাকালাম। এক জায়গায় একটা উনুনের ওপর কেটলি চাপানো। সামনে একটা লোক র‍্যাপার দিয়ে কান ও মুখ ঢেকে বসে আছে। কাছে গিয়ে লোকটিকে বললাম, ভাই, চা হবে?

লোকটি কান ও মুখ থেকে র‍্যাপার সরিয়ে হিন্দীতে বলল যে, চা ফুরিয়ে গেছে। আবার বানানো হচ্ছে।

সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে ট্রেনটা না ছাড়লেই বাঁচি। গোটা প্ল্যাটফর্মে আর একটিও ফেরিওয়ালা নেই। তাতে বেশ স্বস্তিই বোধ করলাম। এই রকম একটা চোখজুড়োনো ভোরবেলায় বেশি লোকজনের চিৎকার যেন মানাত না।

হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষে এসে দাঁড়াবার পর চোখে পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে আর একটি সাত-আট বছরের ছেলে হাত-ধরাধরি করে নেমে আসছে। মেয়েটির মাথায় একটা ঝুড়ি। মেয়েটি শুধু একটা শাড়ি পরেছে, ছেলেটির গায়ে একটা লম্বা ঢোলা জামা, তার নিচে প্যান্ট আছে কিনা বোঝা যায় না। বেশ শীত। আমার গায়ে সোয়েটারের ওপর কোট।

অপলকভাবে তাকিয়ে রইলাম সেই মেয়েটি ও ছেলেটির দিকে। একটা ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা। আকাশটা বাড়াবাড়ি রকমের নীল। সামনের প্রথম পাহাড়টিতে একটাও গাছ নেই, লালচে রঙের উজ্জ্বল পাথরের স্তূপ—সেই পাহাড় থেকে আসছে ঐ দুটি প্রাণী যাদের শীতবোধ নেই। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন অলৌকিক মনে হয়।

আমি মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লাম, ধোঁয়ার মতন বেরুলো। ছেলেবেলায় এই ব্যাপারটা কি ভালোই যে লাগত। নিজের মুখনিঃসৃত ধোঁয়ার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকতাম। এখনো একটুক্ষণের জন্য ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে বার বার মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে লাগলাম।

মেয়েটি ও ছেলেটি অনেক নিচে নেমে এসেছে। ওরা স্টেশনেই আসতে চায়। আমি ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছি ট্রেনের নড়াচড়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা।

ছেলেটি এখন মেয়েটির হাত ছেড়ে লাফাতে শুরু করেছে। বুঝতে পারলাম, শীত তাড়াবার জন্যই ঐ চাঞ্চল্য। মেয়েটি কিন্তু বেশ শান্ত। তার চলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে।

মেয়েটি কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, কি আছে তোমার ঝুড়িতে?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে মাথা থেকে ঝুড়িটা নামাল। দেখলাম কতকগুলো টাটকা কাঁচা পেয়ারা। মনে হলো যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে এনেছে গাছ থেকে। এ-রকম টাটকা পেয়ারা অনেকদিন দেখিনি।

—কত করে?

—এক-একঠো দশ নয়া।

আমি দুটি বেশ পরিপুষ্ট পেয়ারা বেছে নিয়ে বললাম, এক জোড়া পনেরো নয়া হবে?

—নেহী বাবুজী!

—দেবে না? এক জোড়া তো নিচ্ছি—

—নেহী বাবুজী!

হঠাৎ ধাতস্থ হলাম। শহুরে লোক বলে দরাদরি করার অভ্যেসটা কিছুতেই

যায় না। কত সময় কত টাকাপয়সা আজেবাজে খরচ করি। আমার পরিচিত অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এমন সিগারেট খান, যার এক-একটির দামই আট আনা বা তার বেশি। অনেক সময় তাঁরা আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দেন। আমি অনাগ্রহের সঙ্গে একটা তুলে নিই। ধরাই, অন্যমনস্কভাবে আট আনা পুড়ে যায়। আর এই মেয়েটি পাহাড় পেরিয়ে কয়েকটি পেয়ারা বিক্রি করতে এসেছে সামান্য দশ পয়সা দামে. তা নিয়েও আমি দরাদরি করছি!

লজ্জিতভাবে পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলাম। খুচরো পয়সা নেই, এক টাকার নোট। মেয়েটির কাছে খুচরো নেই। সে অসম্ভব লাজুক। আমার টাকাটা দেখে মুখে কিছু না বলে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। এর মধ্যে হাসির কি আছে?

একবার মনে হলো মেয়েটিকে পুরো টাকাটাই দিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু একবার পাঁচ পয়সার জন্য দরাদরি করে, পরক্ষণেই আবার একটা টাকা দিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে, যা আমার চরিত্রে ঠিক মানায় না। আমিও লজ্জা পাই।

বললাম, ঠিক আছে, আমি ঐখানে চা কিনতে গিয়ে টাকাটা ভাঙিয়ে নিচ্ছি, তুমি একটু পরে আমার কাছ থেকে দাম নিয়ে যেও।

মেয়েটি বিনা বাক্যব্যয়ে অন্য লোকজনের দিকে চলে গেল। আমি পেয়ারাতে কামড় বসালাম। গত সরস্বতী পুজোতে প্রসাদের মধ্যে বুঝি এক টুকরো পেয়ারা ছিল, তাছাড়া এর মধ্যে আর পেয়ারা খাইনি। এখন দুটোই খেয়ে ফেললাম। তেমন মিষ্টি নয়, একটু কষকষ, সেটাই আমার পছন্দ। মুখটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

চা তৈরি হয়ে গেছে। পর পর তিন ভাঁড় চা খেলাম। চায়ের সঙ্গে কাঁচা পেয়ারা দিয়ে ব্রেকফাস্ট এর আগে কখনো করিনি। তবু এরপর সিগারেট ধরাতেই মনের ভেতরটা আশ্চর্য হালকা হয়ে গেল। যেন এরকম আনন্দ জীবনে কখনো পাইনি। কি সুন্দর একটা অচেনা জায়গায় এই চমৎকার ভোরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যদি এরকম একটা উৎকণ্ঠাহীন স্থানে কয়েকটা দিন থেকে যাওয়া যেত।

তক্ষুনি মনে পড়ল। কতবার ট্রেনে যেতে যেতে আমি ভেবেছি এই রকম অখ্যাত ছিমছাম পাহাড়ী জায়গায় আমি বেড়াতে আসব। কখনো আসা হয়নি। আজ এখানে থেকে গেলে কেমন হয়? কি অসুবিধে আছে?

তক্ষুনি দৌড়ে গেলাম নিজের কামরার দিকে, স্যুটকেসটা নামিয়ে নেবার জন্য। সহযাত্রীরা অনেকেই ইতিমধ্যে জেগে উঠেছেন, আমি বাঙ্ক থেকে স্যুটকেসটা নামাতেই একজন বললেন, কি ব্যাপার, কোথায় চললেন?

গোটা একদিন ধরে এঁদের সঙ্গে এক কামরায় এসেছি, অনেক কথাবার্তা

হয়েছে, কে কোথায় যাব জানা হয়ে গেছে। এখন আমি যদি এই অসম্ভব জায়গায় নেমে পড়ার কথা বলি, এঁরা নিশ্চয়ই দারুণ আশ্চর্য হবেন। এই সব স্টেশনে কেউ নামে না। স্টেশনগুলো কেন তৈরি হয়েছে, তাই-ই বা কে জানে!

চক্ষুলজ্জার জন্য পৃথিবীতে কত কাজ পণ্ড হয়েছে। আমিও চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারলাম না। শুধু এই জায়গাটা দেখতে ভালো লাগছে বলেই এখানে নেমে পড়ছি, এই কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। বললাম, ভাবছি, পাশের একটা কামরায় অনেক জায়গা খালি আছে, সেখানে—

দুজন সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, চলুন তো আমরাও গিয়ে দেখি, তাহলে না হয় একসঙ্গেই—

এই সময় আমাকে বাঁচাবার জন্যই হুইশল দিয়ে ট্রেনটা একটু নড়ে উঠল। ট্রেন ছাড়ছে। আর একটি সদিচ্ছার অঙ্কুরে বিনাশ হলো। আমি স্যুটকেসটা আবার বাঙ্কে তুলে রাখলাম। সেই মুহূর্তে মনে পড়ল মেয়েটিকে তার পেয়ারার দাম তো দেওয়া হয়নি? লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

মেয়েটি বিস্মিতভাবে তাকিয়ে ছিল। আমি ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে পকেটের সব খুচরো পয়সা তুলে দিতে গেলাম তার হাতে। অতি ব্যস্ততায় পয়সাগুলো ছড়িয়ে গেলো মাটিতে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, আমার আর সময় নেই। আমি আবার দৌড়ে এসে উঠে পড়লাম নিজের কামরায়।

জানলা দিয়ে মেয়েটিকে দেখা যায় তখনো। সে নিচু হয়ে পয়সা কুড়োচ্ছে। কি করুণ সেই ভঙ্গি। আমার মনে হলো, আমি মেয়েটিকে অপমান করেছি। আমি অপরাধী।

শ্মশানের পাশে একজন

শ্মশানের পাশেই নিমগাছ। সেই গাছে উঠে একটা লোক খুব ব্যস্তভাবে মটমট করে ডালসুদ্ধ পাতাগুলো ভেঙে নিয়ে কোঁচড়ে ভরছে। সেদিকে এমনিই তাকিয়েছিলাম, কোনো কিছু চিন্তা করিনি, হঠাৎ পাশ থেকে একজন বলল, দেখেছ কাণ্ড!

চমকে উঠে বললাম, কি ব্যাপার?

—ঐ যে লোকটা নিমপাতা ছিড়চে? ঐগুলোই আমাদের খেতে হবে।

—কেন?

—ঐগুলোই তো বাজারে বিক্রি করবে!

আমি বুঝতে পারলাম, শীতের শেষ দিকে ভাতের সঙ্গে প্রথমেই নিমবেগুন খাওয়ার একটা রেওয়াজ আছে বটে। বাজারে এই সময় কচি কচি নিমপাতা ওঠে। এ বছর সেগুলোর দামও একটু বেড়েছে।

আমার সঙ্গী রাগতভাবে আবার বলল, বিনা মলধনের ব্যাবসা, তা বলে শ্মশানের ধারের গাছটাকেও বাদ দেওয়া যায় না?

যে-লোকটি পাতাগুলো ভাঙছে, তার চেহারা খুবই দীনদরিদ্রের মতন। বেওয়ারিশ নিমগাছ সে আর কত খুঁজে পাবে, আজই নিশ্চয়ই শ্মশানের ধারের এই গাছটা নজরে পড়েছে। অন্য কেউ যাতে এসে না পড়ে, তাই ওর এত ব্যস্ততা। শুধু নিমপাতা কেন, টুথপেস্টের ওপর করবৃদ্ধির জন্য নিমডালের দাতনেরও নিশ্চয়ই চাহিদা বেড়েছে। অবিলম্বেই গাছটা নির্মূল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমার পাশের লোকটির আপত্তি এই যে, শ্মশানের পাশে গাছ, যেখানে সব সময় মড়া-পোড়ানো হাওয়া লাগছে, সেই গাছের পাতা কি মানুষকে খাওয়ানো উচিত?

মানুষ-পোড়ানো হাওয়া লাগলে গাছের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, কিংবা সেই গাছের পাতা খেলে জীবিত মানুষের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, সে বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য আমার জানা নেই। তবে আমার চোখ পড়ল অন্য এক দিকে। শ্মশানের পাশেই একটা ঝোপড়া, খুব সম্ভবত সেখানে চণ্ডালের স্ত্রীপুত্র-পরিবার থাকে। সম্প্রতি সেখানে মাটির উনুনে খিচুড়ি রাঁধা হচ্ছে, একটা বাচ্চা তার পাশেই বসে মুড়ি চিবোচ্ছে। স্ত্রীলোকটি এবং বাচ্চাটির স্বাস্থ্য—টাচ উড—বেশ ভালোই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মড়াপোড়ানো হাওয়ায় এদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

এ বিষয়ে আমি কিছু বলার আগেই আমার চেনা ব্যক্তিটি উত্তেজিতভাবে এগিয়ে গেল সেই গাছটির দিকে। ধমক দিয়ে বলল, এই, কি হচ্ছে কি? নামো ওখান থেকে?

লোকটি অবাক হয়ে হাঁ করে তাকাল। সে বুঝতেই পারছে না, সে কি অন্যায় করেছে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন লোক জমে গেছে সেখানে। শ্মশানে শুধু শোকগ্রস্ত লোকেরাই আসে না। সব জায়গার মতন শ্মশানেও মানবজাতির বিচিত্র সব রকম উপাদানই সমবেত হয়, একদল হৈ-হৈ-করা শ্মশানযাত্রীকে সব শ্মশানেই দেখা যায়, যাদের প্রাণের স্ফূর্তি কখনোই কমে না। আসলে জীবিত লোকেরা মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না তেমন। শ্মশানেই ব্যাবসার আলোচনা কিংবা আদি রসাত্মক রসিকতা আমি নিজের কানে শুনেছি। কোনো যুবতী নারী যখন শ্মশানে এসে শোক করে, তখন অন্যরা তার দিকে যে দৃষ্টিতে যে দিকে তাকায়, সেটা ঠিক মমতা নয়।

এইরকম কয়েকজন লোক এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

আমার পরিচিত লোকটি বলল, দেখুন না এখান থেকে নিমপাতা পাড়ছে—এগুলোই বাজারে বিক্রি করে লোককে খাওয়াবে।

সকলেরই ধারণা হয়ে গেল, এটা একটা মহা অন্যায় ব্যাপার। চোখের সামনে এরকম ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে দেখলে সকলেরই প্রতিবাদ করা উচিত।

—এই, নেমে এসো, শিগ্গির নেমে এসো।

—আজকাল সব কিছুতেই ভেজাল মাইরি!

—শ্মশানেও লোকে চুরি করতে আসে!

গাছের উপরের লোকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নিচের লোকেরা আরো তর্জন গর্জন করতে লাগল।

শ্মশানটা খুব সম্ভবত মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা। সেখান থেকে যদি কেউ কোনো জিনিস নেয়, তা হলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানাতে পারে, অন্য কারুর তো কিছু বলার নেই। কিন্তু যেহেতু লোকটির পরনে একটা নেংটি এবং গায়ে জামা নেই, তাই তাকে বাবু-শ্রেণীর লোকেরা সব সময়ই ধমকাতে পারে। পার্কের ফুলগাছ থেকে যদি আমি ফুল ছিঁড়ি, তা হলে সেখানে জনসাধারণ আপত্তি করে না। তা ছাড়া এখানে আবার জনস্বাস্থ্যের ব্যাপার জড়িত কিনা।

আমি আমার পরিচিত ব্যক্তিটিকে ফিসফিস করে বললাম, দেখো, বাজারে যে-সব জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলো যে কোনটা কোথা থেকে আসছে তা কি আমরা বুঝতে পারি?

সে কিছু উত্তর দেবার আগেই পাশ থেকে আর একজন শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, সে মশাই যেটা দেখতে পাচ্ছি না, সেটা আলাদা কথা। তা বলে চোখের সামনে দেখেও...!

আমি চুপসে গেলাম একটু। অচেনা লোকজনের সঙ্গে তর্ক করা আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া, হয়তো এই লোকগুলিই ঠিক বলছে, আমিই ভুল করছি। এতগুলি লোক কি একসঙ্গে ভুল করে?

ধমকের চোটে নিমগাছের ওপর থেকে লোকটিকে নামানো হলো। কাঁদো কাঁদো মুখ।

—এখানে কি হচ্ছে কি অ্যাঁ?

—বাবু, দুটো নিমপাতা পাড়ছি।

—নিমপাতা পাড়ছ? আর জায়গা পাওনি? কি হবে এগুলো দিয়ে?

—বাবু, বিক্রি করব। দুটো পয়সা পাব।

সকলে আবার হৈ-হৈ করে উঠল। তা হলে ঠিকই ধরা গেছে। এই লোকটা

শ্মশানের নিমপাতা মানুষকে খাওয়াবার তালে ছিল। কত বড়ো পাষণ্ড!

আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। এত লোক যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই শ্মশানের গাছের কোনো জিনিস খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু যে লোক নিমপাতা বিক্রি করে সংসার চালায়, তার কি স্বাস্থ্যজ্ঞান থাকার কথা?

জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল প্রায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মারধোর পর্যন্ত গড়াল না। লোকটির কাছ থেকে সমস্ত নিমপাতাগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া হলো নদীতে। লোকটিকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ বাদে আমি যখন ফিরছি, তখন দেখি সে বাইরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার কোথাও যাবার নেই, পৃথিবীতে তার কিছুই করার নেই।

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দারুণ চমকে উঠলাম। মনে হলো, এতক্ষণ শ্মশানে আমি এর চেয়ে বেশি দুঃখিত মানুষ আর একজনও দেখিনি।

ভোরবেলা, পার্কে

পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছেন তিন বুড়ো। সামনে পুকুরের জল মিহি বাতাসে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে, দেবদারু গাছগুলিতে নতুন ফিকে-সবুজ পাতা এসেছে। শীত চলে গেল বলে এখন সকালের দিকে পার্কে বেশ ভিড় হয়। কুকুর ও বাচ্চা ছেলে সমেত আসে গণ্যমান্য লোকেরা, স্বাস্থ্য-সচেতন যুবকরা আসে সাঁতার কাটতে, অন্য যুবকরা যুবতীদের সঙ্গে নিরিবিলি কোণ খোঁজে, সারাদিন যাদের মোটরগাড়ি কিংবা এয়ার-কণ্ডিশানড ঘরে কাটে— এমন ধনীরা এখন কেডস জুতো পরে আধ ঘণ্টা শখ করে হাঁটাহাঁটির জন্য আসে, সকালের কলেজ-পালানো ছেলে ও মেয়ের দঙ্গলও আলাদা আলাদা ভাবে আসে।

সকালের দিকে পার্কের বেঞ্চগুলিতে জায়গা পাওয়া শক্ত। তবু এই তিন বৃদ্ধ খুব ভোর-ভোর এসে নির্দিষ্ট একটা বেঞ্চে আগেভাগে জায়গা দখল করে রাখেন।

পার্কের বেঞ্চগুলি চাকরি থেকে রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের একটা আড্ডাস্থল। প্রাক্তন কর্মজীবনের মান অনুযায়ী তাঁদের নাম। ভূতপূর্ব অফিসাররা এখনো দাস সাহেব, বোস সাহেব, মুখার্জি সাহেব। আর অন্যরা সেনবাবু, দাশগুপ্তবাবু, রায়বাবু। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এই তিন বৃদ্ধের কিছুটা যেন তফাত আছে। এদের তিনজনেরই পরনে ঠেঙো ধুতি, আধময়লা পাঞ্জাবি আর রবারের চটি, গালে দু-তিন দিনের পাকা দাড়ি।

বৃদ্ধেরা সাধারণত বেশি বক্‌বক্‌ করেন অথবা খুবই কম কথা বলেন। এঁদের তিনজনকে দেখলে মনে হয় যেন জীবনের সব কথাবার্তা ফুরিয়ে গেছে। একজন হয়তো বললেন, এবার শীতটা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না!

অন্য দুজন চুপ। ভদ্রতা করেও কোনো উত্তর দেবার যেন দরকার নেই। প্রথম বৃদ্ধ উত্তর আশাও করেননি মনে হয়। কথাটা বলার পর তিনি গলায় হাত বুলোলেন। রোগা-রোগা লম্বা হাতেব আঙুল।

দু'মিনিট বাদে আর একজন বললেন, হুঁ! ঠিকই ভেবেছিলাম।

তৃতীয় বৃদ্ধ দ্বিতীয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করেই সব বুঝে ফেলেন। তবু অনেকটা সময় নিয়ে তিনি বলেন, বিয়ে-টিয়েগুলো এখনো দেশ থেকে উঠে গেল না?

এসব কথাব তাৎপর্য বাইবের কারুব পক্ষে বোঝা অসম্ভব। এর পর একজন পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে তার থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন। অন্যদের দিলেন না। তবু দ্বিতীয় বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি একটা! তখন প্রথম বৃদ্ধ তৃতীয় জনের দিকেও কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু তৃতীয় জন বললেন, থাক।

পুকুরেব ধার ঘেঁষে তিন জোড়া যুবক-যুবতী বসে আছে, হয়তো তাদেব উদ্দেশেই পুকুরে সাঁতার-রত ছেলেরা দারুণ ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করেছে, মাড়োয়ারি প্রৌঢ় অবাধ্য কুকুরকে ধমকাচ্ছেন ইংরেজিতে, চমৎকার বাতাসেব মধ্য দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক শালিক। আব, সব কিছুর মাঝখানে বসে আছে তিনজন বেখাপ্পা চেহারার বৃদ্ধ। তিনজনই রোগা ও লম্বা, আশির কাছাকাছি বয়েস, আর সব কিছুই সাধারণ, শুধু মুখে একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি।

দুটি মাস্তান চেহারার যুবক হন্তদন্ত হয়ে বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি দাদু, একটু মেরে বসুন তো!

তিন বৃদ্ধ অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সরে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলেন। দুই যুবক বাকি স্থানটুকু দখল করে ফস করে সিগারেট জ্বালালে। তারপর একজন বলল, মাইরি, ফন্টেশালাকে কাল এত করে বললাম—

অন্যজন বলল, দেব শালাকে একদিন হাতে হ্যারিকেন করে—

এই যুবকটির কথাবার্তাও বৃদ্ধদের কাছে দুর্বোধ্য লাগে। কিন্তু বোঝা যায়, ওরা কান খাড়া করে আছেন। তিনজনেই ইদানীং কানে কম শুনছেন, তাই বেশি মনঃসংযোগ করতে হয়।

একটা জিনিস খুব সহজেই বোঝা যায়, এই যুবক ও বৃদ্ধের দল প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে অপছন্দ করেছে। অচেনা বৃদ্ধদের সাধারণত সব যুবকই অবজ্ঞা করে থাকে। তারা মনে করে, এরা সব ঝড়তি পড়তি, কোনো কিছু করার মুরোদ নেই,

শুধু ক্যাটক্যাট করতে জানে। টাকাই বার্ধক্যের শক্তি। যে বৃদ্ধের টাকা নেই, সে ফালতু। অন্য দিকে, বৃদ্ধেরা ঈর্ষা করে যুবকদের। যে পৃথিবীটা একদিন তাঁদের ছিল, আজ সেটা নিয়ে নিয়েছে এই সব ছেলেছোকরারা। এই সব ছোকরাদের বিদ্যে না থাক, গুণ না থাক, টাকা না থাক, শুধু যৌবনের শক্তিতেই এরা ডগমগ করে।

একজন যুবক বলল, ও দাদু, একটু সরে বসতে বললাম না! আমাদের একেবারে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন যে!

তিন বৃদ্ধ পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। এখন মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে, নটা বাজার আগে কেউ বাড়ি ফেরেন না। বাড়ি ফেরা সম্পর্কে আগ্রহও নেই কারুর, গৃহ এঁদের কাছে শান্তির নীড় নয়। সকালে রোদের ঝাঁঝ অসহ্য না-হওয়া পর্যন্ত পার্কেই এঁদের সবচেয়ে ভালো সময় কাটে।

দুই বৃদ্ধ আর একটু সরে বসলেন বটে, কিন্তু একজন উঠে দাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবক দুটি বলল, আরে দাদু, উঠলেন কেন, রাগ হয়ে গেল নাকি? বসুন, বসুন!

তৃতীয় বৃদ্ধ কোনো উত্তর না দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। এক যুবক আর এক যুবককে বলল, বুড়ো দাদু খেপচুরিয়াস হয়েছে মাইরি!

যৌবন বড়ো কৌতুকপ্রবণ। যুবক দুটি বেশ মজা পেয়ে গেল। একজন তড়াক করে উঠে গিয়ে বৃদ্ধের হাত ধরে টানাটানি করতে করতে ইয়ার্কির সুরে বার বার বলতে লাগল, আরে দাদু, আসুন, আসুন না—

বৃদ্ধ দু-একবার হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য টানাটানি করতেই ব্যাপারটা আরো হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে ওদিকে বসে থাকা যুবক-যুবতীরাও মৃদু মৃদু হাসে। রাগী বুড়োদের দেখতে সকলেরই ভালো লাগে।

অপর দুজন বৃদ্ধ উঠে এসে সঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, কি হচ্ছে কি, ছেড়ে দাও!

আস্তে আস্তে চার পাশে ভিড় জমে। ছোট ছেলেরা হাততালি দেয়। তখন একজন বৃদ্ধ হাত জোড় করে শান্তভাবে বলেন, বাবা, আমাদের তোমরা ছেড়ে দাও, আমরা চলে যাচ্ছি।

অতি কষ্টে যুবকদের হাত ছাড়িয়ে বৃদ্ধ তিনটি চলতে শুরু করেন। পিছন থেকে নানা রকম মন্তব্য আসে। কৌতুকের দৃশ্যটি এত সহজে শেষ হয়ে যাবার জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হয় কেউ কেউ।

বৃদ্ধ তিনটি চুপচাপ হাঁটতে থাকেন। তাঁদের মুখে ঠিক রাগের চিহ্ন নেই, বরং খানিকটা চাপা ব্যঙ্গের হাসি। এই পার্কে আর আসা হবে না, তারা বুঝে গেছেন।

এই বৃদ্ধ তিনজনের নাম শুনলে কেউ চিনতে পারবে না। নিজেদের বাড়িতেও এঁদের কোনো খাতির নেই। এঁদের মধ্যে একজন সরকারের কাছ থেকে পেনশান পান দেড় শো টাকা। যৌবনে সাতটি বছর জেলে কাটিয়েছেন, তখন দেশোদ্ধারের ভূত চেপেছিল মাথায়। আর একজন তাম্রপত্র পেয়েছেন দিল্লি থেকে—শোভাবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন এবং যৌবনে তিনি এই যুবকদের চেয়ে ঢের বেশি ডানপিটে ছিলেন। আর একজন ছিলেন অশ্বিনী দত্তের চেলা—বরিশালে যেবার পুলিশ লাঠি চালায়—বাংলাদেশের জেল থেকে ঠিক মতন রেকর্ড পাওয়া যায়নি বলে ইনি এখানকার সরকারের কাছ থেকেও কোনো স্বীকৃতি পাননি। এ দেশে এখন আর এঁদের জন্য কিচ্ছুই নেই, একটা পার্কের বেঞ্চে সকালবেলার সুখভোগ ছিল, আজ থেকে তাও গেল।

জ্যান্ত উনবিংশ শতাব্দী

আমার বাবা একবার কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একজন লোক, খুবই কম চেনা, বাবার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন সেটা কলকাতার কোনো একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। শুধু অনুরোধ নয়, কাকুতি মিনতি করেছিলেন লোকটি, তাই বাবা উপরোধটি ঠেলতে পারেননি, নিয়ে এসেছিলেন সেটা। বেশ যত্ন করে বাঁধাছাঁদা কাগজের মোড়ক, এক ফুট লম্বা, অনায়াসেই রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠানো যেত, কিন্তু লোকটি বোধহয় ডাকখরচ বাঁচাতে চেয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে বাবা সেই মোড়কটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলেন আমাকে। এই সব বেগারের কাজ মোটেই কারুর ভালো লাগে না। কিন্তু আমি বাড়ির বাইরে বেশ সাহসী পুরুষ হলেও নিজের বাড়িতে বেশ ভীরু, কোনোদিন বাবার হুকুম অগ্রাহ্য করতে পারিনি।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেরুলাম। ওপরে নাম-ঠিকানা লেখাই আছে, যেতে হবে সেই বেহালায়। সবে মাত্র মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছি, দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তারা বলল, কি রে কোথায় যাচ্ছিস? হাতে ওটা কি?

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম, এটা এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

—ভেতরে কি আছে?

—কি জানি!

এক বন্ধু আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে বলল, ভেতরে কি আছে খুলেও

দেখিসনি। যদি বেআইনি কিছু থাকে, গাঁজা-ফাঁজা এই রকমভাবে চালান দেয়!

অন্য বন্ধুটি সেটা নিয়ে ওজনটা অনুভব করার জন্য লোফালুফি করল কয়েকবার। তারপর বলল, নাঃ, শুধু কাগজপত্রই আছে মনে হয়।

—এখন এটা পৌঁছে দিতে সেই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরে যাবি!

—কি করব, উপায় কি?

—এটা খুলে দ্যাখ ভেতরে কি মাল আছে। যদি শুধু আজেবাজে কাগজ থাকে, তাহলে ফেলে দে রাস্তায়। বাবাকে গুল মেরে দিবি, ঠিক পৌঁছে দিয়ে এসেছি। বাসভাড়ার পয়সাটা বেঁচে যাবে, সেই পয়সা দিয়ে আমাদের চা খাওয়া।

কে না জানে, বন্ধুবাই সব সময় কু-মন্ত্রণা দিয়ে বাড়ির ছেলেদের খারাপ করে দেয়। আমার অন্য কোনো বন্ধুর হাতে এই রকম প্যাকেট দেখলে আমিও বোধহয় ঠিক এইরকম কথাই বলতাম।

তবে, কারুর কথা চট করে মেনে নেওয়া উচিত নয়। আবার বন্ধুদের সামনে পিতৃভক্ত সাজাও ঠিক ফ্যাসান নয়। তাই কোনো মন্তব্য না করে হাসতে লাগলাম।

তখন এক বন্ধু বলল, ঠিক আছে, তুই না খাওয়াস তো আমিই খাওয়াচ্ছি, আয়।

অপরের পয়সায় চা খাওয়ার প্রস্তাব পেলে প্রত্যাখ্যান করার নিয়ম পৃথিবীতে কোথাও নেই। সুতরাং যেতে হলো। খানিকটা পরে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে কিছুদূরে চলে আসার পর খেয়াল হলো, সেই প্যাকেটটা আমি চায়ের দোকানে ফেলে এসেছি। একবার ভাবলুম, যাক—গেছে যখন যাক। আবার মনটা একটু খচখচ করতে লাগল। যদি বিশেষ কিছু দরকারি দলিলপত্র হয়। ফিরে গিয়ে নিয়ে এলাম। এবং এক সময় চেপে বসলাম বেহালার বাসে।

ঠিকানা খুঁজে পেতে রীতিমতন কষ্ট হলো। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি। উঠোনে তুলসীমঞ্চ, কয়েকটা সিঁড়ির পাশে দালান, তারপর দুটি ঘর। ছোট বাড়ি, বাইরে প্লাস্টার করা নেই।

মোড়কটির ওপর যে নাম লেখা ছিল, সেই নাম ধরে ডাকাডাকি করতেই একজন রোগা মতন প্রৌঢ় লোক বেরিয়ে এলেন। ধুতি পরা, খালি গা, গলায় খুব মোটা পৈতে।

আমার ইচ্ছে ছিল প্যাকেটটা দিয়েই চলে আসা—সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিয়েছি প্রৌঢ়টির দিকে, তিনি সেটা গ্রহণ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম?

আমি শুধু নামটা বললাম।

উনি একটু ধমকে বললেন, পদবী কি?

আমার পদবীটা শুনে উনি একটু প্রসন্ন হলেন মনে হলো। অর্থাৎ উনি জেনে নিতে চাইলেন আমি ব্রাহ্মণ কিনা। আমার একটু হাসি পেল।

প্রৌঢ় বললেন, জুতো খুলে ওপরে উঠে এসো।

কথাটার মধ্যে খানিকটা হুকুমের সুর ছিল। তাই অগ্রাহ্য করা গেল না, জুতো খুলে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। উনি ডাকলেন, উমা, উমা!

একটি সতরো-আঠারো বছরের মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। প্রৌঢ় তাকে বললেন, ভদ্দরলোকের পা ধোওয়ার জল এনে দে।

বারান্দার কোণে একটি জলভর্তি বালতি রাখা ছিল। মেয়েটি তার থেকে একমগ জল নিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

এক ধরনের লোক আছে, যারা পৃথিবীর সমস্ত নারীকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করে। তাদের দিয়ে যেন যা ইচ্ছে করানো যায়। এই লোকটি সেই জাতের। নিজের বাড়ির মেয়েকে দিয়ে একজন অচেনা লোকের পা ধুয়ে দিতে বলার মধ্যে একটা বর্বরতা আছে। এটা সৌজন্য নয়, কারণ, ব্রাহ্মণ না হলে উনি আমাকে উপরেই উঠতে দিতেন না। আমাদের ধারণা বুঝি গ্রামে-ট্রামেই এত সব শুচিবায়ুগ্রস্তরা থাকে। কিন্তু কলকাতাতেও এরকম স্যাম্পেল এখনো রয়ে গেছে দেখছি।

প্রৌঢ়টি আমাকে যে ঘরে বসালেন, সে ঘরটি অসম্ভব নোংরা। দারিদ্র্য নয়, স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনতা। ঘরের মেঝেতে মুড়ি ছড়ানো, দেয়ালে পানের পিক ও গুড়ের দাগ, বহুকাল ছাদের ঝুল ঝাড়া হয়নি, খাটের তলায় ভয়াবহ রকমের ধুলো। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি রয়েছে, সেই জন্যই বুঝি জুতো খুলে আসা ও পা ধোওয়া, কিন্তু ঠাকুরকে এরকম নোংরা ঘরে বসাতে কোনো লজ্জা নেই।

প্রৌঢ়টি তার মেয়েকে বললেন, মিষ্টি নিয়ে আয়।

আমি ঘোরতর আপত্তি করতে লাগলাম, কিন্তু মেয়েটি অবিলম্বে একটা পিতলের রেকাবিতে কয়েকটা চিঁড়ের মোয়া ও নারকেলের নাড়ু নিয়ে এল। হোম-মেড জিনিস! এসব ফোক কালচারের প্রতি অনেকের বেশ আকর্ষণ থাকে, কিন্তু আমি ভালোবাসি চপ, কাটলেট, ডিম ভাজা। বললাম, এক গেলাস জল।

মেয়েটি মিষ্টির সঙ্গে জল দেয়নি, এমনকি আমি চাইবার পরও দ্বিধা করতে লাগল। কুণ্ঠিতভাবে তাকাল আমার দিকে। ব্যাপারটা বুঝলাম একটু পরেই। এ বাড়িতে এই মেয়েটিই একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু, কিন্তু ঠিক কতবার যে এর দিকে তাকানো চলে, তা তো জানি না।

মেয়েটি এক গ্লাস জল এনে রাখল। রীতিমতন ঘোলা জল। আমি সেদিকে

সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়েছি, প্রৌঢ়টি বললেন, জলে ময়লা নেই। আমরা কলের জল খাই না, কুয়োর জলের সঙ্গে গঙ্গা জল মেশানো আছে।

বুঝলাম, পাগলের বাড়িতে এসে পড়েছি। অন্তত পাগল হোক বা না হোক এরা আমার টাইপ নয়। আমি সেই মিষ্টি ও জল স্পর্শ করলাম না। মেয়েটির জন্য মায়া হলো।

তক্ষুনি উঠে পড়ছিলাম, কিন্তু প্যাকেটের মধ্যে কি আছে সেটা দেখার কৌতূহল দমন করতে পারিনি। প্রৌঢ়টি তখন সেটা খুলছিলেন। ভেতর থেকে বেরুলো কতকগুলো গোল গোল কাগজ, পুরোনো ধরনের হাতের লেখায় ভর্তি। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কয়েকটি ঠিকুজী-কোষ্ঠী।

আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। এরই জন্য আমাকে বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা ছেড়ে, এতখানি রাস্তা বাসে ঝুলতে ঝুলতে আসতে হলো! লোকগুলো মহা স্বার্থপর তো!

প্রৌঢ়টি বলল, বাঃ সবই ঠিকঠাক আছে। বড়ো উপকার করলে ভায়া। তোমার পিতাকে আমার নমস্কার জানিও। বুঝলে না, এসব জিনিস ডাকে পাঠানো যায় না। পোস্টাফিসে বারো জাতের লোক চাকরি করে, তারা ঘাঁটাঘাঁটি করলে এসব পবিত্র জিনিসের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলেছিলাম, কোনো সৎ ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে পাঠাতে। মানুষের জন্য মানুষ এটুকু করেই।

আমি বললাম, কাশীতে তো আমার বাবাকে বলা হয়েছিল, ভীষণ তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার—ডাকে যদি দেরি হয়ে যায়, তাই লোক মারফত...

—ওরকম একটু বলতে হয়। সবাই কি আর সব কথা বোঝে?

এবার আমার পক্ষে রাগ সামলানো শক্ত হলো। এই লোকটি যদি এর উদ্ভট চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারে, তা হলে আমিই বা বলব না কেন। আমি বললাম, শুনুন—আমাদের বংশে আবার সত্যিকথা বলার একটা ধারা আছে। তাই কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। আমার পৈতে নেই, গায়ত্রী মন্ত্র জানি না! পার্ক সার্কাসের গরুর মাংসের কাবাব এবং লিণ্ডসে স্ট্রিটের শুয়োর মাংসের সসেজ আমার অতি প্রিয় খাদ্য। আমি ছাড়াও এই প্যাকেটটা আর যারা ছুঁয়েছে তাদের মধ্যে আছে...।

লোকটা স্প্রিংয়ের মতন উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আজ চলি—।

বাঙালির গান

অনুপমের সঙ্গে ওদের বাড়ির বসবার ঘরে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় ওর ছোট বোন রিনি সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ত হয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল, কিছু একটা জরুরি কথা বলতে এসেছিল অনুপমকে, মুখের ভাব দেখে সেইরকম মনে হয়।

রিনির বয়েস চোদ্দ-পনেরো হবে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। শাড়ি পরতে শুরু করেছে, ফ্রকও ছাড়েনি। বেশ লম্বা চুলের গোছা হয়েছে রিনির।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর? কেমন আছ!

এই বয়েসের মেয়েরা একটু বেশি লাজুক হয়। মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো?

তারপর সে অনুপমের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনুপম বলল, কি রে? কিছু বলবি?

—রেডিওটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, আর চলছে না।

—কেন, চলছে না কেন?

—ক'দিন ধরেই তো মিনমিন করছিল। ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে।

অনুপম কপাল কুচকে কিছু একটা হিসেব করল। তারপর বলল, হ্যাঁ, ব্যাটারি তো শেষ হয়ে যাবারই কথা। অনেকদিন চলল। আবার কিনে আনতে হবে।

—এখন কিনবে না?

—এখন? এই রোদ্দুরের মধ্যে কে যাবে।

—কাছেই তো দোকান। তুমি টাকা দাও, আমি কিনে আনছি।

—এত ব্যস্ততা কিসের রে! যা, যা, এখন হবে না।

—বাঃ, আমি বুঝি রেডিও শুনব না।

সকাল এগারোটা-সাড়ে এগারোটা বাজে। এই সময় রেডিওতে কি এমন সাঙ্ঘাতিক অনুষ্ঠান থাকে, আমার তা জানবার কথা নয়। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রিনির দিকে।

রিনি তক্ষুনি ব্যাটারি কেনার জন্য বায়না ধরেছে, অনুপম কিছুতেই রাজি নয়।

এই সব ক্ষেত্রে আমি সব সময়েই বাচ্চা মেয়েদের সমর্থন করি। অনুপমকে বললাম, কাছেই যখন দোকান, নিয়ে আয় না ব্যাটারি! বেচারা এত করে বলেছে।

অনুপম বলল, তুই জানিস না! সব সময় ও কানের কাছে একটা রেডিও

খুলে রাখবে। পড়াশুনোর সময় পর্যন্ত!

আমি বললাম, রিনি তো রেজাল্ট ভালোই করে।

—আরো ভালো করতে পারত, যদি না রেডিওর জন্য এ রকম পাগল না হতো—

যাই হোক, অনুপম শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। ওদের চাকর দু' মিনিটের মধ্যে ব্যাটারি কিনে আনল মোড়ের দোকান থেকে। ট্রানজিস্টারে সেই ব্যাটারি ভরতেই ঝনঝন আওয়াজ বেরল। রিনি রেডিওটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল ওর পড়ার ঘরের দিকে। মহম্মদ রফি না কিশোরকুমার—কার যেন জোরালো গলার গানে গমগম করতে লাগল সারা বাড়ি।

অনুপম বলল, দেখলি তো, হিন্দী-মিন্দি গানের জন্য কি রকম টান এখনকার ছেলেমেয়েদের।

আমি কথা না বলে একটু হাসলাম। আমার মনে পড়ল আর একদিনের ঘটনা। সেদিন সন্ধের পর বসেছিলাম সুবিমলদার বাড়িতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দু'একদিন মাত্র বাকি। আমরা খুব উত্তেজিত, সর্বক্ষণ ঐ এক আলোচনা। সুবিমলদা বসবার ঘরের বিরাট রেডিওটা চালিয়ে রেখেছেন, যদি কোনো নতুন খবর জানা যায়। একটু বাদেই দিল্লি থেকে ইংরেজি খবর শোনাবে।

সবেমাত্র ইংরেজি খবরের ঘোষণাটা হয়েছে, এই সময় সুবিমলদার এগারো বছরের মেয়ে ঝুমপা ঘরে ঢুকেই বলল, ওমা, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুমপা ঘুরিয়ে দিল রেডিওর কাঁটা অন্যদিকে, বেজে উঠল হিন্দী গান। সুবিমলদা এত অসম্ভব রেগে গেলেন যে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চট করে উঠেই তিনি ঝুমপাকে এক চড় মেরে বললেন, তুই কাঁটা ঘোরালি কেন? অসভ্য মেয়ে! ফের যদি কোনোদিন হিন্দী গান শুনতে দেখি—

ঝুমপা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রথমটায়। সুবিমলদার মেয়ে খুব আদরের, তাকে চড় মারা তো দূরের কথা, তার কোনো কাজে বাড়িতে কেউ কখনো বাধা দেয় না। আজ দেশাত্মবোধের উত্তেজনায় সুবিমলদা কঠোর হয়ে উঠেছেন।

ঝুমপা বলল, বাঃ, আমি গান শুনব না?

সুবিমলদা বললেন, দেখছিস না আমি খবর শুনছি! এই সময় গান না শুনলে চলে না! জিজ্ঞেস করা নেই, কিছু নেই।

ঝুমপা হঠাৎ কেঁদে ফেলে দুপদাপ করে ঘর থেকে চলে গেল। খানিকটা বাদে আমি বাথরুমে যাবার জন্য উঠলাম। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সেখান থেকে ভেসে আসছে হিন্দী গানের ক্ষীণ আওয়াজ। ছোট একটা ট্রানজিস্টার

যোগাড় করে ঝুমপা বাথরুমে বসেই গান শুনছে।

সেদিন ঝুমপার প্রতি আমার সহানুভূতিই হয়েছিল। ঐটুকু মেয়ের পক্ষে যুদ্ধ-টুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয়। সাড়ে ন'টার সময় কিছু একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সে নিয়মিত শোনে—সেটার জন্যই সে টান অনুভব করেছিল। তাকে বকুনি দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না।

যে-কোনো বাড়িতে গেলেই আজকাল দেখা যাবে—নয় থেকে উনিশ বছরের মেয়েরা রেডিও খুব ভালোবাসে। তাদের পড়ার টেবিলে, খাবার টেবিলে কিংবা কোলের ওপর একটা ট্রানজিস্টার থাকবেই। এবং তারা রেডিওর অন্যান্য প্রোগ্রাম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তারা শোনে বিবিধ ভারতীর হিন্দী গান। কোন্ সময় কি অনুষ্ঠান হয়, তাদের মুখস্থ। তারা গান ভালোবাসে, তাই তারা শোনে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। ওদের কোনোক্রমেই দোষ দেওয়া উচিত নয়। ছেলেরা সাধারণত এতটা রেডিওর গানের ভক্ত নয়। আর উনিশ বছরেরও বেশি বয়েসের মেয়েরা যদি সব সময় বিবিধ ভারতী নিয়ে মত্ত থাকে—তবে অবশ্য তাদের নিছকই হালকা চরিত্রের বা অপরিণত বলতে হবে।

মানুষের মনের মধ্যে নানারকম তৃষ্ণা থাকে। গান শোনাও সেই রকম একটা তৃষ্ণার ব্যাপার। কোনো তৃষ্ণাই দমন করা যায় না। গুরুজনের সামনে দুঘণ্টা বসে থেকে যে যুবক সিগারেট খেতে পারে না, সে গুরুজনদের চোখের আড়াল হলেই পর-পর দু'তিনটে সিগারেট খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেবে। তেমনি, গানের যার তৃষ্ণা, তাকে বকুনি দিলে সে তো বাথরুমে বসেও গান শুনবেই।

অল্পবয়েসী বাঙালি ছেলেমেয়েরা আজকাল ভালোবাসে হিন্দী গান। অন্য ভাষায় আধুনিক গানের প্রতি এ রকম আসক্তি খুবই অদ্ভুত হলেও এখানে আর কোনো উপায় তো নেই। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করার মতন বাংলা গান তো নেই। আমি দেখেছি, আধুনিক বাংলা গানের চেয়ে হিন্দী সিনেমার গান অনেক বেশি জোরালো। রচনা, সুর এবং গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ—সবই বেশি ভালো। আমাদের বাংলায় গর্ব করার মতন আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিন্তু তার মধ্যেও একঘেয়েমি এসে যেতে বাধ্য এবং ওসব গান তো অল্পবয়েসীদের জন্য নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্ম বোঝার মতন মানসিক গঠন না হলে ঐ গান ভালো লাগতে পারে না।

সেইজন্যই, উপায়ান্তর হয়ে, আমাদের এখানকার অল্পবয়সীরা হিন্দী গানে ডুব দিয়েছে। অনেক বয়স্ক লোক এজন্য বোকার মতন নাক সেঁটকায়। সত্যিই বোকার মতন, কারণ, ছেলেমেয়েদের কি দোষ, পুরো দোষ হচ্ছে তাদের, যারা হাস্যকর বা কুৎসিত ভাষায় আধুনিক বাংলা গান লেখে, যারা তাতে প্যানপ্যানে

সুর দেয় এবং যে-সব গায়ক-গায়িকা তা মিনমিন করে গায়। এখনকার ছেলেমেয়েদের তারা ধরে রাখতে পারেনি, আকৃষ্টও করতে পারেনি। আধুনিক বাংলা গানের গায়ক-সুরকাররা হিন্দী গানওয়ালাদের কাছে গো-হারান হেরে গেছে। দুয়ো, হেরে গেছে, দুয়ো!

চিঠি এবং প্রণয়

আমার নামে কোনো চিঠি এলেই আমি প্রথমে ঠিকানার হাতের লেখাটা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখি। হাতের লেখা দেখেই চরিত্র অনুধাবন করার একটা বিজ্ঞান নাকি আছে শুনেছি, আমি সে বিষয়ে কিছু জানি না। তবে ঠিকানার লেখা দেখেই আমি বুঝতে পারি, সেটা কোনো ছেলে লিখেছে, না কোনো মেয়ে, কম বয়েস না বেশি বয়েস ইত্যাদি। অচেনা হাতের লেখা দেখলে সেই চিঠি আমি আগে খুলি।

সেই রকম একটা খাম ছেঁড়ার পর দেখলাম, ভেতরে আর একটা মুখবন্ধ খাম, তার ওপর লেখা, 'দয়া করে চিঠিটা মিনুকে দিয়ে দেবেন।'

মিনু আমার মাসতুতো বোন, এম. এ. পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, সাইকেল চালাতে পারে, শুধু কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে গত যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ-সীমান্ত দেখতে গিয়েছিল, অর্থাৎ আধুনিকা যাকে বলে। কিন্তু নিজের বাড়ির ঠিকানায় তার বন্ধুদের চিঠি লিখতে বলতে পারে না—এ কি রকম ব্যবহার! তার তিন-চার জন ছেলে বন্ধু আছে, তাদের নামও সে প্রায়ই বলে। মাঝে মাঝে তারা বাড়িতেও আসে—কিন্তু তারা চিঠি লিখলেই যত দোষ!

মিনুর মা, অর্থাৎ আমার সেজো মাসিমা নিজেই কলেজ-জীবনে বেশ প্রেমট্রেম করেছিলেন। আমার সেজো মেসোমশাইও বেশ উদার চরিত্রের মানুষ তবে বড্ড ভুলো মন, বাড়িতে যে-কোনো চিঠি এলে তিনি নিজেই হয়তো খুলেটুলে পড়েন, সেই কারণেই এই সতর্কতা।

পরের চিঠি পড়া মহাপাপ। আমার পাঠক-পাঠিকারা কক্ষনো পরের চিঠি পড়বেন না, আমি এই উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু লেখকদের কথা আলাদা, তাদের হতে হয় অন্তর্যামীর ছোট ভাই, তা ছাড়া তাদের কৌতূহল বেশি থাকে। সুতরাং আমি সেই খামের আঠালাগানো জায়গাটা আঙুলে করে জল দিতে লাগলাম। অবিলম্বেই সেটা খোলা গেল।

মিনুর মুখে আমি সুরজিৎ, শান্তনু এবং রণজয়—এই তিনটি ছেলের নাম

প্রায়ই শুনেছি। মিনু অবশ্য ওদের কারুরই প্রশংসা করে না। কারুকে বলে ওপর-চালাক, কারুকে বলে ল্যাবা, এবং আর একজনকে বলে লালিমা পাল পুং। মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে আড়ালে কি বলে, তা যদি ছেলেরা কখনো জানতে পারত!

যাই হোক, এই তিনজনের মধ্যে কে চিঠিটা লিখেছে, সেটাই আমার জানার উদ্দেশ্য। মিনু নিশ্চয়ই নিজেই তাকে চিঠি লিখতে বলেছে, না হলে এই পত্রলেখক আমার ঠিকানা কি করে জানবে!

চিঠিটার শেষে লেখা আছে, ইতি বাবলু। বোঝা গেল না, আমার নাম জানা ঐ তিনজনের মধ্যে কোন জন। কিংবা অন্য কেউও হতে পারে। আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডাক-নামে ডাকাডাকি করাই ফ্যাসান। আগে সবাই ডাকনাম লুকোতো—এখন অবশ্য ডাকনামগুলোও বেশ মিষ্টি মিষ্টি হয়।

'সচিত্র প্রেমপত্র' নামে বটতলা-প্রকাশিত একটা বই অনেক দিন আগে দেখেছিলাম। দরকার হলে ঐ বইটা থেকে কিছু টুকবো ভেবেছিলাম এক সময়, কিন্তু আমার অবশ্য প্রেমপত্র লেখার কোনো সুযোগই এল না এ পর্যন্ত। এখন আর ঐ বই থেকে কেউ টুকবেও না, কারণ প্রেমপত্রের ফ্যাসানই একদম বদলে গেছে। এখন আর সম্বোধনে হৃদয়েশ্বরী, প্রাণেশ্বরী বা অচিনপাখি কিংবা দখিনা বাতাস এসব কিছুই থাকে না, এখন শুধু নাম।

এককালে প্রণয়-পর্বে আপনি থেকে তুমিতে নামার ব্যাপারেই একটা বিরাট সমস্যা ছিল, এখন সেসব ঝঞ্ঝাট নেই। বাবলু মিনুকে লিখেছে তুই বলে, হঠাৎ মনে হতে পারত ভাই-বোনের ব্যাপার—যদি না জানতুম যে এখনকার কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুই বলাই ফ্যাসান।

দুটি মাত্র বানান ভুল! আমি আরও বেশি থাকবে আশা করেছিলাম। প্রেমপত্রে বানান ভুল কোনো দোষের ব্যাপার নয়, অনেক সময় জানা বানানই ভুল হয়ে যেতে পারে। চিঠিটাতে কোনো গদগদ ব্যাপার কিংবা শারীরিক প্রসঙ্গ নেই, মিনু যে বাবলুকে সাঙ্ঘাতিক ভুল বুঝেছে, বাবলু সেই ভুল ভাঙাবারই চেষ্টা করেছে। প্রণয়পর্বে ভুল বোঝাবুঝিই জুড়ে থাকে পঁচাত্তরভাগ সময়। এত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে মন যে, যে-কোনো তৃতীয় নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ এলেই মনে হয়, সে বুঝি সব জয় করে নিল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম অনেকক্ষণ, হঠাৎ আমার চমক ভাঙল। মনে মনে কিছুক্ষণের জন্য আমিই বাবলু হয়ে গিয়েছিলাম। যেন আমিই চিঠিটা লিখেছি, মিনুকে নয়, পৃথিবীর সমস্ত নারীকে মিলিয়ে যে একজন নারী হয়, তাকে। যেন আমাকেও কেউ ভুল বুঝেছে, সেই ভুল ভাঙাবার জন্য আমি মনে মনে লিখে যাচ্ছি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অনেক বানান ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঘোর ভাঙতেই লজ্জা

পেয়ে গেলাম। মিনু যদি এক্ষুনি এসে পড়ে? তাড়াতাড়ি খামটা আবার আঠা দিয়ে জুড়ে ঠিকঠাক করে রাখলাম।

জানতাম মিনু সেইদিনই আসবে। এল সন্ধের দিকে। অনেকদিন আগে আমার বাড়ি থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে গিয়েছিল, মিনু এমন ভাব দেখালে যে হঠাৎ সেই বইটা ফেরত দেবার কথা ওর মনে পড়েছে।

আমি খুব সাধারণ গলায় বললাম, তোর একটা চিঠি আছে, এই নে।

খামটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মিনু ভুরু কুঁচকে বলল, আমার চিঠি। তুমি কোথায় পেলে?

যে-কোনো মেয়েই গ্রেটা গার্বো কিংবা সুচিত্রা সেনের সমান অভিনেত্রী। নেহাত তারা সবাই দয়া করে সিনেমায় নামে না। মিনুর ভুরু কোঁচকানো বিস্ময়টা আমার কাছেও সত্যি বলে মনে হয়।

ভেবেছিলাম খামটা ও বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু মিনু বেশ একটা অবহেলার ভাব দেখিয়ে আমার সামনেই খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে পড়তে লাগল। আমি তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে লাগলাম ওর মুখভঙ্গি। কিছুই বোঝবার উপায় নেই। মিনু কি নির্জনে জানলার ধারে বসে চিঠিটা পড়তে পারত না। ছেলেটা অত যত্ন করে লিখেছে।

মিনু চিঠিটা পড়া শেষ করে সেটা মুড়ে ফেলল। আমি আশা করেছিলাম, সেটাকে ও বুকের মধ্যে রাখবে। মেয়েরা বুকের মধ্যে টাকাপয়সা রাখে অনেক সময়, আর একটা চিঠি রাখতে পারে না। এ রকম চিঠির ঐটাই তো সবচেয়ে যোগ্য জায়গা।

মিনু তার বদলে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি পড়বে?

আমি রীতিমতন চমকে গিয়ে বললাম, কেন রে, তোর চিঠি আমি পড়ব কেন?

মিনু হাসতে হাসতে বলল, তোমার নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হচ্ছে। ভাবছ, বুঝি কোনো প্রেমপত্র-টত্র হবে—

—তা নয় বুঝি?

—মোটেই না। এখন তো ক্লাস বন্ধ, তাই আমার এক বন্ধু লিখেছে যে আগামী সোমবার আমরা একজন প্রফেসারের বাড়িতে দেখা করে—

—তাহলে আমার বাড়িতে চিঠি কেন?

মিনু অম্লানমুখে বলল, আমার ঠিকানা জানে না। একদিন এই রাস্তা দিয়ে এর সঙ্গে যেতে যেতে তোমার বাড়িটা আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম—

কথা বলতে বলতে মিনু টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। তারপর বারান্দায় গিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিয়ে এল। আমাকে ও খুব জব্দ করেছে, ওর কথায়

প্রতিবাদ করার মুখ নেই আমার।

কিন্তু বাবলুর জন্য আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয়। এত যত্ন করে লেখা চিঠি, তার মূল্য শুধু এইটুকু। কিংবা চিঠি ছিঁড়ে ফেলাই আধুনিকতম ফ্যাসান হয়তো!

দ্বীপের ঠিকানা

ভাবতে কি খারাপ লাগে যে, পৃথিবীতে কোথাও আর একটাও অচেনা-অজানা দেশ নেই। জাহাজ চালাতে চালাতে কোনো ক্যাপ্টেন আর কখনো হঠাৎ কোনো তটরেখা বা দ্বীপের কাছে এসে বলবে না, আরে এ জায়গাটা তো কোনো ম্যাপে নেই! এখানে একটা পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যাক।

সমস্ত দ্বীপ সমস্ত স্থলভাগ মানুষের চেনা হয়ে গেছে, জরীপের হিসেবে লেখা আছে তার আয়তন, মালিকানাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আবিষ্কারের জন্য কোনো নতুন দেশ আর বাকি রাখেনি, এজন্য কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুক, লিভিংস্টোন, এমাণ্ডসেনদের ওপরে মাঝে মাঝে এত রাগ হয়!

বেশ কয়েকবার মানুষ চাঁদে যাচ্ছিল, তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর টাকা নেই। সুতরাং মঙ্গল বা বুধ গ্রহে মানুষের যাত্রা বোধহয় আমাদের এই জীবনে আর দেখা গেল না। আর গেলেই বা কি হতো, সেখানে যাবার অধিকার থাকত শুধু সাহেবদেব।

সমস্ত পৃথিবীটা সাদা, কালো এবং পীত রঙেব জাতিরা ভাগ করে নিয়েছে। আমরা অর্থাৎ ভারতীয়, বাঙলাদেশী, পাকিস্তানী, ইরানী এবং আরবদেশীয়রা হয়তো ঠিক কালো নই। খানিকটা খয়েরি বলা যায়, আমরাও অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছি বটে—কিন্তু গণ্ডগোলের সময় ছাড়া আমাদের কেউ গ্রাহ্য করে না। আমরা খয়েরিরা, কালোদের কখনো পছন্দ করিনি। কাব্যসাহিত্যে বন্দনা করেছি গৌরবর্ণ তনুর, বাস্তবেও কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করতে চাই ফর্সা সাহেবদের সঙ্গে, তাদেরই আচার-ব্যবহার অনুকরণ করি কিন্তু তারা অবশ্য আমাদের পাত্তাই দেয় না, কখনো দয়া করে ছিটেফোঁটা করুণা বিলায় মাত্র। এদিকে পীত জাতির মধ্যে জাপান অর্থ-গৌরবে অহংকারী হয়ে প্রাচ্যের সাহেব হয়েছে। চীনও সাম্যবাদী হবার পর এখন আর কাছাকাছি কালো বা খয়েরিদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না, তারা দু'হাতে রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে লোপালুপি খেলা খেলছে। শুধু আমরাই এখন দুয়োরানীর সন্তান।

বাসের ভিড়ের মধ্যে অনেকদিন বাদে পারমিতাকে দেখলাম। এখনো বুক কাঁপে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। মনে হয় এতদিন পারমিতাকে না দেখেও কি করে আমি বেঁচে ছিলাম?

ভিড় ঠেলে পারমিতার কাছে যাবার চেষ্টা করি। চোখে চোখ পড়ে। নীরব দৃষ্টিতে পারমিতা হয়তো কিছু বলতে চায়, কিন্তু চোখের ভাষা পড়তে বরাবরই আমার ভুল হয়ে যায়। আমাকে আরো এগোতে দেখে পারমিতা আস্তে আস্তে মুখটা ফিরিয়ে নেয় জানলার দিকে।

অতি ব্যস্ত হবার জনাই এক ভদ্রলোকের কনুইয়ের ধাক্কা লাগে আমার ঠোঁটে। এ জন্য বোধহয় আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত, তার আগেই ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি তাঁকে দেখে চমকে উঠলাম। ইনি পারমিতার মামা, আমাকে কোনোদিন পছন্দ করেননি। সেইজন্যই পারমিতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পারমিতার মামা তো কোনোদিন ট্রামে-বাসে চড়তেন না, মনে পড়ল, আজ ট্যাক্সি ধর্মঘট।

আমি পরের স্টপেই বাস থেকে নেমে পড়লাম আর একবার তাকালাম পারমিতার দিকে, তার সিঁথিতে সিঁদুরের লাল বিন্দুটা যেন একটা আগুনের ফুলকির মতন ছুটে এল আমার দিকে।

পারমিতার বিয়ের সময় তো আমি বাধা দিইনি। কোনোদিন কোনো উপদ্রব করিনি ওদের বাড়িতে। পারমিতার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বলেই বিয়ের পর আমার সঙ্গে দেখা করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়েছে পারমিতার জীবনে।

আমি তো আর কিছু চাই না, শুধু একটু কথাও বলতে পারব না! একটুক্ষণ কথা বলতে কি এমন অপরাধ?

সিগারেট ধরিয়ে একা-একা হাঁটতে থাকি রাস্তা দিয়ে। পারমিতাকে ভোলার জন্য আমি বিশ্ব-সমস্যার কথা চিন্তা করি। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন খাদ্য-সমস্যা চলেছে। পেট্রোলের দরবৃদ্ধিতে সভ্যতার ভিত কেঁপে গেল। দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে মার্কিনীরা আণবিক অস্ত্রের ঘাটি বানাচ্ছে। আমাদের এখানে খাদ্য নেই, বিদ্যুৎ নেই, অফিসে, বাড়িতে এমনকি হাসপাতালেও শান্তি নেই। মানুষের কত রকম দুঃখ। সেখানে পারমিতার মতন একটি সামান্য মেয়ের সঙ্গে আমার মতন একজন সামান্য মানুষের দেখা হলো কি হলো না, এটা কি কোনো সমস্যা হতে পারে?

তবু মনের মধ্যে একটা ঝিরঝিরে ব্যথা ঘুরতেই থাকে। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। দু'তিন দিন ধরে সেই বাসের রুটে ঘোরাঘুরি করি যদি পারমিতার সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়।

দেখা হয় একমাস বাদে। শুনেছি, বিদেশ চলে যাবে। তার আগে বোধহয়

পারমিতাকে আর একা রাস্তায় বেরুতেই দেয় না। আজও ওর সঙ্গে রয়েছে ওর দেওর!

পারমিতার দেওর বোধহয় আমাকে চেনে না। পারমিতাকে ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে সে ছুটে গেল ট্যাক্সি ধরতে। সেই ফাঁকে আমি পারমিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ?

খুবই ক্লান্ত ও কোমলভাবে পারমিতা চোখ তুলল, দু'এক মুহূর্ত চেয়ে রইল স্থিরভাবে। এবারও আমি ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে বলল, এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কি বলে খারাপ?

আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। খুব বেশি তো সময় নেই যে এ রকম ঘোরালো কথার মানে বুঝব।

আমি আবার বললাম, পারমিতা, তোমার সঙ্গে আমি একদিন কথা বলতে চাই।

—কোথায়?

এই সময় ঝপ করে পাশে একটা ট্যাক্সি থামল। একটি তরুণ কণ্ঠ বলল, বৌদি, উঠে আসুন। পারমিতা চলে গেল।

আমি বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। পারমিতার ঐ একটি কথাই মাথার মধ্যে প্রবল শব্দ করতে লাগল। কোথায়? কোথায়? পারমিতার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যায়? কোনো পার্কে, ময়দানে, হোটেলে? কোনো জায়গাই পছন্দ হয় না। কোনো জায়গাটাই যেন ঠিক পারমিতার সঙ্গে দেখা করার যোগ্য নয়। পারমিতার জন্য একটা আলাদা নতুন কোনো দেশ দরকার—যেখানে অন্য কোনো চোখ নেই। আজই, পৃথিবীতে আর একটাও নতুন দেশ বাকি নেই বলে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে চেনাশুনো সকলের থেকে দূরে যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যাই, বাতাস হালকা হয়ে আসে, অদৃশ্য কোথায় ঝনঝন করে শব্দ হয়, সেই মুহূর্তে আমি একটা নতুন দ্বীপের সন্ধান পেয়ে যাই।

বেলাভূমিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ, রুক্ষ পাথরের স্তূপের ওপাশে বনতুলসী গাছের ঝাড় হয়ে আছে। তারপর বহুদূর বিস্তৃত সমতল প্রান্তর, মাঝে মাঝে একটা দুটো দেবদারু গাছ, আর অজস্র ফড়িং সেখানে। তাদের ডানার শন শন শব্দে, ঠিক ঝড়ের মতন নয়, অন্য এক আবহাওয়া তৈরি হয়। সেখানে পারমিতা আমার দিকে হাতছানি দিয়ে বলে, তুমি কি কথা বলবে বলছিলে আমাকে?

আমার কোনো কথা মনে পড়ে না। আমি এই পৃথিবীর সব দুঃখ, খাদ্য, বস্ত্র,

বিদ্যুতের সমস্যা কিংবা আণবিক অস্ত্রের কথাও সম্পূর্ণ ভুলে যাই। বার বার শুধু মনে হয়, বেঁচে থাকাটা কি সুন্দর!

সেই দ্বীপের ঠিকানা আমি অন্য কারুকে জানাতে পারি না।

উপহারের কলম

আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু আগে কবিতা-টবিতা লিখত। এখন গল্প-উপন্যাসই বেশি লেখে, একটু নামও হয়েছে। সে যখন কবিতা লিখত, তখন যথারীতি সে ছিল সমাজে অবহেলিত, আত্মীয়-স্বজনরা তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকাত, অনাত্মীয়রা তাকে পাত্তাই দিত না—দু'একজন বন্ধুবান্ধব শুধু তার রচনার তারিফ করেছে কখনো কখনো—তাও বিনা দ্বিধায় নয়। এখন তার গল্প-উপন্যাস দু'চারটে সিনেমা পত্রিকায় ছাপা হয় বলে তার নাম শুনলে কেউ কেউ চিনতে পারে।

একদিন বন্ধুটি আমার বাড়িতে এসে বলল, এই—তোর পেনের দরকার আছে? তোকে একটা পেন দিতে পারি।

আমার বছরে সতেরোটা কলম হারায় কিংবা নিব ভাঙে। তাছাড়া বিনা পয়সায় কোনো জিনিস পেলে কার না নিতে ইচ্ছে হয়? ভাবলুম বছরের গোড়ায় অনেক কোম্পানি ক্যালেণ্ডার, ডায়েরি কিংবা কলম উপহার দেয়—লেখক বন্ধুটি বোধহয় দু'তিনটি কলম পেয়ে আমাকে একটি দিতে চাইছে।

হাত বাড়িয়ে বললাম, ভীষণ দরকার। দে, দে!

কলমটা পেয়ে অবাক হলাম। নতুন নয়। পুরোনো এবং কম দামী। ক্লিপটা বাঁকা। বছরের গোড়াতেই এ রকম রসিকতার মর্ম বোঝা শক্ত। কলমটা খুলে সেটা দিয়ে লেখার চেষ্টা করে দেখলাম নিবটা ঠিকই আছে।

ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

বন্ধুটি হাসতে হাসতে বলল, কলমটা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার আছে। এটা আমার কাছে অদ্ভুতভাবে এসেছে কিন্তু এটা আমার কাছে রাখতে চাই না।

আমি আর উচ্চবাচ্য না করে কলমটা নিয়ে অবহেলার সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললাম, জানিস তো পেট্রোলের দাম আবার বাড়ছে। তার মানেই সব জিনিসপত্তরের দাম আবার বাড়বে। তার মানে, সামনে যে কি দুঃসময় আসছে।

এই চলতি বিষয়ে মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা চলল। বন্ধুটি ঠিক যেন স্বস্তি পাচ্ছে না, উসখুস করতে লাগল। তারপর এক সময় দুম করে বলে ফেলল,

তুই জিজ্ঞেস করলি না তো, কলমটা আমি কি করে পেলাম!

আমি তো জানিই, বন্ধুটি ঐ গল্পটি বলার জন্য আজ এসেছে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলেই বরং ধানাইপানাই করত। এখন ওরই পেট ফুলে উঠেছে।

বললাম, লেখকরা কলম দিয়ে অনেক মিথ্যে গল্প বানিয়ে বানিয়ে লেখে। সেগুলো আমাদের পড়তে হয়। কোনো লেখকেব নিজের মুখ থেকে মিথ্যে গল্প আমি শুনতে চাই না।

—এটা সত্যি। তাছাড়া এটা আমার গল্প নয়. ঐ কলমটার গল্প। দিন সাতেক আগে একদিন সন্ধের পর বাড়ি ফিরছি, দেখি, আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে কলমটা পড়ে আছে। সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠিটাতে লেখা আছে, 'এই কলমটা আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আপনাকে দিয়ে গেলাম। অনেকদিন তো আপনি কবিতা লেখেননি। দেখুন যদি এই হারানো কলমে আপনার কবিতাকে আবার খুঁজে পান!'

—নাম সই নেই?

—না। শুধু লেখা আছে, 'আমরা তিনজন'। তিনটি মেয়ে লিখেছে।

—কি করে বুঝলি মেয়ে?

বন্ধুটি একটু লজ্জা পেয়ে গেল। তারপর বলল, হাতের লেখাটা অনেকটা মেয়েলি ধরনের। তাছাড়া, মেয়ে হিসেবেই ভাবতে ভালো লাগে। একটা মস্ত বড়ো কাগজে শুধু তিন লাইনের চিঠি—

—ঠিক আছে, এটা দিয়ে কবিতা লিখলেই তো পারিস!

—তুইও এ-কথা বললি? আমার ট্র্যাজিডি কি জানিস না? যখন কবিতা লিখতাম, তখন সকলেই বলত, কবিতা লিখে কি হবে। কবিতা তোমার হাতে ঠিক আসে না। গদ্য লেখার চেষ্টা করে দ্যাখো। এখন গদ্য লিখছি—এখন সকলে বলছে, গল্প-উপন্যাসে তোমার একেবারেই হাত নেই—বরং কবিতাটি মন্দ ছিল না--

এবার আমি হেসে উঠলাম। বন্ধুটি আহতভাবে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সিগারেট টানতে লাগল আপনমনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, গল্পটা কি এখানেই শেষ।

ও মুখ ফিরিয়ে বলল, না। এই ঘটনার দিন চারেক বাদে আমি আর একটি চিঠি পেলাম ডাকে। এবারেও মস্ত বড়ো একটা সুদৃশ্য কাগজে কয়েক লাইন। 'গলফ ক্লাব রোডের পাশে একটা মাঠে আমরা বসে আছি। সন্ধে হয়ে এসেছে। আমরাই আপনাকে কলমটা দিয়ে এসেছিলাম। কবিতা লিখলেন? ইতি আমরা তিনজন।'

—এ তো রীতিমতন রোমান্টিক ব্যাপার দেখছি। এই 'আমরা তিনজন' যদি সত্যিই তিনটি মেয়ে হয় তাহলে ওদের নিরাশ করা মোটেই উচিত নয়।

—মেয়ে নিশ্চয়ই। হাতের লেখা ছাড়াও, এ রকম চিঠি কি ছেলেরা লেখে!

—আমি কি করে জানব? আমি কি কখনো কোনো মেয়ের চিঠি পেয়েছি? তা ওদের উদ্দেশ্যে করে একটা কবিতা লিখলেই তো পারিস। কবিতা লিখতে কি একদম ভুলে গেছিস?

—না। তা নয়। অন্যদিকে একটা গোলমাল হয়েছে। আমার বৌদিকে কলমটার ব্যাপার নিয়ে গল্প করেছিলাম। বৌদি দারুণ চটে গেছেন।

—কেন, মেয়েরা দিয়েছে বলে?

—উঁহুঃ। বৌদির সেসব দোষ নেই। বৌদি বলছেন, কুড়িয়ে পাওয়া কলম আবার কেউ কারুকে উপহার দেয় নাকি? তাও সস্তা বাজে কলম, ক্লিপটা ব্যাকা। এটা একটা অলক্ষুনে ব্যাপার।

—যদি খুব দামী গোল্ড ক্যাপ কলম হতো, তাহলে বোধহয় আর অলক্ষুনে থাকত না?

—অত দামী কলম হলে কেউ আমাকে দিতই না। মেয়েরাও না। যাই হোক, বৌদি বললেন, কলমটা আমাদের ঝিয়ের ছেলেকে দিয়ে দিতে। কিন্তু যাই বল, একটা উপহার পাওয়া জিনিস কি ঝিয়ের ছেলেকে দেওয়া যায়! তাকে আমি আর একটা কিনে দিয়েছি।

—আর সেইজন্যই বুঝি ঝিয়ের ছেলের বদলে আমাকে নির্বাচন করেছিস?

—কি করব, বৌদি যে কলমটা বাড়িতে রাখতেই দেবে না।

আমি আপত্তি করলাম না। রেখেই দিলাম কলমটা আমার কাছে। টেবিলের ওপরেই কলমটা পড়ে রইল, আমি ওটার কথা ভুলে গেলাম। কলমটা ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনই আমার হয়নি।

কয়েকদিন বাদে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেছি, আমার ছোট ভাই লাফাতে লাফাতে এসে বলল, ছোড়দা, একটা কবিতা শুনবে?

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, কবিতা? হঠাৎ?

—এই দ্যাখো না। আমি নিজে লিখেছি। আজই দুপুরে লিখলাম।

আমার ছোট ভাইয়ের হাতে একটা গত বছরের পুরোনো ডায়েরি আর সেই ক্লিপ-ব্যাঁকা কলমটা।

আমার ছোট ভাই কক্ষনো কবিতা-টবিতা লেখেনি এর আগে। এরকম কোনো চিন্তাই ওর মাথায় ছিল না। কলমটায় কি কোনো জাদু আছে? আমার বন্ধু ওটা দিয়ে কবিতা না লিখলেও আমার ছোট ভাইকে দিয়েই শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখাল!

কলমটা নিয়ে এলাম ওর হাত থেকে। খুব একটা বকুনি দিলাম। মনে মনে তক্ষুনি ঠিক করলাম, আমার ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎটি যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য অবিলম্বে এই কলমটি অন্য কোথাও পাচার করতে হবে। কাকে দেওয়া যায়? কাকে দেওয়া যায়? কোনো জজ সাহেবের হাতে কলমটা গুঁজে দিয়ে এলে কেমন হয়?

নির্জন নির্জন বাড়ি

ছেলেবেলায় অনেক কিছু দেখেই মুগ্ধ হতাম। সেই মুগ্ধতাবোধ এখন আর নেই। আমরা যতই অভিজ্ঞ হয়ে উঠি নিজেদের চালাক ভাবতে শুরু করি—ততই আমাদের অবাক হবার শক্তি চলে যায়। আজকাল প্রায়ই আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, এমন কিছু নয়!

এখনো পর্যন্ত যে কয়েকটি জিনিস দেখলে আমার সত্যিই ভালো লাগে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শূন্য বাড়ি। মানুষহীন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে সব সময়েই আমার অন্য রকম একটা অনুভূতি হয়। মানুষহীন বাড়ি বলতে অবশ্য সাময়িকভাবে ফাঁকা বাড়ি কিংবা যেসব বাড়ি ভাড়ার অপেক্ষায় আছে সেগুলির কথা বলছি না। প্রকৃতই পরিত্যক্ত এবং নির্জন—যেমন বহু ঐতিহাসিক দুর্গ কিংবা রাজপ্রাসাদ কিংবা দেবতাহীন মন্দির অথবা যে-কোনো সাধারণ বাড়িও হতে পারে।

এরকম বাড়ি বেশ কিছু দেখে ছিলাম বিগত একাত্তর সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। সীমান্ত পেরিয়ে কয়েকজন গিয়েছি ওপারে, দেখেছি পড়ে আছে অনেক গৃহস্থবাড়ি, তখন সম্পূর্ণ জনশূন্য, কিছুটা অগ্নিকাণ্ড বা লুণ্ঠনের চিহ্ন রয়েছে, অধিবাসীদের কোনো খবর নেই। বাগানের পাশের পথ দিয়ে ঢুকেছি বাড়ির মধ্যে, অপরের বাড়ি, তবু অনুমতি নেবার প্রশ্ন নেই, পুকুরের শান্ত জলে শালুক ফুলের ওপর খেলা করছে ফড়িং, বারান্দায় পড়ে আছে পুরনো খবরের কাগজ, দেয়ালে লেখা আছে, গয়লা সাড়ে তিন টাকা। সে বাড়িতে কারা ছিল জানি না। তবু যেটাকে শয়নঘর মনে হয়, সেখানে ঢুকে যখন দেখতে পাই অসংখ্য ছেঁড়া চিঠি ও একটা চুলের কাটা, তখন শরীরটা শিরশির করে ওঠে। কোথাও একটা ভাঙা জানলায় খটখট শব্দ হলেই চমকে উঠি। আগ্রা দুর্গে বেগমদের স্নানের ঘরে প্রবেশ করার রোমাঞ্চের চেয়েও এই রোমাঞ্চ কম নয়।

তবে ইতিহাস কিংবা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত বাড়িই নয়, আরো এরকম অনেক খালি বাড়িতে ঢুকে আমি এরকম রোমাঞ্চ পেয়েছি। অনেক দিন আগে দমদমের

দিকে ট্রেনে চড়ে যাবার সময় মাঠের মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি প্রায়ই আমার চোখে পড়ত। বেশ বড়ো বাড়ি এবং দেখলেই বোঝা যেত ওখানে কোনো লোক থাকে না। প্রত্যেকবার ওদিক দিয়ে যাবার সময় আমি জানলা দিয়ে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকতাম। সে জায়গাটা স্টেশনে থেকে বেশ দূরে। একদিন কি কারণে, সম্ভবত সিগন্যাল না পেয়ে, ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি আর দ্বিধা না করে ট্রেন থেকে নেমে মাঠ ভেঙে এগুতে লাগলাম সেই বাড়িটার দিকে।

মাইলখানেক হাঁটতে হয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখলাম, সেটা কোনো জমিদারের বাগানবাড়ির মতন, বিরাট থামওয়ালা সিংহের মুখ বসানো গেট, একটি বাগান আগাছায় ভর্তি, তার মধ্য দিয়ে সুরকি-ঢালা পথ। অবশ্য বাড়িটার দরজা-জানলা বিশেষ নেই, লোকে ভেঙে নিয়ে গেছে। দেয়াল দিয়ে উঠেছে বট অশ্বত্থের মোটা মোটা গাছ। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই ধারে-কাছে। তবু বিরাট চওড়া সিঁড়ি এখনো অনেকটা অক্ষত আছে, ঘরগুলো একেবারে বাসের অযোগ্য নয়। তাহলে অন্য কেউ এসে বাড়িটাকে জবরদখল করে নেয়নি কেন?

একটি কারণই মনে আসে। নিশ্চয়ই ভূতুড়ে বাড়ি হিসেবে বদনাম আছে। আমি যখন পৌঁচেছি তখন গনগনে দুপুর। ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঠ্যালা। আমার যে একটুও গা ছমছম করেনি তা বলতে পারি না। তবু যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমি উঠে গেলাম ওপরে। বিরাট চওড়া বারান্দা, একটা ভাঙা আয়নার হাজার টুকরো কাঁচ ছড়িয়ে আছে। এবং অনেক বইয়ের ছেঁড়া পাতা, ময়লা কাপড়ের টুকরো, বাতিল খেলনা। ভূত-টূত কিছু দেখিনি, তবু আমার শরীরের সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হচ্ছিল। সেই খানিকটা ভয় ও কল্পনা-মেশা রোমাঞ্চ আমি এত বেশি উপভোগ করছিলাম যে, আমি সেখানে থেকে গিয়েছিলাম প্রায় ঘণ্টা দু'এক। ট্রেন ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সেই বাড়িতে কিছু পায়রা ও শালিকের বাসা ছাড়াও আমি প্রাণের চিহ্ন পেয়েছিলাম। দোতলার সিঁড়ির পাশের সবচেয়ে বড়ো ঘরটার কোণ থেকে দারুণ খচমচ শব্দ পেয়ে আমি দারুণ চমকে উঠেছিলাম ঠিকই, তাহলেও উঁকি মেরে দেখেছিলাম ভেতরে। যাঁরা ভূতের গল্প লেখেন, তাঁরা এই জায়গাটায় অনেকখানি রহস্যময় বর্ণনা দিতেন, কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটা কুকুর।

আমি ভূতের চেয়েও কুকুরকে বেশি ভয় পাই। সুতরাং আমার ভয় পাবার কারণ ছিল। কিন্তু কুকুরটা খুবই বুড়ো, আমায় দেখে তর্জন-গর্জন কিছুই করল না—অলস চোখ মেলে শুয়েই রইল। এটা ঠিক সাধারণ নেড়িকুত্তা নয়, বেশ বড়ো আকারের, একদা বংশমর্যাদা ছিল, এখন লোম-ওঠা, প্রায় অথর্ব। কুকুর সাধারণত মানুষের আশেপাশেই থাকে। এই কুকুরটা জনহীন পরিত্যক্ত বাড়িতে রয়ে গেছে

কেন? কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয় এমন জায়গায় এত বড়ো একটা বাড়িকে এরকমভাবে নষ্ট হতে দেওয়া হচ্ছে কেন? তখনই মনে হয়, নিশ্চয়ই এই বাড়িটার সঙ্গে কোনো গল্প জড়িত আছে। সেই গল্পের সামান্য সূত্রও আমি জানি না, বাড়ির পূর্বতন মালিকদের সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। তবু সেই দুপুরে, সেই নির্জন পোড়ো বাড়ির বারান্দায় বসে আমি অজানা এক গল্পের স্বাদ পাচ্ছিলাম।

এরকম পরিত্যক্ত বাড়ি আজকাল সহজে চোখে পড়ে না। ভূতুড়ে বাড়ি, হানা বাড়ি—কিছুই আজকাল আর খালি থাকে না। ওরাং ওটাং গণ্ডার চিত্রল হরিণ প্রভৃতি বিরল প্রাণীর মতন ভূতরাও পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। ভূত সংরক্ষণের জন্যে কোনো সমিতিরও মাথাব্যথা নেই।

কয়েকদিন আগে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। না, সেটা হয়তো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ি নয়, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শরৎচন্দ্রের কোনো উত্তরাধিকারী যেখানে পাহারাদার হিসেবে থাকতেও পারেন। কিন্তু আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন সে-রকম কারুকে দেখিনি। অনেক ঘর তালাবন্ধ, তবু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাওয়া যায়। বাড়িটিতে বহু দিনের ধুলো ও অযত্ন জমে আছে, ধানের গোলা, রান্নাঘর—সব কিছুরই পরিত্যক্ত চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় এককালে একটি চমৎকার বাড়ি ছিল, সামনে বিরাট দিঘি ও বাগান, বারান্দায় দাঁড়ালেই অদূরের রূপনারায়ণ নদ দেখা যায়, রোদ্দুরে ঝকঝক করছে জল। বারান্দায় একটুক্ষণ দাড়ালেই অনুভব করা যায় এইখানে ইজিচেয়ার পেতে বসে থাকতেন শরৎচন্দ্র, তাকিয়ে থাকতেন নদীর দিকে—ঠিক যে-রকম বর্ণনা আছে তাঁর চিঠিপত্রে। যেহেতু বাড়িটাতে কোনো নতুন গৃহস্থালির চিহ্ন নেই, কোনো রমণীর কাপড় শুকোচ্ছে না, কোনো শিশুর খেলনা নেই—তাই অনায়াসেই কল্পনা করা যায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে বাড়িটা এই রকমই পড়ে আছে, এখনো এখানকার হাওয়ায় ভাসছে সেদিনকার নিশ্বাস। ক্লান্ত বিপ্লবীর মতন একজন মানুষ এখানে এসে শান্তি চেয়েছিল। পায়নি।

শরৎচন্দ্রের বাড়িটি দেখে আমার অন্য একটি বাড়ির কথা মনে পড়েছিল। যদিও দুটি বাড়ির মধ্যে আপাতত কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু মনে পড়েছিল, স্মৃতির কি যুক্তি থাকে সব সময়!

সেই বাড়িটি আমি দেখেছিলাম রামগড় শহর থেকে কিছুটা দূরে। হাজারিবাগ থেকে রামগড় আসার পথে জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকায়, হঠাৎ সেই বাড়িটা চোখে পড়ে। কয়েক বন্ধু মিলে আমরা গাড়িতে আসছিলাম, বাড়িটা দেখেই আমার কৌতূহল জাগ্রত হলো, গাড়ি থামিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। বাড়িটা দেখতে খুবই সুন্দর, মূল রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গল-ঘেরা টিলার ওপরে সাদা

বাড়িটা দূর থেকে একটা বিশাল ফুলের মতন দেখায়। তবে, নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে কেউ ঐরকম জায়গায় বাড়ি করে না। কাছাকাছি হাটবাজার তো দূরের কথা, জনবসতিও নেই—সে-কোনো একটা ছোটখাটো জিনিস কেনার দরকার হলেও অন্তত সাত-আট মাইল যেতে হবে, তার মধ্যে প্রায় দু'মাইল হাঁটা রাস্তা।

দূর থেকেই বোঝা গিয়েছিল, কাছে গিয়ে আরো নিশ্চিন্ত হলাম যে বাড়িটাতে বেশ কয়েক বছর কোনো মানুষ থাকেনি। আগাছা ও কাঁটাগাছে গেটের সামনেটা ঢেকে গেছে, মূল দরজাটা হাট করে খোলা।

আগাছা সরিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। বেশ শৌখিন ধরনের বাড়ি, বাড়ির মালিকের রুচিবোধ ছিল। ভেতরে ঢুকে আমরা ক্রমশ অবাক হতে লাগলাম। মোট চারখানা ঘর কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই সাংঘাতিক এক ধ্বংসের চিহ্ন। ঘরগুলি চেয়ার টেবিল আলমারিতে সাজানো ছিল এক সময়, কিন্তু সে-সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড ক্রোধে একটা কুড়ুল দিয়ে সেগুলো ফালা-ফালা করেছে। এমনকি দেয়ালের গায়ে লাগানো তাকও সেইরকম কোনো ধাবালো অস্ত্র দিয়ে কাটা। প্রত্যেকটা ঘরে একই দৃশ্য। একটা ঘরে মনে হলো প্রায় হাজারখানেক বই কেউ যেন ইচ্ছে করে ছিঁড়েছে। পাতাগুলো কুচিকুচি করা। কয়েকটা টুকরো তুলে আমরা দেখলাম বিজ্ঞান ও দর্শনের বই।

কে এরকম করেছে? এ বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল? তাহলে জিনিসগুলো এমন টুকরো টুকরো করে ভাঙার কি দরকার ছিল? বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে চোরেরা এসব আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে যেতে পারত—এমন করে নষ্ট করবে কেন? কেউ এসে লুকোনো কোনো সম্পদের খোজ করেছে? কিন্তু চেয়ার-টেবিল-খাট, এমনকি বইয়ের পাতায় কোন গুপ্ত সম্পদ থাকতে পারে? আমরা বিমূঢ় হয়ে বাড়িটার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। কি এই পরিত্যক্ত বাড়ির গল্প? আমাদের কৌতূহল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতেই চেপে কাছাকাছি জনপদ দেখেই আবার থামলাম। খোঁজ করতে লাগলাম বাড়িটা সম্পর্কে।

খুব বেশি কিছু জানা গেল না। শুনলাম একজন অধ্যাপক চাকরি থেকে রিটায়ার করে শান্তিতে থাকার জন্য ঐ বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বেশ দয়ালু ও সজ্জন ছিলেন তিনি। স্থানীয় গরীব ছেলেদের সাহায্য করতেন। কয়েক বছর আগে হঠাৎ তিনি সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। মানুষের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, কিন্তু তার আগে কোন সাংঘাতিক ক্রোধে ঐ লোকটি নিজের পাতানো সংসারের প্রতিটি জিনিস এমনভাবে ধ্বংস করে গেছেন তা কে বলবে?

বাজার ও নাগা সন্ন্যাসী

সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি বাজারে যাবার জন্য, বাড়ির ঠিক সামনেই একজন লম্বা মতন সাধু আমার দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, এই বাচ্চা, শোন শোন—

থমকে দাঁড়ালাম দুটি কারণে। ধর্মে মতি না থাকলেও আমি পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের পছন্দ করি। বাড়িঘর সংসারের কথা চিন্তা না করে যারা সারাজীবন ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গে হয়তো আমার অন্তরের কিছু যোগ আছে।

দ্বিতীয় কারণটি এই যে, বহুদিন আমাকে কেউ বাচ্চা বলে ডাকেনি। যখন বয়স খুব কম ছিল, তখন কেউ আমাকে বাচ্চা বললে চটে যেতাম। এখন বেশ একটা রোমাঞ্চের ভাব হয়।

সাধুটি বিরাট লম্বা-চওড়া, মাথায় জটা, মুখে পাউডারের মতন ছাই মেখে বেশ প্রসাধন করেছে, একটা আলখাল্লা দিয়ে শরীরটা ঢাকা। এক হাতে ত্রিশূল। অর্থাৎ বেশ খাঁটি সাধু সাধুই চেহারা বলতে হবে।

সাধুটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য হিন্দীতে আমাকে যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো এই যে, উনি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাবেন। আমি যেন ওঁর ট্রেন ভাড়াটা দিয়ে দিই।

সাধু-সন্ন্যাসীদেরও ট্রেনভাড়া লাগে কিনা সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আগে তো লাগত না বলেই জানতাম। কি জানি, এখন হয়তো সাধারণ যাত্রীদের কাছ থেকেই ভাড়া আদায় করা যায় না বলে রেলওয়ে বিভাগ নিরীহ সাধুদের কাছ থেকেই শুধু জোর জবরদস্তি করে ভাড়া আদায় করতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, সাধুজী, হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখতে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমারও। যদি ট্রেনভাড়া যোগাড করতে পারতাম তাহলে তো আমি নিজেই যেতাম।

সাধুটি আমার বাংলা কথা একটি বর্ণও বুঝতে পারলেন না বোধহয়। আবার বললেন, আমি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাব, তুমি আমায় ট্রেনভাড়া দাও। আমি একজন নাগা সন্ন্যাসী, গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছিলাম, এখন আমাকে হরিদ্বারে যেতেই হবে।

তিনি তাঁর গায়ের আলখাল্লাটি খুলে সম্পূর্ণ শরীরটা আমাকে দেখালেন। তাঁর নাগাত্ব বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণই নেই।

যেহেতু পরিব্রাজক সাধুদের সম্পর্কে আমার দুর্বলতা আছে, তাই আমি পকেট থেকে দুটি টাকা বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, বাবাজী, তোমার রেলভাড়ার পুরো টাকাটি তো আমাকে বিক্রি করলেও বেরুবে না। আমি এই সামান্য কিছু

দিলাম—বাকিটা তুমি আর সবার কাছ থেকে কিছু-কিছু করে যোগাড় করে নাও।

সাধু তাঁর ঝকঝকে দাঁতে হাসলেন এবং খপ করে আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন।

ঘটনাটি ঘটছে আমারই বাড়ির সামনে। তিনতলার বারান্দা থেকে আমার মা এবং অন্যরা চেঁচামেচি করে আমাকে তক্ষুনি সাধুর হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে বললেন। ওঁরা ভয় পেয়েছেন। ভয় পাবারই কথা। এখনকার দিনে বাজার খরচ থেকে দু'টাকা কম পড়া কি সোজা কথা। ওঁরা ভাবছেন আমি বুঝি সাধুটিকে বাকি টাকাটাও দিয়ে দেব—সেদিন বাড়িতে মাছ তরকারি কিছুই আসবে না।

আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সাধু বাবাজীকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

সাধুজী আবার খটখটে হিন্দী ভাষায় যা বললেন, তাতে বুঝলাম যে, উনি আমাকে দেখেই বুঝেছিলেন, আমি রীতিমতন একটি পুণ্যাত্মা। আমার কপালে কিসের যেন একটা ছাপ আছে। সুতরাং উনি হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গিয়ে আমার নামে একটা যজ্ঞ করবেন। তাতে আমাব জীবনের দারুণ উন্নতি হবে। সুতরাং এক সের খাঁটি ঘিয়ের দাম ওকে দেওয়া দরকার। খাঁটি ঘি বহুকাল চোখে দেখি নি, স্বাদও ভুলে গেছি। সেই খাঁটি ঘি আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করার প্রস্তাব একটা রীতিমত বীভৎস ব্যাপার। যাই হোক, সে কথা সাধুজীকে না বলে আমি সংক্ষেপে বললাম, আমার তো উন্নতির দরকার নেই।

সাধু হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া?

আমি একটু লঘু হয়ে গিয়ে বললাম, বিশ্বাস করুন স্যার, আমার জীবনের আর কোনো উন্নতির দরকার নেই। মাইরি বলছি, আমি বেশ আছি। উন্নতি হলেই আবার কত ঝামেলা হবে, ওসব দরকার নেই।

সাধু রক্তাক্ত চোখে আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তখনও আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার একটু হাসলেন।

নাগা সন্ন্যাসী হলেও তিনি এতদিনে জেনে গেছেন নিশ্চয়ই যে বাঙালিরা সাধারণত একটু অবিশ্বাসী ও ফোক্কড় প্রকৃতির হয়। এবং তিনিও এও জেনেছেন যে শহরের লোকেরা বিভূতি-টিভূতি অর্থাৎ ভেল্কিবাজি না দেখলে মুগ্ধ হয় না।

সাধুটি তাঁর মাথাটি ঝুঁকিয়ে এনে আমাকে বললেন, তাঁর মাথা থেকে কয়েকটা চুল টেনে ছিঁড়ে নিতে।

আমি রাজি হলাম না। যার সঙ্গে আমার কখনো ঝগড়া হয়নি, তার চুল ছিঁড়তে যাব কেন আমি। অনেক সময় নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয় বটে। কিন্তু আমার চুলে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের কোনো আগ্রহের কারণ থাকতে পারে না।

উনি নিজেই তখন নিজের মাথার কয়েক গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললেন পটাং করে। তারপর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পাকড়ো।

আমি রাজি হলাম না। দুদিকে মাথা নাড়লাম।

উনি তখন নিজেই চুলগুলো গুলি পাকিয়ে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, ফুঁ দাও। আমি ওঁর আঙুল দুটিতে ফুঁ দিলাম।

আমার নিশ্বাসে যে আগুন আছে তা আমি নিজেই জানতাম না। সত্যি, মানুষ নিজের সম্পর্কেও কত কিছু জানে না। আমি ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঠিক পুড়ে যেতে দেখলাম না অবশ্য, দেখলাম চুলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার বদলে সন্ন্যাসীর হাতে রয়েছে খানিকটা ছাই। সেই ছাই দিয়ে আমার কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলেন।

ইদানীং ছাই-মাহাত্ম্য যে খুব চলছে, এই সন্ন্যাসীও তা জেনে গেছেন মনে হচ্ছে। তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু এই ছাইয়ের সঙ্গে ঘিয়ের দামের কোনো সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে আমি ভুরু নাচিয়ে বললাম, কি হলো?

সন্ন্যাসীর চোখে এবার যেন ফুটে উঠল ভর্ৎসনা। তিনি ফের বললেন, তোমার উন্নতির জন্য আমি যজ্ঞ করতে চাই। আমিও আবার বললাম, আমার উন্নতির কোনো দরকারই যে নেই।

তিনি তখন আবার দু'হাত উঁচু করলেন, আলখাল্লাটি সরিয়ে পুনরায় নিজের শরীরটা দেখিয়ে বললেন, নাগা সন্ন্যাসী।

অর্থাৎ তিনি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, তাঁর শরীরের লুকোনো কিছু নেই। তারপর দুটো আঙুলে নস্যি ধরার ভঙ্গিতে টিপে আমার কাছে নিয়ে এলেন, সেখান থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। একটু আগে যেখানে ছাই ছিল, এখন সেখান থেকে জল পড়ছে—এটা যে একটা চমকপ্রদ ব্যাপার তা স্বীকার করতেই হবে।

এবার সাধুজী আমার চোখের দিকে তাকাতেই আমি বললাম, বাঃ।

শুনেছি বিভূতি বা সিদ্ধাই বারবার প্রয়োগ করলে সাধুদের আয়ু কমে যায়। এই স্বাস্থ্যবান সাধুটির কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই। পাছে উনি আরো চমকপ্রদ কিছু আমাকে দেখাতে চান, তাই আমি বললাম, আর থাক, খুব ভালো হয়েছে।

কেউ একে বলবেন অলৌকিক ক্ষমতা, কেউ বলবেন ম্যাজিক। আমি ওসব সাতে-পাঁচে নেই। তবে, সব কাজেরই একটা পারিশ্রমিক দেওয়ায় আমি বিশ্বাস করি। এই যে সাধুটি আমাকে এই সব দেখালেন, এর একটা মূল্য পাওয়া উচিত। আমি বাজার খরচের অবশিষ্ট দুটি টাকা সাধুটিকে দিয়ে বললাম, সাধুজী, গোলপার্কে

একটা দোকানে ভালো জিলিপি পাওয়া যায়—এই টাকা নিন, আপনি জিলিপি সেবা করবেন।

আমি জানি, সাধুরা যেসব বায়বীয় পদার্থ অহরহ পান করেন, তারপর একটু মিষ্টি খাওয়া খুব দরকার।

যাই হোক, তারপর শূন্য থলি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসার পর সে কি চ্যাঁচামেচি। সবাই আমাকে বোকা, গাধা, ইস্টুপিড—এই সব বিশেষণে ভূষিত করতে লাগলেন। আমার ছোড়দা আবার কট্টর নাস্তিক, সে বলল, ইডিয়েট, তুই সামান্য ম্যাজিক দেখেই টাকাটা দিয়ে এলি।

আমি মনে মনে বললাম, একদিন বাজার না হলে কি ক্ষতি হয়। তার বদলে ম্যাজিকেই বা মন্দ কি। এই বাজারেও যে আমরা দিনের পর দিন সংসার চালাচ্ছি—সেটাও তো একটা ম্যাজিক বলতে গেলে।

আত্মহত্যা ও কবিতা

চিরঞ্জীবের বাড়িতে গেলে বই দেখেই অনেক সময় কেটে যায়। নিয়মিত বই কেনে চিরঞ্জীব, যত্ন করে সাজিয়ে রাখে, আস্তে আস্তে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরি বানিয়ে তুলছে। এত টাটকা নতুন বই শুধু ওর বাড়িতেই দেখেছি। যা মাইনে পায়, তার আদ্ধেকের বেশি টাকাই ও বই কেনার জন্য খরচ করে। সিগারেট খায় না, অন্য কোনো নেশা নেই, এমনকি প্রেমও করে না।

আমরা এই নিয়ে কখনো কখনো ঠাট্টা করেছি ওকে। বলেছি, অত তোর বই-প্রেম যে তুই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখারও সময় পাস না? তুই বিয়ে করলে তোর বউ যে এই বইগুলোকেই সতীন মনে করবে।

চিরঞ্জীব লাজুক ধরনের ছেলে, এই সব কথার কোনো উত্তর দেয় না। মেয়েদের প্রতি সত্যিই যেন ওর কোনো আগ্রহ নেই। এটা একটু ভয়ের ব্যাপার। অনেকের ধারণা, বেশি মেয়েদের সঙ্গে মিশলে ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়। কিন্তু আমি দেখেছি আঠাশ তিরিশ বছর বয়সেও যে পুরুষ একটিও মেয়ের সঙ্গে মেশেনি, তারই চরিত্র খারাপ হয় বেশি। সে বাতিকগ্রস্ত কিংবা খিটখিটে হয়, স্বার্থপর হয় এবং ক্রমশই বোকা বোকা হয়ে যায়।

চিরঞ্জীবের সেই সব দোষ এখনো অবশ্য দেখা দেয়নি। তবে, বই সম্পর্কে ওর বড়োই বাড়াবাড়ি। একটি বইও কারুকে নিয়ে যেতে দেবে না বাড়ি থেকে। কতদিন কত বই দেখে লোভ হয়েছে, কিন্তু চিরঞ্জীব এই ব্যাপারে খুব কড়া। ও

বলেছে, আমার এখানে বসে যতক্ষণ ইচ্ছে পড়ো, কিন্তু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে না। অনেকে বই ফেরত দিতে ভুলে যায়, বার বার চাওয়া যায় না, ফেরত পেলেও মলাট আস্ত থাকে না।

সন্ধেবেলা হাতে কিছু কাজ না থাকলে আমি চিরঞ্জীবের বাড়িতে চলে যাই। আর কোনো বন্ধুবান্ধবকে সন্ধের পর বাড়িতে না পাওয়া গেলেও চিরঞ্জীবকে পাওয়া যাবেই। এবং ও বেশ বন্ধুবৎসল।

ইদানীং পর পর দু'দিন চিরঞ্জীবকে সন্ধের পর বাড়িতে পাইনি। একটু খটকা লেগেছিল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা দেখতে পেলাম রাজভবনের পাশ দিয়ে চিরঞ্জীব একটি মেয়ের সঙ্গে নিবিষ্টভাবে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এটা একটা ভালো লক্ষণ--দিনরাত বই নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আমি আর ওকে বিরক্ত করলাম না।

দিন সাতেক বাদে আর একটি অবাক ব্যাপার ঘটল। বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখলাম, চিরঞ্জীব আমার জন্য তিনখানা বই রেখে গেছে। ওর নিজের সংগ্রহের বই, বেশ দামী। কিছুদিন আগে এই তিনখানা বই সম্পর্কে আমি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। চিরঞ্জীব কারুকে বই নিতে দেয় না, আজ নিজে থেকে বাড়িতে এসে বইগুলো দিয়ে গেল কেন? এই কি প্রথম প্রেমের পুলক।

পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলাম পরে। সেদিন চিরঞ্জীব ট্যাক্সি নিয়ে প্রত্যেক বন্ধুব বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঐরকমভাবে তিন চারখানা করে বই রেখে গেছে। বন্ধুরা সবাই বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু কেউই খুব বেশি মাথা ঘামায়নি।

শুধু বই নয়, চিরঞ্জীব তার অনেক প্রিয় জিনিসপত্রও বিলিয়ে দিয়েছে অনেককে। তার বদলে সংগ্রহ করেছে পঞ্চাশটা ঘুমের বড়ি। রাত্রিবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর চিরঞ্জীব নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রথমে লিখেছে একটা চিঠি। 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি ভালোবাসা পাইনি বলেই চলে যাচ্ছি এ পৃথিবী থেকে।'

চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। পাশে জলের জাগ। একটার পর একটা ঘুমের বড়ি মুখে দিয়েছে, চোখের সামনে খোলা জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই। কবিতা পড়তে পড়তে মরে যাওয়াই ওর শেষ সাধ।

ঊনত্রিশ বছর বয়েসে প্রথম একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় চিরঞ্জীবের। পরিচয় মানেই প্রেম। কিন্তু প্রেম সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। চাপা স্বভাব বলে বন্ধুদের কাছেও কিছু বলেনি বা পরামর্শ নেয়নি। তার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। *মেয়েটির প্রত্যাখ্যান চিরঞ্জীবের জগৎ-সংসার শূন্য হয়ে গেছে।*

কবিতার বইটি পড়তে পড়তে চিরঞ্জীব এক জায়গায় থমকে যায়। ঠিক যেন

তার নিজেরই মনের কথা।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ জব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড় ;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

চিরঞ্জীবের শরীরটা শিউরে ওঠে। একটি মেয়ের সামান্য একটা মুখের কথায় সে মরতে যাচ্ছে? মানুষের জীবন কি নক্ষত্রের মতন?

তখন চিরঞ্জীবের খুব বাঁচতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে সাতাশটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছে। বাকি বড়িগুলো বাথরুমে গিয়ে ফেলে দেবার জন্য সে বিছানা ছেড়ে উঠল কিন্তু যেতে পারল না, ঝপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

পরদিন বেলা দশটায় যখন দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হলো তাকে তখনও তার বুক ধুকপুক করছে। হাসপাতালে নিয়ে স্টমাক পাম্প করার পর কোনোক্রমে বেঁচে গেল চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীবের আত্মহত্যার চেষ্টার খবর শুনে আমরা বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। এরকম আধখ্যাচড়াভাবে কোনো কাজই ভালো লাগে না। যাই হোক, ও আবার বেচে ওঠার পর আমরা সমস্যায় পড়লাম। ওর বইগুলো কি ওকে আবার ফেরত দিয়ে আসা উচিত? উপহার কি ফেরত দেওয়া যায়? অথচ বইগুলো ওর কত প্রিয় তাও আমরা জানি।

একদিন হাতে করে নিয়ে গেলাম বইগুলো ওর বাড়িতে। মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসে চিরঞ্জীব আরো লাজুক হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে আড়ষ্ট গলায় বললে, না না ওগুলো আর দিতে হবে না আমাকে। আমি আবার একটা একটা করে সব বই কিনব। সেইটাই হবে আমার বেঁচে থাকার কারণ।

মায়াকাননের ফুল

নবনীতা দেবসেনকে

লেখকের কথা

এই লেখাটি পড়তে গিয়ে প্রথম দিকে পাঠক-পাঠিকাদের খানিকটা খটকা লাগতে পারে। মনে হবে অজস্র ছাপার ভুল। আসলে ইচ্ছে করেই অনেক বাক্য অসমাপ্ত রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলো একটু একঘেয়ে। অনেক সময় সেগুলো বাদ দিলেও পুরো বাক্যের মানে বোঝা যায়। যেমন আমরা মুখের কথায় অনেক সময়।

লেখক খানিকটা বলে দিচ্ছেন বাকিটা পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নেবেন। অর্থাৎ লেখক ও পাঠক মিলেমিশে বাক্যগুলি তৈরি করছেন। এইভাবে, একটি উপন্যাসের মধ্যে লেখক ও পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ হতে পারে। তবে, বলাই বাহুল্য, এটা একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র, বিরাট কোনো দাবি নাই। তাছাড়া সব জায়গাতে যে ক্রিয়াপদ বাদ দিতেই হবে, এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণও আমার। যখন যেমন মনে। অনেকটা কৌতুকের ছলেও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় যাব ? কোনো একটা নতুন জায়গায়।

যেতে হবে ট্রেনে। আগে থেকে টিকিট-ফিকিট কিছুই। ইচ্ছেই তো জাগল বিকেলে। সারা ট্রেনটি মানুষে জমজমাট। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে। কোনো কামরাতেই আর একজনও অতিরিক্ত মানুষের জায়গা হবে না। শুধু ফার্স্ট ক্লাসের বগিগুলো এখনো কিছু ফাঁকা। কিন্তু থার্ড ক্লাসে টিকিট ফাঁকি দেবার অভ্যেস থাকলেও ফার্স্ট ক্লাসে নেই। এরকম ঝুঁকি নিতে সাহস ঠিক।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট। যা হোক কিছু একটা করা।

স্টেশন থেকে কোনো দিন ফিরে যাইনি। শেষ মুহূর্তে যে-কোনো কামরায় লাফিয়ে উঠেও অন্তত।

শুনেছি, কাকে যেন ঘুষ দিলে থ্রি-টায়ার বা টু-টায়ার কামরায় টিকিট পাওয়া যায় যে-কোনো সময়ে। কিন্তু যাকে সেই ঘুষটা দিতে হবে তাকে খুঁজে বার করব কী উপায়ে ? ঘুষখোরদের কি মুখ দেখে চেনা যায় ? তাছাড়া ঘুষ দেবার সঠিক পন্থাটা কি ? টাকাটা কি আগে থেকেই বাড়িয়ে দিতে হয়, না ওরা নিজেরাই ? ওদের মধ্যে যে একটিমাত্র সৎলোক আছে, যদি আমি ঠিক তার সামনেই পড়ে যাই ? যদি সে রাগ ও দুঃখের সঙ্গে বলে, ছিঃ, আপনি আমাকে অপমান ?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমি এ পর্যন্ত কখনো কারুকে ঘুষ দিইনি। কারুকে নিতেও দেখিনি। এমনকি, এতগুলো বছর বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে, এরকম একটা বড়ো শহরে, অথচ আমার চোখের সামনে একটাও মৃত্যু ঘটেনি, দুর্ঘটনাও না। আর সবাই দেখেছে, আমারই দেখা হয়নি। কোনো নিষ্ঠুর রমণী আমার চোখে পড়েনি। কত কী যে বাকি আছে।

—দাদা, আগুনটা

পাশ ফিরে দেখলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন মধ্যবয়স্ক ফর্সা চেহারার লোক, মুখে সিগারেট গোঁজা, হাতটা আমার সিগারেটের দিকে। লোকটির নাক ও চোখে স্পষ্ট মঙ্গোলীয় ছাপ। এমন হতে পারে, তিব্বতরাজ একবার যখন বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীর কারুর সঙ্গে এদের পরিবারের রক্তের সংমিশ্রণ। এরকম হঠাৎ মনে আসে।

ধীরে সুস্থে পকেট থেকে দেশলাইটা। ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত লক্ষ রাখলাম লোকটির দিকে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অন্য কারুর কাছ থেকে আগুন চায়, সে নির্ঘাত কৃপণ। কেননা কাছেই দেশলাই কিনতে। এটাও আমার এক মুহূর্তের চিন্তা। পরে ভুল প্রমাণিত।

দেশলাইটা ফেরত দিয়ে লোকটি হনহন করে চলে গেল সামনের দিকে। ধুতি-পরা লোকের এত জোরে হাঁটা কি ঠিক?

বাচ্চাদের ঝুমঝুমির যে রকম আওয়াজ, স্টেশনের মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে সেই রকম একটা আওয়াজ সব সময়। তাছাড়া, একই সঙ্গে এখানে ব্যস্ততা ও মন্থরতা। বেঞ্চগুলোতে যারা জায়গা পেয়েছে তারা এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেয়। গরম দেশে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও প্রকাশ্যে ঘুমোতে লজ্জা পায় না। এই সন্ধে বেলাতেও। আমার একটুও ভালো লাগে না এসব দেখতে।

জানলাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। কোনো জানলার পাশে যদি কোনো সুন্দরী। যে-কোনো একটা কামরায় উঠতেই হবে, তখন মোটামুটি একটু চোখের আরাম যাতে সে রকম কেউ নেই। হঠাৎ নাকি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের গলার হার টেনে ছিঁড়ে নেয় আজকাল। মেয়েরা তাই ভেতরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আমার খুব কাছেই দুটি যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ নধর, পাকা হলুদ রঙের। লক্ষ্য রাখি, কলার খোসা ওরা কোথায়। ছেলেবেলায় বয়স্কাউট ছিলুম তো। কেউ প্ল্যাটফর্মে বা রাস্তার ওপর ফেললে তার সামনেই তাকে অপমান করার জন্য আমি খানিকটা আড়ম্বরের সঙ্গে পা দিয়ে সেগুলো সরিয়ে।

ছেলে দুটির কলা খাওয়া এখনো শেষ হয়নি, এর আগেই একটা অন্যরকম দৃশ্য। ওদের সামনে দাঁড়ানো একটি ভিখিরি। বেশ বৃদ্ধ ও লম্বা। ওরা প্রথমে তার দিকে নজরই দেয় না। তারপর এক সময় বিরক্ত। একজন তার হাতের অতিরিক্ত একটি কলা বৃদ্ধটির দিকে বাড়িয়ে বলে, এই নাও!

এটা নতুন কিছু নয়। এর পরের টুক্।

ভিখিরিটি যেন কুঁকড়ে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, না, না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনাদের মুখের গ্রাস।

—আরে নাও না, নাও না, বলছি তো।

—আমায় মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে।

ভিখিরিটি দ্রুত সেখান থেকে পা চালিয়ে। আমি সেদিকে একটু চিন্তিতভাবে। অদ্ভুত তো! এই ঘটনাটা দেখে আমার কিছু একটা মনে হওয়া উচিত ছিল। চোখের সামনের যে-কোনো ঘটনা সম্পর্কেই হওয়া উচিত। আমরা তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে। এই ভিখিরিটিকে দেখে আমার খুশি হওয়া উচিত না বিরক্ত? ভদ্র ভিখিরি

হিসেবে এ অনন্য, কিংবা অন্য ভিখিরিদের চেয়েও অনেক বেশি বোকা?

তারপর হাসি পেল। ভিখিরিও মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায় না। অথচ

ঘন্টা বাজল। এবার ট্রেন। আমি সোজা সামনের কামরার দিকেই পা বাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় সেই মঙ্গোলিয়ান মুখ ভদ্রলোকটি হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

—কেন বলুন তো?

—একটা টিকিট আছে, এক্সট্রা...আমাদের একজন লাস্ট মোমেণ্টেও এলো না।

—কোথাকার টিকিট?

—ডেহরি-অন-শোন... আপনি যা দাম দিতে চান, মানে আপনি যদি অতদূরে না যান...এখন তো আর ফেরত দেবার সময় নেই...

—আমি ডেহরি-অন-শোনেই যাব। কত টাকা দিতে হবে।

—আগে উঠে পড়ুন, উঠুন, গাড়ি এক্ষুনি।

লোকটি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই। দরজার সামনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে সেই ভিখারিটা। কেউ কেউ তাকে ধমক দিচ্ছে, আরে বাবা, সরো, সরো—

আমি কোনোক্রমে ভেতরে ঢুকে। আস্ত একটি বাঙ্ক আমার জন্য। টিকিট ও রিজার্ভেশন কার্ড হাতে দিয়ে লোকটি বলল, একেবারে ওপরেরটা। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

—না, কিছু না।

—আপনি ডেহরি-অন-শোনেই যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

বস্তুত এইখান থেকেই গল্পের শুরু। ডেহরি-অন-শোনে আমার চেনা কেউ নেই, কোনোদিন সেখানে যাওয়ার কথা ভাবিইনি। একেবারে নিরুদ্দেশে কেউ বেরিয়ে পড়ে না, বিশেষত আমি পরীক্ষাতেও ফেল করিনি, প্রেমেও ব্যর্থ হই নি এখনো। মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম, সমীরের ওখানে যদি...খুব বেশি দূর নয়।

কিন্তু অভ্যন্ত ভিড়ের ট্রেনে যদি কেউ আমাকে হঠাৎ একটা টিকিট দেয়, তবে আর সেখানে না যাওযার কোনো যুক্তি আমার নেই। ব্যাপারটাকে আরো যুক্তিযুক্ত করার জন্য আমি কাঁধের ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে, ফের দরজার কাছে এসে সেই লম্বা মতন ভিখিরিটিকে দশ পয়সা। সে যখন নমস্কার করতে

আসে, আমি লক্ষ্য করি, তার ডান হাতে ছটা আঙুল।

মঙ্গোলিয়ান-মুখ লোকটির নাম অরবিন্দ ভৌমিক। তার বন্ধুর আসার কথা ছিল, কেন আসতে পারেনি, সেজন্য ঈষৎ দুশ্চিন্তিত মুখে আমায় প্রশ্ন করল, বলতে পারেন, বেলেঘাটার দিকে আজ কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কিনা।

এটা আমি সত্যিই জানি যে সকালবেলা বেলেঘাটায় একজন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছে। দুপুরবেলা রেডিওতে।

—আপনার বন্ধুর নাম কি?

—অশেষ মজুমদার, চিনতে পারবেন বোধ হয়, জাস্টিস চন্দ্রভূষণ মজুমদার—যিনি আবার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডে...তাঁর মেজো ছেলে...আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড।

একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে আবার বলল, অশেষ কোনোদিন কথা দিয়ে ফেইল করে না। যাক গে, আপনাকে কিন্তু ট্রেনে এই নামেই, মানে, চেকার যদি আসে—নাম জিজ্ঞেস করে না অবশ্য, তবু যদি, আপনি তা হলে ঐ নামটা—

—কোন নাম?

—আমার বন্ধুর নাম যা বললাম।

এমনও হতে পারে, অশেষ মজুমদারই আজ বেলেঘাটায়। রেডিওতে যেন ঐ রকমই একটা নাম। ট্রেনে আমাকে ঐ নামেই। কিন্তু অরবিন্দ ভৌমিকেব বন্ধু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বয়েসের তফাতের জন্যই—

চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় কেউ বুকের কাছে জামার হাপর দিয়ে ঘাম শুকোবার। বাইরে আলো অতি ক্ষীণ। এর মধ্যেই ওপরেব বাঙ্কে উঠে বসা চলে না, রাত মাত্র আটটা। কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে ঘুমের তোড়জোড়।

অরবিন্দ ভৌমিক একা নয়, তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। তিনি উল্টো দিকে চক্ষু বুজে। অরবিন্দ ভৌমিক বলল, মা, তুমি একটু এদিকে এসে বসো তো—ওনাকে একটু বসার।

একজন মাসিক পত্রিকা পাঠরত যুবকেব পাশে আমি এসে। তারপর পকেট থেকে টাকা পয়সা বার করে অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে। সামান্য খুচরো সাত পয়সার হিসেব মেলানো যায় না। সে বলল, ঠিক আছে।

আমি সেটা মানতে রাজি নই। ভিখিরিটিকে দশ পয়সা না দিলে ঠিকই হিসেব মিলে যেত—একথা অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে। সে-কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, কাল সকালে।

—আপনি আচ্ছা লোক তো—মোটে সাতটা পয়সা।

সাতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলেই একটা দেশলাই কেনা যায়। আমি পকেট

থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই ফের হাত সরিয়ে। ওর মায়ের সামনে।

কিন্তু ওর মায়ের সামনে কি আমি সিগারেট খেতে পারি? মনস্থির করতে পারি না। বৃদ্ধা যখন সরু চোখে আমারই হাতের দিকে। আমি ম্যাজিসিয়ানের কায়দায় সিগারেট দেশলাই লুকিয়ে। একটা অস্বস্তি।

আমার পাশের যুবকটি অন্যমনস্কভাবে ফস করে সিগারেট জ্বালিয়েই ধোঁয়া ছাড়ল সোজা সামনে। এর কোনো বাধা নেই। এ তো অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধুর টিকিটে যাচ্ছে না!

এবার কামরাটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে। আমাদের কিউবিকলে ছ'জন মানুষের মধ্যে বাকি দু'জন: একজন বছর তিরিশেক বয়েসের বউ ও একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ফ্রক পরা মেয়ে। এদের আমি আগেই দেখেছি, কিন্তু সরাসরি চোখের দিকে তাকাইনি। এখন আমরা সহযাত্রী, এখন কোনো বাধা নেই।

—আপনি ডেহরি-অন-শোনে কোথায় যাবেন?

এর উত্তর আমি একটু আগেই ভেবে ঠিক করে। আলগাভাবে বললাম, ওখান থেকে আবার ট্রেন বদলাবো।

—কোনদিকে? ডাল্টনগঞ্জের দিকে?

যেন ঐ সব অঞ্চল আমার কতই চেনা, এই ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ি। তারপর ব্যস্তভাবে বলি, একটু আসছি।

অরবিন্দ ভৌমিক আমার বন্ধু নয়, আমার অভিভাবক নয়, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তবু যেন কেন আমার একটু কৃতজ্ঞ ভাব। একটা টিকিট দিয়েছে বলে? টিকিটটা ওর নষ্ট হতোই। কিন্তু, প্ল্যাটফর্মের অত ভিড়ের মধ্যে শুধু আমাকেই নির্বাচন।

অকারণেই একবার বাথরুমের দিকে ঘুরে ফিরে। অন্যান্য কিউবিকলের যাত্রীরা এরই মধ্যে বিছানাপত্র গোছাতে ব্যস্ত, মাত্র আটটা বেজে পনেরো কুড়ি। অনেকে খাবারের কৌটো খুলে। চারজন যুবক তাস খেলায়। সমস্ত কামরাটা ঘুরে এসে আমি একটি কালো সিল্কের বোরখা পরা, ইদানীং মুখটুকু খোলা, মুসলমান রমণীকেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আখ্যা দিই। আমাদের জায়গাটা থেকে সে অনেকটা দূরে। ভোরবেলা উঠেই এঁর মুখদর্শন করতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতেই মনে পড়ল, সারা রাত কি এই জন্য আমাকে বার বার উঠে আসতে হবে? সিগারেট ছাড়া তো আমি বেশিক্ষণ। তা ছাড়া এত হাওয়ায় সিগারেট ঠিক জমে না।

চাঁদের হালকা ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে। অসুন্দর শহরতলিও এখন একটু

একটু রহস্যময়। বিশেষত খাল বা পুকুরের জল যখন অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে ওঠে। জলের প্রতি আমার বড়ো বেশি টান। অচেনা জল দেখলেই ভালোবাসতে। হঠাৎ বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শৈশব।

মনে হয়, জলের ওপাশে ঐ যে প্রান্তর, যেখানে অন্ধকার আরো গাঢ়, সেখানে একটা গোপন সুড়ঙ্গ হয়তো। তার ওপাশেই স্বর্গ। এসব ছেলেবেলার কথা। পকেটে সব সময় একটা গুলিসুতোর ডিম থাকত, যদি কখনো সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়—

ফিরে এসে দেখলাম, সকলে বিছানা পেতে ঠিকঠাক। মাসিক পত্রিকা হাতে যুবকটি বলল, আপনি বসবেন তো বসুন না—

তাহলে ওদের বিছানার ওপরেই বসতে হয়। বিছানাটি বধূটির। ইংরেজ-ভদ্রতার সঙ্গে বলি, না, না, আমি ওপরেই।

একদম নিচের দুটি বাঙ্কে মহিলা ও বৃদ্ধা। মাঝখানের দুটিতে কিশোরী ও মাসিক পত্রিকা। আমার ওপাশে অরবিন্দ ভৌমিক।

চটি খুলে ওপরে আগে রেখে তারপর কসরৎ করে ওঠা। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তেই অরবিন্দ ভৌমিক বলল, আপনি বিছানা আনেননি?

আমি আরো কী কী আনিনি তার একটি তালিকা তক্ষুনি শুনিয়ে দেওয়া উচিত। তার বদলে একটু সাদামাটা হাসির সঙ্গে জানালাম, না, দরকার হয় না।

—আমার সঙ্গে একটা এক্সট্রা বালিশ আর চাদর আছে।

অনেক মানুষই বোঝে না যে অপরের কাছ থেকে কোনোরকম দয়া বা সাহায্য নেওয়া কারুর কারুব পক্ষে কি রকম অস্বস্তিকর। আমি আপন মনে থাকতেই বেশি।

—না। সত্যিই কোনো দরকার নেই।

—আবে নিন না। শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন?

নিতেই হলো। অপরের চাদর ও বালিশে কি রকম যেন অন্য লোক অন্য লোক গন্ধ। যদিও হোটেল কিংবা ডাকবাংলোতে একথা মনে হয় না। ধন্যবাদ বলার বদলে আমার মুখটা আড়ষ্ট হয়ে। ঝোলা থেকে একটা বই বার করে।

একটা দেশলাইয়ের বাক্স খালি হয়ে গেছে। সেটা অ্যাশট্রে হিসেবে। এখানে সিগারেট ধরাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবার বেশ আরাম বোধ। ট্রেনে শুয়ে শুয়ে যাওয়া কী সৌভাগ্য। এখানে প্রত্যেকের জন্য প্রমাণ মাপের শোওয়ার জায়গা। অতিরিক্ত মাত্র সাড়ে চার টাকা। অন্য কামরাগুলোতে বহুলোক দাঁড়িয়ে। অনেকে দু'পায়ের উপর সমান ভার রাখতেও পারেনি।

কোনো নতুন জায়গায় যাওয়ার আগেই সেই জায়গাটা কল্পনায় দেখে নেওয়া

আমার অভ্যেস। ডেহরি-অন-শোন জায়গাটা কেমন? স্টেশনের ওপর দিয়ে অনেকবার গেছি কিন্তু কোনো বারই। এখন কেনই বা আমি যাচ্ছি সেখানে। যাই হোক, জায়গাটা কী রকম? স্টেশনের পাশেই একটা বিশাল গুলমোহর গাছ। ব্রীজের গা দিয়ে নদীতে নামার জন্য সিমেন্টের সিঁড়ি। তার মধ্যে একটা সিঁড়ি মারাত্মক রকম ভাঙা। সিঁড়িতে সামান্য রক্তের দাগ। আমি স্পষ্ট দেখতে। শুকনো রক্ত। একদল ছেলে দুপদাপ করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জানতে হবে তো রক্তের ছোপটা কিসের।

কিশোরী মেয়েটি এর মধ্যে ঘুমিয়ে। অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে গেলে আমাকে ওরই দিকে তাকাতে।

একটা ব্যাপারে খটকা লাগে। অরবিন্দ ভৌমিক যাচ্ছে তার মায়ের সঙ্গে, আর এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। কি রকম যেন অদ্ভুত কম্বিনেশন। মাসিক পত্রিকা-পড়া যুবকটির সঙ্গে বিবাহিতা মহিলা ও কিশোরীটির সম্পর্ক কি? মহিলাটি ও যুবকটি ভাই বোন? এরা এত কম কথা বলে কেন। কিশোরী মেয়েটি, বিশেষত, কি দারুণ গম্ভীর। ট্রেন যাত্রার চাঞ্চল্য পর্যন্ত নেই। এই বয়েসের সকলেই তো। হোক না অচেনা, তবু ঠিকঠাক সম্পর্ক না মিললে মনটা কীরকম যেন অপ্রসন্ন হয়ে।

কি একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। তুমুল হৈহৈ। বহুলোক জোর করে কামরায়। শুয়ে-থাকা মানুষগুলো চিৎকার করে উঠল, দরজা দরজা। কেউ নিজে থেকে উঠছে না। কামরা প্রায় ভরে গেছে বাইরের লোকে। তখন শুয়ে থাকা মানুষের হুকুম, এই নিকালো, নিকালো, দেখতা নেই হ্যায়, রিজার্ভ কম্পার্ট—

—কে দরজা খুলেছে কে? দরজাটাও বন্ধ করে রাখা হয়নি? অ্যা?

আমি চোরের মতন গুটিশুটি মেরে চুপচাপ। শেষবার আমিই সিগারেট খাবার সময় দরজা খোলা রেখে। কেউ কি টের পেয়েছে যে আমিই?

অনেকক্ষণ ধরে চ্যাচামেচি ও হল্লা। যারা উঠে এসেছে তারা কেউ নামবে না। তাদেরও তো যেতেই। কন্ডাকটর গার্ড উধাও। বচসা চলতে চলতেই ট্রেন হঠাৎ ছেড়ে। তখন আদি যাত্রীরা যে-যার নিজের বাঙ্কে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়, যাতে আর একটুও জায়গা না থাকে, আর কেউ সেখানে বসতে।

ফর্সা জামাকাপড় পরা নবাগতরা দাঁড়িয়েই থাকে, তাদের মুখমণ্ডলে অভিমান ও রাগ। অন্যরা মেঝেতেই। আমার ঠিক চোখের নিচেই এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি, এদের কাপড় যদিও অত্যন্ত পরিষ্কার, তবু এরা মেঝেতেই এবং মুখে কোনো অভিমান নেই। দুটি পুঁটলির ওপর ওরা দু'জন। ওদের মুখের দিকে

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে। যেন বিহ্বলতার সমুদ্র থেকে এই মাত্র স্নান করে এসেছে।

অরবিন্দ ভৌমিক মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ঘুমের দফা গয়া। মালপত্তরের ওপর নজর রাখতে হবে, বুঝলেন! কত চোর ছ্যাঁচোড় আছে এর মধ্যে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস।

কিশোরী মেয়েটি এখন জেগে। সম্পূর্ণ খোলা চোখ, তার ঠোঁটে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব। এই বয়েসে হয়। এত হৈচৈ-এর মধ্যেও ও একটিও কথা বলেনি।

মেয়েটির নাম কি ?

আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই স্বল্পবাক কিশোরীটির একটি নাম না দিলে, এর চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। হলুদ রঙের স্কার্টের বদলে যদি ও শালোয়ার কামিজ পরে থাকত, তা হলে আমি যেমন ওকে অগ্রাহ্য।

বার বার ওর দিকেই আমার চোখ। শুধু ওর রূপের জন্যই নয়। ওর নীরবতা। এই বয়েসের সব মেয়েরই শরীরে একটা হঠাৎ-আসা লাবণ্য বড়ো উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর রূপ তার চেয়েও কিছু বেশি। কিন্তু এই বয়েসটা তো উচ্ছলতারও। ও কেন এত চুপ ?

চোখ বুজে মেয়েটির একটা নাম বসাবার চেষ্টা করছি এমন সময় কান্নার শব্দ। চমকে নিচের দিকে। প্রথমে বুঝতে পারি না। কে ? কোন দিকে ? তারপর শব্দ অনুসরণ করে। কিশোরী মেয়েটিই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মধ্যের যুবকটি হাত বাড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, রমু, কি হয়েছে ?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামিয়ে দেয়। যুবকটি আবার বলে, এই রমু, কি হয়েছে ?

বুঝতে পারি সমস্ত কামরা উৎকর্ণ হয়ে আছে মেয়েটির উত্তর শোনার জন্য। একতলার বধূটিও উঠে দাঁড়িয়ে।

অতি ব্যস্ততায় আমার এক পাটি চটি পড়ে গেল নিচে। সাঁওতাল যুবকটির গায়ের ওপরে।

সাঁওতাল যুবকটি তার সুন্দর বড়ো চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। তাতে বিস্ময় কিংবা বিরক্তি আছে বোঝা যায় না।

আমি মরমে মরে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বলি, ভাই, কিছু মনে করো না।

চটিটা আমার হাতের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে ওর গায়েই। ছি ছি। এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য আমি সেই মুহূর্তে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিতে পারি না।

আমি নিচে নামবার আগেই সাঁওতাল যুবকটি আমার চটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এতে আমি আরো বেশি লজ্জিত বোধ। অপরের জুতো হাতে নেওয়া মোটেই সুচারু ব্যাপার নয়। কেন ও আমার জুতো। আমি ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলি, ভাই, কিছু মনে করোনি তো!

এ কথার কি উত্তর দিতে হয় সে জানে না। এ সব ভদ্রলোকি ভাষা। যেমন আমি ওকে 'তুমি' সম্বোধন করছি। কাল সকাল থেকে আমি ওকে আপনি।

ঠিক। অনেক কিছুই কাল থেকে শুরু করব, এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার বহুদিনের দুর্বলতা।

আমার নিচের বাঙ্কের যুবকটি ওকে একটু ঠ্যালা মেরে বলল, এই, একটু হঠে যাও তো।

তারপর কিশোরী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, এই রমু, তোর কি হয়েছে? বল না কি হয়েছে?

মেয়েটি কান্না থামিয়ে এখন নীরব। অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে ভয় বা দুঃখ পেয়ে এ রকম কান্না। কিন্তু মেয়েটি তো জেগেই। এক মিনিট আগেই দেখেছি। ওর খোলা চোখ। ওর এখনকার নীরবতাই আরো বেশি কৌতূহল উদ্দীপক।

—রমু, কাঁদছিস কেন?

মেয়েটি এবার বলল, কিছু না। তারপর সে অন্যদিকে মুখ। এই সময় ট্রেন একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে যায়, বিরাট শব্দ। যেন সমস্ত লৌহসভ্যতার তারস্বরে চীৎকার।

—তোর পেট ব্যথা করছে?

—না

—তাহলে কাঁদছিস কেন?

একতলার বাঙ্কের মহিলাটি উঠে এসে শান্ত হুকুমের স্বরে বললেন, কি হয়েছে আমাকে বল তো।

—কিছুই হয়নি বলছি তো!

—আমার দিকে মুখ ফেরা।

কিশোরী মেয়েটি মুখ ফেরাল। তখনো তার চোখের দু'পাশে অশ্রুরেখা। আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে। এই চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটির কি এমন দুঃখ, যাতে রাত্রে ট্রেনের কামরায় একা একা সে কেঁদে ওঠে। মনে হয়, এই দুঃখের অতলতা আমি ছুঁতে পারব না। আমি সতর্ক হয়ে রুমাল। অন্য কারুর কান্না দেখলে হঠাৎ আমারও চোখে।

অরবিন্দ ভৌমিক বলল, যদি পেট-টেট ব্যথা করে...আমার কাছে ওষুধ আছে।

দেখা যাচ্ছে অন্যদের সাহায্য করার জন্য এর কাছে অনেক কিছুই মজুত। অবশ্য ওর কথায় কেউই ভ্রূক্ষেপ। মহিলাটি মৃদু ধমকের সুরে মেয়েটিকে বললেন, ছিঃ, এরকম কোরো না!

যুবকটি ও মহিলাটি দু'জনেই গম্ভীর। খুব একটা ব্যস্ততা বা উদ্বেগের চিহ্ন তো। ভেবেছিলাম ওঁরা মেয়েটির হঠাৎ কেঁদে ওঠার কারণ জানার জন্য। কিন্তু এখন মহিলাটি বললেন, কেঁদে কী হবে? ওরকম ভাবে কাঁদতে নেই!

মেয়েটি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। তারপর বলল, ঠিক আছে, তোমরা শোও।

মহিলাটি চলে গেলেন নিজের বিছানায়। যুবকটি তখনো দাঁড়িয়ে। সমস্ত কামরার লোক যে ওদেরই দিকে তাকিয়ে আছে, এটা জেনে সে একটু বিব্রত। ফস করে একটা সিগারেট জ্বেলে সে বলল, রমু, ঘুমিয়ে পড়—

যেন ঘুমটা কারুর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। তার গাম্ভীর্য ও কান্না, এই দুটি মিলিয়েই এই কিশোরী মেয়েটিকে বেশ খানিকটা উঁচু করে।

অরবিন্দ ভৌমিকের নাক সশব্দে। কামরায় হুড়হুড় করে অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়ায় ও বলেছিল, চোর ছ্যাঁচোড় থাকতে পারে। সারা রাত জেগে নজর রাখতে হবে।

কিশোরী মেয়েটি চিত হয়ে শুয়ে। হাত দুটি আড়াআড়ি করে চোখের ওপরে। কান্না লুকোবার জন্য কিংবা আলো আড়াল করার জন্য, কে জানে। আমি ওর পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে তন্ন তন্ন করে। পায়ের নখে রক্তকুঙ্কুম। পরিচ্ছন্ন গোড়ালি। হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তার সুডৌল পায়ের গোছ দেখে সাহেবরা প্রশংসা করত। হলুদ রঙের স্কার্ট। কোমরে একটা বেল্টের মতন স্ট্র্যাপ থাকায় কোমরটি যথেষ্ট সরু দেখায়। তার বুকের স্বাস্থ্য ভালো। তার গলা দেখলে টিনকাটা মাখনের কথা মনে আসবেই। ধারালো চিবুকে খানিকটা জেদী ভাব। ঠোঁটে যেন লেগে আছে অভিমান। কিংবা ওটা আমার কল্পনা। রমু। ওর পুরো নাম কি? রমা কিংবা রমলা নাম তো ওকে মানায় না। দেখলেই বোঝা যায়, ও এখনো ঘুমোয়নি। কি ওর দুঃখ?

পাশের কিউবিকলে কিসের যেন বাগবিতণ্ডা। উৎকর্ণ হই। নতুন কিছু না, জায়গা দখলের লড়াই। আমাদের এদিকে নিচের দুটি বাঙ্কেই স্ত্রীলোক বলে কেউ জোর করে বসতে আসেনি। অন্য জায়গায় ছাড়বে কেন? এদিকের মেঝেতে

সাঁওতাল দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে এখন সবাই মোটামুটি মালপত্রের ওপর একটা না একটা বসার জায়গা।

পুটলি থেকে খাবার বার করে সাঁওতাল দম্পতি এখন ডিনার সেরে নিচ্ছে। কয়েকটা লাড্ডু। ইঁটের মতন শক্ত চেহারা। সেগুলো দাঁত দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে খুব নিম্ন স্বরে কথা। আগে লক্ষ্য করিনি, মেয়েটি গর্ভবতী। তাই ওর চোখে মুখে এত অলস লাবণ্য। আমি লোভীর মতন ওদের খাওয়া। আমার খিদে পায়নি, শুধু দেখতে ভালো লাগছে এমন! পরের জন্মে আমি সাঁওতাল হবো। এই রকম গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় মেঝেতে বসে লাড্ডু খাব।

ট্রেনে আমার সহজে ঘুম আসে না। যদি জানলার কাছে বসার জায়গা একটা! অন্য সবাই এখন ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আর একবার কিশোরীটির দিকে। কি জানি বোঝা যায় না। নিশ্বাসের স্পন্দনে তার বুক উঠছে নামছে না। কি সুন্দর এই বয়েস, যেন সবেমাত্র ভোর হলো। ভোরবেলার মতন একটি কিশোরী পা ফেলে আসছে যৌবনের দিকে। একমাত্র তাকেই মানায়, আমি বললুম সুন্দর, তাই এ পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠল। তবু সে একা আপন মনে কেঁদে ওঠে কেন? আর কিছু না, তার ঐ রহস্যটার জন্যেই তার খুব কাছাকাছি যেতে।

খুব সাবধানে বাঙ্ক থেকে নিচে। চটি জোড়াটা হাতে। আমি চলে এলাম বাথরুমের দিকে। এখানে মেঝেতে অনেক লোকজন বসে আছে। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে বাথরুমে যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার।

একটু বিরক্তভাবে আমি বললাম, অন্য কোনো কামরায় আর জায়গা নেই?

একজন বিদ্রূপের সুরে বলল, তাহলে আর এখানে এসেছি কেন, এখানে কি বেশি মধু আছে। আপনি শোওয়ার জায়গা পেয়েছেন, শুয়ে থাকুন না।

শুধু শুধু এদের কাছে ধমক। কী দরকার ছিল আমার মাথা ঘামাবার। সত্যিই তো অন্য কামরায় জায়গা থাকলে কেনই বা এখানকার মেঝেতে। আমরা অনেক সময় জেনেশুনেও এরকম অবাস্তব প্রশ্ন।

আমি বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই আর একজন বলল, ভেতরে লোক আছে।

অগত্যা একটা সিগারেট। আমার বিদ্রূপকারীই ফস করে হাত বাড়িয়ে বলল, একটু আগুনটা।

লিকলিকে চেহারার একটি ছেলে। এই রকম রোগা লোকরা বেশির ভাগ সময়ে রেগে থাকে। শারীরিক শক্তির অভাবটা কণ্ঠস্বর দিয়ে।

—কত দূর যাবেন?

—আর দুটো স্টেশন। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আমি উৎসুকভাবে তাকাই। লিকলিকে ছেলেটি সিগারেটটা গাঁজার কল্কির স্টাইলে ধরেছে আঙুলের ফাঁকে। কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট। প্রশ্ন করল, আপনি কি রাজবল্লভপাড়ায় থাকেন?

—না তো।

—আপনার দাদা এরিয়ান্স ক্লাবে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলে না?

—না, আপনি ভুল করেছেন।

—কিন্তু আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি। খুব চেনা চেনা লাগছে।

ছেলেটির দুটি তথ্যই সম্পূর্ণ ভুল। আমাকে ও অন্য কারুর সঙ্গে। এরকম আমার প্রায়ই হয়। আমার চেহারা এতই সাধারণ যে অনেকেই ভাবে, আগে কোথাও।

তখন মনে পড়ল, আমি অশেষ মজুমদারের টিকিটে। ইচ্ছে হলো এই কৌতূহলী ছেলেটিকে বলি, আমার নাম অশেষ মজুমদার, আমি খুব সম্ভবত আজ সকালেই বেলেঘাটায় নিহত হয়েছি!

এই কৌতুক আমি নিজেই মনে মনে উপভোগ। ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে আমি ওকে জানাই, আমার কোনো দাদা নেই। রাজবল্লভপাড়ার নাম শুনেছি বটে, কখনো যাইনি। আপনি আমাকে দেখে থাকতে পারেন।

—কোথায় বলুন তো, কোথায় বলুন তো—

—কার্জন পার্কে। ওখানে আমি ম্যাজিক দেখাই।

ছেলেটি সন্দেহভরা চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে। তারপর বলে, ট্রেন লেট করবে মনে হচ্ছে।

বাথরুমের দরজা এই সময় খোলে।

ফিরে এসে আমি আবার আমার বাঙ্কে। বইটা খুললাম। তারপরেই তাকালাম পাশে। কিশোরী মেয়েটি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। চোখ দুটি খোলা। সেখানে নিঃশব্দে অশ্রু। আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করি। কেন একটি মেয়ে একা একা শুয়ে কাঁদবে? ওর সঙ্গের পুরুষ ও মহিলাটি এখন ঘুমন্ত। আমি ওর অচেনা, আমি তো ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। যদি আর একটু ছোট হতো, যদি খুকি বলে সম্বোধন করা যেত। কিন্তু এখন ওর বিপজ্জনক বয়েস, অচেনা লোকের বেশি কৌতূহল কেউ সুনজরে দেখে না।

মেয়েটি পাশ ফিরল। মনে হয় ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে। কান্না চেপে রাখার চেষ্টায়। কিংবা এটা আমার দেখার ভুল। কাঁপছে না। কেউ যদি স্নেহময় হাত ওর মাথায় বুলিয়ে এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে।

আমি কতদিন কাঁদিনি। বই পড়তে পড়তে কিংবা সিনেমা দেখার সময় প্রায়ই

আমার চোখে জল আসে। সে অন্য। নিজের কোনো দুঃখে? মনে পড়ে না।

বইটা চোখের সামনে মেলা, আমি পড়ছি না। আমার সমস্ত কৌতূহল ঐ মেয়েটির দিকে। ও এখন আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমার ঐ রকম বয়েসে, সদ্য স্কুল থেকে কলেজে, তখন আমি ম্যাজিসিয়ান হবার স্বপ্ন! ম্যাজিসিয়ান হয়ে দেশ-বিদেশে। পি সি সরকারের বই নিয়ে হিপনটিজম। যাদুসম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী ভোরবেলা ছাদে উঠে দূরের সবুজ গাছপালার দিকে একদৃষ্টে। ওতে চোখের জোর বাড়ে। শ্রেণীবদ্ধ নারকেল গাছগুলির পাশেই যে বাড়ি তার ছাদে একটি মেয়ে হাতে একখানি বই নিয়ে গোল হয়ে ঘুরত। ভোরবেলা ঘুরে ঘুরে পড়া মুখস্থ করার অভ্যেস ছিল তার। এবং আসলে সে-ই জানত ম্যাজিক। অবিলম্বে সে আমাকে তার পোষা কুকুর বানিয়ে।

এর চার পাঁচ বছর বাদে নন্দিতা যখন সুশোভনকে বিয়ে করতে চায়, এবং আমাকে জানায়, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি দাতা কর্ণের চেয়ে বড়ো। আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি, এমনকি আমার প্রেমিকাকেও। একদিন মাত্র আমি কথার ছলে সুশোভনের সামান্য নিন্দে করেই অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করে। আমি এত নিচে নামতে পারি না। পৃথিবীতে আর যাকেই হোক, সুশোভনকে কোনোদিন নিন্দে করার অধিকার আমার নেই। সে আমার প্রেমিকার স্বামী। সে চিরকালের সম্মান পাবে।

ট্রেন কোনো একটা স্টেশনে যেন। অস্পষ্ট শব্দ। ট্রেন কি অনেকক্ষণ থেমে আছে? এখন কত রাত? না, আবার চলছে...

নন্দিতার বিশেষ সাধ ছিল কোনো একদিন আমার সঙ্গে প্যারিসের রাস্তায়। তারপর যখন ও নিজেই যায় আমি তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়...একদিন একটা সাপ...

তন্দ্রার মতো এসেছিল। মনে হয় যেন এক মুহূর্ত আগে চোখ বুজেছি, আসলে বেশ কিছুক্ষণ। বইটা পাশে ঝুলছে, আর একটু হলেই। বইটা তুলতে গিয়ে চোখ পড়ল। মেয়েটি তার জায়গায় নেই। কোথায় গেল? রাত প্রায় দুটো। আমি ওর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। শূন্য বাঙ্কটার দিকে চোখ। সারা কামরা ঘুমন্ত। আমারও আবার ঘুম-ঘুম আসছিল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে না এলে। এটা যেন আমারই দায়িত্ব।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই। এতক্ষণ কি করছে ও? বাথরুমের দরজা বন্ধ? এত রাত্রে ও যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি বাধা দেবার কে?

আমি আবার ঘুমোবার। চোখ বুজলেই একটা হালকা লাল রঙের আভা। চোখের ওপরেই আলো। পাশ ফিরলাম। এবারে বেশ মনোমতন অন্ধকার। যেন

একটা ঘন জঙ্গল। প্রত্যেকদিন এই জঙ্গলটাকে দেখি। একদিন আমি ওখানে। হঠাৎ মনে হয় কোনো একটা জরুরি জিনিস বোধ হয় বাড়িতে ফেলে। কি? টাকা, টুথব্রাশ, একটা ডটপেন, পাজামা, তোয়ালে—আর কি লাগতে পারে? আগামীকাল কি কারুর সঙ্গে দেখা করার। কিছু যেন একটা ভুল হয়ে। পেছনে, কলকাতায় ফেলে এসেছি কোনো ভুল। কাল সকালে যদি মনে পড়ে, তখন অন্তত আড়াইশো মাইল।

মাস তিনেক আগে, যখন আসামে গিয়েছিলাম, শিলচর থেকে ডিমাপুর যাবার পথে, কি যেন স্টেশনের নামটা, কি যেন, ওরাং...না না, ডিগ্রুভ...না না, লালডেঙ্গা... না না, মনে পড়েছে, হারাংগাজাও, কি চমৎকার নাম, যেন আমার পূর্বজন্মের জন্মস্থান, সেখানে, যেন, সেখানে একজন খুনে ডাকাত, হাতে হাতকড়া, আমাকে বলেছিল, আমাকে, পাশেই দাঁড়ানো দুটি পাহাড়ী তরুণী, তারা...

ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। সত্যিই ঘুমিয়ে। এরকম উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি পাশ ফিবে দেখলাম, ওদিকের দ্বিতীয় বাঙ্কটা তখনো ফাঁকা। মেয়েটি গেল কোথায়? এতক্ষণ।

খুব ব্যস্ত হয়ে আমি নেমে। ওর সঙ্গী যুবক ও মহিলাটি নিশ্চিন্ত ঘুমে। আমি প্রথমেই যাচ্ছিলাম বাথরুমের দিকে। তার দরজাটা খোলা। ঢকাস ঢকাস শব্দ হচ্ছে, তবু আমি একবার তার ভেতরে উঁকি।

মেঝেতে অনেক লোক বসেছিল, এখন একজনও নেই। মাঝখানের কোন স্টেশনে নিশ্চয়ই সবাই। খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, হ্যান্ডেল ধরে, বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে।

আমি থমকে একটু দূরে। মেয়েটি যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে চায়, তা হলে আমার আপত্তি করার কি আছে? বিশেষত অচেনা মেয়ে। কিন্তু যে মেয়েটি খানিকক্ষণ আগে একা একা কাঁদছিল, সে যদি চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজায়। আমি মনস্থির করতে পারি না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়ালে বিপদের স্পর্শ আছে, গুরুজনরা বকে, কিন্তু ঐ বয়েসে আমিও।

একটু দূরে আমি বিসদৃশ। অন্য সবাই ঘুমিয়ে, আমি একটি কিশোরী মেয়ের কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি। খুব সহজভাবে যদি ওর সঙ্গে ভাব করা যায়, সেটাই খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমি কখনো সহজ হতে পারি না।

হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটি বুঝি আরও ঝুঁকছে সামনের দিকে। হ্যান্ডেল ছেড়ে দেবে। আমি দৌড়ে এসে।

এই রকম সময়ে বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কম্পন হয়। বাতাস লাফিয়ে

ওঠে, তোলপাড় শুরু হয়, যেন এক্ষুনি দম বন্ধ। আমি পৌঁছোবার আগেই যদি মেয়েটি—

দরজা থেকে সে অনেকটা ঝুঁকে ছিল, আমি দ্রুত এসে তার একটা হাত। সে বোধহয় টের পায়নি আমার উপস্থিতি আগে। তবু কোনো চমক ফোটেনি তার চোখে। সে তার নীরব মুখ আমার দিকে।

আমি ব্যস্তভাবে বলি, কি হচ্ছে কি?

মেয়েটি বলল, কি?

—এখানে,...দরজার সামনে...এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—এমনিই ...কেন?

হয়তো সবটাই আমার ভুল। অতিরিক্ত কল্পনা। অন্যের জীবনের যে-কোনো ঘটনাই আমি নাটকীয়ভাবে দেখতে। নাটকীয় শব্দটা স্বাভাবিক নয় এই অর্থেই কেন যে আমরা। অথচ কত নাটক জীবনের মতনই স্বাভাবিক।

মেয়েটির বদলে আমিই লজ্জা। আত্মহত্যায় উদ্যত একটি কিশোরীকে হঠাৎ রক্ষা করায় আমার গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু যদি আত্মহত্যার কোনো চিন্তাই ওর মনে না এসে থাকে, এমনিই দরজার কাছে।

আমার লজ্জাকে আমি ঈষৎ দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে বলি, এত রাত্রে দরজার কাছে, এই সময় দরজা খোলা রাখা।

—কেন, তাতে কি হয়েছে?

আমি আগেই তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সময় সে সম্পূর্ণ আমার দিকে ফেরে। তার ভুরুতে একটু রাগের চিহ্ন।

আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বললাম, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ভাবলাম।

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হলো, রাত দুপুরে কোনো কিশোরীর হাত ধরে এটা ক্ষমা চাইবার ভাষা নয়। এ অন্যরকম ভাষা। এক এক সময়, আমি যে ভালো, এটা প্রমাণ করাই কত যে শক্ত হয়ে ওঠে।

অগৌণে নিজেকে শুধরে নিয়ে আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম, দরজা খোলা দেখে আমি তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল, আমার ঘুম আসছিল না, খুব গরম।

—তবু এখানে এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—হঠাৎ ঝাকুনিতে অনেক সময় বিপদ হয়। আমি তোমার জন্য ভয়...

—আমার জন্য? কিসের ভয়? আপনি কেন আমার জন্য ভয় পাবেন?

—বাঃ, এ রকম অবস্থায় যে-কেউ...সত্যিই তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম,

তুমি এতখানি ঝুঁকে...

—আমার কিছু হবে না। তা ছাড়া আমি মরে গেলেই বা কার কি আসে যায়!

কৈশোরের এই অভিমান কি অপূর্ব সুশ্রী। একমাত্র এই বয়েসটাই পারে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে তোমার বন্ধু করে নেবে? আমাকে তোমার গোপন কথা?

কিন্তু প্রকাশ্যে অচেনা কারুকে এরকমভাবে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

যেন সে নাম জানাতে চায় না, এই রকম মুখের ভঙ্গি! একটু ইতস্তত। তারপর বাইরেব দিকে মুখ ফিবিয়ে, যেন হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, অনুরাধা বসুমল্লিক।

ওর ডাকনাম রমু শুনে আমি ভেবেছিলাম, ওর নাম রমলা বা রমা এই ধরনেব। সব সময় এই অনুমান খাটে না। তবে, অনুরাধা নামটিও ওকে মানায় নি। অনুরাধা নামে যে আর দুটি মেয়েকে আমি চিনি, তারা বেশ নরম ও শান্ত। তারা মাঝরাতে একা ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াবে না।

—তুমি এবার শুতে যাও।

—যাচ্ছি।

সত্যিই সে যখন ফিরে যেতে লাগল তার বাঙ্কের দিকে, তখন আমি বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাক একটা কথা...তুমি কাদছিলে কেন।

মেয়েটি স্থির হয়ে দাড়াল। সোজাসুজি তাকাল আমার মুখের দিকে। অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় সেই বালিকা তেজের সঙ্গে বলল, আমি বলব না। কেন সবাই জানতে চায়?

আমি আমার প্রাপ্য পেয়েছি। অন্যায্য কৌতূহলের জন্য। মেয়েটির চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো হয়েও আমি অপবাধীর মতন নতমস্তকে।

সে তবু দাড়িয়েই রইল। যেন আমাকে আরো শাস্তি। হ্যা, আরো শাস্তি আমার প্রাপ্য। আমি একজনের পবিত্র গোপনকে উচ্ছিষ্ট করতে। অন্য কেউ যদি এরকমভাবে আমার। অবশ্য কান্না অনেক প্রশ্ন আনে। আনবেই।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে, যেন আমার ওপরে দয়া করেই বলল, আমার খুব চেনা একজন পরশুদিন মারা গেছে।

আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝাটির নাম গোপনীয়তা। একা একা তা বেশিক্ষণ বহন করা যে কত কষ্টেব। আমি চুপ করে।

—আজ তাকে পোড়াবার কথা। হয়তো এতক্ষণে—

তক্ষুনি সব ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। দুটি মাত্র কারণেই শুধু মৃত্যুর দু'দিন পর কারুকে পোড়াবার ব্যবস্থা হয়। আত্মহত্যা অথবা খুন। এ ক্ষেত্রে যে কোনটা, তাও বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরে দুঃখের সঙ্গে ক্রোধ মিশে থাকার জন্য। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। মেয়েটিকে ওর আত্মীয়স্বজন জোর করে দূরে কোথাও। এই জনাই সকলে এত গম্ভীর।

আমি বললাম, কে মেরেছে? পুলিশ?

—হ্যাঁ।

—ওর নাম কি?

—ওর নাম...না, বলব না, আপনি কে? কেন এইসব কথা জানতে চাইছেন? আপনার কি আসে যায়?

ডিটেকটিভ, স্কুলমাস্টার আর লেখক—এই তিনজনই মানুষের চরিত্র সব চেয়ে ভালো বোঝে, কে যেন বলেছিলেন এই কথা? স্কুলমাস্টাররা বছরের পর বছর এত শিশুকে বড়ো হয়ে উঠতে দেখে যে মানুষের মোটামুটি সবকটা টাইপ তার জানা। ডিটেকটিভ আর লেখকরা বেশি উঁকি দেয় মানুষের গোপন জীবনে। বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষে যে তফাত তা তাদের চোখে অনেকটা।

ট্রেনের গতি আগেই মন্থর হয়ে এসেছিল, এই সময় একটা আলো-ঝলমল প্ল্যাটফর্মে। অনুরাধা আর কোনো কথা না বলে ফিরে গেল বাঙ্কের দিকে। আমি দরজার কাছেই একটুক্ষণ।

স্টেশনটা প্রায় জনহীন। সব কটা আলো জ্বলছে, এর মধ্যে সব কিছুই ঘুমন্ত। আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। দূরের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে কেউ উঠছে বা নামছে। অনেক মালপত্র। যে দিকে তাকাও, মনে হবে জীবন কত স্বাভাবিক। মধ্যরাত্রির ট্রেন কোনো অখ্যাত স্টেশনে থামলে এরকমই দৃশ্য, প্ল্যাটফর্মে মানুষ ঘুমোয়, একটা কুকুর অনর্থক ছুটে যায়, কু-র-র-র করে বেজে উঠল গার্ডের হুইসল—সবই ঠিকঠাক। আর এই সময় কলকাতার শ্মশানে একজন কেউ পুড়ে ছাই হচ্ছে অসময়ে, যে চেয়েছিল কিছু বদলাতে, আর অনেক দূরে, ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি মেয়ের হঠাৎ হঠাৎ কান্না—কান্না তাকে বিশুদ্ধ করবে, না জীবনটাই বদলে দেবে এমন এক দিকে।

চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আমি দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ। সতর্কভাবে চারিদিকে দেখে নিই। কেউ জাগেনি। সাঁওতাল বধূটির মাথা হেলে পড়েছে তার স্বামীর কাঁধে। স্বামীটির মুখ ঘুমের মধ্যেও বেশ দায়িত্ববান।

মেয়েটি শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ। আমি তার বাঙ্কের কাছে দাঁড়ালাম।

খুব কাছে। যেন আমি একবার তার কপালে হাত। যদি সে মুখ ফেরাত, আমি তাকে আরো দু'একটি কথা। এরকমভাবে দাঁড়ানো মোটেই। অন্য কেউ দেখলে। কিন্তু অনুরাধা আমার উপস্থিতি টের পেলেও মুখ ফেরাচ্ছে না। আমি অগত্যা নিজের বাঙ্কে বেশ সশব্দেই। তবু ওর মুখ অন্যদিকে। ওর সঙ্গে আমার খুব চেনা হয়ে গেল আজ থেকে।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকালের আলো এসেছে জানলা দিয়ে। খুব গাঢ় আলো নয়, শহরে নিজের বাড়িতে শুয়ে থেকে এরকম সকাল আমি চোখে দেখি না।

অনুরাধা ও তার সঙ্গী দু'জন বিছানা গুটিয়ে পরিষ্কার। পরবর্তী স্টেশনের জন্য প্রস্তুত। আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়, আমিও ওদের সঙ্গে। মেয়েটির সম্পূর্ণ গোপনীয়তা হরণ করাব জন্য আমার ভেতরে একটা দুর্দমনীয় চোরের মতন। কেনই বা নামব না। আমি তো যেখানে খুশি।

কিন্তু মেয়েটি যদি ভাবে আমি ওকে অনুসরণ করে। ভাবে ভাবুক। অন্যেব সামান্য একটু ভাবনার জন্য আমি কি নিজের। এক কামরার লোক অনেক সময় কি একই স্টেশনে নামে না? তবে, মুশকিল হচ্ছে এই, আমি কাল অরবিন্দ ভৌমিককে বলেছিলাম ডেহরি-অন-শোনেই—। ওরাও শুনেছে নিশ্চয়ই।

অনুরাধা এখন নিচেব বাঙ্কে বধূটির পাশে বসে আছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা নেই। দিনের আলোতে বুঝতে পারি, সঙ্গের যুবক ও বধূটির মুখও খুব বিমর্ষ।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে আসে, তবু আমি মনস্থির কবতে না পেরে। অরবিন্দ ভৌমিকও জেগে উঠে মিটিমিটি তাকাল আমার দিকে। আমি এই স্টেশনে নামতে গেলেই নির্ঘাত চেঁচিয়ে নানা বকম প্রশ্ন। কেন যে কিছু না ভেবেচিন্তে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করতে!

গাড়ি একেবারে থামবার আগেই ওরা দরজার কাছে গিয়ে। থামল, দরজা খুলল, আরো কয়েকজনের সঙ্গে ওবাও প্ল্যাটফর্মে। ওদের আর আমি দেখতে পেলাম না। এই স্টেশনে বেশ চ্যাচামেচি। আমি ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লাম বাঙ্ক থেকে।

অরবিন্দ ভৌমিক অবধাবিতভাবে প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছেন?

—চা খেতে।

নিচে নেমে এসে ওদের আর কোথাও কোনোদিকেই। ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। এখনো আমি ইচ্ছে করলে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে এসে। ভিতরের দোলাচল কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। যাক, স্টেশনের নামটা জানা রইল, দু'একদিনের মধ্যেই আমি আবার।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে একটু শান্তি এল। বেশ ভালো চা। টাকা ভাঙিয়ে পরপর দু'ভাঁড়। তারপর কি মনে হলো, আরো এক ভাঁড় হাতে নিয়ে উঠে এলাম কামরায়, সেটা অরবিন্দ ভৌমিকের মুখের সামনে।

অরবিন্দ ভৌমিক বলল, একি, আপনি আবার কষ্ট করে আমার জন্য।

—আপনার মায়ের জন্য আনব কি?

—না, না, উনি বাইরে কিছু খান না।

আমি আবার নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। ইঞ্জিনে জল ভরছে। দেরি হবে। একটু পায়চারি করার জন্য পা বাড়াতেই। আমাদের কামরাতেই অন্য একটি জানলার পাশে সেই মুসলমান রমণী। কালো সিল্কের বোরখাটা এখন মুখ থেকে নামানো। আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা। কী অসম্ভব রূপ। ভোরবেলায় ফোটা শিশির-ধোওয়ায় কোনো সাদা ফুলের সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। কারণ, ফুলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি সুন্দর হতে পারে, তা আমি কয়েকবার। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, অন্তত এক যুগ এর কোনো অসুখ হয়নি।

নারীটিকে কয়েক পলক দেখে আমি সামনের দিকে পা চালিয়ে। আমার একটু একটু মনখারাপ। তখন বুঝতে পারি, কোনো কোনো সুন্দর জিনিস দেখলে কষ্ট হয়, কবিরা কেন একথা। এ এক অনির্বচনীয় কষ্ট, শিলিগুড়ি শহর থেকে জীবনে প্রথম তুষারমৌলি দেখে আমার অনেকটা এ রকম। পর্বতশৃঙ্গ কিংবা সমুদ্রের চেয়েও যে নারীর রূপ তুলনার অধিক পাওয়া যায়, কাপুরুষরা একথা স্বীকার করতে পারে না। আমার ইচ্ছে হয় প্রণাম জানাতে। আমি এই সুন্দরের অংশভাক।

পরক্ষণেই মনে মনে একটু অনুতাপ বোধ। আমার মন এত বিক্ষিপ্ত! একটু আগেই আমি একটি কিশোরীর দুঃখের জন্য, আর এখন আমি আবার নির্লজ্জভাবে অপর নারীর রূপ। অনুতাপ থেকে ক্রোধ জন্মায়। অনুরাধার কান্নার জন্য সমস্ত পৃথিবী দায়ী। এর শোধ তুলতে হবে। অনুরাধা, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার আমার।

এই স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন। এখনো ইচ্ছে করলে ব্যাগ নামিয়ে এনে। ছোট্ট শহরে হয়তো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে—কিন্তু ওর দুঃখের শোধ তোলার জন্য কি করতে পারি। শুধু লুকোবার জন্য আমি দশদিককে অন্ধ হতে বলি।

পুনরায় আমি গতি মেলাই ট্রেনের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে। ডেহরি-অন-শোন-এ এসে আমি বিনা আড়ম্বরে বিদায় নিই অরবিন্দ ভৌমিকের কাছ থেকে। তার সব রকম সাহায্যের আহ্বান আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান। আমার প্রথম কাজ নদীর ঘাটে। স্বপ্নটার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে।

সিঁড়ি একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ তন্ন তন্ন করে

খুঁজেও আমি কোনো রক্তের দাগ খুঁজে তো। অথচ, তন্দ্রার মধ্যে কেন দেখেছিলাম দু'তিনটি সিঁড়িতে লেগে আছে পুরোনো রক্তের ছোপ। কী এর মানে? দু'তিনবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেও। হয়তো অন্য কোনো রক্ত, আমার স্বপ্নের মধ্যে—স্বপ্ন অনেক রকম কোলাজ সৃষ্টি করে।

বিশাল সেতু, সেই তুলনায় নদীটি এখন একটু ছোট। আমি একেবারে ধারে নেমে গিয়ে নদীর জলেই চোখ মুখ। এমনভাবে কোনোদিন প্রক্ষালন করিনি। বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নানটাও সেরে নিলে। জামা-প্যান্ট খুলে ফেললাম, কেউ তো দেখবার নেই, ব্যাগ থেকে তোয়ালেটা বার করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একেবারে বেশি জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে। আরে বেশ স্রোতের টান আছে তো! দু'একবার হাত ছুঁড়ে সাঁতার কাটতেই জড়তা কাটে। সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে আর কেউ ভোলে না, প্রমাণিত হলো এবার। ব্যাপারটা পুরো ঠিক নয় যদিও। চাইবাসায় একটা সাইকেল পেয়ে, বছর দশেক অনভ্যাসের পরও অতি উৎসাহে চড়তে গিয়ে আমি প্রথমবার এক আছাড়।

কয়েকটা ডুব দিয়ে ঘাটের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি আমার ব্যাগ ও জামা কাপড়ের কাছে একটি ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে। ছেলেটিকে তো একটু আগেও দেখিনি, যেন অন্তরীক্ষ থেকে হঠাৎ টুপ করে। বেশ চতুর চোখ-মুখ। ছোঁড়াটা যদি আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পিঠটান দেয়, আমি কি সাঁতরে পারে গিয়ে দৌড়ে ওকে ধরতে? আমি জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় ভেজা গায়ে একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে ছুটছি এই দৃশ্য!

ছেলেটির দিকে চোখ রেখে আমি চিত ও ডুবে নানা রকম সাঁতারের কসরত দেখাই। তারপর পারের দিকে। সিঁড়িতে এসে বসার পর বেশ অবসন্ন লাগে। সাঁতার দুরন্ত ব্যায়াম। অনেকদিনের অনভ্যাস। যদিও আবার ইচ্ছে হয় জলে নামতে।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আমি জিজ্ঞেস করি, এই, তোর নাম কি?

সে আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকে। বাচ্চা ছেলেদের একটা ব্যাপার আছে, তারা কখন কোন কথায় উত্তর দেবে না দেবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর।

পরে মনে হলো, এটা বাংলায় প্রশ্ন করার জায়গা নয়। সুতরাং।

—কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা?

—ছোটেলাল।

—ঘর কাঁহা হ্যায়?

—নেহি হ্যায়।

—কেয়া, ঘর নেহি হ্যায়?

—নেহি হ্যায়।

অবাক হতে গিয়েও সামলে নিই। দেশের পঞ্চাশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই যে ঘর থাকে না, এ নতুন কথা? ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। ঠিকই ধরেছিলাম, ছেলেটা আমার ব্যাগটা চুরি করে পালাতেও।

—কাঁহা রহ্তা হ্যায়?

ছেলেটি রেলস্টেশনের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, উধার। বুঝলাম রেলস্টেশনের পরগাছা। প্রায় প্রত্যেক রেলস্টেশনেই কিছু কুকুর ও কিছু বেওয়ারিশ বাচ্চা থাকে।

জামা-প্যান্ট পরে নিতে নিতেই বেশ খিদে চনচন ক'রে। স্নান করলেই তৎক্ষণাৎ আমার এরকম খিদে। দিনের যে-কোনো সময়েই হোক।

ব্যাগ হাতড়ে দেখলাম, চিরুনি আনতে ভুলে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ছোটেলালজী, হিয়া খানা মিলতা হ্যায়?

—হাঁ, মিলতা।

—কাহা?

—বহুৎসা হোটাল হ্যায়।

আমার এই প্রশ্নগুলি অবান্তর। যে ছেলেটা নিজে রোজ খেতে পায় কিনা সন্দেহ, সেও হোটেলের খোঁজ রাখে। এবং আমি তাকে।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি তার মাথায় একটা আলতো চাঁটি মেরে জিজ্ঞেস করি, হিয়া পর কিঁউ আয়া?

সে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার মনে করে না। আমি তবু হিন্দী বলার উৎসাহে আবার বলি, তুমহারা পিতা মাতা কোই হ্যায়?

আমার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তার ইজেরটা খুলে ফেলে। কোমরে একটা ঘুনসি বাঁধা। তরতর করে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং জলের পোকার মতন সাঁতার কাটে। সে যে আমার চেয়ে অনেক ভালো সাঁতার জানে, এটা দেখানোই যেন তার। এক একবার ভুস করে মাথা তুলছে আর হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। প্রথম নজরে দেখেই বুঝেছিলাম, অতি পাজী ছেলে।

ওকে জব্দ করার একমাত্র উপায়, ওর দিকে নজর না-দেওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ওপারের দিকে। ছেলেটা চেঁচিয়ে কি যেন বলে। আমি শুনতে চাই না। ও যদি গালাগালও করে আমাকে, বিনা কারণেই, আমার সাধ্য নেই ওকে শাস্তি দেবার। হঠাৎ আমার সামনেই কি রকম অবলীলাক্রমে ইজেরটা!

হোটেল খুঁজে দু'খানা চাপাটি আর এক প্লেট পাঁঠার মাংস নিয়ে। মাংসটা

এমনই ঝাল আর মুখরোচক যে আর এক প্লেট না নিয়ে পারি না। সঙ্গে লেবুর আচার। জীবনে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর কি ? ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে করতে বেরিয়ে আসি বাইরে। সেখান থেকেই দেখা যায় ছেলেটা এখনো জলে দাপাদাপি। ওকে বকবার কেউ নেই। এত কম বয়েসের এমন স্বাধীন ছেলে আগে দেখিনি কখনো।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কয়েকটা নৈরাশ্যজনক খবর। শোন নদীর ধারে অপূর্ব সুন্দর ডাকবাংলোটিতে থাকবার জায়গা নেই। হোটেলগুলির চেহারা সুবিধের নয়, তাছাড়া হোটেলে থেকে বিলাসিতা করার মতন পয়সা।

ফিরে এসে রেলস্টেশনের বেঞ্চিতে। যে-কোনো দিকের ট্রেন এলেই। কুলির কাছ থেকে জানা গেল, ডাল্টনগঞ্জের দিকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনই সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে। ডাল্টনগঞ্জই বা খারাপ কী ? ওখানে পরিতোষ থাকে না ? ঠিকানা জানি না অবশ্য, তবে স্থানীয় বাঙালিদের কাছে।

ডাল্টনগঞ্জের মতো যোগারূঢ় নামের জায়গাগুলি চাক্ষুষ দেখার আগে কিছু বিস্ময় রেখে দেয়। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইওরোপের একটা টুকরো। সার সার ঢালু ছাদওয়ালা বাংলো।

পৌঁছে দেখলাম, সেসব কিছুই না। ধুলোয় ভরা রাস্তা, কুদৃশ্য বাড়ি, বিহারের সমতলভূমির যে-কোনো এলেবেলে শহরের মতন। এইসব শহরের চেয়ে শহরতলি অনেক সুন্দর হয়, যেখানে ভূমি স্পর্শ করে দিগন্ত, একটা অচেনা নামের ছোট নদী, মকাই ক্ষেতের পাশে মোষের পিঠে বালক, তন্বী রমণীর মাথায় সোনার মতন উজ্জ্বল পেতলের কলসি।

শহরের মধ্যে টায়ার সারাবার দোকান আর কচৌরি মিঠাই, ডাক্তারখানার শো-কেসে মদের বোতল। একটি ছোট রেডিওর দোকানের মালিককে বাঙালি বলে চিনতে পারা যায়। তিনিও চেনেন পরিতোষকে। পরিতোষের স্ত্রী পুজোর সময় ষোড়শী নাটকে নাম-ভূমিকায়। রেডিও দোকানের মালিকই একটা সাইকেল রিকশাকে ডেকে।

স্থানীয় জেলখানা পেরিয়ে এসে সাইকেল রিকশা একটা বাড়ির সামনে। সদর দরজায় মস্তবড় তালা। পাশের বাড়ির অপর সরকারি অফিসার, মাদ্রাজী, জানালেন, পরিতোষ দু'দিন আগে সফরে বেরিয়েছে, স্ত্রীকেও সঙ্গে।

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, একটা কোনো থাকার জায়গা না পেলে।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সরু চোখে আমার আপাদমস্তক। উনি লুঙ্গির ওপর হাওয়াই শার্ট পরে আছেন, মাথার চুল অবিকল শিশুদের মতন পাশ থেকে সিঁথি কাটা। অপরের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার সহ্য হয় না। আমি মাটি থেকে আমার ঝোলাটা।

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি কিছু ন-ড-এ মেশানো ইংরেজি শোনার জন্য।

—আর ইউ মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়'জ ইয়াংগার ব্রাদার?

অপ্রত্যাশিত রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ব্যানার্জী না বলে বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আগেও লক্ষ করেছি, উচ্চশিক্ষিত হলেও দক্ষিণ ভারতীয়রাই সবচেয়ে কম সাহেবীয়ানা অভ্যেস করে।

না, আমি পরিতোষের ছোট ভাই নই। গত রাত্রে আমি ট্রেনে অশেষ মজুমদার। আজ আবার অন্য পরিচয়, ক্ষণতরে লোভ হয়, তবু কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ।

—না, কেন বলুন তো?

—মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাইয়ের বেড়াতে আসার কথা ছিল। তাই আমাদের কাছে ঘরের চাবি রেখে গেছেন।

—আমি পরিতোষের বন্ধু। এবং আমার আসার কোনো কথা ছিল না।

—বন্ধু? মানে উনি কি জানেন, আপনি হঠাৎ এসে পড়তে পারেন?

অধিকাংশ মানুষেরই কোনো পরিচয়পত্র থাকে না। উনি যদি জেরা করেন, আমি পরিতোষের কতদিনের বন্ধু, কতখানি ঘনিষ্ঠতা, কী ভাবে তার প্রমাণ? হঠাৎ এসেছি খবর না দিয়ে, পবিতোষ গেছে সফরে, সরকারি অফিসাররা তো এরকম প্রায়ই। উনি আমাকে ঘরের চাবিটা দেবেন কিনা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আজকাল কতরকম তঞ্চক-বঞ্চক।

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুতের মতন একটা। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, পরিতোষ কখনো কফিতে চিনি খায় না।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন। ঠিক বুঝতে। উনি হয়তো আমাকে জেরা করতে (চেয়েছিলেন কিংবা চাননি)।

তৎক্ষণাৎ নিজের ঘর থেকে চাবি এনে। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে তালা। আলোর সুইচ। তারপর আমার দিকে ফিরেই বললেন, আপনার বন্ধু দু'দিন বাদেই ফিরবেন।

আমার রাত্রে থাকার একটা জায়গার দরকার ছিল। আমি ওঁকে তিনবার ধন্যবাদ।

উনি চলে যেতেই আমি দরজা ভেজিয়ে সোজা ঝপাং করে পরিতোষের বিছানায়। নিভাঁজ চাদরপাতা এরকম বিছানা দেখলেই আমার। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম, ইট মাস্ট বী ওয়ান্ডারফুল টু বী অ্যালাইভ! কেন একথাটা আমি ইংরেজিতে বললাম, আমি নিজেও জানি না! অনেক সময় একা একাও ইংরেজিতে। অকস্মাৎ পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে একটা বন্য নদীর মতন খাসা দৃশ্য দেখেও আমরা বলি, বিউটিফুল! বেশ জোর দিয়ে।

একটু পরেই দরজায় শব্দ ও সামান্য ফাঁক হলো। সেই ভদ্রলোক। একটু আগেই আমি ওঁর নাম শুনেছি এবং ইতিমধ্যেই ভুলে। শেষটা যেন মনে হয়েছিল নেড়ুচেনঝিয়ান! এরকম কোনো নাম হয়? কিংবা ভুল শুনেছি। প্রথম নামটা কি যেন? খুব অন্যায় নাম ভুলে যাওয়া।

ভদ্রলোক আমাকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করলেন ওঁদের বাড়িতে। আমি ভয়ে শিউরে। ভয়টা আসলে অভদ্রতার। ভদ্রলোক সত্যি অতি ভদ্র, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা যায়। কি করে এঁকে প্রত্যাখ্যান।

দক্ষিণ ভারতীয়দের আর সব কিছুই আমি ভালোবাসি। সঙ্গীত পর্যন্ত, কিন্তু ওদের রান্না খাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর। আগাগোড়া নিরামিষ খাদ্য আমার দু'চক্ষের বিষ। পৃথিবীর সমস্ত নিরামিষ জিনিসের মধ্যে আমি একমাত্র পছন্দ করি বিধবা নারীদের।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন? তাতে কি? আর একবার খাবেন, আমাদের সঙ্গে ভেরি লাইট ফুড। আমার ওয়াইফ বললেন—

—না, সত্যিই আজ আর কিছু খেতে পারব না। একদম পেট ভরা।

—তা হলে আসুন, এক কাপ কফি খাবেন অন্তত।

এরপর আর না বলা যায় না। ওঁরা ভাবছেন, আমি একলা একলা ঘরের মধ্যে, সেই জন্যই কিছু অন্তত ভদ্রতা না করলে। সহকর্মীর বন্ধু, খানিকটা সৌজন্য তার প্রাপ্য।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি স্নান করতে চাই, গরম জল লাগবে কি না। তা হলে ওঁর বাড়ি থেকে।

—না, না, না।

—খুব সহজেই অ্যারেঞ্জ করা যায়। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওয়াস করে তার পর আসুন। ডোনট হেজিটেট টু আসক ফর এনিথিং—

অনেকের অভ্যেস আছে সন্ধের পর স্নানের।

বিশেষ করে ট্রেন জার্নির পর। আমি অনেকটা গাঁজাখোরের মতন বেশি স্নান-টান এড়িয়ে। দিনে একবারই যথেষ্ট। বিশেষত আজ সকালেই শোন নদীতে সাঁতার কেটে।

এক হাঁড়ি গরম জলে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে আমি কোনোক্রমে মুখে হাতে ঘাড়ে। বাকি জলটা গড়িয়ে ফেলে দিলাম। তারপরও পাঁচ সাত মিনিট বাথরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে, স্নান করতে যতটা সময়।

এইসবগুলো সত্যিই মজার ব্যাপার। কেউ কি সত্যি দেখছে আমি বাথরুমের

মধ্যে স্নান করছি কি না? তবু আমি স্নানের অভিনয়। অকারণেই পরিতোষের আফটার শেভ লোশান থেকে খানিকটা গালে। বাথরুমে পরিতোষের স্ত্রী শ্রীলেখার ব্যবহার্য কোনো জিনিসই নেই। মেয়েলি গন্ধও না। সিনেমা হল-এ গিয়ে কতবার আমার মেয়েদের বাথরুমটার ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে।

উনি বাইরের দরজার কাছেই। জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং ফ্রেশ? আমি অমায়িক হাস্যে উত্তর।

পাশাপাশি দুটি ছোট একতলা হুবহু এক রকম। কিন্তু পরিতোষের তুলনায় মিঃ নেড়ুচেনঝিয়ানের (?) বাড়ি কত ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝে তেল-চকচকে। মঙ্গোলিয়ান ও আর্যদেব তুলনায় দ্রাবিড়দের পরিচ্ছন্নতা বোধ অনেক বেশি। এ ছাড়াও অবাক হবার মতন একটা জিনিস।

কফি প্রস্তুত। বসবার ঘরে নিচু খাটের ওপর নকশা-কাটা মাদুর। তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট লাল মখমলের তাকিয়া। পাশে একটা টেবিল। কিন্তু সবচেয়ে যা দেখে আমি প্রথমে খুব অবাক, তা হলো দোলনায় বসা একটি নারী। ঘরের ঠিক মাঝখানেই ঝুলছে দুটি দোলনা। বসবার ঘরে এরকম দোলনা আমরা আশা করি না। বাচ্চাদের জন্য নয়, রীতিমতন বড়োদের। পরে মনে পড়ল, মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো বাড়িতে এমন দেখেছি। চেয়ার টেবিলের চেয়ে ব্যবস্থাটা খারাপ নয়।

দোলনায় বসেছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ঘাগরা ধরনের লাল শাড়ি, গাঢ় নীল ফুলকাটা পাড়। কাঞ্জিভরম শাড়ির নাম বিজ্ঞাপনে দেখেছি, এইটাই? মহিলার গায়ের রং তেঁতুল বিচির মতন বেগুনি-কালো, সেই রকমই মসৃণ। অত্যন্ত সুশ্রী মুখখানি আরো লাবণ্যময়ী হয়েছে একটি নাকছাবিতে। কতদিন পর একজন নাকছাবি পরা নারীর সঙ্গে কথা বলব সামনাসামনি।

আমি বললাম, নমস্কার।

দোলনা ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে তিনি বললেন, বসুন।

পরিষ্কার বাংলা : মেয়েরা অনেক চটপট ভাষা শিখতে। ভদ্রলোক বাংলা একেবারেই। ইস, এর নাম নেড়ুচেনঝিয়ান কিংবা ঐ টাইপের কিছু না হয়ে নাউড়ু বা রামস্বামী জাতীয় সহজ কিছু হতে পারত না? কিংবা কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামে, তা হলে মনে রাখা।

মহিলাটির নাম, স্বামী বললেন পদমা, উনি নিজে বললেন, পদ্মা। কোথায় পদ্মা নদী, এখন বিদেশে, আর কোথায় দক্ষিণ ভারতে সেই নাম। অবশ্য বাংলাদেশেও তো কাবেরী নামে। নদীর নামে নামের মেয়েরা স্বভাবতই একটু উচ্ছল। এই নারীটির সারা শরীরে বাজনা।

পদ্মার স্বামী আর আমি দোলনায় বসলাম। টেবিলের ওপর কফি পট আর

বীয়ার মগের মতন বড়ো বড়ো কফির কাপ। কিছু চানাচুর ও সেমুই ভাজা। যা ভেবেছিলাম তাই, সারা বাড়িতে নিরামিষ গন্ধ। নিরামিষ খেয়েও এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কি করে? নিরামিষ খেয়েও নারীরা রূপসী হয়। আর্যরা ছিল প্রায় সর্বভুক এবং অতি মাংসাশী, অথচ ভারতের বেশির ভাগ মানুষই নিরামিষাশী। আসলে সাহেব ও আরবরাই খাঁটি আর্য।

আমরা যেমন বেশির ভাগ সময় চা, এরা তেমনি কফি। কারণ খুব সাধারণ। যে-কারণে উত্তর ভারতে বেশি অ্যামবাসেডর গাড়ি, দক্ষিণ ভারতে ফিয়াট। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা বেশি মাছ খেলেও এরা।

দোলনায় দুলতে দুলতে কফি। এবার কলকাতায় ফিরেই বসবার ঘরে একটা দোলনা। বেশ জোরে জোরে দুলতে লাগলাম, কফি উছলে পড়ছে না। খাটের ওপর বসে আছেন পদ্মা, হাতে চানাচুরের প্লেট। আমি দুলে সেখানে গিয়ে খপ করে এক মুঠো চানাচুর তুলেই আবার। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। ইস, এখানে না এলে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কোনো কাজে এসেছেন?

—না, এমনিই। বেড়াতে।

—বেড়াতে? এখানে বেড়াতে?

পদ্মা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে আবার হাসির কী আছে রে বাবা!

স্বামীটি বললেন, এখানে কেউ বেড়াতে আসে? কি আছে দেখবার? তবু যদি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যেতেন; কিংবা যদি বিজার্ভ ফরেস্ট যেতে চান—

—কেন, জায়গাটা খারাপ?

পদ্মাই আবার বললেন, খুব বাজে, খুব বাজে। আমার বিচ্ছিরি লাগে।

অবাঙালি নারীর মুখে বাংলা বেশ মিষ্টি। বিচ্ছিরি শব্দটাও সুন্দর।

আমি হেসে বললাম, কেন, এখানে তো কোয়েল নদী আছে।

পদ্মা তাঁর ঠোঁট ওল্টালেন অবজ্ঞায়। এই ভঙ্গিটি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু আমি বেশি বেশি না দেখে। জানি না, ব্যবহারে কোথায় কি ভুল হয়ে। নিজেদের জন্মস্থান থেকে এত দূরে, মাতৃভাষায় কথা বলার একটিও লোক নেই, বিহারে এই ক্ষুদ্র শহরে নেই কোনো উত্তেজনা, ওদের ভালো না লাগবারই তো। পছন্দমতন খাদ্যও কি। এখানে কি ক্যাপসিকাম পাওয়া যায়? শুধু কোয়েল নদী দিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

স্বামীটি, এর নাম আমি রাখলাম স্বামীনাথন, বললেন—সন্ধের পর এখানে কিছুই করার নেই। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়রা থাকলে তবু একটু আড্ডা হয়। কিন্তু ওঁরা

প্রায়ই বাইরে বাইরে।

পদ্মা বললেন, অন্য সময়ে আমরা কি করি জানেন, দু'জনে মিলে তাস খেলি।

সত্যিই এটাকে আনন্দের জীবন বলা যায় না। শুধু চাকরির জন্য দুটি স্বাস্থ্যবান নারী পুরুষ দিন দিন শাকচচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে এঁদের কোনো সন্তান। বাড়িতে নেই কোনো শিশুর শব্দ কিংবা ভাঙা খেলনা।

স্বামীনাথন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী সার্ভিসে আছেন?

—সার্ভিস?

—গভর্নমেন্ট না পাবলিক এন্টারপ্রাইজে? কিংবা বোধহয় নিজের বিজনেস।

এক মুখ হেসে বললাম, বেকার।

স্বামীনাথন বললেন বাঃ! এর চেয়ে সুখের জীবন আর কী হতে পারে!

কিন্তু শ্রীমতী পদ্মা আমার বেকার থাকার কথাটা তেমন পছন্দ করলেন না। বোধহয় ভাবলেন, বাঙালিরা বড্ড বেশি বেকার থাকে। বাঙালিদের উদ্যম নেই। শুধু রাজনীতি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, এখনো সার্ভিস নেননি কেন?

পাছে আমি বিরক্ত বোধ করি, তাই স্বামীনাথন তাড়াতাড়ি বললেন, হী মাস্ট বী ইয়াংগার দ্যান মী, এখনো অনেক সময় আছে, যতদিন ফ্রি থাকা যায়।

এবার আমি পদ্মার দিকে তাকিয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললাম, আমি একজন রাইটার।

—রাইটার? আপনি কি লিখেন?

—পোয়েট্রি।

স্বামী স্ত্রী একবার চোখাচোখি। আশাই করেননি। এরকম নির্লজ্জভাবে। যেন কেউ বলছে আমি বেকার, কিন্তু মাঝে মাঝে চুরি করি।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গান করেন?

তেমনি সহাস্য মুখে আমি, না।

—তবে কবিতা লিখে কি করেন?

—কাগজে ছাপা হয়। কেউ কেউ পড়ে।

—একটা শোনান না।

—বাংলা।

—তা হোক। তবু শোনান।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম, 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—' ইত্যাদি লাইন আষ্টেক এখনো মুখস্থ আছে, শুনিয়ে দিলাম। একই কথা।

স্বামীনাথন বললেন, এবারে মনে পড়ছে, আপনার কথা আমি মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। তার এক বন্ধু পোয়েট্রি লেখে, খুব বোহেমিয়ান।

বুঝলাম, আমি নয়, পরিতোষ নিশ্চয়ই শক্তির কথা। প্রতিবাদ না করে, মৃদ মৃদু হাসি মুখে চুপ করে তাকিয়ে। দোলনায় জোরে জোরে দোলা।

এরপর কিছুক্ষণ পরিতোষ আর শ্রীলেখার কথা। আমিও সোৎসাহে। আমি যে ওদের বন্ধু তার নির্ভুল প্রমাণ।

দু'কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ওঠা উচিত। দোলনা থেকে নামতেই পদ্মা বললেন, আপনি তাস খেলতে জানেন?

আমি অন্তত সাত আট রকম তাসের খেলা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে নতুন কিছু খেলা আছে কিনা জানি না।

—কী খেলা?

—ফিস, রামি?

—জানি।

—খেলবেন?

—এখন? অনেক রাত হয়ে গেছে না। এমনই আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম।

স্বামীনাথন বললেন, ইফ ইউ ডোন্ট ফিল স্লিপি—আমরা অনেক রাত পর্যন্ত।

—আমার আপত্তি নেই।

অবিলম্বে নিচু খাটের ওপর তাস খেলায়। ওরা ওদের বাত্তিরের খাবার দুটি প্লেটে সাজিয়ে পাশে নিয়েই। নিরামিষে এঁটো হয় না।

রামির তাস বিলি হতেই আমি বললাম, রামি খেলা তো স্টেক ছাড়া জমে না।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বললন, এগজ্যাক্টলি। রোজ আমরা দু'জনে স্টেকেই খেলি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে, এত বাজে লাগে...। আজ আমরা একজন পোয়েটকে পেয়েছি, তাকে হারাব।

—লেট আস সি।

একটুক্ষণের মধ্যেই তাস খেলা বেশ। ওরা দু'জনেই পাকা খেলোয়াড়। মেয়েটিরই নেশা বেশি। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকবার পুরো হাত হারলাম। মুশকিল হচ্ছে আমার পুঁজি কম, বেশি টাকা নিয়ে না বসলে বাজির খেলায় পৌরুষ দেখানো যায় না।

খেলতে খেলতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি। গত রাত্রে ছিলাম ট্রেনে, অচেনা লোকদের সঙ্গে। আজ আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে তাস। আমার

ডাল্টনগঞ্জে পরিতোষের কাছে আসার কোনো কথাই। কলকাতা ছেড়ে বেরুবার সময় ক্ষীণ ইচ্ছে ছিল চাইবাসায় সমীরের কাছে। কিন্তু এখানে না এলে এই দম্পতির সঙ্গে।

আমার ঠিক উল্টো দিকেই বসেছে পদ্মা, ডান পাশে স্বামীনাথন। পদ্মার চোখের পল্লবগুলি অনেক দীর্ঘ, হাতের আঙুলগুলি এত কোমল মনে হয়। পা দুটো মুড়ে বসেছে বলে তার একটি সম্পূর্ণ ঊরু। কোনো স্বাস্থ্যবতীর মাংসল ঊরুর সঙ্গে কি পারস্যের ছুরির উপমা দেওয়া যায়? পাখির নীড়ের সঙ্গে যদি চোখের।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল অনুরাধার মুখ। একটা ছোট্ট স্টেশনে নেমে মিলিয়ে। বাড়ির লোক ওকে জোর করে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও। ওর নীরবতা ও দুঃখ আমার মধ্যে এমন একটা ছাপ ফেলেছে। যেন আমাকে যেতেই হবে ঐ ছোট্ট শহরটিতে, আবার দেখতে হবে ঐ কিশোরীকে যতক্ষণ না ওর গোপনীয়তা। অনুরাধা, আমি যাব তোমার কাছে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, তবুও।

একটু পরেই স্বামীনাথন হারতে লাগলেন। ভুলভাল তাস ফেলে ফেলে। তাঁর স্ত্রীর মৃদু বকুনি। আমি পরপর দু'বার পদ্মাকে পুরো হাত সমেত হারিয়ে দিতেই সে বেশ উত্তেজিত। সে হারতে ভালোবাসে না। তাকে রাগিয়ে দেবার জন্যই আমি প্রাণপণ মনোযোগে। তবু আমিই হারলাম। পরের বারও। পরাজয় উসুল করার জন্য আমি তার বুক ও নগ্ন কোমরে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে সে আবার দ্রুত তাস বিলি। স্বামীকে বলে, নাও, নাও, তুমি এত স্লো।

এক মিনিট পরেই স্বামীনাথনের হাত থেকে তাসগুলি ঝরঝর করে। বসে থাকা অবস্থাতেই তার নাক ডাকে। তারপর মাথা হেলে পড়ে পাশে।

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পদ্মার দিকে। পদ্মার চোখ। হাত। কাঁধের ডৌল। খসে পড়া আঁচল। পারস্যের ছুরি।

পদ্মা বলল, একি, আর খেলা হবে না?

আমি হাতের তাসগুলো উল্টে দিয়ে বললাম, আপনার স্বামী তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে একটা বিরক্তির ভঙ্গি। পরক্ষণেই ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। শাড়ির আঁচলটা পাকিয়ে সরু করে স্বামীনাথনের নাকের মধ্যে। আমার চোখে চোখ, যেন আমরা একই ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

নাকে খোঁচা খেয়ে স্বামীনাথন ধড়মড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায়

কি যেন, মনে হয় যেন বিরক্তিসূচকই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাপ চাইবার ভঙ্গিতে হিন্দীতে বললেন, সরি, ভেরি সরি, নিদ আ গয়া।

ঘুমের ঘোরে উনি ভুলে গেছেন আমি হিন্দীভাষী নই। বিহারে থাকার জন্য আচমকা ঐ ভাষাতেই।

আমি বললাম, আপনার ঘুম এসে গেছে, এখন খেলা বন্ধ থাক।

পদ্মা আদুরে অনুনাসিক গলায় বলল, না, রাত তো বেশি হয়নি, এর মধ্যেই ঘুম?

স্বামীনাথন চোখ কচলে বললেন, ঠিক আছে, আর একটু যদি খেলতে চাও।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলে মানুষকে একটু দুর্বল। মানুষের মুখে বুদ্ধির ছাপটার নামই তো ব্যক্তিত্ব, ঘুমের সময় বুদ্ধি ছুটি নেয়।

স্বামীনাথন এক ফাঁকে উঠে বাথরুমে। পদ্মা আবার তাস বিলি করছে, আমি দেখছি ওর আঙুল, রক্তাভ নখে স্বাস্থ্যের আভা। নারীটি বেশ ছটফটে, এই মফঃস্বলের জীবন ওর জন্য নয়। যেমন—।

—আপনি সাউথ ইন্ডিয়ায় কোথাও গেছেন?

পদ্মার এই প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠি, আমি তখন অন্য কথা। আমি এখানে ছিলাম না কয়েক মুহূর্তের জন্য। মুখ তুলে বললাম, হ্যাঁ, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

—আপনি বুঝি খুব।

—হ্যাঁ।

—বেশ মজার তো! ছেলেরা পারে, মেয়েরা পারে না।

—মেয়েরা আবার এমন অনেক কিছু পারে, যা ছেলেরা—

—কী রকম?

উত্তর দেওয়া হলো না। স্বামীনাথন ফিরে এলেন। আমার একটা লঘু ইয়ার্কির কথা মনে এসেছিল, যা কোনো স্বামীর সামনে বলা যায় না। বললে কোনো দোষ নেই, কিন্তু আড়ালেই।

তাস তুলে নিলাম। আরো কিছুক্ষণ খেলা। কিন্তু আর ঠিক জমছে না। স্বামীনাথন বড়ো বড়ো হাই। বেচারাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। হারছেও খুব। স্বামীর ঘুম তাড়াবার জন্য একবার পদ্মা রেকর্ড প্লেয়ারে একটা গান চালিয়ে দিল, এম এস শুভলক্ষ্মী। তাতেও সুবিধে হলো না, যখন কারুকে ঘুমে পায়।

মাঝে মাঝে পদ্মা মৃদু ভর্ৎসনা করছে স্বামীকে। তখন আমি নীরবে। চোখ চলে যায় পদ্মার দিকে। ওর কোমর ও পেটের অনেকখানি নগ্ন। কোনো নারীর পোশাক যদি হ্রস্ব হয়, সেদিকে তাকানো কি অসমীচীন? তাহলে পোশাক হ্রস্ব কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নারীদের কোমর আমার

কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয়দৃশ্য, আমি স্বীকার করছি, বার বার সেই দিকে চোখ।

স্বামীনাথন আর একবার ঢুলে পড়তেই আমি নিজেই বললাম, আর খেলতে ইচ্ছে করছে না, আমারও এবার।

স্বামীনাথন লজ্জিত ও কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওরা দু'জনেও।

পদ্মা বলল, আপনারও ঘুম পেয়েছে?

—হ্যাঁ, মানে, খেলা আর জমছে না।

—আপনি বললেন না তো, মেয়েরা কি এমন পারে যা ছেলেরা পারে না?

আমি এমনভাবে হাসলাম, যার তেষট্টি রকমের মানে হতে পারে। এমন কি চৌষট্টি রকমও। ওকে একটু ধাঁধায় রাখলে ক্ষতি কি?

বিদায় নেবার জন্য সময় না নিয়ে আমি দ্রুত দরজার কাছে। স্বামীনাথন জানালেন, কাল সকালে আমার কফি। রাত্রে কিছু দরকার হলে যে-কোনো সময়।

দরজার ওপরে একটা হাত তুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা বলল, আমার মোটেই এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে ইচ্ছে করে না—

এ ব্যাপারে মীমাংসার ভার ওর স্বামীর ওপরে দিয়েই আমি বাইরে। আসলে আমার পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেতে। ওঁদের বাড়ির নিরামিষ খাবার প্রত্যাখ্যান করে ভেবেছিলাম, রাতটা না খেয়েই। কিন্তু এখন দাউদাউ আগুন।

রাত দশটা বাজে। এখনো কোনো কোনো পাঞ্জাবীর হোটেল। দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায়। বেশি দূর যেতে হলো না, পেট্রল পাম্পটার পাশেই বৃদ্ধ সর্দারজী তাঁর দোকান খুলে বসে ছিলেন যেন শুধু আমারই প্রতীক্ষায়। ভাত নেই, কিন্তু রুটি, তরকা, আলু-মটর, আলু-পনীর। না, ফিশ কারি, মাটন কারি, ফাউল কারি—সব শেষ। এখানেও নিরামিষ খেতে হবে? আজ রাতে আমার নিরামিষ ভবিতব্য? আণ্ডা হ্যায় তো? ঠিক হ্যায়, ভাজো। রুটির সঙ্গে তিন তিনটে ডিমভাজা। খাওয়ার পর শরীরে বেশ একটা।

ফেরার পথে নিস্তব্ধ রাস্তায় শুধু আমার জুতোর শব্দ। শরীরে আরাম দিচ্ছে মদালসা বাতাস। কোথাও একটা রাতপাখির ডাক। হঠাৎ ওপরে চোখ যায়। বিশাল উদ্যান। এর নিচে আমি কী অসম্ভব ছোট ও একা। নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধে আমি যেন আরো চুপসে যাই। কিংবা যেন আমি আর নেই, অদৃশ্য হয়ে। রাস্তায় কেউ নেই, শূন্য, নির্জন, তার ওপরে মাতৃস্নেহের মতন জ্যোৎস্না। প্রথম যে চাঁদে পা দিয়েছিল তার নাম নীল আর্মস্ট্রিং। আমার নামে নাম। মৃত্যুর আগে আমি বলে যাব, আমিও সুন্দরকে।

খুব মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাড়ির কাছে। স্বামীনাথনদের দিকে

তাকালাম। দরজা বন্ধ, আলো নিভে গেছে। এর মধ্যেই কি ? পদ্মা বলেছিল। এখন আবার গিয়ে ডাকা যায় ? কেনই বা ডাকব ? 'কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে ?'

আমার, অর্থাৎ পরিতোষের ঘরের দরজার কাছে একটা কুকুর। আগে তো ছিল না। চেহারাটা বেশ ভয়াবহ। এদিকে ওদিক একটা ইঁটের টুকরোর জন্য। সেটা ছুঁড়ে মারতেই কুকুরটা প্রচণ্ড গলায় ঘাউ ঘাউ করে। বিশ্রীভাবে ভেঙে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। এইসঙ্গে কি স্বামীনাথনরা জেগে উঠবে ? কুকুরটাকে রাগাবার জন্য আমি আরো দু'বার পাথর ছুঁড়ে। ওটা আসলে ভীতু, তাই অত গলার জোর, ছুটে পালাল।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে আরাম করে একটা সিগারেট। আমার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। এখনো সামনে দীর্ঘ রাত। পরিতোষ কল্পনাও করতে পারবে না, এই সময় আমি তার বিছানায়। অনেক দিন আগে পরিতোষের কাছে যখন এসেছিলাম, তখন ওর ছোট খাট ছিল, সেবার আমাদের সঙ্গে দীপকও, কত কষ্ট করে যে তিনজন সেই খাটে। এখন এত বড়ো বিছানায় তিন-চারজন অনায়াসেই। বড়ো বিছানা বলেই আমার খুব একা একা লাগতে।

আমি জীবনে কী চাই ? জীবন আমার কাছ থেকে কী ? জানি না, জানি না, জানি না! কতগুলো বছর কেটে গেল, কিছুই জানি না। জানার কী খুব দরকার? আজ সকাল পর্যন্ত আমি কী চাই, তা জানতাম। আমি চেয়েছিলাম অনুরাধা নাম্নী একটি মেয়ের দুঃখের। কে অনুরাধা ? ট্রেনে কিছুক্ষণের জন্য। অসম্ভব গভীর মনে হয়েছিল তার দুঃখ। ঐ মেয়েটির বদলে যদি একটি ছেলের দুঃখ ? তা হলেও ? সত্যি জানি না, জানি না, জানি না। জানার কি খুব ?

পরিতোষের ঘরে বইটই বিশেষ নেই। রাত্রে একটা বইকে অন্তত সঙ্গী করে না শুলে। র‍্যাকের ওপরে দুটো সরু-মোটা টাইম টেবল, কয়েকটা সিনেমার পত্রিকা। নিচের তাকে গীতবিতান, দুটি বাংলা উপন্যাস (পড়া), তিনখানা আমারই বন্ধুদের লেখা কবিতার বই, একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ, কয়েকখানা ইংরেজি পেপার-ব্যাক, একটা ডায়েরি, সহজ সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। এর মধ্যে কোনো বইটাই ঠিক আকৃষ্ট। অথচ একটা বই চাই-ই। আমি চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে যে-কোনো একটা।

গীতবিতানটিই উঠে এল। গীতবিতান পড়তে পড়তে ঘুমের চর্চা! তবু পাতা উল্টে উল্টে। বইয়ের মাঝখানে গানের চেয়েও আকর্ষণীয় অন্য কিছু। টুকরো টুকরো করে ছেড়া কাগজ। মনে হয় চিঠি। এত ছোট টুকরো করা হয়েছে মনে হয় হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যই। তবু যত্ন করে রাখা কেন বইয়ের ভাঁজে ?

চিঠিটা যে ছিঁড়েছে সে পরে নিশ্চয়ই মত বদলেছে। ছেঁড়া চিঠি বলেই মনে হয় অনেক কিছু গোপন। আমি টুকরোগুলো সাজাবার চেষ্টা করি। আমি ভুল...সেদিন বিকেলে...জানি কেউ...ভয় নেই...তোমার মু...ভারি তো এক ...আমার ছো বনের কিছুই সেও তো দু...বর্ধমানে...তোমার বু...নেক আশা...

না, অসম্ভব, এ টুকরোগুলো মিলিয়ে পাঠ উদ্ধার। জেলখানার কোনো কয়েদিকে যদি এ কাজ দেওয়া যায় তার বেশ ভালোই সময় কেটে যাওয়ার। আমার আর ধৈর্যে। চিঠিটা কি শ্রীলেখার? সেগুলি গীতবিতানের মধ্যেই রেখে দিয়ে আর একটা বই। ইংরেজি পেপার-ব্যাক, মলাটে পুরোপুরি খোলামেলা মেয়ে, যারা রেল স্টেশনের বুক-স্টল আলো করে থাকে। এটাই আপাতত।

মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ। ইঁদুর আছে নাকি! খাটের নিচে উঁকি মেরেও কিচ্ছু। হয়তো মূষিকরূপী চপল ইন্দিরা। কী ভীষণ একা লাগছে। হোটেলের ঘরে থাকলে একটা। আমার বইতে চোখ। মন্দ না, মেয়েটির নাম সুজি, সে কারুকে ভালোবাসতে পারে না—

বাইরে কিসের যেন ছপছপ শব্দ। কেউ যেন জল ছেটাচ্ছে। বৃষ্টি নাকি? না তো, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছেটানোর মতন, আমার ঘরটার ঠিক পাশেই। আমি পায়ে পায়ে বাইরে চলে এলাম, শব্দটা আসছে বাড়ির পেছন দিক থেকে। সেখানে একটা বাগান, ছোটখাট হলেও, অনেক ফুলগাছ।

সেই দিকে এসে অদ্ভুত দৃশ্য। জ্যোৎস্না যামিনী, সেই জ্যোৎস্নার বাগানে এক নারী, তার কাঁখে একটা জলভরা কলসী। আপন মনে ঘুরে ঘুরে জল ছেটাচ্ছে। প্রথমে গাটা ছমছম। অপ্রাকৃত মনে হয়। মানুষ, না অলীক? তবে ভয়েরও নেশা নেশা ভাব। আরো বেশি ভয় পেতে ইচ্ছে। আমি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে, কে?

নারীটির ভ্রূক্ষেপ নেই। গাছে গাছে জল-ছড়া দিতে দিতে। একবার সে আমার দিকে মুখ। হাসল। কালো রঙের মুখে অত্যন্ত ফর্সা হাসি। পদ্মা।

—এ কি?

—আপনি ঘুমোননি?

—না, শব্দ শুনে উঠে এলাম। কী করছেন?

—বলেছি তো আমার তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।

—কী করছেন এখানে?

—গাছে জল দিচ্ছি।

—এত রাত্রে কেউ গাছে জল দেয়?

—দেয় না বুঝি?

—কখনো দেখিনি।

—আমি দিই। রোজ রাত্রে। তাই তো ফুলগুলো এমন

—আপনার ভয় করে না?

পদ্মা উত্তর না দিয়ে কুলকুল করে হাসল। আবার জল দিতে দিতে অন্য দিকে। আমি একদৃষ্টে। বাগানে জল দেবার জন্য ঝারি পাওয়া যায়, তার বদলে ওর কাঁখে কলসী। ঠিক কোনো গ্রাম্য মেয়েব মতন। ওর কোমরের গড়নটা কি অপূর্ব। ঠিক পাথর কেটে কোনারকের মূর্তিগুলো যেমন। আমি বড়ো কোমর-লোভী, দু'চোখ ভরে ওর কোমর। ঘাগরার ওপরে ব্লাউজ, উড়নিটা রেখে এসেছে।

জল ছড়াতে ছড়াতে ও আমার কাছেই। আমি দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে বললাম, আমাকে একটু জল দেবে! আমার তেষ্টা লেগেছে।

ও হেসে কি যেন উত্তর। মনে হলো, না।

আমি বললাম, একটু জল দেবে না? তুমি বুঝি শুধু গাছকেই জল দাও, মানুষকে দাও না?

ও এবাব কলসী উপুড় করে দেখিয়ে বলল, নেই।

—আর নেই? আমার যে তেষ্টা পেয়েছে?

—খুব?

—হ্যাঁ।

আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে ও বলল, এই নাও।

ততক্ষণে ও ব্লাউজের দুটো বোতাম খুলে ফেলেছে, বন্দী একটা বলের মতন বেরিয়ে এসেছে ওর স্তন।

আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে ও খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, এই নাও।

আমি সেই মুহূর্তে একটি শিশু। প্রথমে জিভ ছোয়ালাম ওর স্তনবৃন্তে। কী গরম। তারপর সম্পূর্ণ মুখটা চেপে। ও আমাব মাথায় হাত। আমার শরীর কাঁপছে। সেই শক্ত অথচ ও কোমল, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্তনে আমাব মুখ ও চোখ। ততক্ষণে শিশু থেকে পুরুষ, আমি দু'হাতে ওর কোমর। যেন ওকে কতদিন থেকে চিনি, অথচ আজই প্রথম শরীরের চেনা।

নিজেকে বিযুক্ত করে একবার ওকে দেখা। বৃষ্টিব মতন জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে ওর মাথায়। ওর সামনে পেছনে, দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ, ও দাঁড়িয়ে আছে ঋজু হয়ে, একটি স্তন শুধু অনাবৃত।

ও হাত বাড়িয়ে বলল, এসো। আমি ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতেই ও মুখটা সরিয়ে। আমার মাথাটাও জোর করে নিচের দিকে। ফের ওর বুকে। যেন আমি ওকে তৃষ্ণার কথা বলেছি বলে ও তৃষ্ণা মেটাতে চায়। কিন্তু পুরুষমানুষের তৃষ্ণা।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে ওর দুই ঊরু জড়িয়ে ধরে ওর কোমরে এক লক্ষ চুম্বন। কিংবা এক লক্ষের থেকে একটা দুটো কম হতে পারে।

ও বলল, এখানে নয় আর। এসো।

দৌড়ে গেল আমারই ঘরের দিকে। আমিও পিছু পিছু। ঘর পেরিয়ে বাথরুমে। দাঁড়াও আসছি। আমি শুনলাম না। আমিও ভেতরে। বাথরুমের দরজার পাশে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন চুম্বন আমি জীবনে আগে কখনো। আমি উর্বশীর ঠোঁট থেকে অমৃত নিচ্ছি। একবার দুবার তিনবার, আরো দাও, আরো দাও—

খুট খুট খুট খুট শব্দ। হাত থেকে বইটা মাটিতে। আলো জ্বালা, দরজা খোলা। আমি কোথাও যাইনি? পদ্মা কোথায়? সে যে এখানেই এই মাত্র। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তবে কি? কিন্তু আমার ঠোঁটে যে এখনো চুম্বনের। শরীরে সেই উষ্ণতা। তা হলে! আবার সেই খুট খুট খুট খুট। কিসের শব্দ? মুষিকরূপী ইন্দ্রিয়? কপালে ঘাম জমেছে। স্বপ্ন এত তীব্র হয়? আমি কি জল ছড়ানোর শব্দ শুনিনি?

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে। ঘুরে পেছন দিকটায়। সত্যিই একটা বাগানের মতন আছে। বেশ কিছু গোলাপ গাছ। আমি তো এদিকটায় আগে আসিনি, বাগান দেখিনি, তাহলে কি করে স্বপ্নে? বাগানের মধ্যে ঢুকে আমি নিচু হয়ে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলাম। মাটি ভিজে ভিজে। গোলাপগুলির পাপড়িতে ও পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জল। সত্যিই জল ছড়িয়েছে একটু আগে মনে হয়। তাহলে কোথায় সেই এক বুক খোলা নারী, যে এখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্নান?

স্বামীনাথনদের বাড়ির দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। একই সঙ্গে আমার লজ্জা ও দুঃখ। ব্যাপারটা সত্যি হলে আমি লজ্জিত বোধ করতাম। সত্যি নয় বলেই বিষম দুঃখ, বিষম দুঃখ।

ফিরে এলাম ঘরে। এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। দরজা খোলাই ছিল যদিও। বাথরুমের মধ্যে। এখানেও কেউ। তখন আমি সেই বাথরুমের দরজার পাশে দাড়িয়ে এক কাল্পনিক নারীকে তিনবার প্রগাঢ় চুম্বন। ওষ্ঠ থেকে অমিয়। তার ঊরু চেপে ধরে পায়ের কাছে। স্বপ্নের চেয়েও এই জেগে থাকা কাল্পনিক প্রণয়লীলা কম তীব্র হয় না। এর পরেও বিরাট অতৃপ্তি নিয়ে আমি ফিরে আসি বিছানায়। তারপর পাজামার দড়ি খুলে।

পরদিন খুব ভোরেই আমার ঘুম। বিছানায় উঠে বসেই একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয় আমাকে। আজ সারাদিন কীভাবে? পরিতোষ দু'তিন দিনের মধ্যে ফিরবে না। শ্রীলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন। এই দু'তিন দিন আমি? এখানে

থেকে যাওয়া যায় অবশ্য, কোনো অসুবিধে নেই, পরিতোষের ভাঁড়ারে চাল ডাল আছে, আমি নিজেই খিচুড়ি ফুটিয়ে। কিংবা কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল। কিন্তু কী করব একা একা? অথচ একা থাকতেই তো আসা, নইলে কলকাতা ছেড়ে। যেখানে হাজার পরিচিত মানুষ।

কালকের স্বপ্নটাই যত গণ্ডগোল। এরপর পদ্মার কাছে মুখ দেখাতে। সামান্য পরিচয়, তাতেই এমন অবৈধ। দুপুরে স্বামীনাথন অফিসে যাবে। তখন কি পদ্মা ঘুমোয়? সেই সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হতে পারে না? যদি হয়? অনেক সময় অসম্ভবও তো। ওর হয়তো কোনো অতৃপ্তি আছে, যেরকম ছটফটে ভাব—। আসলে তা-ও নয়। যেটা ওর সারল্য, যেটা ওর পবিত্র মনের চঞ্চলতা, সেটাকেই আমি অতৃপ্তি ভেবে।

হঠাৎ নিজেকে আমার একটা লম্পটের মতন। সকালবেলা উঠেই এক নিরীহ দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী সম্পর্কে। যেন কোনো মহিলা অপরের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই ব্যভিচারে রাজি হবে। ইডিয়েট! আমি নিজের গালে ঠাস করে এক চড় কশালাম। তবু মনের মধ্যে একটা ছুঁকছুঁকে ভাব। যখন নিজেকে আরো শাস্তি দেবার জন্য সকালবেলা সিগারেট খাবই না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এবং আরো ঠিক করলাম স্বামীনাথন-পদ্মার সঙ্গে দেখা না করেই।

পরিতোষরা গেছে ছিপাদহের দিকে। আমি ওদের খোঁজে অনায়াসেই। এদিককার পথঘাট আমার খুব অচেনা নয়। হিটারে গরমজল চাপিয়ে তৎক্ষণে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে। এত ভোরে বহুদিন দাড়ি কামাইনি।

সদর দরজাটায় তালা লাগিয়ে দাড়ালাম। মাত্র সাড়ে পাঁচটা। স্বামীনাথনরা এখনো। একটা খামের মধ্যে চাবিটা ভরে, সেই খামেরই গায়ে কয়েক লাইন লিখে সেটা ওদের লেটার বক্সে। যাক, নিশ্চিন্ত। এবার বড়ো রাস্তায়।

মনের মধ্যে একটা কাপুরুষ-কাপুরুষ ভাব। যেন আমি পালিয়ে, হেরে। কোথায় পালাচ্ছি? আত্মসংযমীকে বীরপুরুষ বলা উচিত না? কেউ তো ব্যাপারটা জানল না। তা হলে হয়তো কিছু প্রশংসা। তার বদলে, মনে মনে বলছি, শালা, ভীতু কোথাকার—পদ্মা মেয়েটার ছলাকলা দেখেও।

বাস ছাড়তে এখনো দেরি আছে। একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে। যাবে বেতলায়, পথেই ছিপাদহ। দু'টাকার রফা। আমি উঠে ড্রাইভারের পাশে।

ট্রাকটা বহুদূর থেকে আসছে, সারারাত ধ'রে। ড্রাইভারের চোখ দুটো লাল। গলায় একটা মাফলার। তার পাশে বসে ক্লীনার, একটা অসম্ভব রোগা ছেলে, দেখলে কিছুতেই ঠিক বয়েসটা। ক্লীনার শব্দটাই কি রকম রোগা-রোগা।

পেছনে দশ-বারো জন নারী-পুরুষ মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে বসেই

ঢুলছে। ড্রাইভারের পেছনে একটা চৌকো ফুটো, সেখান দিয়ে আমি মাঝে মাঝে ওদের দিকে। দৃশ্যটা কি রকম যেন করুণ করুণ। ওরা সারা রাত্রি এইভাবে! ড্রাইভারের মুখখানা এমনই রুক্ষ, যেন মনে হয় দস্যুদলের সর্দার।

আর একটা অদ্ভুত জিনিস। অনেকগুলো মাছি ভনভন ভনভন। অসম্ভব দ্রুত চলছে ট্রাকটা, তবু মাছি, ড্রাইভার মাঝে মাঝে স্টিয়ারিংএর ওপর থেকে হাত ছেড়ে, মুখের সামনের মাছিগুলোকে। ভয়-ভয় করে। যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট। এত মাছি কেন? তাড়ি-টাড়ি খেয়েছে নাকি? সেই গন্ধে মাছি? তা'হলে তো আরো সাঙ্ঘাতিক।

ক্লীনার ছেলেটাও ঘুম ঘুম। মাঝে মাঝে আমার কাঁধের ওপর। ছেলেটার কষে লালা। ক্রিমির দোষ আছে নিশ্চিত। আমি হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে।

সবে আলো ফুটছে। দু'পাশে হালকা জঙ্গল। ল্যাজ গুটিয়ে একটা শিয়াল। বাঁ পাশে শিয়াল দেখা কিসের যেন লক্ষণ? শুভ না অশুভ? আমি দূরে চলে যাচ্ছি ক্রমশ! পদ্মাকে আর জীবনে কখনো হয়তো! কী সুন্দর কোমর! বাঁধিয়ে রাখার মতন। ঐ সৌন্দর্য দূরেই থাক। স্পর্শের বদলে চোখে।

একটা ছোট নদীর ওপর সরু ব্রীজ। ট্রাকের গতি ক্রমে কমে। ভোরের হালকা আলোয় ক্ষীণ নদীটি অপরূপ। এইসব অচেনা পাহাড়ী নদী দেখলেই আমার মনে হয়, এরা বড্ড একা। দিনের পর দিন চুপচাপ কাটিয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। কেউ কি কখনো এখানে গাগরীতে জল ভরতে? দাপাদাপি করে না শিশুরা। বালির ওপর দিয়ে তিরতিরে জলধারা।

নদীটি অবশ্য তখন একা ছিল না। ব্রীজের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। হাত উঁচু ক'রে। ট্রাকটা বেশ জোরে ব্রেকের শব্দ। লোকটি কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে সন্দেহজনক চোখে। তারপর দুর্বোধ্য হিন্দীতে ড্রাইভারকে কি যেন। ড্রাইভারও উত্তরে সেই রকম। তারপর লোকটি একতাড়া নোট। ড্রাইভার সেগুলো না গুণেই জেবের মধ্যে ভরে আমাকে বলল, একটু উঠন তো বাবুজী।

উঠে দাড়ালাম। সিটের গদি সরাতেই ভেতরে একটা বাক্সের মতন! তাতে কয়েকটা পুটলি। ড্রাইভার দুটো পুটলি তুলে রাস্তার লোকটার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মাছি সেই পুটলি দুটো অনুসরণ করে।

মনের মধ্যে একটা খটকা। কি এমন মাছি-ভনভনে বস্তু, যার বিনিময়ে অতগুলো টাকা? আমার কৌতূহলী চোখ একবার ড্রাইভারের দিকে, একবার সেই লোকটার।

আরো দু'একটা বাক্য বিনিময়ের পর ট্রাক আবার। এখনো কয়েকটা মাছি। কী যেন আমার মনে পড়বার কথা। কেউ একবার বলেছিল, ট্রাকে যদি মাছি থাকে।

উল্টো দিক থেকে একটা সরকারি জীপ। ট্রাক ড্রাইভার আমার দিকে একবার আড়চোখে। সেই দৃষ্টিতে অপরাধ। তৎক্ষণাৎ আমার মাথার মধ্যে চিড়িক করে। আফিং। নিশ্চিত আফিং। ধানবাদে সেই যে একবার। চৌধুরীদা ছিলেন একসাইজের লোক।

ট্রাকটা জীপটাকে পথ ছাড়ল না। নিজেই জোরে বেরিয়ে।

আমি আমার কাঁধ থেকে ক্লীনারের মাথাটা ঠেলে তুলে বিরক্তির সঙ্গে বললাম, এ লোকটাও আফিং খেয়েছে নাকি?

ড্রাইভার সচকিতভাবে জিজ্ঞেস করল, কেয়া?

—মালুম হোতা হ্যায় কি ইয়ে ভি আফিং খায়া?

ক্লীনারটা চোখ খুলে মিটিমিটি হাসছে। বোধহয় আমার হিন্দী বলার কসরৎ দেখেই। আব একটু কৌতুকের জন্য আমি বললাম, আফিংকা কারবার মে কিৎনা নাফা হোতা হ্যায়?

ড্রাইভারের মুখটা সম্পূর্ণ ঘুরল। রক্তচক্ষু। লোকটির কোনো কৌতুকবোধ! কর্কশ গলায় বলল, আফিং কা কেয়া বাৎ হ্যায়?

—ওঁ চীজ কেয়া? আফিং নেহি?

—উও তো তামাক হ্যায়।

—ভোরবেলা রাস্তায় খাড়া হোকে, ইৎনা রূপিয়া দেকে আদমি লোক তামাক খরিদ করতা হ্যায়? তব ইৎনা মচ্ছর কাঁহে?

—মচ্ছর?

মচ্ছর মানে মশা না মাছি? বোধহয় মশা-ই। তা হলে মাছির হিন্দী কি? যেমন বোলতার হিন্দী জানি না। এই নিয়ে তারাপদর রসিকতা, আপলোক বোলতা কো বোলতা নেহি বোলতা হ্যায় তো কেয়া বোলতা হ্যায়?

সেই রসিকতাটা ওদের শোনাব শোনাব, তখন ক্লীনারটি হঠাৎ রেগেমেগে এক চীৎকার, এইজন্যই বলছিলাম, বাঙালি বাবুদের কক্ষনো তুলতে নেই।

ড্রাইভারটি তাকে জানাল, সুবৎ দেখে আগে বুঝিনি যে এ বাঙালি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক। উতার যাইয়ে।

—অ্যাঁ?

—উতার যাইয়ে।

বলে কি এরা? এই মাঠের মধ্যে নেমে যাব? এরা আফিং চোরাচালান করে, তাতে আমাব কি? আমি কি কোনো আপত্তি? শুধু একটু রসিকতার জন্য।

ড্রাইভারটির চোখ দেখে রীতিমতন ভয়ে গা ছমছম। গুটিগুটি নেমে পড়তেই। ক্লীনারটি আমার হাত চেপে ধরে বলল, রূপিয়া?

কোনো তর্কের মধ্যে না যাওয়াই। দু' টাকাই ওদের। এবং বললাম, নমস্তে। বাকি সব টাকাও যে কেড়ে নেয়নি, সে তো ওদের দয়া। শুধু মাঝরাস্তায় এমনভাবে ফেলে।

একবার ভেবেছিলাম ট্রাকের নম্বরটা। পকেট থেকে কলম বার করেও মত বদল। পুলিশকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। পুলিশকে না জানিয়ে কেউ কক্ষনো চোরা কারবার করে নাকি? মাত্র দু'টাকা অতিরিক্ত লাভের জন্য যে আমাকেও এরা ট্রাকে জায়গা। অতিরিক্ত দুঃসাহসী না হলে।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সকালের প্রথম সিগারেট। ইচ্ছে করলে এখনো পরিতোষের বিছানায়। শুধু শুধু একটা স্বপ্নের জন্য।

কাছাকাছি বাড়িঘর কিছু নেই। বিরাট ফরাসের মতো মাঠ। পরবর্তী কোনো ট্রাক বা বাসের জন্য কতক্ষণ? তার চেয়ে বরং হাঁটতে হাঁটতেই। ছিপাদহ আর কতদূর?

আধঘন্টা মতন হাঁটার পর দূরে একটা কালো গাড়ি। প্রায় মাঝরাস্তাতেই হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রাহ্য করল না গাড়িটা, একরাশ ধুলো উড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে আমি সরে না দাঁড়ালে হয়তো চাপা দিয়েই। আমার চেহারাটা কি যথেষ্ট বিপন্ন এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়?

আবার হেঁটে হেঁটে এক দিগন্ত মাঠ পার হবার পর দ্বিতীয় দিগন্তে কিছু ঘরবাড়ি। খাপরার চাল। ছোট একটি গ্রাম। যদি ওখানে চা। স্বামীনাথন কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, চমৎকার মানুষ। ওরা দু'জনেই চমৎকার। শুধু আমারই দুর্ভাগ্য।

একটি ঘরের দাওয়ায় একজন বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি এত শাদা যে মনে হয় ওর বয়েস অন্তত দু'শো বছরের কম নয়। প্রথমে তাকে আমি কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার। তার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। ঘরের দেয়ালে পরিবার পরিকল্পনার সরকারি বিজ্ঞাপন।

জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি চায়ের দোকান আছে?

বৃদ্ধটি নির্বিকার। নিরুত্তর।

দু'তিনবার প্রশ্ন করে একই। তখন জানতে চাইলাম, ছিপাদহ কতদূর?

বুড়োটা নিশ্চয়ই কালা। কিংবা কোনো উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। দুচ্ছাই, এত বুড়ো-ফুড়ো দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বাড়িতে কি আর কেউ নেই? উঁকিঝুঁকি দিয়েও আর কারুকে।

খানিকটা দূরে আর একটা বাড়ি। শালিক পাখির মতন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে দুটি শিশু। একজন মাঝবয়েসী লোক পেঁয়াজের ক্ষেতে কোদাল দিয়ে। পাশের

একটি চালার নিচে একটি গরু বাঁধা। যথারীতি খড়ের বাছুর। একজন স্ত্রীলোক মাটির হাঁড়ি নিয়ে সেই দিকে।

অল্প খানিকটা জমিতে নধর পেঁয়াজকলি। আমি সেখানে। পুরুষটি একবার শুধু মুখ তুলে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে আবার। তার পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরলাম, কিন্তু একটিও স্বাস্থ্যবান পুরুষ দেখি না।

—ইধার চা-কা দুকান হ্যায় ?

লোকটি সিধে হয়ে আমার দিকে ভালোভাবে। কোদালের ফলাটা কি চকচকে!

—আপনি কোথা থেকে আসছেন ? (হিন্দীতে)

—এইসাই ঘুমতা হ্যায়।

—ঘুমতা হ্যায় ?

লোকটির বিস্ময়ের কারণ আমি বুঝতে পারি। সদ্য সকালে একজন ফিটফাট বাবু চেহারার লোক এই গ্রামে। সচরাচর তো।

—এদিকে চায়ের দোকান নেই ?

—না, বাবু।

—আপলোগ চা নেই পিতা ?

—হাটে গেলে কোনো কোনো দিন খাই। এদিকে তো কোনো দোকান নেই।

অনেকখানি হেঁটে আমি একটু ক্লান্ত। সকালবেলা চায়ের জন্য বুকের ভেতরটা টাস টাস। চা না খেলে সিগারেট জমে না।

চ্যা—চো—চ্যাক—চ্যাক আওয়াজে দৃষ্টি ফিরিয়ে! স্ত্রীলোকটি দুধ দুইছে। গরুটি শান্তভাবে। মুখে জাবর, ডান উরুতে দুটি মাছি, সেই জায়গার চামড়াটা কুঁচকে কুঁচকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দোয়া দেখতে বেশ। স্ত্রীলোকটি এ কাজে বেশ নিপুণা। এই জন্যেই মেয়েদের আর এক নাম দুহিতা। অনেকদিন আমি এ-রকম কাছে থেকে দুধ দোয়া।

হাঁড়িটা প্রায় ভরো ভরো। অনেকটা দুধ তো। এরা গরীব হলেও বেশ একটা ভালো গরু।

—আপলোগ ইতনা দুধ কেয়া করতা হ্যায় ? বেচনা হ্যায় ?

—হ্যাঁ বাবু, বিক্রি করি।

—কাঁহা ?

—ছিপাদহে।

—ছিপাদহ কিৎনা দূর হ্যায় হিঁয়াসে ?

লোকটি হাত তুলে বলল, কাছেই।

সে দেখাল দূরের এক 'ধূধূ'র দিকে। এদের 'কাছেই' মানে অন্তত দু'তিন মাইল। কিন্তু আর উপায় কি?

মধুর শব্দে দুধ দোয়া তখনো। হঠাৎ শেষ হলো। স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে শিশু দুটিকে। শিশু দুটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে। স্ত্রীলোকটি একটা পোয়ামাপের কাঁসার গেলাস হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে ওদেব একজন একজন করে। বাচ্চা দুটি চোখের নিমেষে। স্ত্রীলোকটি তারপব এক গেলাস পুরুষমানুষটিকে। আমি খুবই অবাক হয়ে। এরকমভাবে কাঁচা দুধ খেতে কারুকে দেখিনি। তাও গেলাসটা কলসীর মধ্যে ডুবিয়ে। স্বাস্থ্য বইয়ের লেখকরা এ দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে!

পুরুষটি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, বাবুজী, আপনি কি একটু দুধ খাবেন? লাল রঙের গরু, এর দুধ খেলে খুব তাগৎ হয়।

আমি শশব্যস্তে বললাম, নেহি, নেহি, বহুৎ মেহেরবানী আপকা—

লোকটি তখন খুবই পেড়াপেড়ি। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণে আর এক গেলাস। আমি বার বার আপত্তি জানিয়েও।

একটি খাটিয়া আনা হলো আমার জন্য। আমি গেলাসটা হাতে করে একটুক্ষণ। বলতে পারতাম, দুধটা যদি একটু গরম কবে। সঙ্কোচ হলো। এরা যদি কাঁচা দুধ খেতে পারে তাহলে আমিই বা।

আস্তে আস্তে চুমুক। প্রথমে একটু বুনো বুনো গন্ধ। কিংবা কাল্পনিক। তারপর আস্তে আস্তে ভালো লেগে যায়। স্ত্রীলোকটি ব্যগ্রভাবে আমাকে।

স্ত্রীলোকটির বয়েস বছর চল্লিশেক কিংবা পঁচিশ-ছাব্বিশ—ঠিক বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যটি দৃঢ় কিন্তু মুখে অনেক দুঃখ, অনেক অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম। চোখ দুটিতে বিস্ময় এবং স্নেহ এখনো তবু।

হঠাৎ আমাব চোখে জল এসে যায়। এক অভূতপূর্ব মমতাময় ভালোলাগার স্পর্শ। কোথায় একটা অচেনা গ্রামে, একটা অচেনা বাড়িতে, জীবনে প্রথম টাটকা কাচা গরুর দুধ ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে। এদেব এত আন্তরিকতা! এতটা কি আমাব পাওনা ছিল? আমি কার জন্য কি করেছি? যদি এখনো অন্য কারুর জন্য। যদি কখনো অনুরাধাকে।

অনুরাধাব কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে টনটন। আব কি কখনো দেখা? ভোরবেলায় স্টেশনে নেমে সে কোথায় হারিয়ে। কেন তাকে আমি এমনভাবে হারাতে? সে যে আমাব খুবই আপন।

দুধটার জন্য পয়সা দেব কি না এই নিয়ে মনেব মধ্যে। ভারতীয় আতিথ্য বলে একটা কথা আছে। দারিদ্র্য তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ভারতীয়। একটুক্ষণ

অপেক্ষা করি। তারপর বলি, এক অনজানে মেহমান কে লিয়ে আপলোগ কা বহুৎসা দুধ খরচা হো গিয়া—

আমার হিন্দী শুনে এরা হাসে না—ভাষা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কথাটা সবটা বুঝতে না পারলে দু'এক পলক মুখের দিকে।

লোকটি একটু পরে জানাল যে, ওর ভাবী তো এক্ষুনি ছিপাদহে যাবে দুধ বেচতে, সুতরাং আমিও তার সঙ্গে। আমাকে রাস্তা চিনিয়ে।

এতক্ষণ বাদে আমি ওর নামটা। আশ্চর্য, ওর নাম সাহেবরাম। দু'তিনবার শুনেও বুঝতে পারিনি। সাহেবরাম? কি আশ্চর্য মিলন। এখানে ঠাকুর-দেবতার নামেই এদের নাম রাখার রেওয়াজ। এর একসঙ্গে দুই দেবতা।

আমি তার মাটি-রাঙা পিঠে আমার একটা হাত। কি ঠাণ্ডা! এদের গা এত ঠাণ্ডা হয় কেন?

স্ত্রীলোকটির আঁচলটা গাছকোমর। হাঁড়ির মাথায় একটা পাতলা কাপড় বেঁধে বলল, চলুন।

সে মাঠের মাঝখান দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ চেনে। আমি তার পিছু পিছু। দু'জনেই নিঃশব্দ। সে এত দ্রুত যায় যে আমাকেও হনহন করে।

একটা ছোট্ট ডোবার পাশে দুটি তালগাছ। অল্প ছিরছিরে জল। তালগাছ দুটি যেন দুই প্রহরী। কিংবা বন্ধু। চিরকাল জল দেখলেই আমার। এবার দৌড়ে গিয়ে পা ডুবিয়ে।

—মায়ি, একটু দাঁড়াবে?

স্ত্রীলোকটি দাড়াল ঠিকই, ভুরুতে বিরক্তির রেখা। হয়তো ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে দুধ। হঠাৎ একটা কথা মনে এল। এ তো দুধে জল মেশালো না? আমার সামনেই তো সবকিছু। দুধে জল মেশাতে জানে না। শিখিয়ে দেব? এই ডোবার জলই বা মন্দ কি? হাসি পেল। এসব বাঙালি চিন্তা।

ডোবার জলে পা ছোঁয়াতেই খুব আরাম। কাছেই দু'তিনটে ব্যাঙ। যেন এদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, দেখা না করে চলে গেলে খুবই। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে। পা দিয়ে জল ছলচ্ছল শিশুর মতন। অনেকক্ষণ খেলা করে সময় কাটানো যেত। তবু উঠে আসতে।

আবার যাত্রা। এর মধ্যেই মাইলখানেক অন্তত। সারাটা পথ কোনো কথা না বলে কি?

—মায়ি, তুমি রোজ দুধ নিয়ে যাও?

—জী।

—কখন ফেরো?

—তিন বাড়িতে দুধ মেপে দিয়ে ফিরে আসি।

—যেদিন বৃষ্টি হয়? সকালে যদি বৃষ্টি হয়?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি ওকে অকারণে ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। ছেলেমানুষি।

কিন্তু আকাশ হঠাৎ কালো। কোথা থেকে মেঘ। যদি হঠাৎ এক্ষুনি বৃষ্টি নামে, আমরা দু'জন কোথায়? কাছাকাছি আর বড়ো গাছও নেই। সেই ডোবাটার কাছেই ফিরে যেতে। দু'জনে দুটো তালগাছে হেলান দিয়ে। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে।

বৃষ্টি এল না। মাঠ ভেঙে আমরা বড়ো রাস্তায়। অদূরে কিছু কিছু বাড়িঘর। এবং চায়ের দোকান। আর আমি চা না খেয়ে এক পা-ও। আমার পথপ্রদর্শিকাকে কি এক কাপ চা?

—মাসি, চা খাবে?

এবার মুখটা পাশের দিকে ফিরিয়ে সে অদ্ভুত লজ্জার সঙ্গে হাসি চেপে। মুহূর্তে সে খুকির মতন। এই মুখখানা যদি কোনো ছবিতে।

ফুলুরি ভাজছে। চায়ের সঙ্গে বেশ। এখন যদি আমার পথের সঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে চা ও বিশ্রম্ভালাপ। জানি, তা হয় না। শহরে জন্মায়নি বলেই এই নারী ইহজীবনে কোনো চায়ের দোকানে।

আমার কাছ থেকে কোনো রকম বিদায় না নিয়েই সে হনহনিয়ে। এটাই স্বাভাবিক। আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করিনি। এই নাম-না-জানা রমণীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু সারা জীবনের জন্য।

পর পর দু'গেলাস চা। ছোট ছোট গেলাস, ঠিক জমে না। ফুলুরিও বিস্বাদ, সম্ভবত তিল তেলে। দোকানে আমিই একমাত্র। উনুনে বড্ড ধোঁয়া।

সরকারি বিশ্রাম ভবনের সন্ধান জেনে উঠে দাঁড়িয়ে। বেশি দূর নয়। এখানে অনেকেই কাঠের কারবারী। কয়েকটা বেশ ভালো বাড়ি। সার সার ট্রাক বিশ্রামরত। শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধ। আমার ক্লান্ত পা।

বাংলোটা একদম উঁচুতে। কাঠের গেটের পরে খানিকটা বাগান। তারপর চওড়া বারান্দা, সেখানে পরিতোষ আর তার স্ত্রী, সামনে চায়ের সরঞ্জাম। চমকে দিতে হবে। নিঃশব্দে কাঠের গেট খুলে আমি গুটিগুটি।

হয়তো পিঠে কিল মেরেই বসতাম, তার আগেই। পরিতোষ তো নয়। অচেনা স্বামী-স্ত্রী। কোনো সাড়াশব্দ না করে এতটা কাছে চলে আসা খুবই। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ।

লোকটি কোনো প্রশ্ন করার আগেই আমি পরিতোষের নাম।

লোকটি স্নায়ু শিথিল করে ইংরেজিতে জানাল, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ব্যানার্জী

তো একটু আগেই...

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে পরিতোষের সম্পর্কে। আজ সকালেই ওরা গেছে বেতলা। সেখানেও থাকতে পারে, অথবা। আমি কি এখন পরিতোষের খোঁজে বেতলায়? বেতলায় চমৎকার জঙ্গল। জীপ নিয়ে ঘুরলে হরিণের পাল, কখনো বাঘ কিংবা হাতিও, দারুণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সেখানেও গিয়ে দেখি পরিতোষ ইতিমধ্যে আবার? এখন এইভাবেই পরিতোষকে খুঁজতে খুঁজতে আমার সারা জীবন।

একটু হাসি পায়। ঠিক যেন গেছোবাবা। আমি যাই উত্তরে তো সে দক্ষিণে। আমি টালা গেলে সে চেতলায়। তা ছাড়া আমি পরিতোষকে এত খুঁজছিই বা কেন? কলকাতা থেকে বেরুবার সময় তো।

মনস্থির করে ফেলি। এবার ফেরার পালা।

অচেনা দম্পতি ভদ্রতা-মেশানো চা আমার জন্য। আমি প্রত্যাখ্যান। আমি ওদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন আমায় এখনই পরিতোষের খোঁজে।

বাংলো ছেড়ে হেঁটে এসে রাস্তার ওপরে। আর ট্রাক নয়। এদিকে দিয়ে বাস যায় জানি। একঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পর পর।

একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ। ঘড়ি নেই, কতটা সময় কাটল জানি না। কটা সিগারেট খরচ হলো সেই অনুযায়ী সময়। এক প্যাকেটে যদি দু'ঘণ্টা চলে তাহলে সেই হিসেবে সাতটা সিগারেটে প্রায় দেড়ঘণ্টা। একা থাকলে অবশ্য একটু বেশি ঘন ঘন।

যেন আমার জীবনের দেড়ঘণ্টা আয়ু ছিপাদহের এক গাছতলায় খরচ করার কথা ছিল। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ঝগড়ায় মত্ত এক ঝাঁক ছাতারে পাখি। এই দৃশ্যটিও নির্দিষ্ট আমারই জন্য। পর পর তিনটি নারীচরিত্র বর্জিত মোটরগাড়ির ঠিক এই সময়েই এই রাস্তা দিয়েই।

একটু একটু বিরক্তির ভাব আসাতেই আমি তাড়াতাড়ি সতর্ক। না, বিরক্ত হলে চলবে না তো। পদ্মপাতায় টলটল করছে জল, কখন গড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, এর মধ্যে আবার বিরক্তির সময় নষ্ট? তার বদলে গুনগুন করে একটা গান। ধারে কাছে কেউ না থাকলেই আমি ভরসা করে একটু গান গাইতে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা কিশোরী মেয়ের অভিমানী মুখ। কেন এই মুখটা ভুলতে পারছি না? ট্রেনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। এরকম তো আরো কতবার। অনুরাধা, শুধু এই নামটা জানি, আর ওর সম্পর্কে কিছুই না। হলুদ ফ্রক পরে শুয়েছিল বাঙ্কের ওপর, চোখের পাশ দিয়ে জলের রেখা। ওর সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হবার কথাই নয়। তবু যদি এখনো। হয়তো এখনো।

বহুদূরে বাসের চেহারা। আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে। তখন চোখে পড়ল, খুব কাছেই, উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে কলসী মাথায় সেই স্ত্রীলোকটি। সাহেবরামের ভাবী। দুধ বিক্রি শেষ। দু'একবাব আমার দিকে চোখ। কোনো কথা নেই।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মায়ি, ঘর যা রহা হ্যায় ?

যেন কতকালের চেনা। সে নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে। আমি তার গাম্ভীর্য ভাঙার চেষ্টা করি। হালকা গলায় আবার বলি, সব দুধ খতম ? থোড়া সে দেওনা হামকো ?

সে এবারও কথা বলে না। তবে হাসে। একটা হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে জানায়, নেই, নেই।

ওর সঙ্গে ওদের গ্রামে আবার ফিরে গেলে কেমন হয় ? থেকে যাব সাহেবরামদের বাড়িতে। খাটব সবজি ক্ষেতে। সকালবেলা কাঁচা দুধ। বিকেলে মহুয়া। একটা ইস্কুল খুলে মাস্টারবাবু হয়ে বাকি জীবনটা ?

বাস এসে ওকে আড়াল করে দাড়ায়। আমি আর কিছু চিন্তা না করে লাফিয়ে। কলকাতাব ছেলে আবার কলকাতায়। এই গ্রামে তিনদিনের বেশি চারদিন থাকতে হলেই পাগল হয়ে। ওসব কল্পনাতেই।

আঃ, বাসটা কি এই সময় একটু খালি থাকতে পারত না ? একটা বসবার জায়গা ? গিসগিসে ভিড়। এত লোক সকালে উঠেই কোথায় যায় ? আমি দেড়ঘণ্টা বাস্তায় দাঁড়িয়ে। ভিডেব মধ্যে তীব্র মানুষ-মানুষ গন্ধ। যদি বাক্ষস হতাম, সব ক'টাকে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই একজোড়া বরবধূ। বউটি বসবার জায়গা পেয়েছে, বব দাঁড়িয়ে। বরেব কপালে তখনো চন্দনের ফোঁটা। যেন বাসবশয্যা থেকে সোজা উঠে এসে। দৃশ্যটার মধ্যে খানিকটা যেন ট্র্যাজিক সুর মেশা। নতুন বউয়ের মুখটা অবিকল নতুন বউয়েব মতন। হয়তো পবশু দিন পর্যন্ত ও ছিল কুলি-রমণী, আবার কাল পবশু থেকে। মাঝখানে এই একটা দুটো দিন ওর মুখটা একেবারে আলাদা। ওদের জন্য একটা ঘোড়ায় টানা রথ অর্থাৎ অন্তত একটা টাঙ্গা যদি। শুধু আজকেব জন্য। আজ ওদেব খানিকটা আলাদা সম্মান। তবু কেন বাসে ? হয়তো দরত্ব আরও বেশি।

ডালটনগঞ্জে আসতেই নেমে। এখান থেকে আবার ট্রেন। বেশ গরম। একবার স্নান করতে পাবলে। স্টেশনেব প্লাটফর্মে একটা কলে দু'জন লোক। আমি লোকজনের চোখের সামনে কিছুতেই।

চট করে পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে ? স্বামীনাথনবা যে রকম সহৃদয়, আমাকে আবার দেখলে নিশ্চয়ই খুব খাতির-যত্ন। অনায়াসে ওখানে স্নানটান করে, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে।

সেদিকে পা বাড়িয়েও ছিলাম। আবার থমকে। এখন দুপুর। স্বামীনাথন নিশ্চয়ই অফিসে। দুপুরবেলা একা পদ্মা। শরীরে আলতো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে খেলে। হয়তো মেয়েটি খুবই ভালো, সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, শুধু শুধু আমার লোভ। নির্জন দুপুরে একটি ভালো মেয়েকেও আমি।

ফিরে এলাম। কয়েক মিনিট বাদে আবার। মনটা চঞ্চল হয়ে অবাধ্য। গেলে ক্ষতি কি? মেয়েটি বড্ড সুন্দর। শুধু চোখে দেখতেও। কিন্তু তা হয় না। চোখ অস্থির গর্জন করবে। শরীর যেন চুম্বক, কিছুতেই কাছাকাছি না এসে।

অতিকষ্টে নিজেকে দমন করতেই। একটা যেন দারুণ বীরত্ব। আমার বন্ধুর বাড়ি, যেখানে যাওয়ার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেখানেও।

স্নান হলো না। একটা দোকানে খেয়ে নিয়ে ট্রেনের কামরায় বসে লম্বা ঘুম।

ডেহরি-অন-শোন-এ পৌঁছতে পৌঁছতে রাত। এক্ষুনি বম্বে মেল। টিকিট কেটে উঠলেই সোজা কলকাতা। এবারের মতন ভ্রমণ শেষ।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা ঝনঝন শব্দ। আমাকে অন্য কোথায় যেন। না গিয়ে উপায় নেই, যেতে হবেই হবেই, হবেই হবেই। কথা দেওয়া আছে। কার কাছে? নিজের কাছেই, আবার কার?

একটা শেয়ারের ট্যাক্সি তখনই ঔরঙ্গাবাদের দিকে। উঠে জায়গা করে। চোখ খর করে সব সময় বাইরে। পেরিয়ে না যায়। জায়গাটা ঠিক যদি চিনতে না পারি। না চিনলে আর আপশোষের। সুলেমানপুরে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, রোখকে, রোখকে।

কেউ জানে না কেন আমি সুলেমানপুরে। অন্য লোকরাও অবাক। একজন জিজ্ঞেস করল, এখানে কার কাছে যাবেন? উত্তর দিলাম না। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করে।

ট্যাক্সিটা দূরে মিলিয়ে। আর কোনো উপায় নেই। এবার আমি একা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এ জায়গায় আগে কখনো আমি। কারুকে চিনি না। শুধু একটা নাম জানি, অনুরাধা। এই নামটা শুধু সম্বল করে কোথায় যাব। কোথায়?

তবু এখানেই।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

এই শহরে এখন কে আমাকে আশ্রয়? কোথাও কোনো হোটেল কিংবা। রাত্তিরটা অন্তত।

যে-কোনো একটি বাড়িতে গিয়ে কি? যদি বলি, আমি পথিক, যদি আমাকে একটু। সেসব দিন এখন আর নেই। অচেনা লোককে কেউ অতিথি করে না।

শুধু তারাই আশ্রয় দেয় যারা পয়সা নেয়। রূপকথার গল্পের মতন কোনো বাড়ির জানলা থেকে এখন কেউ যদি আমাকে হাতছানি দিয়ে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বন্ধ দোকান। সম্ভবত বাজার। একটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে ক্ষীণ আলো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা।

—শুনছেন। এই যে, শুনছেন।

প্রথমে কেউ সাড়া দেয় না। কথাবার্তা থেমে। আমি আবার টিনের দরজায় ঢকঢক শব্দ।

—কে ?

—একটু খুলবেন ?

দরজা সামান্য ফাঁক। এটা একটা ভাতের হোটেল। টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো ওল্টানো। এক কোণে নিজেদের লোকেরা খাবার-টাবার নিয়ে—

—কি চাই ?

—কিছু খাবার পাওয়া যাবে ?

—না, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

—শুনুন না, একটু খুলুন—

একটি মহিলাকৃতি লোক এগিয়ে এসে বলল, কি বলছেন কি ?

সেই বিরাট লোকটির সামনে আমি প্রায় চুপসে। কোনো রকমে মিনমিন করে বললাম, আমি একটু থাকা আর খাওয়ার জায়গা খুঁজছিলাম।

—কোথা থেকে আসছেন ?

—এমনিই ঘুরতে ঘুরতে। এখানে আর কোনো হোটেল নেই ?

- না। ঔরঙ্গাবাদে চলে যান।

- সে তো অনেক দূর। আপনার এখানে একটু থাকার জায়গা।

লোকটি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে খুব ভালোভাবে সন্দেহাকুল চোখ। আমি নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল।

--এখানে কি জন্য এসেছেন ?

চট করে উত্তর দিতে পারি না। সম্বল মাত্র একটি নাম। অনুরাধা বসুমল্লিক। একটি কিশোরীর নাম করে কি কোনো খোঁজ ?

—এদিকে জমির খোঁজে এসেছিলাম।

—জমি ?

—হ্যাঁ। শুনেছিলাম এদিকে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ট্যাক্সি ব্রেকডাউন হয়েছিল, পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল।

আমাকে দেখলে কি জমি কেনা মানুষ বলে ? তবু যদি ওরা ভাবে আমার সঙ্গে অনেক টাকা। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমি আবার বলি, জমি কিনে একটা

ফ্যাকটরি হবে, আমার মামার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

—জাঠমলের কাছে খোঁজ করুন।

—কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় থাকা যায়? আপনার হোটেলে ঘর নেই?

—এটা থাকার হোটেল নয়, শুধু খাওয়ার।

দু'জন অল্পবয়েসী বেয়ারাও বাইরে এসে। একজন বলল, ডাকবাংলোতে যান।

—কত দূরে?

—দ' আড়াই মাইল।

—এত রাত্রে সেখানে যাব কি করে? গিয়েও যদি জায়গা না পাই? আপনার ওই টেবিল দুটোর ওপরে যদি শুয়ে থাকি?

ভবিষ্যৎ ফ্যাকটরি মালিকের ভাগের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব প্রত্যাশা করা যায় কিনা, ওরা সেটা ঠিক বুঝতে। এ ওর মুখের দিকে। দীর্ঘকায় লোকটি বলল, ওটার ওপরে এই ছেলেরা শোয়।

—আর কোন জায়গা নেই? যদি একটু সাহায্য করেন।

ওরা নীরব। আমি যেন বেশি বাড়াবাড়ি। সামান্য রাত্রে ঘুমোবার জন্য। বৃষ্টি নেই, মাঠে-ঘাটে গাছতলাতেই তো। আমার তো নেই বাটপাড়ের ভয়। আসলে হয়তো, এই বিকেটি হোটেলের নড়বড়ে কাঠের টেবিলে শোওয়ার জন্যই আমার লোভ। ওই জায়গাটাই আমার চাই। এ-রকম অসঙ্গত লোভ আমার মাঝে মাঝেই। যেন ওই জায়গাটা না পেলে কিছুতেই আজ আমার ঘুম।

ছেলে দুটি স্থানচ্যুত হতে চায় না। একজন বলল, পদমজীর বাড়িতে ইরিগেশানের বাবুরা ছিল কিছুদিন।

—দ্যাখ তো সেখানে ঘর খালি আছে কিনা।

একটি ছেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে। পদে পদে হোঁচট খাওয়ার ভয়। কোথা থেকে কোথায়। কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম। আর আজ। সুখের বিছানা ছেড়ে এই মাঠের মধ্যে। এই অনিশ্চয়তায় আমার দারুণ আরাম।

একটা লম্বা স্কুলবাড়ির মতন। অনেক ডাকাডাকি করে পদমজীকে। টকটকে লাল চোখ। আশু মুখুজ্যের মতন গোঁফ। বোঝা যায় সন্ধে থেকেই গাজা।

ছোট ছেলেটি আমার সমস্যা বুঝিয়ে বলায় সে কোনো রকম বিস্ময় দেখায় না। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, তিন রূপিয়া চার আনা রোজ।

রেট যথেষ্ট বেশি। সাধারণ হোটেলেই চার টাকা। তবু দরাদরি না করে আমি একটা দশটাকার নোট। এবং কিছু চিন্তা না করে বললাম, তিন রোজকা।

ঘরটা বিস্ময়কর রকমের পরিষ্কার। ধপধপে শাদা দেয়াল, মাঝখানে একটি খাটিয়া। সব মিলিয়ে বেশ একটা শুকনো টাটকা ভাব। এতটা আশা করিনি।

ছেলেটাকে বিদেয় দিয়ে আমি অবিলম্বে শুয়ে। আজ রাতের মতন পেটে কিল মেরে।

কোথায় কখন থাকি, তার ঠিক নেই। তবু এই ঘরটা কেন তিন দিনের জন্য? যেন এখানে একটা চুম্বক আছে। আমাকে টেনে রাখছে।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট গোলমাল। গাঁজাখোরদের হল্লা। কখনো একটি স্ত্রীলোকের সরু কণ্ঠস্বর। তবু আমি না উঠে। অচেনা জায়গায় বেশি কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।

সকালে উঠেই চায়ের জন্য। এখানে চা পাওয়া যায় না। যেতে হবে বাজারে। একেবারেই বেরিয়ে পড়া যাক। মুখটুক ধুয়ে নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে।

চা খাওয়ার পর আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেলি। শুধু একটা নাম। ওতে কোনো লাভ নেই। যুবকটিরও পদবী যদি। সুতরাং সারা শহরটা টহল মেরে। যদি হঠাৎ।

শহরটা ছোট। বাজার আর কিছু খুচরো দোকান, ছড়ানো ছেটানো বাড়ি। একটা তিরতিরে নদী। রেল স্টেশন ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

মন্থরভাবে প্রতিটি রাস্তা দিয়ে। প্রতিটি বাড়ির দিকে সতর্ক চোখ। দরজার দিকে, জানলার দিকে। বাড়ির পেছনের উঠোনে। যে-কেউ আমাকে ভাবতে পারে পুলিশের লোক।

কেন আমি এ-রকম করছি? কেন ঐ মেয়েটিকে? নিজেই জানি না। মেয়েটিকে খুঁজে পেলেই বা কি লাভ? জানি না। আমি তাকে কি বলব? জানি না। হঠাৎ কেউ আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর? জানি না।

অন্তত তিনবার গোটা শহরটা চষে ফেলে। এখানে বাঙালিই প্রায় চোখে পড়ে না। এমন হতে পারে ওরা এর মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে। কিংবা এই রেল স্টেশনে নেমে দূরের কোনো গ্রামে। তাহলে আমি এখানে কি করছি? তিন দিনের জন্য ঘর ভাড়া।

একটা বাড়ির দিকে আমার বার বার চোখ। পুরোনো বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালে আইভি লতা। বাড়িটার গেটে বাংলা অক্ষরে লেখা 'চৌধুরী কুঠী'। এরা বাঙালি। সুতরাং এখান থেকে কোনো রকম খবর হয়তো। কিন্তু চৌধুরীদের সঙ্গে বসুমল্লিকদের কি আত্মীয়তা? জানি না। একজন প্রৌঢ় লোককে সে বাড়ির সামনে কয়েকবার। বেশ রাশভারী চেহারা। বাড়িটার পেছনে ঘন ঘন মুরগির ডাক। বেশ কয়েকটা মুরগি আছে বোধহয়।

প্রৌঢ় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে? কিন্তু কি জিজ্ঞেস? একটি মেয়ের নাম? সে আমার কে হয়? যদি আমাকে লম্পট হিসেবে? মহা মুশকিল দেখছি!

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরে বাজারের দোকানে। খেয়ে পদমজীর ঘরে ঘুম। কিন্তু গাঢ় ঘুম হয় না। অনেক রকম স্বপ্ন, এলোমেলো। একবার অনুরাধাকেও। সেই দুঃখ ও রাগ মেশানো মুখ। অনুরাধার সঙ্গে দেখা হলেও ও কি আমাকে চিনতে? কি জানি, ভয়। কেনই বা চিনবে? আমি ওর কে? এমনকি ভালো মতন আলাপ তো।

বিকেলে আবার। জানি পণ্ডশ্রম, তবুও নেশার মতন। পৃথিবীতে আমার এখন একমাত্র কাজ অনুরাধা বসুমল্লিককে খুঁজে বার করা। না হয় শুধু একবার তাকে দেখেই। হয়তো সে এখানে নেই। তবু এখানে সে ট্রেন থেকে নেমেছিল, সেই জন্যই শহরটা চুম্বকের মতো।

ঠিক সন্ধের আগে আমি যুবকটিকে হঠাৎ। সে একটা ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছিল। আমি তাকে এক পলক দেখেই। কিন্তু সেও কি আমাকে? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে।

আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে দুম দুম যেন বাইরের লোকও শুনতে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে নিরাশ হবার ঠিক পরেই এই আশাতীত। এত বেশি আনন্দ যে অনেকটা ভয়ের মতন। দারুণ ভয় ও দারুণ আনন্দের প্রতিক্রিয়া যেন একই রকম।

ডাক্তারখানায় কেন? কার অসুখ? অনুরাধার? তা হলে সে বিছানায় শুয়ে নিশ্চয়ই। কিছুতেই দেখা হবে না। আমি যদি ডাক্তার হতাম, ইস!

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে যুবকটি আবার একটি দোকানে। আমি খানিকটা দূরে। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। যেন গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা। সিগারেট ধরিয়ে বার বার আড়চোখে।

যুবকটি সেই দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই, আমিও তার পেছন পেছন। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। হয়তো যুবকটি আমাকে দেখলেও। ট্রেনের কামরার সঙ্গীদের কে মনে রাখে। আমি রেখেছি, আমি তো রাখবই!

আসলে আমি সারাদিন খুবই বোকামি। একটি মেয়ের বদলে একটি ছেলেকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ! আমি যদি ছেলেটিকেই কোনো না কোনো দোকানে। কিংবা বাজারে। একটা ছেলে তো আর সারাদিন বাড়িতে। আসলে ছেলেটির কথা আগে আমার মনেই। সব সময় অনুরাধার মুখ।

শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে যুবকটি যে বাড়ির সামনে আসে, সেই বাড়ির কাছ দিয়ে আমি আগে অন্তত পাঁচ ছ' বার। এই তো সেই বাড়িটা! সেই চৌধুরী কুঠী। কুকুরের মতন শুঁকে শুঁকে আমি তাহলে ঠিক বাড়িতেই। ইস একটা বেলা শুধু শুধু।

বাড়িটা হলুদ রঙের একতলা। সামনে ছোট বাগান। বেশ পুরোনো আমলের

বাড়ি, মোটা মোটা থাম। গেটটা ভাঙা। রাত্তিরে যে-কোনো চোর অনায়াসেই। বাড়িটার চারপাশে অবশ্য দেওয়াল।

সামনেই রাস্তার ওপাশে মাঠটা ঢালু হয়ে। একটা বিরাট তেঁতুল গাছ। সেই তেঁতুল গাছের ওপাশে হেলান দিয়ে একজন মানুষ যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আমার পা ব্যথা করে। অস্বস্তি ও লজ্জা।

অন্ধকারে কোনো দৃশ্য নেই। চোখের সামনে শুধু পাতলা বা গাঢ়। মাঠের দিকে চেয়ে থাকার কোনোই মানে। শুধু বাড়িটাতেই আমার। বাড়িটা নিস্তব্ধ এবং বাইরের দিকে আলো নেভানো। কতক্ষণ আর কতক্ষণ এইখানে। এবং কি ভাবে? কি ভাবে আমি অনুরাধাকে? কোনো উপায়ই তো চোখে। অস্বস্তিতে শরীরটা কেন কাঁপার মতন। বুকের মধ্যে ব্যথার মতন, গলার কাছে বাষ্পের মতন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য আমি আরো বেপরোয়া হয়ে। সন্তর্পণে চোরের মতন গেট খুলে বাগান পেরিয়ে। সারা বাড়ি শব্দহীন। এ বাড়িব লোকেরা কি, সন্ধেবেলাতেও কেউ বেড়াতে বেরোয় না?

রীতিমত অন্ধকার, তার মধ্যে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির পেছন দিকে। পায়ে কিছু একটা লাগলে আমি নিজেই চমকে। যদি ধরা পড়ি তা হলে কি? আমি অনুরাধার গোপনীয়তার ভাগ নিতে।

দাঁড়িয়ে থাকি, নিঃশ্বাসও প্রায় বন্ধ। সত্যিই এখন গা কাঁপছে। ফিরে যাব, ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের মতো কাজ। আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশি সাহস। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিরাট শব্দ করে দরজা খুলে একজন কেউ বাইরে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেউ কি কোনো রকম সন্দেহ?

ভারী গলায় একজন বলল, এই, দুটো চেয়ার দিয়ে যা তো বাইরে! জয়ন্ত, জয়ন্ত, এদিকে এসো!

—আসছি কাকাবাবু!

—এখানে বসা যাক। বেশ হাওয়া দিয়েছে!

আমি প্রায় মড়ার মতন। লোক দুটো বাইরে দাঁড়িয়ে। এখন আমি কি করে? বাড়িটার চারদিক পাচিল ঘেরা। পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে যদি শব্দ-টব্দ।

বাড়ির দেওয়ালে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। পুরোনো দিনের নোনাধরা দেওয়াল। ইচ্ছে করে গালটা ছোঁয়াই এবং কাঁদি। এরকম বোকামি কি কেউ? যদি এ বাড়িতে কুকুর?

লোক দুটি বাইরে বসে সশব্দে গল্প। অপরজন জয়ন্তর কাকা। তারই বাড়ি বোধহয়। তিনি জয়ন্তকে মুরগিপালন বিষয়ে কিছু। অনেকদিন পোলট্রি করেছেন মনে হয়। জয়ন্তর হুঁ হাঁ শুনলে বোঝা যায় তার কোনোই আগ্রহ।

যাক, তা হলে এখনো সন্দেহ করেনি কিছু। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,

যতক্ষণ না ওরা আবার ভেতরে। সে কতক্ষণ কে জানে।

খানিকটা দূরে একটা জানলায় আলো। আমি পা টিপে টিপে সেই দিকে। জানলার নিচের দিকটা বন্ধ, ওপরের দিকটা খোলা। আমার মাথার চেয়েও উঁচুতে। ডিঙি মেরেও কিছুতেই। অথবা যদি দেওয়াল বেয়ে। না, না, তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি। একটা ইঁট যোগাড় করতে পারলেও।

ভাঙা দেওয়ালে অনেক আলগা ইঁট। অন্ধকারের মধ্যে খুব সাবধানে একটা। তারপর সেই ইঁটের ওপর পা দিয়ে।

এক পলক দেখেই নিচু করে নিই মাথা। খাটের ওপর সেই মেয়েটি। অনুরাধা। সত্যি ? না স্বপ্ন ? খুব কাছে গিয়ে, চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে। তারপরেই আবার সরে। চোখ বুজে একটুক্ষণ হৃদয়ঙ্গম। হ্যাঁ, সত্যিই তো অনুরাধা। অসুস্থ কিনা জানি না। বুকের ওপর বই খোলা। আজ ফ্রক নয়, শাড়ি। কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। যেন শাড়িতে মোড়া এক গুচ্ছ চাঁপা ফুল। ওই এক ঝলকেই আমি দেখেছি তার কোমর। বিলিতি ছবির মতন। যতটা সুন্দর ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সুন্দর অনুরাধা।

এখানে আমি চোরের মতন। সত্যিই কি চোর ? কিছু তো নিতে আসিনি। আমাকে রূপচোর যদি বলে। সেটা কি দোষের ? জানি না। ওকে আর একবার দেখার জন্য আমার বুকের মধ্যে সাংঘাতিক।

আকাশ হালকা মেঘে ঢাকা ছিল। হঠাৎ এই সময় তা ভেদ করে বেরিয়ে এল লক্ষ্মীছাড়া চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হতেই আমার ভয়। এতক্ষণ হাত-পাগুলো অন্ধকারের মধ্যে। এখন নিজেকেই নিজে দেখতে পাই।

কোথায় লুকোবো ? যদিও এখনো আর কেউ। একটা ব্যাপার বুঝে গেছি, এ বাড়িতে কুকুর-টুকুর অন্তত। উঃ, যদি কুকুর থাকত, তাহলে এতক্ষণ আমাকে সাধারণ চোরের মতন।

অদূরে বারান্দায় লোক দুটি এখনো কথাবার্তায়। এখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে। কী করে যে মুরগিপালন থেকে বিদ্যাসাগরমশাই প্রসঙ্গে ? অ্যাট্রোশাস ! জয়ন্তের কাকা বোঝাচ্ছেন, কার্মাটারে বিদ্যাসাগরমশাই সাওতালদের কাছ থেকে ভুট্টা কিনে আবার তাদেরই সেইগুলো খাওয়ার জন্য। সেই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে... উঃ। কী ভুল ! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার কার্মাটারে। আমি চেঁচিয়ে ওনার ভুল শুধরে ? তাহলে হয়েছে আর কি !

আরো কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালা জানলার ওপাশেই অনুরাধা। ওর সঙ্গেও কোনো কথা। আমার অধিকার নেই। দেখার ? আবার পা টিপে টিপে জানলার কাছে। ইঁটের ওপর আঙুলের ভর দিয়ে। জানলার শিক ধরতে সাহস হয় না। দেওয়ালে।

অনুরাধার কি অসুখ ? নীল শাড়ি, অনাবৃত বাহু, পায়ের দুটি পাতা, কোমরের কাছে খানিকটা নগ্ন। বুকে ঢেকে রাখা দুটি স্থলপদ্ম। আমি চোখ দিয়ে শুধু এই সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে যে বিষাদ। ট্রেনে আমি ওকে শয়ান অবস্থায় কাঁদতে। একটি কিশোরীর চাপা দুঃখের মতন এমন তীব্র, মধুর, স্পর্শকাতর আর কী আছে পৃথিবীতে ? কিশোর বয়েসে আমারও এরকম কতবার।

দারুণ লোভ হচ্ছে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে। জানি, তা সম্ভব নয়। তবু লোভ। জানলা দিয়ে ওর নাম ধরে ? নিশ্চয়ই চমকে উঠে, ভয় পেয়ে। তা ছাড়া আমি ওর কে ? ও আমার এত আপন।

নিশ্বাসও বন্ধ করে থাকি। যাতে কোনোরকম শব্দ। দেখে দেখে আশ মেটে না। যদি একবার পাশ ফিরত, তাহলে মুখখানা আরো ভালো করে। ওর মাথা জানলার দিকে। আঙুলগুলো সোনার মতন, ওই আঙুলে হাজারবার ঠোঁট বুলোলেও।

অনুরাধা বইয়ের একটা পাতা ওল্টাল। অর্থাৎ জেগেই। তাহলে এখন কাঁদছে না। বই পড়তে পড়তে এখনো প্রায়ই আমার চোখ দিয়ে জল। সে অন্যরকম কান্না।

পায়ের তলা থেকে ইটটা পিছলে। একটি বিশ্রী শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নিচু করে বসে পড়ার জন্য। তারপরই প্রায় উ করে চেঁচিয়ে। কোনো রকমে মুখ চেপে। খানিকটা কাঁটা তার, এমন খোঁচা মেরেছে উরুতে। আস্তে আস্তে তারটা সরিয়ে।

অনুরাধা শব্দ শুনেছে। স্পষ্ট বুঝলাম খাট থেকে ও। তারপর জানলার কাছে। আলোর মাঝখানে ওর সিলুয়েট। সামনের দেওয়ালটা যেন স্ক্রিন। জানলার শিকগুলোর জন্য হঠাৎ মনে হয় কারাগারে এক বন্দিনী। ও কি চিৎকার করে ? তা হলেই তো আমি। না, না, অনুরাধা, আমি চোর নই, আমি তোমার শত্রু নই, তুমি আমাকে।

একটুক্ষণ ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই। চুলগুলো খোলা। হাত দিয়ে কপালের চুল। চিৎকার করে উঠল না শেষ পর্যন্ত। আসলে রাত তো বেশি হয়নি, এই সময় কেউ সাধারণত চোরের কথা।

আবার সরে গেল জানলা থেকে। আর না। এবার আমাকে পালাতেই। আর বেশি ঝুঁকি নিলে।

কিন্তু কি করে ? সামনে এখনো লোক দুটি। সামনে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

জয়ন্তর কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, রঘু, জল দিয়ে যা।

জল ? সন্ধেবেলা জল। শুধু জল ? তাহলে তো আরো কতক্ষণ কে জানে।

সুতরাং পাঁচিল টপকেই। খুব বেশি উঁচু নয়। আমার মাথা সমান। মাঝে মাঝে

আইভি লতা। শব্দ না করে কোনোক্রমে। খুব আস্তে আস্তে অনুরাধার জানলার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। পাচিলে ধররার মতন কিছুই নেই।

এক হতে পারে, বাড়ির পেছন দিকে যদি কোনো খালি জায়গা। আমি পাচিলের গা ঘেষে ঘেষে। বাড়ির পেছন দিকেও প্রশস্ত বারান্দা। একপাশে রান্নাঘর। ভাগ্যিস আমার উল্টোদিকে। রান্নাঘরে আলো, সেখানেও এক রমণী। বারান্দায় দুটি জ্বলজ্বলে চোখ। ভয়ের কিছু নেই, একটা বেড়াল। বেড়াল তো আর মানুষ দেখলে কুকুরের মতন।

সেই জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে। এবার পায়ের নিচে মাটি নরম। চটিজোড়া খুলে আগেই হাতে। এখন যদি এক দৌড়ে। সামনের দিকটা ফাকা মতন।

একটু দৌড়োতে গিয়েই আবার পায়ে কি যেন। নিচু হয়ে দেখলাম গোলাপ কাটা। এবং অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় একটা বাগান। অনেক গোলাপ ও বেলফুলের চারা। অনেক ফুল এখানে। গোলাপের রঙও শাদা। কিংবা জ্যোৎস্নায় রঙ বদলেছে। একটা গন্ধের ঢেউ।

কাটাটা না বার করলে। হঠাৎ আমি কীরকম বিহ্বল হয়ে পড়ি। ফুলের বাগানে এক চোর। তার পায়ে কাটা। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না পড়ছে তার মাথায়। কোন নিয়তি আমাকে এখানে? আমি কি এর যোগ্য? আমার চোখ জ্বালা করে ওঠে। আমার জীবনে কত ব্যর্থতা, কত কিছুই পাইনি, তবু কেন এই অপরূপ কুসুমগন্ধ।

কাটাটা খানিকটা ভেঙে গিয়ে ভেতরে। একটা গোল মুখওয়ালা চাবি পাওয়া গেলে। যাই হোক, এখন আর কি করা। এইভাবে এখানে কতক্ষণ? একটা বেলফুলের গায়ে টোকা দিয়ে তারে শিশির। একটা গোলাপের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে যেন কারুর ঠোঁট।

উঠে দাড়াতেই দেখি উল্টো দিক থেকে একটা লোক। খালি গা, মালকোচা ধুতি।

—কে?

এক মুহূর্ত আমি চুপ করে। বাগানের ওপাশে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। এক পাশে একটা বাশের গেট। খোলা। ঐখানে আমার মুক্তি।

—কে, কে ওখানে?

উত্তর না দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়।

—আবার এসেছে। দাদাবাবু। দাদাবাবু।

লোকটাও দৌড়ে গিয়ে গেটের কাছে। আমি ডান দিকে বেকে। যদি আর কোনো ফাকা জায়গা।

—দাদাবাবু, দাদাবাবু। হারামজাদা আবার এসেছে।

[illegible] পালাতেই হবে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই একঝাঁক মরাগ

কঁক্ কঁক করে। চমকাবারও সময় নেই। ওদিকে জয়ন্ত আর তার কাকাও। হাতে লাঠি আছে কি?

—ধর, ধর ব্যাটাকে!

খালি গা লোকটা এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ডাণ্ডা। ওদিকে আর কোনো সুবিধে হবে না। আমি একদম মার সহ্য করতে পারি না। ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

অতএব সামনের দিক দিয়েই আবার ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে। যত ইচ্ছে কাঁটা ফুটুক। পায়ের নিচে কি দু'একটা গাছের চারা? তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

জয়ন্ত আর কাকা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে ধরার জন্য। খালি হাত। ওদের যে-কোনো একজনকে এক ধাক্কা দিয়ে। এখন বারান্দাতে অনুরাধাকে।

যেন একটা ইঁদুরকে তিনটে বিড়াল। আমি এদিক ওদিক ছুটেও ফাক পাচ্ছি না। অনুরাধাই একটা দরজার খিল এনে জয়ন্তর দিকে।

আমি হঠাৎ বাগানের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, আমাকে মারবেন না! আমি চোর নই!

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ঐ কথাই আবার ইংরেজিতে। আমার শ্রেষ্ঠ উচ্চারণে।

জয়ন্তর কাকাই সাহস করে এগিয়ে এসে আমার কলারে হাত। খুব রাগী মুখ। যদি চড় মারে, সেইজন্য আমি সাবধান হয়ে।

—কে তুমি? এখানে কী করছ?

—বলছি, বলছি।

একটু হাঁপাচ্ছিলাম। দম নেবার জন্য একটু সময়।

—দয়া করে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলুন!

—কে তুমি?

—ভেতরে গিয়ে বলব!

ভেতরে নয় বারান্দা পর্যন্ত। রান্নাঘর থেকে মহিলাটি, ভেতর থেকে আরো একজন মহিলা। খালি গা লোকটা ডাণ্ডা হাতে আমার পাশে। সে জানাল, এ তো সে হারামজাদা নয়।

আরো একজন নিয়মিত চোর আছে। ওদের বোঝানো দরকার, আমি জীবনে এই প্রথম। জয়ন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। অনুরাধা এখনো আমার মুখটা ভালো করে। ও কি চিনতে পারবে না?

চটি জোড়া হাত থেকে নামিয়ে আমি জয়ন্তর কাকাকে খানিকটা হুকুমের সুরেই, জামাটা ছেড়ে দিন।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস, কে আপনি?

তুমি থেকে আপনিতে। এটা নিশ্চয়ই ইংরিজির জন্য।

—দয়া করে জোরে কথা বলবেন না! আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে চলে যাব।

—ইচ্ছে করে? এটা কি বাজার?

—আপনারা বাঙালি বলেই।

—বাঙালি তো কি হয়েছে?

—বলছি, একটু সময় দিন।

—সময় দিতে হবে? তুমি কোন লাটসাহেব?

জয়ন্তর কাকা আবার মারমুখী। ইনি আমার ইংরিজি শুনেও তেমন গুরুত্ব। ছেলেছোকরাদের কেউই আজকাল। বয়েসটাই অপরাধ।

—এখানে ঢুকেছ কেন?

—পুলিশের হাত থেকে বাচবার জন্য। একটু আগে আপনাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ি আগে দোতলা বাড়ি থেকে একটা লোককে বেরুতে দেখেছি। আই বি'র লোক। আমাকে দেখলেই ধরবে। তবে আপনাদের আগেই বলে রাখছি আমি চোর বা ডাকাত নই।

অনুরাধা এবার আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে। মুখটা ভালো করে দেখে, ওঃ!

আমি সামান্য হেসে, হ্যাঁ, ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

জয়ন্ত অবাক হয়ে, ট্রেনে! কবে? রমু, তুই একে চিনিস?

অনুরাধা ঘাড় নেড়ে এবং মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করে জানাল, না।

আমার শেষ আশাও। চিনতে পারল না? অথচ আমি যে ওকে সারা জীবনের মতন। আমার ভয় পাবার কথা ছিল, তার বদলে অভিমান।

জয়ন্ত আমার দিকে ফিরতেই আমি হাত তুলে। তাকে আর কথা বলতে দিই না।

—এক গেলাস জল পেতে পারি? খুব তেষ্টা পেয়েছে।

জয়ন্তর কাকা বললেন, রঘু জল এনে দে।

—আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি!

একথায় জয়ন্ত যেন একটু চমকে। আবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর জিজ্ঞেস, আপনার নাম কি?

—অশেষ মজুমদার।

পায়ে কাঁটাটার ব্যথা। একটু বসতে পারলে। রঘু জল এনে সামনে উঁচু করে। শুধু একটা ঘটি। গেলাস নেই, উঁচু করে আলগোছে খেতে হবে নাকি, ভিখিরিরা লোকের বাড়িতে এসে যেমনভাবে। সেই রকমভাবে খেতে গিয়ে জামা-টামা

একেবারে ভিজিয়ে।

খুড়োমশাই এবার রঘুকে ধমক, গেলাস আনতে পারিসনি!

—ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে।

তবু খুব তৃষ্ণার্তের মতন অনুরাধার দিকে একবার। ওর চোখে চোখ। কী ঐ চোখের গভীরে? মানুষ এখনো কি শিখেছে চোখের প্রকৃত ভাষা!

—আপনি পালাবার চেষ্টা করছিলেন কেন?

—আমি ভয় পেয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আই বি'র লোকটিকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ লুকিয়ে থেকে।

—কোন দিক দিয়ে এলেন?

আমি বাগানের দিকে গেটের দিকে আঙুল।

—ওদিকে তো রাস্তা নেই, ওদিকে তো মাঠ।

—পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে। সামনের বারান্দায় আপনারা বসেছিলেন তো।

—কতক্ষণ আগে?

—মিনিট পনেরো। পায়ে কাঁটা না ফুটলে এতক্ষণে হয়তো চলেই যেতাম।

কাঁটা ফোটার কথাটা কেউই গ্রাহ্য। জয়ন্ত আর তার কাকা চোখাচোখি। যেন আরো কিছু প্রশ্ন। মহিলাটি এবার সেটা।

—দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের ভয়ে পালাবে কেন?

কাকা বললেন, আমিও তো সেইটাই বুঝতে পারছি না।

কাকাকে উত্তর না দিয়েই আমি ভদ্রমহিলার দিকেই। তাঁর মুখে খানিকটা রাগ। আমি কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে, আপনি জানেন না। কেন ছেলেরা পালায়? এটা উনিশশো সত্তর সাল, তাও একথা জিজ্ঞেস করছেন? কলকাতায় থাকলে আমি এতদিনে মরে যেতাম।

অনুরাধা এবার জিজ্ঞেস, আপনি তপন আচার্যকে চেনেন?

—চিনতাম। সে মারা গেছে!

—কবে?

মনে মনে খানিকটা হিসেব। কবে কলকাতা থেকে ট্রেনে? তার আগের পরশুদিন।

—১৪ই মার্চ। ওর গুলি লেগেছিল।

অনুরাধার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে জ্বর। এর জন্যই ওষুধ আনতে জয়ন্ত। অনুরাধা এক পায়ের আঙুল দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চেপে ধরেছে।

—তপন আমার চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আমার বন্ধুর মতন ছিল। চমৎকার ছেলে। হীরের টুকরো ছেলে—

জয়ন্ত আমাকে থামিয়ে অনুরাধাকে, এই বমু, তুই ঘরে যা—।

—না, কেন?

—তোর এখনো গায়ে জ্বর, শুয়ে থাক, উঠে এসেছিস কেন?

—কিছু হবে না।

জয়ন্ত এবার আমাকে, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

ওদের শোওয়ার ঘরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে তারপর বসবার ঘরে। জয়ন্তর কাকা চাইছিলেন বাইরের বারান্দায়। আমি কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে। রাস্তা থেকে বারান্দাটা স্পষ্ট।

অনুরাধা এ-ঘরে আসেনি। তিনজন তিনটে চেয়ারে। জয়ন্তর কাকা বাইরের বারান্দা থেকে তার গেলাসটা। গেলাসে শুধু জল নয়।

—আপনি চা খাবেন?

—খেতে পারি।

—তপন আচার্য আমাদের বিশেষ চেনা ছিল।

এখন আমার পক্ষে নীরব থাকাই। মনে মনে আমি তপন আচার্যর চেহারাটা। হীরের টুকরো হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরাধার মতন মেয়ে যখন তার জন্য।

জয়ন্তর কাকা খানিকটা আফশোষের সঙ্গে, কেন যে ছেলেরা এরকম পাগলামি শুরু করেছে? এরকমভাবে কি দেশটা বদলানো যায়?

জয়ন্ত— আমারও মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল পথ। শুধু শুধু কতকগুলো ভালো ভালো ছেলে -

আমি তখনও নীরব। আমি অপরাধী। আমি ওরকম পাগলামিও তো। আমাকে পুলিশে কখনো। তবু আমি আন্তরিকভাবে তপনের বন্ধু হয়ে যেতে।

শুধু চা নয়, সঙ্গে মিষ্টি। সেই রাগী মহিলাই।

জয়ন্ত আবার আমাকে, এখানে কোথায় উঠেছেন?

—কোথাও না।

— তাহলে হঠাৎ কী ভাবে?

—ডেহরি অন-শোনে ছিলাম। সেখানে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মনে হলো, যদি কলকাতায় খবর চলে যায়। আজ বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেছি। তারপরেই আই বি লোকটাকে রাস্তায়—ও যে আই বি'র লোক সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট, কলকাতায় দেখেছি, মুখ চেনা।

—আপনি এখানে থাকতে পারেন।

—না, না, ঐ লোকটা যখন এখানে আছে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে

যেতেই হবে।

—আপনি তখন বললেন, ট্রেনে আগে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ। আপনারা যখন কলকাতা থেকে আসছিলেন, আমিও সেই কামরায় ছিলাম। আমি ঐ মেয়েটিকে, বোধহয় আপনার বোন, ওকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখেছিলাম।

একটা সত্যি কথা বললে অনেক মিথ্যের পাপই। কথাটা বলতে পেরে আমি অনেকটা হালকা। আমি অনুরাধাকে আগে দেখেছিলাম, সেই জন্যই দ্বিতীয়বার। আমার যা পাবার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

যেন পুরোনো পরিচয় বেরিয়ে পড়ল, তাই আড়ষ্টতা অনেকখানি। জলের গেলাস হাতে মহিলা তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনি ওপরের বাঙ্কে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আরো যেন কারা—

—ওরা আমার কেউ নয়।

জয়ন্ত এবার ঈষৎ হাস্যে, রঘু আপনার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসালেই হয়েছিল আর কি।

জয়ন্তর কাকা ঠোঁট থেকে গেলাস নামিয়ে, এক ব্যাটা চোর যে এখানে প্রায়ই আসে। মুরগি চুরি করে।

—আমাকে দেখে কি মুরগিচোর।

—হাঃ হাঃ হাঃ, না, না, তবে অন্ধকারের মধ্যে তো বোঝা যায় না।

আরো একটু পরে জয়ন্ত, আমার দিকে তাকিয়ে, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন?

—জানি না।

যেন আমি চির-পলাতক। এটা আমার ছদ্মবেশ। তবু মনে মনে আমি সেই রকমই। এক এক দিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

—কিসে যাবেন?

—ট্রেনে। রাত্তিরে কখন ট্রেন আছে

জয়ন্তর কাকা ফতুয়ার পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে। অনেকদিন আমি এ-রকম ঘড়ি। কাকার বদলে ওঁর ঠাকুর্দা হওয়া উচিত ছিল।

একটা তো রাত্তির সাড়ে আটটায়। আর মাত্র কুড়ি মিনিট পরেই। অবশ্য এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিনই লেট করে। আর একটা ট্রেন রাত তিনটেয়।

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে। আর বেশিক্ষণ এদের আতিথেয়তা।

—আমি সাড়ে আটটার ট্রেনেই যাব।

—কেন, রাতটা থেকে যান এখানে। বাড়ির মধ্যে কেউ আসবে না। এখানে

এখনও অতটা—হয়নি। নিরিবিলি জায়গা।

—না, আমার পক্ষে রাত্রে যাওয়াই সুবিধে।

—বসুন, কিছু খাবার-টাবার খেয়ে যাবেন। বললাম তো, ট্রেনটা লেট করবে।

—এই তো চা মিষ্টি খেলাম।

—ভাত হয়ে গেছে বোধহয়।

—না, ক্ষমা করুন। আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। আমাকে যেতেই হবে।

—তপন দেড় মাস বাড়ি-ছাড়া ছিল। কখন কী যে খেয়েছে না খেয়েছে।

—আমি জানি, তপন মরার সময় একটুও কষ্ট পায়নি। এক সেকেন্ডেই।

—রমুর খুব বন্ধু ছিল। ওর মনে এমন ধাক্কা লেগেছে।

—আমি এখন যাই।

দরজার কাছে অনুরাধা। আগের কথাগুলো কি ও?

অনুরাধার হাতে খানিকটা তুলো ও একবাটি গরম জল। অন্য দু'জন অবাক চোখে। অনুরাধা আমাকে, আপনার পায়ের কাঁটাটা বেরিয়েছে?

আর কেউ মনে রাখেনি। শুধু অনুরাধাই।

—না, খানিকটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে।

—কই দেখি? আমি বার করে দিচ্ছি।

আমি একেবারে আতঙ্কে। তা হয় কখনো? আমার পায়ে অন্য কারুর হাত।

—না, না, তার কিছু দরকার নেই। পরে আপনি আপনি বেরিয়ে আসবে।

অনুরাধা ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। আমার দিকে চোখ তুলে দেখল একবার। তারপর আবার মুখ নিচু করে, অনেকটা আপন মনে, গোলাপের কাঁটা আপনি আপনি বেরোয় না।

অন্য পুরুষ দু'জন একটু অস্বস্তিতে। ঠিক কী করা উচিত। তারপর জয়ন্তই উঠে এসে, দেখি, আমাকে দেখান তো, কোথায় কাঁটা ফুটেছে।

যাতে সেটা মিথ্যে না ভাবে, সেই জন্যই আমাকে সেটা তুলে। ঠিক মাঝখানে কাঁটার মুখটা।

জয়ন্তই সেটা তুলে দেবার চেষ্টা করার জন্য। তাকে বাধা দিয়ে অনুরাধা, তুমি সরো ছোড়দা, আমি তুলে দিচ্ছি।

—রমু, তুই ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে বসলি কেন? এই টুলটা নে না।

—কিছু হবে না। দেখি, আপনি ওই চেয়ারে বসুন।

এটা আমার প্রতি হুকুম। আমি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। জয়ন্তর কাকা তখন। বসুন না। কাঁটাটা তুলে ফেলাই ভালো। ভেতরে থাকলে নির্ঘাত ঘা হবে।

এবার আমাকে চেয়ারে বসতেই। আমার বাঁ পা থেকে চটি খুলে। অনুরাধা

তার নরম নবনী-হাতে আমার বিশ্রী ধুলো-মাখা পায়ের পাতা তুলে নেয়। খুব মনোযোগ দিয়ে। গরম তুলো ভিজিয়ে পায়ের তলাটা মুছতে মুছতে জানতে চায়, ব্যথা লাগছে?

এই যদি ব্যথা হয়, তবে সুখ কার নাম?

তবু আমি চোরের চেয়েও বেশি আড়ষ্ট মুখ করে। এবার সত্যিই আমি কিছু চুরি। এ তো আমার পাওনা নয়।

পরম যত্নে অনুরাধা আমার পা-টা রেখেছে ওর কোলে। তারপর মুখ ঝুঁকিয়ে কাঁটাটা। আমি শুধু ওকে দেখতে এসেছিলাম। তার বদলে এই স্পর্শ। কী মসৃণ চিবুক, গভীর নদীর স্রোতের মতন কাঁধ, পিঠের ওপর লুটানো বর্ষার মেঘের মতন চুল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই কি অলীক? আমি কি সত্যিই এখানে এই ঘরে?

কাঁটাটার জন্য সবাই উদগ্রীব। অনুরাধার মুখ দেখলে মনে হয় ঐ কাঁটা যদি আজ সারা রাতেও না ওঠে, তা হ'লেও।

আমি আত্মা মানি না। তপন আচার্য কি একেবারেই হারিয়ে? কোথাও কি তার আত্মা? তপন, তুমি কি কোথাও আছ? তাহলে এসো, দেখে যাও, এই সেবা। এই সেবা আমার জন্য নয়। তপনের কোনো বন্ধুর জন্য, আসলে তপনের জন্য। অনুরাধা যার পা থেকে কাঁটা তুলছে, সে ঠিক তোমারই মতন আর একজন, আমি নয়, আমি ছদ্মবেশী।

—এই যে উঠেছে!

অনুরাধার মুখে যে হাসি ফুটেছে, তার তুলনা কি-সে? ঐ ওষ্ঠের ঐ হাসিটুকু আমাকে চিরকালের জন্য দেবে? আমি ছবির মতো বাঁধিয়ে।

ওর চোখে চোখ রেখে আমি নীরব প্রশ্ন, তুমি আমাকে ট্রেনে দেখেছিল, চিনতে পারনি? মধ্যরাত্রে তুমি দরজা খুলে।

অনুরাধা নীরব চোখে উত্তর, হ্যাঁ, পেরেছি!

—তখুনি আমি হাত বাড়িয়ে, দাও, কাঁটাটা আমাকে দাও।

সেটা হাতের তালুতে নিয়ে। বেশ ধারাল। একটা কাগজে মুড়ে সেটা বুক পকেটে।

উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ফেলে, বাঃ একটুও ব্যথা নেই। দৌড়োতে পারব। আমি চলি।

ওই রকম সেবা নেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ থাকতে আরো লজ্জা। যদি ছদ্মবেশটা হঠাৎ। চির-পলাতক তো এক জায়গায় এতক্ষণ সময় কখনো।

অনুরাধা অবাক হয়ে, এক্ষুনি যাবেন?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

জয়ন্তর কাকা, যদি অবশ্য সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতেই হয়—